শনিবারের চিঠি
৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৮

বাঙালীর ইংরেজীয়ানা

ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায় শ্রীরাজশেখর বসু "ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার" বিষয়ে একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাদোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচারব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

"পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কুমারী তৃপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লানবদনে বলে—মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি, রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামে ধন্য হতে চায় না। নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না।...মিস-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তা ঘোষণা করা হয় না।

"আদিতে যার নাম ছিল আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, লাট সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য তার নাম কারমাইকেল কলেজ করা হয়। এখন আবার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে আর. জি. কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—Better Bengal Society। বাংলা দেশ এবং বাঙালীর

উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?"

এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। আমাদের চরিত্রগত দোষ বা ধাতুর গুণ যে কারণেই হউক, দুই শত বৎসরের ইংরেজ-সংস্রবের মধ্যে বহুবার আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া রাতারাতি ইংরেজ হইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের মনীষী ও চিন্তানায়কের দল বার বার ব্যঙ্গের দ্বারা, উপহাসের দ্বারা, কটূক্তি ও সদুপদেশ দ্বারা আমাদিগকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মুসলমান-শাসনে বাঙালী এমন আত্মবিস্মৃত হয় নাই; বাঙালী মুসলমানী রীতি সহিয়াছে এবং অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মজে নাই। পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে যখন নবাবের শাসন পূর্ণমাত্রায়, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' তখন শেষ হয়। ইহার এক স্থল সর্বজনবিদিত। মানসিংহ বঙ্গবিজয় শেষ করিয়া উপকারী ভবানন্দ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির করিতেছেন। মজুমদার-প্রসঙ্গে মানসিংহ ও পাতশার মধ্যে যে বাণী বিনিময় করা হইয়াছিল, তাহা—

"উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥"

লোকে সজ্ঞানে এই "অতএব"-এর জন্য যাবনী মিশাল ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু ইংরেজী-যাবনীর বেলা উনবিংশ শতাব্দীতে এই "অতএব" ছিল না। বাঙালী বিনা কারণে ইংরেজী ব্যবহার করিত, "শিশু যেমন মাকে-নামের নেশায় ডাকে" ঠিক সেই ভাবে। এই ক্ মজানো দুর্বলতা বাঙালী-চরিত্রে শুধু ইংরেজীর বেলাতেই আসিয়াছিল কারণ, দেখা যাইতেছে এই বাঙালীই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রাষ্ট্র

সমাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিরাট ও ব্যাপক অধিকারপ্রাপ্ত ফারসীকে সম্পূর্ণ উৎখাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তজ্জন্য কয়েকটি উদ্দেশ্যমূলক অভিধান রচনা ও প্রচারের আশ্চর্য শক্তিও সে দেখাইয়াছিল। ইংরেজীর বেলায় এই শক্তি আমরা এখনও দেখাইতে পারি নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট হইতে স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু ইংরেজীর মোহ আমাদের অশনে বসনে বাহিরে ঘরে রাষ্ট্রে সমাজে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এখনও জড়াইয়া আছে; মিস এবং মিস্টার তাহারই সামান্য প্রকাশমাত্র।

ইংরেজীয়ানার ইতিহাস আর একটু অনুধাবন করা যাক। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংরেজরা প্রথম বাংলা দেশে আসে। তাহাদের আগমন এবং গোবিন্দপুর ও সুতানুটিতে বাস স্থাপন কালে দেশীয়রা কেহই তাহাদের কাছে যাইতে সাহস করিত না, কারণ তাহাদের কথা তাহারা বুঝিতে পারিত না; ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলিত।

"১৬৮০ সালে কোম্পানির গুদামঘর স্বরূপ পুরাতন কেল্লাটি নির্মিত হয়, কলিকাতার অনেক বাসিন্দা এখানে নিযুক্ত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ নদীপথে হাজির হয় এবং বোটানিকাল গার্ডেনের ধারে নোঙর করে। বসাক এবং শেঠরা তখন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘর, ইংরেজ সওদাগরদের সঙ্গে তাঁহাদের কাটা-কাপড়ের কারবার ছিল। জাহাজের অধ্যক্ষ একজন 'দোবাস' (দোভাষী) পাঠাইবার জন্য ইঁহাদের সংবাদ দিলেন। মাদ্রাজে সাহেবরা দোভাষীদের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। বসাকরা জাতিতে তন্তুবায়, ইংরেজ সওদাগরদের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক দিনের পরিচয়, ইঁহারা প্রচুর পরিমাণে 'গড়া' কাপড় প্রস্তুত করিতেন এবং কোম্পানিকে বিক্রয় করিতেন। তাঁহাদের অনেক ধোবা থাকিত। জাহাজের অধ্যক্ষের দোবাস পাঠানোর অনুরোধে বসাকরা হতভম্ব হইলেন, প্রথমটা বুঝিতেই পারিলেন না সাহেব কি চান। শেষে

সমস্ত বসাক ও শেঠেদের পরামর্শ-সভা বসিল, এবং অনেক আলোচনার পর ইঁহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন, জাহাজের ক্যাপ্‌টেন নিশ্চয়ই একজন ধোবা চান, জামাকাপড় ধোলাইয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। একজন ধোবাকে ঠিক করা হইল, কিন্তু সে তো ভয়ে যাইতেই চায় না, তাহার পরিবারেও কান্নাকাটি উঠিল। শেষ পর্যন্ত যেন উত্তর মেরুতে অভিযানে যাইতেছে এই ভাবে সে গেল। তখন হিন্দুদের রীতি ছিল কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত খালি হাতে সাক্ষাৎ করিতে না যাওয়ার, সঙ্গে নজর বা উপহার হিসাবে কিছু লইতেই হইত। শিপ-সরকারদের মধ্যে এই প্রথার অত্যন্ত চল ছিল। নজরস্বরূপ সচরাচর পাকা কলা ও মিছরি সঙ্গে লওয়া হইত। জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের জন্য এই রজক মহাশয়ও নজর সঙ্গে লইলেন। এই দুঃসাহসী ব্যক্তিটি একটি ডিঙি নৌকায় জাহাজের ধার পর্যন্ত যাইতেই একটি তোপধ্বনির সঙ্গে তাহাকে সম্বর্ধনা করা হইল। ডেকের উপর লইয়া গিয়া তাহাকে অদ্ভুতভাবে অভিবাদন করা হইল, এবং সব কিছু কেতাদুরস্ত ভাবে হওয়ার পর তাহাকে ব্যাগভর্তি সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া বিদায় করা হইল। এই ধোবাই কোম্পানির প্রথম দেশীয় কর্মচারীরূপে বহাল হইল ও দীর্ঘকাল এই কার্য করিয়া ঘনিষ্ঠতার ফলে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল। কলিকাতার দেশীয় লোকদের মধ্যে এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম ইংরেজী পণ্ডিত।

"১৭৭৪ সালে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়, ইংরেজী জ্ঞান তখন কাম্য ও আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, রামরাম মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন, কেমন করিয়া কাহার কাছে তিনি শিখিলেন তাহা জানা যায় না। তিনি নিজে অনেকগুলি বাবুকে ইংরেজী শিখাইলেন, তন্মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সুপ্রীমকোর্টের একজন অ্যাটর্নির কেরানী ছিলেন; তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও উপরন্তু একজন প্রসিদ্ধ উকিল বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, কারণ তিনি ইংরেজীতে দরখাস্ত মুসাবিদা করিতে পারিতেন এবং সর্বনাশা ইংরেজী আইনের প্রণালী ও ব্যবহার অবগত ছিলেন—এই

আইনের অধিকারে কলিকাতার যে সকল প্রসিদ্ধ পরিবার ছিল তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই ইহার খপ্পরে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। রামনারায়ণ কিন্তু ইহার জোরেই ভাগ্য ফিরাইয়া লইলেন, কারণ তিনি এই ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পরে তিনি একটি স্কুল খুলিয়া হিন্দু যুবকদের নিকট হইতে মাসিক ৪ টাকা হইতে ১৬ টাকা হারে বেতন লইয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতে থাকেন। ইঁহার পূর্বেই আনন্দীরাম দাস নামক আর এক ব্যক্তি এই কাজে লাগিয়াছিলেন; ইনি রামনারায়ণের চাইতেও বেশি সংখ্যক ইংরেজী শব্দ জানিতেন। ইঁহার একটি নিজস্ব শব্দকোষ বা শব্দসংগ্রহ ছিল, এইটি ইংরেজী জ্ঞানের একটি রত্নভাণ্ডার স্বরূপ গণ্য হইত এবং অনেক হিন্দু যুবক ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার খিদমতগারি করিয়া তাঁহার খেয়াল-খুশি মাফিক এই রত্নভাণ্ডার হইতে টুকিটাকি সংগ্রহ করিতেন। এই ধর্মপ্রাণ দানবীর প্রত্যহ পাঁচটি কি ছয়টি শব্দ শিক্ষার্থী পিছু দান করিতেন। বাংলা অক্ষরই ব্যবহৃত হইত। একটু নমুনা দিতেছি—

লাড (Lord) ইশ্বর।
গাড (God) ইশ্বর।
কম (come) আইশ।
গো (go) জাও।
গোইন (going) জাইতেছি।

"রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু এবং আরও কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষা দিতেন অনেকটা আজকালকার ধরনে।* ইহারও কিছু পরে ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত প্রভৃতি কেহ কেহ পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত হইয়াছিলেন। তখন টমাস ডিসের স্পেলিং-বুক ও স্কুল মাস্টার ছাড়া আর কোনও বই ছিল না। আরব্য উপন্যাস ও তুতিনামার প্রচলন হয় আরও পরে। ইহার যে কোনটি পড়িতে পারিলে পণ্ডিত খ্যাতি লাভ হইত এবং যাঁহারা ব্যাকরণের সূত্রগুলি বলিতে পারিতেন, তাঁহারা মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

* রামকমল সেন "আজকালকার ধরন" বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কথা বুঝাইতেছেন।

"১৮০১ সালে মিঃ মিলার ইংরেজী ও বাংলাতে একটি ১৪০ পাতার মত পুস্তক সঙ্কলন করেন, যাহাতে বর্ণপরিচয়, সিলেবল বিভাগ, কয়েকটি দ্রব্যের নাম, ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্র এবং কয়েকটি গল্প ছিল।† বইটির ৪০০০ কপি ছাপা হয় এবং ছাপাখানা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই প্রত্যেক কপি বত্রিশ টাকা হিসাবে চার হাজার কপিই বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময়ে আমি কলিকাতার কিছু উত্তরে নদীর ধারে এক হিন্দু ভদ্রলোকের স্কুলে ইংরেজী শিখিতেছিলাম। তখন কোনও ব্যাকরণ বা অভিধান ছিল না। ফরস্টার সাহেবের অভিধান সবে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দাম এত বেশি ছিল যে, সাধারণ দেশীয়দের তাহা কিনিবার সাধ্য ছিল না।"

রামকমল সেনের ভূমিকা ইংরেজীতে লিখিত, আমরা অনুবাদ দিলাম। ইহা ১৮০১ সালের কথা। ইহার অব্যবহিত পরের ইতিহাস রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন—

"সর্ব্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী প'ড়িতে হইলে টামস্ ডিষ্ প্রণীত স্পেলিং বুক্, স্কুলমাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুল মাষ্টর" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামর, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়ল গ্রামর পড়িতেন, লোকে মনে করিত তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ নাই। তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—

গাড়—ঈশ্বর। লাড—ঈশ্বর। কম্—আইস। গো—যাও। আই—আমি। ইউ—তুমি। ইত্যাদি। এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা, Well—আচ্ছা—ভাল—পাতকো। Bear—সহ—বহ—ভল্লুক। সেকালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন এমন কতকগুলি

---

† ইহা রামকমল সেনের ভুল, ১৮০১ সাল নয়, জন মিলারের 'দি মাষ্টার' ('শিক্ষাগুরু') বইখানি ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল ; ফ্লোর (Flour) ময়দা ; ফ্লোর (Floor) মেজে। তাঁহারা "Flower" "Flour" ও "Floor" এই তিন শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করিত।…তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত কোন দ্রব্য শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন ; স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব ? গের্ডেন (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস (Spice) ঘোষাব ?" ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব ? যদি স্থির হইল গের্ডেন ঘোষাও তবে সর্দ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল ; "পম্‌কিন্‌—(Pumpkin) লাউ কুম্‌ড়ো ;" অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, "পম্‌কিন্‌—লাউ কুম্‌ড়ো"।—সর্দ্দার পোড়ো বলিল "কোকোম্বর (Cucumber) শসা" ; আর সকলে অমনি বলিল "কোকোম্বর শসা"। সর্দ্দার পোড়ো বলিল "ব্রিঞ্জেল (Brinjal) বার্ত্তাকু ;" আর সকলে অমনি বলিল "ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু"। সর্দ্দার পোড়ো বলিল "প্লোমেন (Ploughman) চাষা ;" আর সকলে অমনি বলিল "প্লোমেন চাষা"। …কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালী অর্থ বলান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী, তাল ঠুংরি

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি কাছে।

কট্‌ (Cut) কাট্‌, কট্‌ (Cot) খাট্‌, ফলোয়িং (Following) পাছে।…

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার এই দুরবস্থা ছিল। ইহার পরই ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীয়ানার ঢল নামিল। তাহার তোড় এমনই প্রবল যে, ১৮২১, ১৫ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার একজন পত্রপ্রেরককে নিতান্ত মর্মাহত হইয়া লিখিতে দেখিতেছি—

"প্রেরিত পত্র।—নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কুতকগুলি

লোকের আছে ইহাতে তাঁহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে।...

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন; নোটের নাম লোট, বডি গার্ডের নাম বেনিগারদ, লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলা ভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙালি পত্রও লিখেন না, সকলকেই ইংরেজী চিঠী লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন। কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন।"*

কিন্তু সত্যকার ইংরেজী শিক্ষা আসিতে বিলম্ব হইল না; ডেভিড হেয়ারের স্নেহে এবং ডিরোজিও-রিচার্ডসনের শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের দল মাথা চাড়া দিলেন! তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্জে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং পরবর্ত্তী মধুসূদন, রাজনারায়ণ, ভূদেব, ভোলানাথ, গৌরদাস, রামতনুর দল আসিলেন। ইঁহারা শুধু ইংরেজীতে স্বপ্নই দেখিলেন না, ইংরেজীয়ানার প্রবল বন্যায়—মদে গোমাংসে এবং নিরীশ্বরবাদে, আবেগে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় জাতি ও সমাজকে ভাসাইয়া দিতে চাহিলেন। এমন কি টুলো পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এবং দেশী পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্তও বৈদেশিক আদর্শ ও উদাহরণ দাখিল করিয়া এ দেশের ছেলেদের নীতিকথা শিখাইতে লাগিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং নূতন যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়া লিখিলেন—

"কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

লিখিলেন— "যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড।

মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥”

ভাল কথায় কাজ হইল না, গুপ্তকবি ক্ষুরধার ব্যঙ্গের কষাঘাতে এই
)দের জর্জরিত করিতে লাগিলেন—

“হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?…
যত কালের যুবো যেন সুবো,
ইংরেজী কয় বাঁকা ভাবে।…
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।…
হোয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।…
ঢুকে ঠাকুর ঘরে, কুকুর নিয়ে
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।…
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ডবের [Duff] টবে।

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা “বেথুন” এসে শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন “এ বি” শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটাচামচে ধোরবে শেষে,

ও ভাই! আর কিছুদিন, বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মোলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?
বুঝি "হুট" বোলে "বুট" পায়ে দিয়ে,
"চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।"

শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; এই সর্বনাশা বৈদেশিক প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি ঘরে ও বাহিরে সতর্ক হইলেন, তাঁহার নিকট ইংরেজীতে লেখা কোন নূতন আত্মীয়ের পত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ফেরত দিতে দ্বিধা করিলেন না, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধর্মের দোহাই দিয়া মাতৃভাষা ও স্বাদেশিকতার প্রচার করিতে লাগিলেন। জ্ঞানের দিক দিয়া এই কার্য করিতে লাগিলেন 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা তিনি ইংরেজী-মোহমুগ্ধ স্বদেশবাসীকে স্মরণ করাইতে লাগিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের প্রত্যেকের কোন-না-কোন দিক দিয়া মোহ আসিয়াছিল। কৃষ্ণমোহন ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু মাতৃভাষা ত্যাগ করেন নাই; মধুসূদনের কাছে ধর্ম ছিল একান্ত গৌণ, ধর্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাতৃভাষা ও জাতীয় সংস্কার বর্জন করিয়াছিলেন; প্যারীচাঁদ কিশোরীচাঁদ রাধানাথ প্রত্যেকেই ভাষায় ও ভঙ্গিতে বিজাতীয় হইয়া উঠিতেছিলেন। শুধু স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন ভূদেব ও রাজেন্দ্রলাল এবং কতকটা রাজনারায়ণ। ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ-রাধানাথের মোহ ভঙ্গ হইল, তাঁহারা সহজ সরল মাতৃভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' মারফৎ দেশের কথা ও কাহিনী দেশের সাধারণ লোককে শুনাইতে লাগিলেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাহির হইল ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া প্রবাসবাস ত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন, 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখিয়া যিনি বিশ্ব বিমোহন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তিনি লিখিলেন (১৮৬০)

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি।"

ইহাই পরে এই রূপ লইল—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে ; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

আমরা পাইলাম 'মেঘনাদবধ' 'বীরাঙ্গনা' 'ব্রজাঙ্গনা' 'চতুর্দশপদী' এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রেঁা' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'—নিজের মত পথভ্রান্তদের উপর কঠিন কষাঘাত। দীনবন্ধু আরও সক্ষমভাবে সেই কাজ করিলেন 'সধবার একাদশী'তে। মাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় বালক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' লিখিলেন—

"বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা আঘাত করিলে আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া খ্রীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। তৎকালে আশা ছিল যে কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া

অলাভে হতাশ হইয়া অশ্রুপাত ও আমায় শাপদান করিবে, এই সকল অদম্য মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই আমার খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়। যদি শ্রদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা কর, শ্রদ্ধা আমার অন্য ধর্ম্মে যেমন, খ্রীষ্টধর্ম্মেও সেইরূপ অর্থাৎ কিছুই নহে। আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার একটিও সফল হইল না। কোন বিবিই প্রণয়িভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাঙ্গালি বলিয়া ইংরাজেরা ঘৃণা, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগিলেন। মিশনরিরা যে অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন, তাহাতে আবশ্যক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত না। অতএব বাঙ্গালা ভাষার একজন লেখক হইয়া বসিলাম।...বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ ছিল না, অতএব চেষ্টাও হইল না। আমি বাঙ্গালার অধিবাসী, ভাষা, এমন কি সকলই অতিশয় ঘৃণা করিতাম। অতি পাপাচার ক্ষুদ্রদেহ কতকগুলি কৃষাণের স্বজাতীয় হইয়াছি এই ভাবিয়াই আমার কত ক্ষোভ হইত, আবার তাহাদের দেশে তাহাদের ভাষায় কিছু আনুকূল্য করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিব বরং মলিনগাত্র বীভৎসাচার নগ্নাঙ্গ পিশাচদিগের সহবাস তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আমার তখন মনের গতি এইরূপ ছিল।"

এই মনের গতি তখন অনেক শিক্ষিত বাঙালীর। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই সময়কার কথা এই ভাবে লিখিয়াছেন—

"দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিত দলের মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের যোল সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দুকালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে শুনিয়াছি যে কালেজের বালকেরা গোলদীঘির মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে

বসিয়া মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।

"একদিকে যুবক বয়স্থদিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ ওদিকে কালেজ গৃহে ডি এল রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ সেক্সপীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যাইতেন, এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন।..তাঁহার মুখে সেক্সপীয়ার শুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্দ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপান অবাধে চলিত। অতিরিক্ত সুরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সময় বুঝিয়া এই সময়ে সুবাগ্মী খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডফ তাঁহার মধ্য বয়সের অদম্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন।"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি এই বৈদেশিক ভাববন্যাকে রোধ করিবার জন্য নবগঙ্গাধরের মত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইংরেজীয়ানার আওতায় পড়িয়া এই সময়ে হাবুডুবু খাইয়াছেন। কিন্তু যুগন্ধরের সম্বিত ফিরিয়া পাইতে দেরি হয় নাই। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের "ললিতা" ও "মানসে"র লেখক দীর্ঘ বারো বৎসর পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মত মায়ের ভাণ্ডারে "বিবিধ রতন" খুঁজিয়া পাইলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একবার বাংলা দেশে ইংরেজীয়ানার বহর যাচাই করিয়া লইলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য গুরুর কাব্য-কবিতায় এই বিকারের পরিচয় ভাল করিয়াই পাইয়াছিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'একেই কি বলে সভ্যতা,' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' ও 'সধবার একাদশী' তাঁহাকে সঙ্কল্পে আরও

দৃঢ় করিয়া তুলিল। তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সমরে অবতীর্ণ হইতে আরও সাত বৎসর সময় লাগিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র 'বঙ্গদর্শনে' তিনি পাঞ্চজন্য-নিনাদে প্রথমেই ঘোষণা করিলেন—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ; ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?...

"লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর্, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়. কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।...

"আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি

ধার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের
র জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই
ন্ন হওয়া আবশ্যক।...এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা
বল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা
য়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র
রতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত এক-
রামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই
তক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়;
ন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী
ঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই
জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর
রাজি চলা আবশ্যক ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ
ইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।...
দি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত,
বে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা
ত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন,
ংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র।
াক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ
ন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে
াটি রূপা ভাল।...নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।
ংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন
খন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত
ানবস্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত
রিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু চাকা ঘুরাইয়া দিলেন না, নিজে সক্ষম হাতে
ঙ্গদর্শনে'র জুড়ি হাঁকাইতে লাগিলেন; তাঁহার সম্পাদনায় পাঁচ বৎসরে
ঞ্চাশ বছরের কাজ হইল। শিক্ষিত কৃতবিদ্যেরা আশ্বস্ত হইলেন,
াঙালীর আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়া আসিল। 'বঙ্গদর্শনে'র
খাদেখি শহরে ও মফস্বলে 'আর্য্যদর্শন' 'ভ্রমর' 'বান্ধব' 'জ্ঞানাঙ্কুর'

'ভারতী' 'সাধারণী' 'নবজীবন' ও 'প্রচার'—'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের মা
আঠার বৎসরের মধ্যে বাহির হইল, বাঙালী-সাহিত্যিকের মর্যা
ফিরিয়া আসিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরব্ধ কার্য কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার প্রায় সুসম্প
করিয়া আনিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনা
ভারতবর্ষ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি ফিরাইবার
প্রয়াস বরাবর করিয়া আসিয়াছিলেন, পুত্র দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ
জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র এবং কন্যা স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'তে তাহা সুসম্প
করিয়া আনিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'তে সেই সাধনা জয়যু
হইল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার ও রামবাগানের দত্ত-পরিবা
তখন কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের আদর্শ। ঠাকুর-পরিবার স্বভাষা
প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরজীবী হইয়া রহিলেন। দত্ত-পরিবারের শশিচ
গোবিন্দচন্দ্র তরু ও অরু ইংরেজীয়ানার মোহে পড়িয়া ক্ষমতাশা
হওয়া সত্ত্বেও বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ গ্র
করিয়া একমাত্র রমেশচন্দ্র আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন
বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তখনও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেও তি
লিখিলেন—

"আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে
যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকে
ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি
নবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"

সাহিত্যের দিক দিয়া কাজ যতটুকু বাকি ছিল, স্বদেশী আন্দোলনে
সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ব্রহ্মবান্ধব পাঁচকড়ি বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি
চেষ্টায় সেটুকুও বাকি রহিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে
রবীন্দ্রনাথ তৎপূর্বেই (১৮৯২) মন দিয়াছিলেন। 'সাধনা'য় "শিক্ষার
হেরফের" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার
দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

[১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইংরেজী রূপ

বির মধুসূদন দত্তই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা। এই ছন্দে লিখিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ১৮৬১ সনে এই কাব্যের দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়া অচিরে প্রসিদ্ধি লাভ য়াছিল। ১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে (বেঙ্গল য়টারে) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়; অমিত্রাক্ষর ন্দর কথাবার্ত্তায় আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্ব্বে অভিনীত হয় ই। এই অভিনয়ে দর্শক আকৃষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কাব্যের ধুর্য্য সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে নাই,—নাটকীয় সংলাপ একপ্রকার গদ্য রিয়া বলিবারই চেষ্টা হইত। ইহার দুই বৎসর পরে—১৮৭৭ সনের াই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ্‌ লইয়া, উহার ন্যাশনাল য়েটার নামকরণ করিয়া স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের হায্যে অভিনয় সুরু করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ভনীত প্রথম নাটক—মেঘনাদ বধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।* যাহাতে ব্য ও নাট্যের উভয় রসই সমভাবে উপভোগ করা যায় এই উদ্দেশ্যে াকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকাকারে থিত করিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং; রাম ও মেঘনাদ—এই যুগল মকায় তিনিই অবতীর্ণ হইতেন। অভিনয় যে চরম সাফল্যমণ্ডিত য়াছিল তাহা না বলিলেও্‌ চলে। সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঘনাদ বধে'র অভিনয় দেখিয়া তাঁহার 'সাধারণী' পত্রে (১০ ফেব্রুয়ারি ৭৯) লিখিয়াছিলেন—"...ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার চয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও রিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ণা হয় না।"

১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে এই নাট্যরূপ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক াকারে (পৃ. ৬৮) প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা ন্ধিত করিয়াছিলেন।

ইহার অল্প দিন পরেই গিরিশচন্দ্র-কৃত মেঘনাদবধের নাট্যরূপ প্রধানতঃ গদ্যে অনূদিত ও কর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া শ্যামপুকুর-নিবাসী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৫। পুস্তকে প্রকাশকাল না থাকিলেও উহা যে ১৮৭৯, ১৫ই আগষ্ট, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। ইংরেজী অনুবাদটি মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন—খ্যাতনামা ইংরেজীনবীশ রেঃ লালবিহারী দে। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

The Meghnad Badha or The Death of the Prince of Lanka. A Tragedy in Five Acts. As performed at the National Theatre Beadon Street. *Revised and Corrected by the Rev. Lal Behary Day.*

এই অনুবাদের শেষ সীমা মেঘনাদের পতন,—প্রমীলার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত নহে : "লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে !"

"Lanka ! thou proudest lotus in th' main,
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again !"

মধুসূদনের সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইংরেজী blank verse-এ আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় আরও কুড়ি বৎসর পরে—১৮৯৯ সনে ; পুস্তকের Preface-এ অনুবাদক সংক্ষেপে স্বীয় নাম "U. S." ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩+৬+১৯২+৭। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

The Fall of Megnadh. Being a Metrical Translation of the Famous Bengali Poem 'Megnadhbadh Kavya" of Michael Madhusudan Dutta. Calcutta. Printed by W. Newman & Co. 1899.

এই আক্ষরিক পদ্যানুবাদ আদৃত হইয়াছিল ; ১৯০৭ সনে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে অনুবাদকের পুরা নাম—Umesh Chandra Sen of the Provincial Judicial Service মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

্যাসের বিশেষ টেকনিক

্যাস যদি এতই বড় মুক্তিপথ, তবে তার জন্য বিশেষ টেকনিক দরকার। আমাদের বিশেষ টেকনিক—এক পা টেকনিক, যা মন্ত্রে আছে—Technic one step.

দীর্ঘ পথ দেখে ভয় পাই, উৎসাহ যায় দ'মে। হিতকথা অনেক ়ছি, কিন্তু ভয় কাটাবার মন্ত্র ও প্রেরণা কমই পেয়েছি। যারা ়য়েছে তারা ভাগ্যবান। অভীঃমন্ত্র ও উৎসাহ-প্রেরণার টেকনিকে মাদের সব চাইতে বড় প্রয়োজন।

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ' শুনেছি, 'শনৈঃ পন্থা শনৈঃ ন্থা, শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্' শুনেছি, কেউ আশা পেয়েছি, কেউ বা পাই নি, র্ঘ পথ ও বিরাট পর্বত চোখের সামনে এসে কেবলই ভয় দেখিয়েছে, ত-পা অবশ হয়েছে। এমন সময় এক ঋষির কাছে মন্ত্র পেলাম। ভৈঃ, দীর্ঘ পথ ও বিরাট পর্বত ভুলে যাও'। একটা পা ফেল, শুধু কটা পা—one step. ঋষি বললেন, First step is the hardest ep, তুমি শুধু ঐ প্রথম পাটার ভার নাও, দেখবে দ্বিতীয় পা আপনি পাবে, তার পরের পাগুলি (steps) নিজেরা নিজেদের ভার নেবে। ড়বার নিয়ম step by step—পরের পা পরের পা, শরীরকে পতন কে রক্ষা ক'রে হোঁচট খেলে, একটা পা ব্যর্থ হ'লেই বিপদ। গতির য়ম পা পাকে অনুসরণ করবে। এমনই এক পা এক পা ক'রে মার কাজ দ্রুত হবে, সহজ হবে, মিষ্ট হবে। Inertia, acclera-on, momentum গতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এরই অভিক্ষেপনে ভাবা রেছি—Nothing succeeds like succees, অতএব first p—প্রথম পা। শুভস্য শীঘ্রম্। আজই, এখনই, শুরু কর। ভুল ক, তবু শুরু কর, পরে শুধরে যাবে। Dread Debt Default e death—ফেলে রাখবে না। প্রথম পাটা বাড়াও, এখনই।

এই ফার্স্ট স্টেপের ঋষি আরও বলেন, Success is after the t step—শেষ পার পরই সফলতা। এই শেষ পাটা কোথায়, দূর, তা জানবার তোমার কিছুমাত্র দরকার নেই, তোমার প্রথম া হয়েছে, এবার অন্য স্টেপের পালা, তারা তোমায় ঠিক পৌঁছে

দেবে। Try try try again টেকনিক পুরোনো হয়ে ঝাঁজ কমেছে তা ছাড়া try মনে হয় যেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কোথায় তার শেষ? স্টেপ-টেকনিকের ঋষি বলেন, শেষ পা ও সফলতা দেখা যাচ্ছে ঐ যে ঐ শেষ পা, যেন দেখা যায়, Psycholgical planeএ মে ধারণা হ'লেও তার মূল্য অনেক।

এবার সফলতার পথটা একবার বর্ণনা করি। প্রথম থেকে সবগুলি পদক্ষেপ একত্র গেঁথে নিলে এই স্টেপস্-এর মালাটা হয় সফলতার মালা। আর পদক্ষেপগুলি পৃথকভাবে দেখলে ওগুলি মনে হবে ব্যর্থ। সেই ক্ষেত্রে মনে করতে হবে, ভুল ও ব্যর্থতার স্টেপস্ দিয়ে সফলতার মালা গাঁথা। কথা একই। একজন ঋষি বলেন, Mistakes and failures are matters of course like bad weather and measles. আর একজন বলেন, Failures are the pillars of success. এই স্বভাবের নিয়ম। সফলতা আসে বিফলতার ভিতর দিয়ে। মধু-আহরণে মক্ষিকা-দংশন অনিবার্য। মৃত্যু অমৃতের সোপান। জীবন্তেরই সমস্যা ভুল ও ব্যর্থতা। মৃতের এসব সমস্যাও মাথাব্যথাও নেই। I have never heard anyone stumbling while sitting down—পথ চলতে চলতে হোঁচট খায়, ব'সে ব'সে কেউ হোঁচট খায় না। এ অতি সোজা কথা।

প্রকৃতি-(nature)-ও এই ভুল ও ব্যর্থতার হাত এড়াতে পারে নি এক হিসেবে। আপত্তি না থাকলে বলতে পার, স্বয়ং ভগবানও—Godও এই ভুল ও ব্যর্থতা নিয়ে চলেছেন, হয়তো তাঁর লীলা। অ্যামিবা থেকে শুরু ক'রে Repetition, Rejection, Natural selection, Survival of the fittest. ইভলিউশনের নিয়মে তিন কোটি বা তিনশো কোটি বছরে এখানে এসেছি। God তো এই সব ফেল হওয়া বাদ দিয়ে এক লাফে, তিন মিনিটে অ্যামিবা থেকে এখানে পৌঁছে দেন নি। জীবনশিল্পী ভগবানের বিধান, এক পা এক পা ক'রে ভুল ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলা, এমনই ক'রে অনেক বার ফেল হ'য়ে ক'রে পাস করা, এমনই ক'রে শেষ পা ও সফলতাতে পৌঁছে দেওয়া। তারপর আর এক রাউণ্ড খেলা আরম্ভ, ঐ এক পা, ঐ ভুল ও ব্যর্থতা

নিয়ে তার গতি, যাকে বলি, Cosmic habit force—এই বিশ্বগতি ও স্বভাব। অতএব ভুল ও ব্যর্থতা অপরিহার্য ও অনিবার্য। তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখবে, এক ভুল দুই বা বহু বার করবে না, আর প্রত্যেক ভুল থেকেই শিক্ষা নেবে ও ঠিক পথটা ধ'রে নেবে। এই পন্থা, এই টেকনিক, আমাদের দর্শনের দৃষ্টিকোণে এই আমাদের শ্রেষ্ঠ টেকনিক।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক এডিসন। হাজার হাজার পরীক্ষা—experiment বা ভুল ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে সফলকাম। এডিসনের সফলতা ও বিফলতার সমান আনন্দ। প্রত্যেক সফলতার পর এডিসন আনন্দে নাচতেন আর বলতেন, পেয়েছি, পেয়েছি। আবার প্রত্যেক ব্যর্থতা ও বিফলতার পরও ঐ আনন্দ-নৃত্য ও মুখে ঐ একই স্লোগান—পেয়েছি পেয়েছি। বন্ধুগণ, পেয়েছি। এটা এ ভাবে করলে চলবে না, অন্য ভাবে করতে হবে, অন্য ভাবে কর। কি মজা আর একটা পথ পাওয়া গেল! একটা ভুল জানা মানে, সফলতার দিকে আর এক পা এগোনো। অতএব এডিসনের পাসেও যা, ফেলেও তা, একই আনন্দ-নৃত্য ও একই 'পেয়েছি পেয়েছি'।

ফার্স্ট স্টেপের ঋষি আগে বলেন, প্রথম পা অতীব কঠিন এবং তার পরই শেষ পা অত্যন্ত কঠিন। তবে একটা সহজ পথে সহজে এই শেষ পায়ে পৌছানো যায়। টেকনিক One more step—আর এক পা। হতাশ না হয়ে এই 'আর এক পা' সাধন কর, জয় হবেই। সব প্রতিভাই অনুকূল অবস্থা পায় না, অনেক প্রতিভা ব্যর্থতা ও হতাশায় দ'মে না গিয়ে এই 'আর এক পা' সাধনে জয়লাভ করেছে। ইতিহাসে অসংখ্য নজির আছে।

পল আর্লিক ক্লান্ত ও ব্যর্থ হন। সংকল্প—ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তার পূর্বে একটা experiment করবেন। হ'ল না। আর একটা, আর একটা। এগিয়ে চলে এই 'আর এক পা' সাধন টেকনিকে। ৬০৬ পা ফেলে পায় মানবকল্যাণে স্যালভার্সান। তার পরের সাধক 'আর এক পা' সাধনায় ৯১৪ পা ফেলে পায় নিওস্যালভার্সান। মাদাম কুরি, স্বামী হাল ছাড়েন, আস্তাবল বাসে 'আর এক পা' সাধনে পান রেডিয়াম। মনুষ্যবসতি থেকে হাজার মাইল দূরে Explorer

Nansen 'আর এক পা' সাধনে প্রাণ পায়, জয়লাভ করে। One more round এ মুষ্টিযোদ্ধা করবেট। বারো বছরে শতাধিক নাটক লিখেও ব্যর্থ হয়ে শেষ one more play সাধনায়, মার্কিন ই. এইচ. বারম্যান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে আসন পান। রবার্ট ব্রুসের কথা সবাই জানে, তাঁরও ঐ 'আর এক পা' সাধন।

অতএব অভ্যাস-অনুশীলন আমার শ্রেষ্ঠ টেকনিক। সাতটি অভ্যাস নিত্য—স্বাস্থ্য শক্তি সহ্য সেবা সন্তোষ অঋণ অপ্রবাস। আরব্ধ কাজে প্রথম পা, ব্যর্থতায় 'আর এক পা' সাধন। ভুল ও ব্যর্থতাকে নিয়েই চলব। অভ্যাস—পাতঞ্জলের ভাষায় 'তত্রাস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'।

তুমি প্রভু—মাধ্যম নয়

একাদশ সূত্র—Yourself with yes: Be yourself by yourself: Technic yes—আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ়সংকল্প হাঁ-সূচক ভাবনায় উন্নতি। Don't play in the second fiddle—অপরের পাখার নীচে না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। Don't lead a second hand life—পরের মুখে ঝাল খাবে না। আমি অমুকের মত হব, এই দাসমনোভাব ছাড়। তুমি তোমারই মত হবে এবং সেই তুমিই হবে শ্রেষ্ঠ। হার্বার্ট স্পেন্‌সারের কথা শুনতে চাই না, তোমার কথা শুনতে চাই। যদি হার্বার্ট স্পেন্‌সারের কথাই শোনাতে চাও তবে তাকে তোমার রক্তে মিশিয়ে নাও, তখন সেটা তোমারই কথা হবে। মাধ্যম মাধ্যম, সে প্রভু নয়। ডাকপিওন মনিঅর্ডারের টাকা দিয়ে কৃতজ্ঞতা পায় না, কারণ সে মাধ্যম মাত্র।

সেই শিক্ষাই সত্য শিক্ষা, যাতে নিজে বড় হবে। মাধ্যম নয়, প্রভু হবে। শিক্ষার প্রথম ধাপে সাধারণত মানুষকে নাবালক করে, তখন দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবার আশঙ্কা। তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে মানুষ জন স্টুয়ার্ট মিল বা রাস্কিন বা ইমার্সনের মুখাপেক্ষী হতে চায়। সাংখ্য-গীতার মুখাপেক্ষী হয়ে অর্ধচর্বিত হিতকথা আওড়ালেও নাবালকই থাকি। যখন শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপে উঠে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়, যখন sixth sense—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নেত্র জাগে, তখনই শিক্ষার সত্যি ফল পাই। অনেক সময় দেখতে পাই, শিক্ষিতের দৃষ্টির চাইতে

অশিক্ষিতের দৃষ্টি পরিষ্কার। পুস্তককীট পণ্ডিত যখন রবিবার মেলাতে পারে না, যখন সে টি-র টান ও আইয়ের পুঁটুলি নিয়ে বিব্রত, তখন অনেক সময় তথাকথিত অশিক্ষিত রবিবারও আন্দাজ ক'রে নেয় আর টি-র টানটাও ধ'রে নেয়। আমরা রহস্য ক'রে বলি 'পণ্ডিতের মূর্খতাই দোষ'। বাস্তবিক এই ক্ষেত্রে এই রহস্য-ব্যাখ্যা বেশ খাটে। কিন্তু নিরক্ষরের স্বল্পসম্বল ও পণ্ডিতের অন্ধচোখ অতিক্রম ক'রে যখন তৃতীয়-নেত্র-চক্ষুষ্মান পণ্ডিত দেখি তখন বুঝতে পারি, সত্যিকার পণ্ডিত কত বড় আর কত উর্ধ্বে! তাঁরাই ঋষিপদবাচ্য। ঋষি বলে তাকে, যে দেবত্ব দান করতে পারে। অবশ্য এই শ্রেণীর পণ্ডিত পথে ঘাটে পাওয়া যায় না।

হাঁ টেকনিক। পারব, হবে—এই positive thinking নিয়ে চলবে। আমি অশক্ত, অক্ষম, পঙ্গু—এই negative thinking ছাড়। অপরকে তোমার মতে আনতেও এই yes technic. ভিন্নমত কাউকে চমৎকার যুক্তি, তর্ক, লজিক দিয়ে দাবিয়ে তাক লাগালে সভাতে তোমার জয় হতে পারে, কিন্তু যাকে চাও তাকে পাবে না। তার অহমিকা আহত হওয়াতে সে যতক্ষণ নিজেকে সমর্থন করতে ব্যস্ত, ভালই হোক আর মন্দই হোক, সে ততক্ষণ অনেকদূরে স'রে গিয়েছে। মানুষ যুক্তিবাদী নয়, rational নয়, মানুষ আবেগধর্মী—sentiment-বাদী জানবে। তা ছাড়া মানুষ নিজের মূর্খতা ও অক্ষমতা স্বীকার করবে না।

হাঁ দিয়ে চেষ্টা কর, তাকে পাবে। তার কথায় সায় দিয়ে দেখ। একটু তলিয়ে দেখ, ১৭টা পয়েণ্টে তোমরা একমত, মাত্র তিনটে পয়েণ্টে অমিল, তাও তেমন আকাশ-পাতাল নয়। এইটে statistics-এর প্রতিষ্ঠা। তোমাদের একমত সতেরটা পয়েণ্ট নিয়ে শুরু কর, 'yes'—'হাঁ, তা তো বটেই' দিয়ে শুরু কর। ক্রমে সাত পা বন্ধুত্ব, তারপর ধীরে ধীরে সমবেদনা ও সহযোগিতা জাগবে। সে তোমার অনেক কাছে এসে পড়েছে, ক্রমে inertia ও momentum পেয়েছে। তখন সহসা সে তোমার বিরুদ্ধে যাবে না, cosmic habit forceএর নিয়ম। তখন সন্তর্পণে—তোমার অমিল তিন পয়েণ্ট যথাসম্ভব সন্তর্পণে, সুবিবে

হ'লে পরোক্ষে তুলবে। সে তার মত বদলাবে বা একটা via media মধ্যপথ ক'রে তোমার মতে মত দেবে। ভুলের বেলাও এই। তোমার নিজের ভুল ঝটপট এবং আড়ম্বর ক'রে স্বীকার কর, কিন্তু তার ভুল দেখাবে ঘুরিয়ে বা পরোক্ষ ভাবে। সাবধান, ভুল দেখাবার বেলা তাকে হীনও করবে না, তার সুনামও নষ্ট করবে না। তার মনে যদি গ্লানির ছাপ না পড়ে, যদি কৌশলে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পার, তবে সে তার ভুল মেনে নেবে। আমরা ছেলেবেলা এমন কত ভুল করেছি, অনেকে ক'রে শোধরায়ও, এমন কিছু ভাববার নয়। সাপ বাঘ কিছু নয়, এমনি ভাবে হালকা ক'রে দেবে যেন সে অপ্রতিভ না হয়। এই টেকনিক সব বাপ-মায়েরই জানা দরকার, যদি সন্তানকে সত্যিকার মানুষ করতে চায়।

উৎসাহ ও অনুকূল আবেষ্টনী

দ্বাদশ সূত্র—Ardency for expression with normality avoiding abnormality—আত্মপ্রকাশে উৎসাহ চাই, নিজের বেলাও, পরের বেলাও; কিন্তু যথাসম্ভব স্বাভাবিক নিয়ে চলবে, অস্বাভাবিককে এড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ অনুকূল আবেষ্টনী ও উৎসাহের তাপ তোমার প্রধান সহায়।

১। আত্মপ্রকাশ। ইভলিউশন বা বিকাশের মূলমন্ত্র আত্মপ্রকাশ —self expression. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ আত্মপ্রকাশ করতে চায়। মানুষের আত্মপ্রকাশে সাহায্য পেলে সে খুশি হয়, আত্মপ্রকাশে বাধা পেলে কেউ সহ্য করে না। শিশু ও বৃদ্ধ আত্মপ্রকাশে অসমর্থ ব'লে তাদের মধ্যে tyrant হবার, পরপীড়ক অত্যাচারী হবার ঝোঁক থাকে। তাদের অত্যন্ত কৌশলে চালনা করতে হয়।

নিজের আত্মপ্রকাশের পথে পরের অহমিকাকে আঘাত করবে না। তোমার উত্তমপুরুষের একবচনকে পেছনে রেখে, বোতাম ধ'রে বা হাত ধ'রে টানাটানি না ক'রে, দলের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্থান নেবে, পরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রকৃতির advertiser—প্রচারক ফুল, কি সুন্দর তার পদ্ধতি—নিঃশব্দ, অনাড়ম্বর, মিষ্ট ও নির্ভুল!

পরের বেলা গরজ ক'রে, আড়ম্বর ক'রে তার আত্মপ্রকাশের

সুযোগ দেবে। সে তোমার হাতের মুঠোতে। শিশু, যুবা, প্রবীণ, বৃদ্ধ সবাই। এতটুকু বয়সের দুষ্টু ছেলে সব নেবে সব খাবে, আবদার অবাধ্যতা স্বার্থ তার স্বভাব। বাগ মানানো অসম্ভব। Self expression-এর সুযোগ দাও। 'খোকাবাবু সবাইকে সন্দেশ দেবে, কেউ একটার বেশি পাবে না, খোকাবাবু দেবে'। খোকাবাবু উৎসাহে হয়তো নিজের জন্যে না রেখেই সব বিলিয়ে দিলে।

কাঁচাও নয় পাকাও নয়, ডাঁসা। এই সন্ধি অবস্থা নিয়ে মুশকিল। শৈশব ও যৌবনের সন্ধি কৈশোর—ওঁরা বলেন, Teen-agers are really dangerous—এরা ছোট থাকতে চায় না, আবার বড়রাও আমোল দিতে চায় না, কাজেই তারা বিদ্রোহ করে। তোমার পাশে বসাও, মর্যাদা দাও, কিশোর বিগড়াবে না।

Man's fifty per cent is his expression—মানুষের অর্ধেক সত্তা তার প্রকাশে; অতএব তার আত্মপ্রকাশে সহায়তা কর। উৎসাহ দাও, আত্মপ্রকাশের গতি বাড়বে; বাধা দাও, তাতেও আত্মপ্রকাশের গতি বাড়বে, কারণ নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। আত্মপ্রকাশে দিতে বাধা চাও, পরোক্ষ পন্থায় দেবে—আত্মপ্রকাশে সোজা বাধা না দিয়ে তার গতির মোড় কৌশলে ফিরিয়ে দেবে। এই টেকনিকে মানুষকে দেবতা করা যায়—ইতিহাস বলে।

(২) উৎসাহতাপ। কেমিক্যাল ক্রিয়ায় যেমন তাপ চাই, তেমনই তোমার আমার জীবন-পথে চাই উৎসাহের তাপ। অসীম উৎসাহের কাছে কোন বাধাই টেকে না। নিজের মনে উৎসাহ থাকলে তুমি যেমন বল পাও, তেমনই অপরেও মনে উৎসাহ পেলে তার হাতে বল পায়। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে উৎসাহের আয়োজন সব চাইতে বেশি দরকার—নিজের জন্য তো বটেই, অপরের জন্যও। অপরের মনে উৎসাহ জাগাও, তোমার মনোমত কাজ পাবে।

(৩) স্বাভাবিক ভাবে চলবে। অস্বাভাবিককে এড়িয়ে চলবে।

স্বাভাবিক আবেষ্টনীতে থাকবে। তোমার পারিপার্শ্বিকে যাতে যথাসম্ভব স্বাভাবিক লোক থাকে, সেই চেষ্টা করবে। আর তোমার পন্থাও হবে যথাসম্ভব স্বাভাবিক, পরিমিত।

অস্বাভাবিকদের এড়িয়ে চলবে। Insanity, imbecility—বাতুল ও নির্বুদ্ধিকে নিয়ে ঘর করা কঠিন, তাকে এড়িয়ে আমরা চলি। তা ছাড়া স্বাভাবিক পোশাকে যে সকল বাতুল ও নির্বুদ্ধি খাপছাড়া আছে, তাদের নিয়েও ঘর করা যায় না—Godএর পক্ষেও সুবিধে হয় না। এই সব খাপছাড়াদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবে,—সংস্পর্শে এসে পড়, যত তাড়াতাড়ি পার পাশ কাটিয়ে যাবে। তাঁরা কারা? তারা অবুঝ, unteachable, যারা বোঝে না, বুঝতে চায় না, বুঝেও বোঝে না, উদগ্র প্রথাবাদী হয়ে তারা বুঝতে পারে না। শাস্ত্রে বলে, মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ। তারা অরসিক—unable to understand spirit. তারা bigot, know-it-all, fault-finders, critic-natured and egotist,—গোঁড়া, সবজান্তা, মাক্ষীবৃত্তি, স্বভাবতার্কিক, অতিদাম্ভিক। এই পাঁচ রকম লোক নিয়ে ঘর করা কঠিন। ওঁরা বলেন অর্ধশিক্ষিত—"half-educated—he is the most dangerous man—he makes the radical, the chronic reformer and the rabble-rouser. Half-education has made him mad."

(৪) অনুকূল আবেষ্টনী বা অপ্রবাস।

অনুকূল আবেষ্টনীতে থাকবে। The soil must be suitable for you to grow and thrive—তোমার জমিতে কাঁটা না থাকে, ফুটবে। যে আবেষ্টনীতে তুমি উৎসাহ পাও, যেখানে তোমার আত্ম-প্রকাশ বাধা না পায় এবং যেখানে সহজে আত্মোপলব্ধি করতে পার। এই অনুকূল আবেষ্টনীর অভাব বা বিরুদ্ধ আবেষ্টনীকে মহাভারতের অর্থে প্রবাসী বলা চলে। পৈতৃক ভিটে, নিজের দেশ—এই সবই এতদিন অপ্রবাস বুঝে এসেছি। আজকে বৃহত্তর পটে মানে খুঁজে পাচ্ছি, বিশেষ ক'রে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের পর যখন চাক্ষুষ দেখছি, চোদ্দ-পুরুষের ভিটে বারুদের স্তূপ হয়ে প্রবাস হয়েছে। এক কথায় বলি, অপ্রবাসী হ'লেই তোমার সুখ শান্তি সফলতার সাহায্য হবে। যথাসম্ভব অপ্রবাসী হবে, যেখানেই থাক না কেন। সহযোগিতা ও সেবা-ভাবনায় আবেষ্টনীকে অপ্রবাসে পরিণত করতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়—সফলতা-সঙ্কেত

কালের মোহ

ত্রয়োদশ সূত্র—It is never too late to mend—with your assets—ভুল শোধরাবার সুযোগ সর্বদা পাওয়া যায়। ইতিহাস নাড়াচাড়া করলেও দেখবে, ভুল শোধরাবার, কাজ শুরু করবার বা জয়লাভ করবার সময়-অসময় নেই। আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, আমি নাবালক,—এসব escapist-এর—পলায়নেচ্ছুর উক্তি। জয়ের বয়েস দেখ। মোজার্ট ৬, মাইকেল এঞ্জেলো ৮৭, পিট ২৪, গ্লাড্স্টোন ৮৩, গেটে আরম্ভ ১০, ফাউস্ট শেষ ৮০, লেনার্ডো ৭৭, কেলভিন আরম্ভ ১৮—শেষ আবিষ্কার ৮৩। এঁদের কারও বিশেষ পুঁজি—asset ছিল না, প্রত্যেকে নিজের শক্তি জাগিয়েছেন, যা তোমার আমার সুপ্ত।

অসম্ভবের মায়া ও ভীতি তোমার মনে

চতুর্দশ সূত্র—No ill is incurable before your assets—অসম্ভব ব'লে কিছু নেই তোমার শক্তির কাছে। হয় corrected হবে, নতুবা compensated হবে। অসীম উৎসাহের কাছে কোন বাধা টেঁকে না। ইতিহাস দেখ। পঙ্গু—Scott, Byron, Roosevelt, Darwin; চক্ষুহীন—Hellen Keller, Milton, Edison, Beethoven, Fisher, Baldwin; ব্যাধিগ্রস্ত—Woodro Wilson, Guy de Maupassant, Luther; কুৎসিত—Socrates, Lincoln, Hollywood stars 90%, reputed actresses 90%, কলেজ শিক্ষা—Graduates, Journalists, Authors, Business executives 40·50%.

মনস্তাত্ত্বিকের হিসাব। সাধারণের উপরে মানুষ দশে একেরও কম, নিম্নে ঐ হিসাব, সাধারণ মানুষ দশে আটের বেশি অর্থাৎ শত-করা ৮০-৯০। আমরা যে সচরাচর বলি, অমুক ওস্তাদ আর ওমুক একেবারে নিরেট, তার মানে নেই। আমরা সবাই সাধারণ, তার মধ্যে যে শক্তির সাধনা করে, সে বড় হয়।

কার্যদক্ষতার চাইতে মানুষের স্বভাব অনেক বড়। এইটে আজকের দিনের মনস্তাত্ত্বিক ও statisticianদের বিশেষ আবিষ্কার ও বিশেষ

প্রতিষ্ঠা। Personal trait বা মানুষের ব্যক্তিস্বভাবের প্রভাব সব চাইতে বেশি। মানুষ হও, পনেরো আনা জয় তোমার হাতে, কার্যদক্ষতা বাকি এক আনা। Statistician বা হাজার হাজার অবস্থা পরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠা করেছে, মানুষের কাজ যায় তার ব্যক্তি-স্বভাবের জন্য, কার্যদক্ষতার অভাবে প্রায় কারও কাজ যেতে দেখা যায় না। যদি কার্যদক্ষতার অনুপাত ধর, তবে শত-করা দুইই যথেষ্ট। শত-করা দুই কাজ যায় কার্যদক্ষতার অভাবে এবং তাও একেবারে অচল নিরেট হ'লে।

হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। দৃষ্টান্ত দেখ। ৭৫টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, এক বছরে ৪০০০ চার হাজার ছাঁটাই। কারণ? ৪০০ অর্থাৎ দশে এক প্রত্যক্ষ বা আনুষঙ্গিক কার্যদক্ষতার অভাব। প্রত্যক্ষ কার্যদক্ষতার অভাব, পৃথক ক'রে নিলে শত-করা দুইয়ের বেশি হবে না। তার পর বাকি ৩৬০০। আলস্য ৪০০, অসতর্কতা ৪০০, অসহযোগিতা ৪০০। বাকি ২৪০০, অকারণে কাজ কামাই, অসাধুতা, কাজের সময় নভেল পড়া বা অপরের কাজ করা, initiative-এর অভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, ভদ্রতার অভাব, অবাধ্যতা, অপরিষ্কার থাকা, কিম্ভূত পোশাক, মাথায় ছিট। তা ছাড়া অন্যান্য ব্যসন। এই তো ফিরিস্তি। মানুষের কাজ যায় প্রধানত তিনটি কারণে, চারটে নয়, তিনটি—(১) আলস্য (কাজ না করা), (২) অসতর্কতা (কাজে মন না দেওয়া, কাজ গ্রাহ্য না করা), (৩) অসহযোগিতা (কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে রাতদিন বিবাদ কোঁদল খোঁচাখুঁচি করা)। অপ্রধান কারণ যা, তা সবই ব্যক্তিস্বভাবের দোষে। এই নিয়ে হ'ল শত-করা ৯৮। বাকি দুই কর্মদক্ষতার অভাব ধরা যায়।

এবার কাজের উন্নতি বা প্রমোশন। একই নিয়ম, ব্যক্তিস্বভাব, তবে অনুপাত একটু বেশি। কার্নেগী ইন্‌স্টিটিউটে ১০,০০০ দশ হাজার প্রমোশনের পরীক্ষা। এদের মধ্যে highly technical বিষয়ও আছে, যথা ইঞ্জিনীয়ারিং। ব্যক্তিস্বভাবে প্রমোশন শত-করা ৮৫, শিল্পদক্ষতায় প্রমোশন শতকরা মাত্র ১৫।

এইবার বোঝা গেল, মানুষ নিজের স্বভাবদোষের জন্য, অক্ষমতা

নয়, স্বকৃত দোষের জন্য ব্যর্থ হয়ে নিজেকে দোষ না দিয়ে, নিজের ঠুনকো মান রাখতে গিয়ে দোষ চাপায় সংসারের ঘাড়ে। সব বাপ-মাই মনে করে 'আমার ছেলে ফার্স্ট হতে পারত, পোড়ার-মুখো একচোখা মাস্টারগুলো হিংসে ক'রে বাছাকে একেবারে ফেল করিয়ে দিয়েছে।'

এটা বুঝে নিলাম, বড় হতে হ'লে তেমন উজ্জ্বল—brilliant হবার কোনই দরকার নেই। দশজন সাধারণের মত—mediocre হ'লেই চলবে, এবং ঐখান থেকে কাজ শুরু করলেই যথেষ্ট। আমার যা পুঁজি আছে, যাই থাক্, নিদেন হাত পা চোখ কান, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পাথেয় এবং অপর সকলের পক্ষেও যথেষ্ট পাথেয়। এই পাথেয় দিয়েই জয় কেনা যায়, এমন কি প্রতিভাবানও হওয়া চলে।

আমরা ভুল পথে গিয়ে ঘুরে মরি। অতএব সাবধান। ওর পুতুলের কাপড়টা ধুয়ে সাদা করলে, আমার কাপড়টা লাল হয় না, লাল রঙ দিয়ে রাঙিয়ে লাল করতে হয়। এই টেকনিক ভুলে গিয়ে পদে পদে গর্তে পড়ি।

ওর ছেলের দুধ বন্ধ করলেই, আমার মেয়ে দুধ পায় না। ধনীকে দরিদ্র করতে পারলেই আমি ধনী হই না। শক্তিমানের শক্তি নষ্ট করলেই আমি শক্তিমান হব না। মালিককে টেনে নামালেই মজুর বড় হয় না। 'তুমিও তো সেদিন মিথ্যে কথা বলেছ' ব'লে চাপান দিলে আমার মিথ্যেটা সত্য হয় না। 'তুমিও তো মদ খাও' বললে আমার বোতলের মদটা জল হয় না। কোনও negative thought দিয়ে বড় হওয়া যায় না। ঈর্ষা দিয়ে উন্নতি হয় না, অবনতিই হয়। গড়ার নিয়ম ও ভাবনা স্বতন্ত্র এবং সেই নিয়ম ও ভাবনার সাড়ে পনেরো আনাই তোমার, আমার, ওর, তার—সকলের হাতের মধ্যে। তোমার স্বভাব ভাল করলেই তুমি মুক্ত, সফলকাম ও নিশ্চিন্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—সংসার—Sangsar

এইবার সংসার। সংসারের এক কথায় ইংরেজী নেই। ওরা একে বলে, Life's situation. এতক্ষণ ব্যক্তিহিসেবে পথ চলছিলাম। পথে যাদের সঙ্গে দেখা, তাদের সম্পর্কে নির্দেশ

পেয়েছি। এবার দশজনকে নিয়ে চলবার পালা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসাক্ষেত্র, সভা, সমিতি—সবই সংসারের নানা ক্ষেত্র ও নানা রূপ। সংসার সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা দরকার। পঞ্চসাম্য সংসার। সমান স্বার্থ, সমান কাম্য, সমান মন্ত্র (টেকনিক) সমান আকূতি (অন্তঃকরণ, অভিলাষ) ও সমান সহযোগ।

সংসারের স্বরূপ

আমাদের দৃষ্টিকোণে অষ্টাবিংশ অক্ষর—পঞ্চসাম্য সংসার—সমান স্বার্থ, সমান কাম্য, সমান মন্ত্র, সমান আকূতি, সমান সহযোগ। পরিবারে এই পঞ্চসাম্য পুরাপুরি পাই, অন্য সব ক্ষেত্রে আংশিক এবং কম-বেশি। অতএব পঞ্চসাম্য সংসারের আদর্শ ক্ষেত্র—পরিবার, এবং সেই পরিবারের আসল স্বরূপ বুঝলেই অন্য ক্ষেত্রগুলি বুঝবার পথ পাব।

একদিন পরিবারে যথেচ্ছাচার (?) একনায়কত্ব (dictatorship) রাজত্ব করত। আজ তা অচল। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ না দিলে ছেলেমেয়েদের পরিবারের আদর্শ গণ্ডীতে ধ'রে রাখা যায় না, পরিবার ভাঙে। পরিবারে কি আছে কি নেই দেখা যাক। শৈশবের দোলা, যৌবনের খেলা, বার্ধক্যের আশ্রয় পরিবার। পরিবারে আছে স্নেহ, মমতা, সেবা, সহযোগ, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সততা—সবই আছে যা চাই, এবং আছে পুরোপুরি ষোল আনা। পরিবারে অভাব কেবল মাত্র একটি জিনিসের। পরিবারে আড়ম্বর ও চাকচিক্যের অভাব। খাঁটি সেগুন কাঠের তৈরি, কিন্তু তাতে চোখ-ধাঁধানো চকচকে রঙ-পালিশ (polish) নেই। পালিশ নেই ব'লে এখানে সেখানে খোঁচা আছে (angularities), মেকি নিরেস কাঠের তৈরি হ'লেও তাতে চটকদার রঙ-পালিশে মানুষ ভোলে। কিন্তু যখন উপরের রঙ-পালিশ চ'টে যায়, মেকি কাঠের স্বরূপ বেড়িয়ে পড়ে, তখন মানুষের হুঁশ হয়, তখন আলেয়ার রূপ দেখে খাঁটির জন্য আকূতি জাগে। পুরোনো চটি জোড়াটার মধ্যে পা দুটো যেমন নিশ্চিন্ত ভাবে প্রবেশ করে, কোন আপত্তি তোলে না, প্রশ্ন করে না, আড়ম্বর

নেই, আয়াস নেই, তেমনই অনাড়ম্বর নিশ্চিন্ততা আছে সংসারে, এবং আছে পুরোপুরি ষোল আনা।

চটক আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসকামীর এই ঝাঁজ ও জাঁকশূন্য পরিবার ভাল লাগে না। বাইরে চটকের মোহ ও নেশা যখন চোখে লাগে, তখন ছেলেরা বাইরে আনন্দ পায় বেশি। বাপ-মা ছেলেদের ভালবাসে—কৃতি অকৃতি দুইকেই। কিন্তু কৃতি ছেলে বাইরে যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়, তেমনটা সে পরিবারে পায় না। মনে করে, বাইরে আত্মপ্রকাশের সুযোগ অনেক বেশি। তখন তারা পরিবারে হাঁপিয়ে ওঠে, অনেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়, বিশেষ ভাবে আজকের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দ'লোস্বাধীনতা প্রকাশের দিনে। প্রতিভা তার নিজ পরিবারে তেমন প্রতিষ্ঠা পায় না, যা সে পায় বাইরে। অমুক আমাদের বাড়ির বা বংশের ব'লে গৌরব আছে, কিন্তু জয়মাল্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় অপরে। এই প্রতিভারও নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় পরিবার। ছেলে নিজের বোনকে পড়ায় না, পরের বোনকে পড়ায়। নিজের ভাইয়ের চাইতে যেন পরের ভাইকে বেশি ভালবাসে। নিজের বাবা-মা ভাই বোন—এরা যেন কেমন, যে যার কাজে ব্যস্ত উদাসীন। আর ঐ বাড়ির ক্ষান্তর মা আমার কত প্রশংসা করে, কত যত্ন করে, কি মিষ্টি তার স্বভাব! কিন্তু সেদিন হঠাৎ 'বড্ড মাথা ধরেছে' কথাটা মুখ থেকে বার করেছি, যেন মৌচাকে ঢিল, শয্যাশায়ী মা বাতের ব্যথা ভুলে বিছানা ক'রে দেন, বোন্ হাতের বোনাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জল গরম করতে নামে, ভাই তার সাধের রেডিও ও খেলার রিলে বন্ধ ক'রে ডাক্তারের বাড়ি ছোটে, আর বাবা হাতের বই রেখে উঠে পায়চারি করেন আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'টেম্পারেচার নিলি? সর্দি আছে? টীকে তো নেওয়াই আছে, চোখটা যেন একটু লাল,' এমন কি বৃদ্ধা ঝি মহামায়াও দেখি হাতপাখা নিয়ে হাজির। এতটুকু খোঁচা দিয়ে দেখতে পাই, এই অনাড়ম্বর নীরস উদাসীন, যে যার কাজে ব্যস্ত পরিবারের প্রাণ কোথায় এবং তার অফুরন্ত রসের স্রোত কোথায় ও কত গভীর! যেদিন প্রবাসে ঠোঁটমিষ্টি ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে পারি, সেদিন বিদেশ-বিভুঁইয়ের নিঃসঙ্গতা এমনি ঝাঁকানি দেয় যে,

অনাড়ম্বর উচ্ছ্বাসহীন অনাবিল অফুরন্ত স্নেহপূর্ণ মায়ের অঞ্চলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, পাগল হয়ে উঠি। সেদিন বুঝতে পারি পরিবারের স্বরূপ, সেদিন বুঝতে পারি আমার নিজের স্বরূপ, বুঝতে পারি আমি পরিবারেরই, আর কারও নই, আর আমার পরিবার আমারই, আর কারও নয়।

পরিবারের এই চটকের অভাবে ছেলেমেয়েরা যাতে আলেয়ার পেছনে ছুটে গিয়ে হোঁচট না খায়, খানায় না পড়ে, তার ব্যবস্থা করতে পারে বাপ-মা—একমাত্র বাপ-মা, আর কেউ নয়। ঋষি বলেন, Dictator হবে না, doctor হবে—একনায়কত্ব বাদ দিয়ে চিকিৎসক হও। সমবেদনাপরায়ণ ও স্নেহপ্রবণ চিকিৎসক হয়ে পুত্রকন্যার স্বাস্থ্য সন্তোষ ও আদর্শ রক্ষা কর। পরিবারে আনন্দের বিধান, সহযোগ, আত্মপ্রকাশ, আত্মশ্রদ্ধা-বোধ—এই সকলের ব্যবস্থা বাপ-মাই করতে পারেন এবং এ সব বাপ-মারই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মাত্র দুটো কথা মনে রাখতে হবে, দশটা-বিশটা নয়। শিক্ষা ও কালচার দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে সংসারের স্বরূপ, বুঝিয়ে দিতে হবে সস্তা চটকে ও সোডার বোতলের ফস্‌ফসানিতে স্নেহরস বিলিয়ে দিলে অন্তরের গভীরতায় টান পড়বে। দ্বিতীয় কথা, পিতা-মাতার একনায়কত্বকে একটু সরস করতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশকে ঠিক পথে চালাবার সহায়তা করে। তাদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির প্রসারও দিতে হবে, আবার তাকে সংহত ও সংযতও করতে হবে। নদীর দুই মুখ খোলা অথচ দুই তট দ্বারা সংযত, জবাবে জলবাসী সমুদ্রযাত্রার পথে দুই তটকে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে যায়, কূপ ঘুরে ঘুরে কেবল তটেরই সেবা করে, আবার বিল তটকে অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে যাওয়ার কল্যাণ-কূপও পায় না, বিলও পায় না। অতি আদরে pampered child-এর পরিণাম criminality ও insanity —অতিশাসনে নাবালক পঙ্গু সংসারে খঞ্জ যষ্টি ছাড়া চলতে পারে না অথবা criminalityর পথ নেয়, পাত্রবিশেষে বাতুলতারও। এই সাইকিয়েটির সিদ্ধান্ত। সন্তান সংসারে এনে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার যা ফল তা হয়, কিন্তু সবজান্তা বাপ-মার ঠোঁট উল্টে

অভিযোগ কত! সংসারে কি ভাবে চলতে হবে তার মন্ত্র—টেকনিক এই সংসার-অধ্যায়ে।

নিরিখ

পঞ্চদশ সূত্র—Standard by ability and need—শক্তি ও প্রয়োজন মত নিরিখ বেঁধে নেবে। কার্নেগী বলেন, Tailor cut budget. তোমার নিশ্চিত আয় এক দিকে, আর একান্ত প্রয়োজন অন্য দিকে। এই দুইয়ে সামঞ্জস্য ক'রে নেবে। কাকেও বাদ দেওয়া চলবে না। যদি তা না হয় তবে মৃত্যু আসবে সন্তর্পণে। হয় ঋণগ্রস্ত হবে নতুবা রোগ আসবে পুষ্টির অভাবে। এর পর আসবে সভ্যসমাজের বা civilizationএর দুটো তাগিদ—আপ-টু-ডেট্ হওয়া ও প্রতিবেশীর সঙ্গে এক বা কাছাকাছি হওয়া। এদের সঙ্গেও সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। কিম্ভূতকিমাকার—grotesque হ'লে চলবে না।

মহাভারতে সুখী হবার জন্য মূল তিনটি উপায়ের নির্দেশ পাই—অরোগী, অপ্রবাসী ও অঋণী হওয়া। অর্থাৎ রোগ, প্রবাস ও ঋণ দুঃখের কারণ। বাকি অপ্রধান উপায়গুলি এই তিনটি উপায়েরই অভিজ্ঞাপন। এর মধ্যে রোগ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাম্যদ্বয়ের স্বাস্থ্য অংশে পড়ে। আজকের আলোচনা 'মানুষের সম্পর্ক,' অতএব বাকি দুটোর কথা বলব। পেলাম অঋণী ও অপ্রবাসী হতে হবে।

(১) আয়ের বেশি ব্যয়—ঋণ। পরের কাছে। আর দরকারমত পোষণের অভাবও ঋণ। নিজের কাছে। এই দুই ঋণ থেকেই মুক্তি পাই যদি আমাদের নিরিখ-মন্ত্র—টেকনিক মেনে চলি।

(২) অপ্রবাস সম্বন্ধে টেকনিক পেয়েছি—দ্বাদশ সূত্রে।

খুঁতখুঁতি ও অভিযোগ বর্জন

ষোড়শ সূত্র—Avoid nagging—রাত দিন খুঁতখুঁত করলে কিছুতে শান্তি আসবে না। অভিযোগ-শুচিবাই, কে-কি-ভাববে-বাই, শুভা অহমিকা, হিংসাদি যথাসম্ভব বর্জন ক'রে সহিষ্ণুতা—tolerance অভ্যাস করবে।

ক্ষুদ্রে মাধুর্য দর্শন ও জ্ঞাপন

সপ্তদশ সূত্র—Neutralise nagging for blessing—find and express beauty in trifles সব বিষয়ে কল্যাণ-দর্শনে সুখী হবে। ঋষি বলেন, "Count blessing in everything." আর এক ঋষি বলেন, ছোটখাট বিষয়ে কল্যাণ দেখবে এবং ছোটখাট বিষয়ে কল্যাণ ও মাধুর্য পরিবেশন করবে, তাতে সহজে মানুষকে আপন করতে পারবে। একখানা বেনারসী শাড়ি দিয়ে খুশি করবার সুযোগ আসবে বছরে একদিন। কিন্তু ছোটখাট বিষয়ে নজর দিলে, দিনে দশবার সুযোগ পাবে প্রিয়জনের সংস্পর্শের, তাতে ভালবাসা জমবে বেশি, এটা cosmic habit forceএর প্রতিষ্ঠা। আমরা এইখানেই ভুল করি সব চাইতে বেশি।

সন্তোষ শ্রেষ্ঠ সঞ্জীবনী

অষ্টাদশ সূত্র—Gaiety is the greatest solvent in Sangsar—মনের সন্তোষে সর্বসফলতা ও আনন্দ। শুধু মন ভাল থাকবে তাই নয়, শোক দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দৈন্য, ব্যর্থতা, রোগ সব পালাবে। জীবনের এত বড় অমৃতত্ব আর নেই। সর্বদা প্রফুল্ল থাকবার অভ্যাস নিত্য প্রয়োজন। অভ্যাস-মন্ত্রের সাতটি অভ্যাসের মধ্যে সন্তোষ-অভ্যাস অন্যতম। কিন্তু সন্তোষ-অভ্যাস কঠিন, অতএব টেকনিক দিলাম। Gaiety শব্দ দিয়েই টেকনিক দিলাম।

(১) Grow—দেহ ও মন সুস্থ না থাকলে বৃদ্ধি সম্ভব নয়। দেহ রাখবে সুস্থ, আর মনের খোরাক যোগাবে নিত্য, নিত্য নূতন কিছু শিখবে। ওঁরা বলেন, মন যেদিন নূতন কিছু শেখা বন্ধ করবে সেদিন মনের মৃত্যু।

(২) Accept blessings or lessons. পত্রের একটা পৃষ্ঠা কালো হ'লে আর একটা নিশ্চয়ই আলো। অতএব প্রত্যেক অবস্থায়ই কল্যাণের দিকটা বেছে নেবে, এবং প্রত্যেক ব্যর্থতায়ও তার শিক্ষা বেছে নেবে। তবেই অভিশাপের গ্লানি যাবে নিবে। আঘাতের ভিতর দিয়েই তো অধিকাংশ কল্যাণ পাই। বীণার তার শিথিল থাকলে তাতে বিশ্বসঙ্গীত বাজে না।

(৩) Inevitable must be accepted—যা ভবিতব্য, যা ওলটাবার উপায় নেই তাকে মেনে নিতেই হবে। পিতার মৃত্যু ফেরাতে পারি নি, মেনে নিয়েছি।

(৪) Envy is the greatest enemy of progress—হিংসা উন্নতির পথে সব চাইতে শক্তিশালী রিপু। ক্রোধ বিষস্রাবী রিপু, তার চাইতে বড় ভীতি, ক্রোধ ও ভীতির সংমিশ্রণে static গুণ নিয়ে জন্মে হিংসা। সে সবার চাইতে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী, দেহ ও মনকে ধ্বংস করে নানা ভাবে। হিংসা সহজে ছাড়ে না, কঠোর তপস্যা চাই। হিংসাকে প্রত্যক্ষ টেকনিকে তাড়ানো কঠিন, নানা পরোক্ষ টেকনিক ব্যবস্থা আছে। একটা শ্রেষ্ঠ টেকনিক, পরের সৌভাগ্যে সুখী হবার অভ্যাস-অনুশীলন। প্রথমটা হয়তো অভিনয় হবে, কিন্তু পরে cosmic habit forceএর নিয়মে পাকা অভ্যাসে দাঁড়াবে। পরের দুঃখে দুখী হওয়া সহজ, কিন্তু পরের সুখে সুখী হওয়া কঠিন। তাই অভ্যাস করতে হবে, তাতে হিংসাবৃত্তি ক্রমেই ম্লান হবে।

(৫) Timidity must be elemenated. সবার চাইতে সেরা পুণ্য যেমন সাহস, সর্বাপেক্ষা বড় পাপ তেমনই ভীতি। ভয় শব্দে গুরুর নিষেধ।

(৬) Yourself will give you gaiety—তোমার সন্তোষ তোমারই মনে।

সেবাস্বভাব

উনবিংশ সূত্র—Service habit, safest solvent for present, for provision, for yourself, for others—সেবাস্বভাবে পাবে আজকের অন্ন, কালকের সংস্থান, তোমার এবং অপরের।

দেনা-পাওনা

বিংশ সূত্র—Allocation of give and take next to proportion—ability gives, need gets—দেনা-পাওনার নিয়ম দুটো, অনুপাত এবং শক্তিমত দেবে, দরকারমত নেবে। এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য ক'রে নেবে। অবস্থা, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের নিরিখে। নিছক ব্যবসায়ে অনুপাত নিয়ম চলে। স্নেহগ্রথিত আদর্শ

সংসারে আদর্শ নিয়ম, 'শক্তি দেবে, প্রয়োজন পাবে'। বাবা রোজগার ক'রে এনে দেন মার হাতে। মা ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করেন ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনমত। কম-বেশির প্রশ্ন ওঠে না। বড় ছেলে বলে না, যেহেতু খোকার ডাক্তার ও ওষুধে এত খরচ, ওই টাকা আমার চাই। মেজো বলে না, সেজোর টিউটার পায় পঞ্চাশ টাকা, আমার নামে পঞ্চাশ টাকা তুলে রাখ।

এইবার একাধিকের উপার্জন ও অসমান আয়ের একান্নবর্তী পরিবার। আমাদের টেকনিকই একটু অদলবদল ক'রে চালানো যায়। সংসারে নিরিখ, খরচ ও ব্যবস্থামত সবাই দেবে প্রত্যেকের শক্তিমত এবং পাবে প্রয়োজনমত। ব্যবস্থামত প্রত্যেকের আয়ের এক অংশ, ধর বারো আনা দেবে, বাকি সিকি তার নিজস্ব রইল। পাবার বেলা সংসারের ব্যবস্থায় যার যার প্রয়োজনমত পাবে। কখনও দেওয়ার অনুপাতে পাবে না। পরিবারকে ব্যবসায়ীর পর্যায়ে তুলবে না, পরিবারের মিষ্টত্ব উবে যাবে, পরিবার দোকানদারিতে এসে দাঁড়াবে। যার বাবা হাটে যাবে, তার ছেলে কমলা পাবে—নিয়ম চলবে না। সবাই আমাদের এই আদর্শ বোঝে না, ছেলেরা বুঝলেও মেয়েরা বোঝে না, মেয়েরা বুঝলে ছেলেরা বোঝে না। আমাদের আদর্শ না মানলে পরিবারকে দোকানদারি ক'রে তুললে, ছুঁতানাতা ক'রে, হয়তো স্পষ্টাস্পষ্টি নয়, বিতণ্ডা বাঁধে, অথবা গোপনে মনোমালিন্য জমে, ফলে সংসার ভাঙে। মূলে আছে হিংসা। হিংসা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট। সংসার তোমায় মানুষ করেছে, তোমার ঋণ শোধ কর, সংসার তোমার উত্তমর্ণ। অকৃতজ্ঞ মানে না, দুঃখও পায়।

যদি আমাদের আদর্শ না মানতে পার, তবে তিক্ততা আসবার আগে ভালয় ভালয় পৃথক হবে। পাশ্চাত্যেরা এই নিয়ম মানে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি দুটো, এক নম্বর—কম আয়ের ছেলের অসুবিধা হয়, বাপ-মায়ের বুকে লাগে। দুই নম্বর—একান্নবর্তী পরিবারের অনেক নীচে এই পাশ্চাত্য পৃথকীকরণ আদর্শ, যার ফলে cosmic habit forceএর মূলসূত্র-সহযোগ ব্যাহত হয়, ফল দুঃখ।

আমাদের আদর্শ. অকপটে যৌথ পরিবারে ব্যবস্থা করবে,

পরিবারের হিসাব ব্যবস্থামত—contribution according to ability, distribution according to need—শক্তিমত দেবে, প্রয়োজনমত পাবে। আমার বড় নাতনীর বিয়েতে খরচ দশ হাজার, তার বাবা I. C. S., ছোট নাতনীর বিয়েতে খরচ এক হাজার, তার বাবা টোলের পণ্ডিত। শুধু এই পৈতৃক সামর্থ্যে অসমান ব্যবস্থা করলে সংসারে শান্তি থাকবে না। মুখে থাকলেও মনে থাকবে না, মনে ওই হিংসাই প্রতিষ্ঠা হবে, প্রচ্ছন্নই হোক আর প্রকটই হোক।

আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও আমাদের টেকনিক একটু অদলবদল ক'রে মানিয়ে নেবে। পৃথক বাড়ি দরকার পাঁচ ভাইয়ের জন্য, উপায় নেই, কিন্তু আমাদের আদর্শ রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকলে সেই ক্ষেত্রেও কৌশলে খানিকটা সহযোগ রক্ষা করা যায়। পাঁচ বাড়িতেই নিরিখ বা স্ট্যাণ্ডার্ড এক রাখতে পার, দরকারমত পরস্পরের সংসারে পরস্পরের সাহায্য থাকতে পারে, পরিবারের বিবাহাদি বড় বড় কাজে শক্তিমত সাহায্য আসবে, এমনি ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে হয়, যদি প্রাণের স্পর্শ থাকে এবং যদি শক্তিমান স্বার্থান্ধ না হয়।

একবিংশ সূত্র—এইবার আমাদের শেষ মন্ত্র। একে প্রতিষেধ বা নিবারণ-মন্ত্র নাম দিলাম। কারণ এবার একটু উল্টো গাইব। ভূমিকা ভাবনা বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত তপস্যা, সফলতা, সঙ্কেত ও সংসার অধ্যায়ে ১৬টি মন্ত্র পেয়েছি। এই টেকনিক-ষোড়শীতে যত 'হাঁ' বলেছি এবার তার 'না', আর যত 'না' বলেছি এবার তার 'হাঁ'।

এই মন্ত্রের বিষয়বস্তু। মন্ত্র দিলাম বটে, কিন্তু তার প্রয়োগ-সন্ধান তোমার বিচারাধীন। নিয়ম-কঠোরতা (নিয়মগ্রহ) নিষেধ। নিয়ম-কঠোরতা যেমন সংযোগাত্মক তেমনই বিয়োগাত্মক, যেমন জীবন দেবে তেমনই মৃত্যুও আনতে পারে অবস্থাবিশেষে। অবস্থাবিশেষে বিষ হয় অমৃত, অমৃত বিষ। জোচ্চুরি করবারও ওই পথ। মানুষ করেও তাই। ধর্মজগতে মিস্টিসিজ্‌ম, যুদ্ধে স্ট্র্যাটিজি ও ব্যবহারিক জগতে পলিসির দোহাই দিয়ে মুখ রক্ষা করতে চায়, যদিও মনে মনে সবাই সব বুঝতে পারে। তবে উপায়? উপায় আছে। ভূমিকায় বলেছি 'তুমিই তোমার বিচারক,' তুমি তোমাকে ঠকাতে পারবে না।

অতএব তোমার কাজে তোমার সমর্থনই শ্রেষ্ঠ সমর্থন, তোমার পরখ শ্রেষ্ঠ পরখ।

নিয়ম, কাঠামো, লক্ষ্য নয়

সূত্র—Rules Rigour opposing Rhythm reciprocation must be chiselled, মন্ত্র বা নিয়ম ছন্দ বা সুরকে বাধা দিলে তার দাঁত ভেঙে নেবে। বিধিনিয়ম, কাঠামো, প্যাটার্ন, উপায় মাত্র—লক্ষ্য নয়। প্রাণের জন্য প্রথা, প্রথার জন্য প্রাণ নয়। নিয়ম-কঠোরতা একচোখা। একচোখো হরিণের গল্পটা মনে কর।

ছন্দ ও সুর—প্রতিযোগিতা ইভলিউশনের মূলমন্ত্র। কিন্তু তার পোশাক সহযোগিতা। একই পাতার দুটো পৃষ্ঠা। নক্ষত্রমণ্ডলী ছন্দে চলে, এবং প্রত্যেকের আপন পথে (orbit-এ) চলে, আর অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে live and let live নিয়মে চলে. তাল কাটলে বিপদ, orbit ছাড়ালেও বিপদ। হার্ট, নাড়ী, শ্বাস, রক্তপ্রবাহ তালে ও সুরে চলে। পথেঘাটে যার যার তালে চলি, যার যার পথে চলি। তাল কাটলে বা গণ্ডী ছাড়ালে বিপদ, ব্যাধি. মোটর চাপা, ছাতার খোঁচা। বাইরের ধাক্কা এসে কোথাও তাল কাটলে, বেশ খানিক বেগ পেতে হয়, সামলে নিতে সময়ও লাগে ছিরোসিমা-নাগাসাকি শুনছি আজও তাদের তাল ও সুর ফিরে পায় নি। এখনও ওই অঞ্চলে চলতে নীল চশমা পরতে হয়। সর্বত্রই এই, তাল ও সুর। নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—তপন-তারা, নদী-সমুদ্র, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, জন্ম-মরণ সবাই। নিজে চলেছি কিন্তু আবেষ্টনী পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল রেখে। তাই তো কবি বলেন, মানুষের জীবনটা পাঁচমেশালি, খানিকটা নিজেরা গড়ি, আর খানিকটা আর পাঁচজনে গ'ড়ে দেয়। এই প্রকাণ্ড সমাজের কাউকে বাদ দেওয়া চলে না।

সবাই সবাইকে জড়িয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনটা মৃত লৌহদণ্ড নয়, তার প্রাণ আছে, গতি আছে, ইচ্ছা আছে, প্রয়োজন আছে, উদ্দেশ্য আছে। অতএব বিধি-নিয়ম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দরকার মত মানিয়ে নেবে। গোঁড়া হয়ে প্রথাকে আঁকড়ে ধরলে অপমৃত্যু।

Geometrical figures কখনও ছবি হয় না, আবার কোন ছবিই অন্তরালে Geometrical figuresএর কল্পনা ও calculation ছাড়া হয় না।

(মহাভারতের নিয়মগ্রহের প্রতীক পিতামহ ভীষ্ম। আর প্রয়োজনে লোকহিতায় নিয়ম-লঙ্ঘনের প্রতীক কুরুক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ। আধুনিক চরিত্রে জয়সিংহের ন্যায় ভীষ্মের আদর্শ, আর রাষ্ট্রপতি শিবাজীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ। আমাদের দর্শনের দৃষ্টিকোণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ মানব।)

মন্ত্রের প্রয়োগসন্ধান হবে দরকারমত। সাপের বিষ মুখে, বিছার বিষ ল্যাজে, মোষের সিং ও ঘোড়ার পেছনের পায়ের চাট্ বুঝে চলবে। গড়মটা উল্টা পরেছি, হাঁ, কড়ায় লাগে ব'লে।

অতিও নয়, নেতিও নয়

সর্বমত্যন্তগর্হিতং, নাল্পে সুখং—দুইই সত্য। মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ পথ। শাক্যসিংহ যেদিন মধ্যপথ বুঝে নিলেন, সেদিনই সুজাতার পায়সান্ন, সেদিনই সিদ্ধি, বুদ্ধত্ব। কাঁচাও চাই না, পচাও চাই না, চাই পাকা, পরিপূর্ণ, পরিণত। চাই সাবধানতা, ভীতি নয়; ভক্তি, দাসত্ব নয়; শ্রদ্ধা, কুসংস্কার গোঁড়ামি নয়; ইচ্ছাশক্তি, একগুঁয়েমি নয়; ভদ্রতা, দুর্বলতা নয়; আত্মপ্রত্যয়, দম্ভ নয়।

ভাল মন্দ আপেক্ষিক। দেশ কাল পাত্র ক্ষেত্র প্রয়োজন উদ্দেশ্য পরিমাণ নিয়ে। প্রত্যেক পাতারই দুটো পৃষ্ঠা—উল্টো ও সমান, একটা কালো হ'লে আর একটা আলো। সব কালোর মধ্যেই আলো, কল্যাণ বেছে নিতে পারি, সর্বব্যর্থতার মধ্যেই শিক্ষা পেতে পারি। তাঁর বীণা বাজে অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে, আবার কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে।

শত্রু মিত্র

পাতার যদি উল্টো দুটো পৃষ্ঠা, তবে তো যে মিত্র সেই শত্রু। তা তো বটেই। পুত্র শ্রেষ্ঠ মিত্র ব'লেই তো সে যখন আত্মহত্যা করবার ভয় দেখায় তখন আমাকে কাবু করে সব চাইতে বেশি। বাপ-মা মিত্র ব'লেই তো অতি আদরে বা অতি শাসনে সন্তানের পরকাল নষ্ট করতে

পারে সব চাইতে বেশি। রক্ষক রক্ষক, সে যদি ভক্ষক হয় তবে ভয় সব চাইতে বেশি। কারণ সে যে ছদ্মবেশী শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বাঘের পোশাকে বাঘ অত ভয়ানক নয়, যতটা বাছুরের চামড়া গায়ে ছদ্মবেশী বাঘ। বাপ-মাও অবিবেচক হ'লে তেমনই ভয়াবহ, ছদ্মবেশী শত্রু; অথচ বাপ-মা কল্যাণকামী, বুদ্ধির দোষে হয়তো কল্যাণকর্মী নয়।

বিবেচক বাপ-মার মত বন্ধু পৃথিবীতে নাই, অথচ অবিবেচক হ'লে বাপ-মা যত অনিষ্ট করতে পারে সন্তানের, তেমন আর কেউ পারে না।

এক ও ঐক্য

Unit ও Unity, এক ও ঐক্য অঙ্গাঙ্গী ও বিপরীত, পাতার এপিঠ-ওপিঠ। এক এক ক'রে ঐক্য, আবার এক অনেকের বিপরীত। ব্যক্তি ও সংঘ বিপরীত, আবার ব্যক্তি বাদ দিলে সংঘ হয় না—এই চিরন্তন বিরোধ ও সাম্য নিয়ে চলেছি। এককে বাধা দিই অনেককে দিয়ে, আবার অনেককে এককে দিয়ে। একনায়কত্বকে বাধা দিই ডেমোক্রেসি দিয়ে, আবার ডেমোক্রেসির উল্টা সুর ধরি ব্যক্তি-প্রতিভা ও ব্যক্তি-নিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে। কমিউনিস্ট, ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, অতএব নিন্দনীয়।

একবার মার্কিন দেশে একটা স্টেটে দলকে বর্জন করার পরীক্ষা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ব স্ব প্রধান ব্যক্তিরা কোমর বেঁধে দলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সংঘাত যখন বাধল তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপাসক স্ব স্ব প্রধান ব্যক্তিরা কাজের সুবিধার জন্য শ্রম-বিভাগ ক'রে নিতে বাধ্য হয়। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, ধনরক্ষক, পল্টনের কাপ্তান সবই করতে হয়। কাজের সমন্বয়ের জন্য, দলের বিরুদ্ধে ভাল ক'রে লড়বার জন্য এরা সভা করে, সংঘ করে, দলে দলে কাজে যায়। ফলে দেখা গেল, দলবিরোধীরা দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দলই বাঁধে, এরাও ফলে দ'লোই হয়ে পড়ল। তখন তারা ভুল বুঝে তাদের সংকল্প ছাড়তে বাধ্য হয়। Cosmic habit forceএ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা অঙ্গাঙ্গী, এককে অতিক্রম করা চলে না। অতএব নিয়ম-কঠোরতা অচল।

চলেছি এগিয়ে, কি পেছিয়ে?

চলেছি। এগিয়ে কি পেছিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বলে, কণারক আর হয় না, গোবি মরুভূমিতে হাজার টন পাথর ব'য়ে নিয়ে যেতে পারি না। Cosmic habit force সাধারণকে নিয়ে এগিয়েই চলছে। সেদিনও 'বিশেষ' ছিল আজও 'বিশেষ' আছে। তবে প্রকারভেদ। সেদিন হালে পানি না পেয়ে বলেছি 'প্রকৃতির খেয়াল', আজ কিন্তু যুক্তিদৃষ্টি খুলেছে অনেক বেশি। একনায়কত্বের আওতায়, রাষ্ট্রের একান্ত সাহায্যে সম্যক ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিপ্রকাশের প্রশ্রয়ে সেদিন যেমন কণারক সম্ভব হয়েছিল, আজও তেমন অনুকূল অবস্থায় 'বিশেষ' সম্ভব হয়। আজও রাষ্ট্রের অবাধ সাহায্যে পুরো স্বাধীনতা পেয়ে 'অ্যাটম' রিসার্চ চলেছে। R ১০০। R ১০১। উড়ো জাহাজ আজও হয়। R১০১ ভাঙল, সমস্ত বিশ্বকর্মাশিষ্যদের নিয়ে বংশে বাতি দিতে রইল না কেউ। ফলে R১০০ ভেঙে বিলাতের কালোয়ার-পট্টি চালতা-বাগানে বিকোতে হয়। কে বলবে মহাভারতের পুষ্পকরথের মেকানিকরাও এমনি ক'রে কুরুক্ষেত্রে নির্মূল হওয়াতেই পুষ্পক অবলুপ্ত কিনা! বিরোধ আমাদের কারও সঙ্গেই নেই, এগিয়ে চলেছি, বলতে আপত্তি থাকে বল—রকম ফের হয়েছে,—এই Cosmic habit force—এগিয়েই বল আর পেছেই বল, সভ্যতা স্পাইরেল নিয়মে চলে, এ কথাও ঋষিমুখে শুনেছি।

জনমত

হিত অহিত জানা এক, আর তাকে চালানো অন্য কথা। ঠিক টেকনিকে কাজ না করলে, তোমার জ্ঞান সহজে চালাতে পারবে না, ভাল হ'লেও না। ওরা বলে tact—কৌশল; আমরা বলি টেকনিক, মন্ত্র ও প্রয়োগসন্ধান। জনমতকে ধাক্কা দিতে গিয়ে সক্রেটিসকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এমনই কত দৃষ্টান্ত আছে। অতএব এখানেই আমাদের মন্ত্রের ও টেকনিকের প্রয়োজনীয়তা।

বিরোধ নেই

বিরোধ আমাদের কারও সঙ্গে নেই। গতানুগতিক উন্নতিশীল, প্রগতি সেকেলে—কারও সঙ্গেই না। অন্তত স্থায়ী বিরোধ কারও

সঙ্গে নেই। কার সঙ্গে বিরোধ করব? সবাই এবং সবই যে Cosmic habit forceএর, বিশ্বরূপের ও বিশ্বস্বভাবের অভিক্ষেপন, বৈষ্ণবী মায়া। ঘটে বুদ্ধির অভাব ব'লে বুদ্ধি যোগাতে চাই এবং হাতে টেকনিক দিতে চাই। অবস্থা বিরূপ হ'লে, অবস্থাকে উপযোগী ক'রে অনুকূল ক'রে নিতে চাই। Adaptability—Adjustment. নরেন্দ্রমর্কট-কথায় মশা মারতে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে রাজাকে কেটে ফেলে। আজও তা হয়, হিতকামী সর্বদা হিতকর্মী হয় না। খুনী ফেরারী আসামীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে এল। কন্‌স্টেব্‌ল কৈফিয়ৎ দেয়, হুজুর, আসামী আপনাকে অপমান করেছে, তাই ছেড়ে দিলাম। বলে কিনা, আমি তোর দারোগাবাবুকে মানি না। আমিও বললাম, তবে আমিও তোকে আসামী ব'লে মানি না। কন্‌স্টেব্‌লের প্রভুভক্তি ও বুদ্ধি প্রশংসনীয় (?)।

সামঞ্জস্য—Adjustment

যখন বিরোধ কারও সঙ্গে নেই, যখন দেখছি পাতার দুটো পৃষ্ঠা—কালোতে আলো, আলোতে কালো, সত্যের পাশে মিথ্যা, মিথ্যার পাশে সত্য, যখন বুঝতে পাচ্ছি—স্বার্থ-পরার্থ, বিরোধ-সন্ধি, আপোস-মীমাংসা জড়িয়ে বিশ্বরূপ, তখন কোন একটার উপর জোর দিয়ে, এক-চোখা হয়ে, নিয়মকঠোরতা সমর্থন করি কি ক'রে? Symmetry ও Deversity—সাম্য ও বৈচিত্র্যে বিশ্বরূপ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Adjustment. Physiologyর বড় কথা এবং শেষ কথা এই Adjustment—মানিয়ে নেওয়া, সবার সঙ্গে উপযোগী ক'রে চলা।

অতএব আমাদের সূত্র-টেকনিক রইল, ভূমিকা ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে এবং পাত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবস্থা ক'রে মানিয়ে নেবে। নিয়মকঠোরতাতে আবদ্ধ হবে না। প্রথা আঁকড়ে ধ'রে অপমৃত্যুকে ডাকবে না।

আমার চৌষট্টি বৎসর পূর্ণ ক'রে পঁষট্টি বর্ষ প্রবেশে, একবিংশ অক্ষর সূত্রে, একবিংশ থিওরি টেকনিক-অনুশাসন দিলাম। সপ্তাভ্যাস না পার একটিও অভ্যাস ক'রো, তাতেই অন্য সূত্রের প্রভাব পাবে।

তোমার সারথি, আমার সারথি, সকলের সারথি, পার্থসারথি আমাদের সহায়-শরণ। শিবমস্তু—কল্যাণমস্তু॥

শ্রীঅতুল সেন

স্মরণী

অপরাহ্ণ-বেলা শেষ; মাঠে মাঠে হেরি
অগণিত গাভী চরে ধান্য-ক্ষেত্র 'পরে—
দক্ষিণ সমীর বহে মাধবীরে ঘেরি,
রাজহংস করে কেলি শ্যাম-সরোবরে।
দিক্‌চক্রবাল চুম্বি অরণ্যের শেষে,
ডাহুয়ার পরপারে—একান্ত নির্জনে,
দৃশ্য সুদূরলোকে—ওরি কোল ঘেঁষে,
ইন্দ্রজাল রচে কে ও নীলনভঃ-কোণে!
বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যের কশাঘাত হানি;
অলক্ত-লাঞ্ছিত পদে ধীরে ধীরে চলে,
ধূপছায়া শাড়ি পরি' সায়াহ্নের রাণী;
শিয়রে প্রদীপ ধরি' শুকতারা জ্বলে।
বিহগের শ্রান্ত স্বরে উতলা কানন,
পশ্চিম দিগন্তে নামে বিদায়ী তপন।

যৌবনের কুঞ্জবন কে পারে ভাঙিতে?
পল্লবে মুকুলে ফুলে আলোক-ছায়ায়,
শত রাস-স্মৃতিভরা মাধবী নিশীথে,
গোধূলির ভ্রষ্টলগ্নে বিস্ময় জাগায়!
আজো রাঙা পলাশের অশোকের বন,
আজো শুনি নীলকণ্ঠ শ্যামার কাকলী,—
কলাপীর কেকারব, ভ্রমরগুঞ্জন,—
উচ্ছ্বসিত কুন্দে ধায় মদমত্ত অলি।

অধিনেত্রী-আনন্দের সঙ্গিনী লীলার,
বিলাস-বিলোল-বক্ষ উদ্বেলিত করি'
অস্ত-অচলের চূড়া ধীরে হয়ে পার
কোথায় লুকালে হায়! দিবস শর্ব্বরী,
অবসন্ন কবরীর খ'সে-পড়া ফুলে
কুড়াইয়া গাঁথি মালা,—যায় খুলে খুলে।

হে আমার বাসন্তিকা, আলোর অপ্সরী,
ঘনাইয়া এস কাছে, এস এইখানে,
কবিতার তপোবনে বাণী-মূর্ত্তি ধরি'
মর্ম্মরিয়া তোল তারে,—বসিলাম ধ্যানে।
ফুল্ল বসন্তের এই মৃদুমন্দ বায়ে
কোকিলের কলকণ্ঠ কাহারে সম্ভাষে?
অস্তমিত সান্ধ্য-সূর্য শালবনচ্ছায়ে।
একা কি গাহিব গান?—বসুন্ধরা হাসে!
কয় এ কল্পনা তব কোথা ল'য়ে যায়,
দিক্‌চক্রলীন দূর বনান্তের পারে,
মানস-নয়ন যেথা নিজেরে হারায়,
মহাশূন্যে জ্যোতিপুঞ্জে—অসীমের দ্বারে।
জনপদ নদী গিরি রবি শশী তারা—
পাকে পাকে বাঁধে মোরে করি গৃহছাড়া!

* * *

বিস্মৃতির পটে সে যে আজো মুছে নাই,
রেখে গেছে পরিচয় বিদায়ের গানে;
অনন্ত এ যাত্রাপথে ভাবি শুধু তাই—
হয়তো বা দেখা হবে অন্য কোনখানে।
হেথা নহে, হেথা নহে, মানসের তীরে
আষাঢ়ের ঘন মেঘ যেথা ঘুরে ফিরে!

শ্রীশান্তি পাল

২৯

শহরে সোরগোল প'ড়ে গেছে। স্বামী জ্ঞানানন্দ সর্বজনীন কালী-পূজা করছেন। আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সকলেই নিমন্ত্রিত হবে শহরের। সকলেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। তারপর হবে সকলের একসঙ্গে ব'সে খাওয়া; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বাউরী, মুচি, মেথর পাশাপাশি। পরিবেশন করবে মেথর বাউরী মুচিরা। সাড়া প'ড়ে গেছে চারদিকে। আয়োজন হচ্ছে প্রচুর। মারোয়াড়ীরা মুক্তহস্তে টাকা দিচ্ছে, দ্রব্য-সামগ্রী দিচ্ছে। রায় বাহাদুর, তপন, গুণেনবাবু, শহরের আরও অনেক বড়লোক, যার যেমন আয়, টাকা দিয়েছে। মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠান হবে। শহরের সবাই প্রবল আগ্রহের সঙ্গে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছে।

একদিন একটা বিরাট সভা হয়ে গেছে রায় বাহাদুরের ধান-কলের চাতালে। শহরের যত নীচশ্রেণীর লোকদের জড়ো করা হয়েছিল। বক্তৃতা দিয়েছেন স্বামীজী। বলেছেন, সমাজে নীচজাতি ব'লে কিছু নেই। বৃত্তির মধ্যে হীনতা নেই। হীনতা হচ্ছে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্রে, আচার-আচরণে, জীবন-যাত্রার প্রণালীতে। যে কোন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে মানুষ পবিত্র মহৎ জীবন যাপন করতে পারে। হৃদয় ও মনের পবিত্রতা ছাড়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করবার অধিকারী হওয়া যায় না। হীনচরিত্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতে অধিকার নেই। অথচ, তথাকথিত হীনবৃত্তিধারী লোক সচ্চরিত্র ও সদাচারী হ'লে যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকারী হতে পারে। জাতিভেদের প্রাচীর তুলে আমাদের প্রাচীন সমাজপতিরা হিন্দু সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে গেছেন। তার ফলে, পরস্পরের মধ্যে এসেছে ঘৃণা বিদ্বেষ। আমাদের ঐক্য-বোধ লোপ পেয়েছে; আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নেই। আমরা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছি। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা ও সবলতার ওপরে সারা দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এতদিন মনে করেছিলেন, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকলেই, তাঁদের ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধি হ'লেই সমাজের পরিণতি ও উন্নতি। নীচের দিকে তাঁরা তাকান নি। যারা

সত্যকার আপনার জন, যারা বিপদে-আপদে প্রাণ দিয়ে তাঁদের রক্ষা করেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁদের খাদ্য উৎপন্ন করেছে, বস্ত্র বয়ন করেছে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেছে, তাদের দুঃখ-দৈন্য, রোগ-মৃত্যু ও ক্রমশ অধোগতির দিকে তাঁরা লক্ষ্য করেন নি। আজ বিপদ যখন দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন ও আস্ফালন করছে, সমাজের ওপরে করছে দণ্ডাঘাত, গৃহের পবিত্রতা ও মেয়েদের পবিত্রতাকে কলুষিত করছে, তখন তাঁদের চোখ খুলেছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, হাত-পা পঙ্গু হয়ে গেলে, মাথার মাহাত্ম্য যতই থাক্, নিস্তার নেই।

তাই আজ সকলকে আমন্ত্রণ করেছি আমি। দেশের আকাশে নবযুগের আগমন-বার্তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নবযুগের অরুণালোকে সকল কুসংস্কার, সকল ভেদজ্ঞান কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে। সমাজের সকলে এক সমতলে এসে দাঁড়ান। পরস্পরের হাত ধরুন। পরস্পরকে ভাই ব'লে ডাকুন, আত্মীয় ব'লে ভাবুন। আমাদের বিশাল হিন্দু সমাজের বিরাট শক্তি, যা কণা কণা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে নিষ্ক্রিয় হয়ে, তা যদি সমবেত হয়, সংহত হয়, সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা হ'লে তার সামনে পৃথিবীর যে কোন বিরুদ্ধ-শক্তি দাঁড়াতে পারবে না। মাথা নুইয়ে নতি স্বীকার করবে।

সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে মাতৃপূজার আয়োজন করছি। আপনারা সকলে সেই পূজায় যোগ দিন। মা আপনাদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁর আশীর্বাদে আপনাদের মনের মালিন্য দূর হবে, ভেদজ্ঞান ক্ষয় হবে, শক্তিসঞ্চয় হবে দেহে ও মনে। নবলব্ধ শক্তিতে আপনারা শত্রুকে নির্মূল করতে পারবেন।

শুধু এই সভা নয়, আরও খণ্ড-সভা হচ্ছে পাড়াতে পাড়াতে, বিশেষ ক'রে নীচশ্রেণীর লোকদের পাড়াতে। হিন্দু-মহাসভার ক্ষুদে পাণ্ডারা বক্তৃতা করছেন সেখানে। একসঙ্গে ব'সে খাওয়াতে আপত্তি হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। বাউরীরা মেথরদের সঙ্গে ব'সে খেতে চাচ্ছে না, মুচিরা বাউরাদের সঙ্গে ব'সে খেতে চাচ্ছে না। উচ্চশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে খেতে আপত্তি নেই কারও। নিজেদের

চেয়ে নীচুদের সঙ্গে খেতে আপত্তি। তা ছাড়া বিয়ে-টিয়ের কোন বাদ-বিচার থাকবে না নাকি! আপত্তি করছে পাড়ার মুরুব্বিরা। বলছে, এটা এজ্ঞে ভাল হচ্ছে নাই। সব একাকার হয়ে যাবে যে!

পাণ্ডারা বোঝাচ্ছেন, একাকার কিছু হবে না। যে যার বৃত্তি করবে, বিয়ে-টিয়ে যে যার সমাজে করবে, কিন্তু ভেদাভেদ কিছু থাকবে না। মুচির ছেলে যদি লেখাপড়া শিখে মানুষের মত হয়, তো বামুনের ঘরে তার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। বামুনদের দিক থেকে আপত্তি হবে না। তেমনই কোন বাউরীর মেয়ে যদি শিক্ষিতা হয়, সুশ্রী হয়, কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়তো তাকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু সে সব পরের কথা। ওসব হতে অনেক দেরি এখনও। সম্প্রতি যা করতে হবে তা হচ্ছে, সকলকে এক হতে হবে। লাঠি-খেলা, ছুরি-খেলা ইত্যাদি শিখে, কুস্তি ক'রে, শক্তি অর্জন করতে হবে। পরস্পরের বিপদে বুক দিয়ে পড়তে হবে। একটা কথা তোমরা সব সময়ে মনে রাখবে, মুসলমানরা বরাবরই আমাদের হিন্দু সমাজের ওপর থাবা মেরেছে। এই যে পূর্ববঙ্গে এত মুসলমান, ওরা সকলেই তোমাদের মত হিন্দু সমাজের লোক ছিল। মুসলমানরা জোর ক'রে তাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। এখন এরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেরা হিন্দুত্ব হারিয়েছে ব'লে ওরা সকলকে নিজেদের স্তরে নামিয়ে নিতে চাচ্ছে। নোয়াখালিতে কত হিন্দুকে যে জোর ক'রে মুসলমান করেছে, কত হিন্দু কুমারী, বিধবা ও এমন কি বিবাহিতা মেয়েদের ধর্ম পবিত্রতা ও সতীত্ব নষ্ট করেছে, তার সংখ্যা নেই। মুসলমানদের তোমরা বিশ্বাস ক'রো না। ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে সব সময়, যেমন সাপের কাছ থেকে লোকে দূরে স'রে থাকে। অজান্তে ছোবল মারতে ওদের জুড়ি নেই দুনিয়ায়। কলকাতায় নিরীহ নির্দোষ ভদ্র হিন্দুদের হাজার-হাজার ওদের ছুরিতে মরেছে। আর বিশ্বাস ক'রো না কম্যুনিস্টদের, ঐ যারা তোমাদের পাড়ায় এসে তোমাদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে, তোমাদের জোয়ান ছেলে-মেয়েদের হাত করবার চেষ্টা করে। ভিতরে ভিতরে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ আছে ওদের। পাছে হিন্দুরা এক জোট

হ'লে মুসলমানদের ক্ষতি হয়, এই জন্তে ওরা তোমাদের ভাঙিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এই কথা সব সময়ে মনে রেখো—হিন্দু ছাড়া হিন্দুর আপনার আর কেউ নেই। যে দিন আসছে, এমন কি দু-পাঁচ বছরের মধ্যেই দেখতে পাবে, হিন্দু সমাজের মধ্যে উঁচু-নীচু বড়লোক-গরিব লোক কোন ভেদ থাকবে না। সবাই সমান হবে মনে ধনে মানে। আমরা যতই একজোট হতে পারব, ততই সেই দিন এগিয়ে আসবে।

কালীপূজার দিন। সকাল নটা। সমরেশ চা-খাবার খাচ্ছিল। এমন সময়ে তিলু ও লতু এল। তিলু ডাকলে, কাকীমা! সমরেশের মা রান্নাঘরে ছিলেন; বললেন, ব'স মা, যাচ্ছি।

সমরেশ বললে, একটা কিছু টেনে নিয়ে ব'স।

আর টানাটানি করতে পারি না; বসছি এখানে।—ব'লে মেঝেতেই ব'সে পড়ল তিলু।

তিলু বললে, ক দিন দেখা নেই যে! কোথায় থাক?

সমরেশ বললে, প্রতুলের ওখানে। ওর মা মারা গেছেন তো!

তিলু বললে, তাই নাকি? কৃত্রিম সহানুভূতির সুর লাগাল কণ্ঠস্বরে। তারপর বললে, তা তোমার চেহারাটা ঝ'ড়ো কাকের মত ক'রে রেখেছ কেন? অশৌচ পালন করছ নাকি?

করলে দোষ কি? প্রতুলের মাও তো আমার মায়ের মতনই।

লতু হেসে বললে, এই তোমাদের আরম্ভ হয়ে গেল মাসী! কথায় বলে, 'না দেখলে থাকতে পারি, দেখলে পরে মারামারি।'

তিলু ধমকের সুরে বললে, তুই বড় ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস লতু! আমাদের তো শাসনের বাইরে চ'লে যাচ্ছিস। তপনকে ব'লে দিতে হবে যেন শাসন করে তোকে।

আবদারের সুরে বললে লতু, বেশ তো, ব'লে দিও না। কিছু অন্যায় বলেছি নাকি! ক দিনই তো সারাক্ষণ খুঁতখুত করছিলে—ভোঁদু ক দিন আসে নি। আজ দেখা হবামাত্র কথা-কাটাকাটি শুরু ক'রে দিলে।

সমরেশ হাসতে লাগল।

তিলু বললে, কথাটা শুনে খুব ফূর্তি হচ্ছে, না?

সমরেশ বললে, হচ্ছে বইকি একটু।

মা এসে দাঁড়ালেন।

তিলু বললে, প্রভুলের মা মারা গেছেন ব'লে উঁদু অশৌচ-পালন করছে। তাই বলছিলাম, যদি পরের মায়ের—

কথাটা শেষ করতে না করতে মা ব'লে উঠলেন, পরের মায়ের ওপর বড় ভক্তি। নিজের মা ম'রে গেল কি না, চোখ চেয়ে দেখে না।

তিলু বললে, তাই তো বলছিলাম—

মা বললেন, ওকে ব'লে কি ফল মা! বলতে তো কসুর কর নি কোনদিন; ওর চোখ কি খুলেছে কখনও? ও আমার অদেষ্ট।

সমরেশ চুপ ক'রে চা খেতে লাগল।

তিলু বললে, চা খেয়েই রোঁদে বেরুবে তো?

সমরেশ বললে, তা বেরুতে হবে বইকি।

আশ্রমে যাবে না?

আশ্রমে যাব কি জন্যে? আমি তো শিষ্য হই নি স্বামীজীর।

সমরেশের মায়ের দিকে তাকিয়ে তিলু বললে, দেখছেন! আশ্রমে এমন একটা ব্যাপার হচ্ছে, কিছু জানে না! সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, শহরের কুকুর বেড়াল পর্যন্ত জানে, আর তুমি জান না?

কি হচ্ছে?

কালীপূজো হচ্ছে। বাউরী-মেথর সব পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সব একসঙ্গে ব'সে খাবে। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে সমরেশ বললে, তাই নাকি! বাউরী মেথরদের একদিন পূজো করতে দিলে, একদিন এক পংক্তিতে ব'সে খেতে দিলে, তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে তো?

তিলু বললে, দুঃখ কি একদিনে ঘোচে? তবে ঘোচাবার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

শুরু তো হয়েছে, সারা হবে কখন? একটু থেমে বললে, তা তোমরাও একসঙ্গে ব'সে খাবে তো?

তিনু বললে, যাব বইকি।

ফিরে এসেই আবার ছুঁই ছুঁই করবে? ওরা কেউ রান্নাঘরের দরজা মাড়ালে হাঁ-হা ক'রে ছুটে যাবে?

তিনু হেসে ফেলে বললে, এতদিনের ভেদজ্ঞান কি একদিনে যাবে? হাজার শিকড় বিছিয়ে হাজার দিক হতে আঁকড়ে আছে সারা মন, ওকে নির্মূল করতে সময় লাগবে। তবে চেষ্টা করলে কি না হয়?

মায়ের দিকে তাকিয়ে সমরেশ বললে, হ্যাঁ মা, আমাদের নফরের মায়ের সঙ্গে ব'সে খেতে পারবে তো?

মা বললেন, না বাছা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। যাদের বয়স কম, তারা যা ইচ্ছে করুক। আমাদের এমনই এমনই যেতে দাও তোমরা।

তিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে সমরেশ মুচকি হেসে বলল, শুনলে?

তিনু হাসতে লাগল। সমরেশের মাকে বললে, তা হ'লে আপনি তৈরি থাকবেন। তপন গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলেছে। ও তো নিজে আসতে পারবে না। ওখানে হাজির হয়েছে সকাল থেকে। জামাই-বাবুও। ওরা শ্বশুর-জামাই দুজনেই এই কাজটির জন্যে খুব খাটছে।

মা আক্ষেপের সুরে বললেন, মানুষের মত মানুষ হ'লেই ভাল কাজের জন্যে খাটে। আর দেখ না ঐ সামনে ব'সে—ব'লে ছেলের উদ্দেশে মুখ ও চোখের ইঙ্গিত করলেন।

সমরেশ মৃদু হেসে তিনুর দিকে তাকাল। চোখোচোখি হ'ল দুজনে। লতু হাসতে লাগল।

তিনু সমরেশকে বললে, তুমি কি যাবে না সত্যি? চল না আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে একজন পুরুষ যাওয়া উচিত।

দিনের বেলায় পুরুষ সঙ্গে যাওয়ার কি দরকার?

ভারি ভিড় হবে যে! ভিড় ঠেলে ভেতরে পৌঁছে দেবে কে?

ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

তা তো আছে। তুমি করবে কি বাড়িতে ব'সে ব'সে?

সমরেশ মাকে বললে, হ্যাঁ মা, বাড়িতে রান্না-বান্না করছ না, নাকি?

মা বললেন, আমার আর নিস্তার কবে আছে বাছা ? সবাই যা' করে, তুমি তো তা কর না। চিরদিন জানি আমি। রান্না করছি বইকি।

সমরেশ বলল, তবে আবার কি ? মোচ্ছবে খাওয়া-টাওয়া আমার পোষায় না।

তিলু বললে, দেখাও পোষায় না ? এমন একটা জিনিস, যা দেখবার জন্তে শহর ভেঙে যাচ্ছে ! তোমার একটুও ইচ্ছে করছে না ?

সমরেশ চুপ ক'রে রইল।

মা বললেন, হ্যাঁ মা, সেই ছেলেটার বাড়িতে ও যে দিন রাত প'ড়ে থাকে, কিসের টানে বলতে পার ?

তিলু মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, কি ক'রে জানব কাকিমা ? একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, শুনেছি ওর একটা ধাড়ী বোন আছে। বিয়ে হয় নি এখনও। আপনি তো দেখেছেন তাকে। এ বাড়িতে একদিন এসেছিল।

মায়ের মনে পড়ল। চোখ ডাগর ক'রে বললেন, তাকেই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় নাকি মা ?

তিলু বললে, তা হবে।

মা সমরেশের দিকে তাকিয়ে খনখন ক'রে ব'লে উঠলেন, তা হ'লে বাছা, আমি ঘর ছেড়ে চ'লে যাব, এখন থেকে জানিয়ে দিচ্ছি।

সমরেশ বিরক্তির সঙ্গে তিলুকে বললে, মা একে পাগল ; তার ওপর তুমি আবার উসকে দিচ্ছ ?

মা সক্রোধে বললেন, পাগল ! চিরদিনটা পাগলামিই করলাম তো ! তাই সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছি তোর !

লতু বললে, দিদিমা, জল খাব।

মা এক মুহূর্তে জল হয়ে গেলেন। সস্নেহে বললেন, জল খাবি দিদি ! আয়, পুজোর পেসাদ আছে, তাই খেয়ে জল খাবি।

লতুকে সঙ্গে নিয়ে মা চ'লে গেলেন।

তিলু বললে, প্রতুলের বোনের কাছেই ভিড়বার চেষ্টায় আছ নাকি ?

সমরেশ বললে, পাগল!

তিলু বললে, বিশ্বাস কিছু নেই। দিন রাত তো প'ড়ে আছ ওখানে। আজ কদিনই আমাদের ওদিকে পা বাড়াও নি।

সমরেশ বললে, প্রতুলটা একেবারে দ'মে গেছে। কাছে থেকে নানা গল্প-সল্প ক'রে ওর মনটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করি।

তিলু বললে, তা হবে।—ব'লে মুখ গম্ভীর ক'রে চুপ ক'রে রইল।

সমরেশ বললে, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। কাজের কথা হোক। তিলু গম্ভীর মুখেই জবাব দিলে, কি আর কাজের কথা বলব? সমরেশ বললে, দেখ তিলু, পূজো না হয় দেখতে যাব, মোচ্ছবে না হয় খেতেও বসব। মুখটা আর হাঁড়ি ক'রে রেখো না, একটু হাস।

হাসি দেখবার জন্যে ম'রে যাচ্ছ যে!—ব'লে মুখ গম্ভীর করতে গিয়েই তিলু হেসে ফেলল।

সমরেশ বললে, দেখ তিলু, সত্যি এসবে কিছু হবে না। আসল কাজ হ'ল শিক্ষার ব্যবস্থা। সমাজের সবাইকে শিক্ষিত হবার সুযোগ দিতে হবে। এইটা আগে দরকার। অন্য সব পরে। কিন্তু কারও ওদিকে নজর নেই। তবে কংগ্রেস যদি কিছু করেন। এতদিন তো সংগ্রামে শক্তি ক্ষয় হয়েছে। এর পর, রাষ্ট্র হাতে এলে কংগ্রেস যদি সমস্ত শক্তি এই দিকে নিয়োগ করেন, তবেই দেশে সত্যিকার সর্বজনীন স্বাধীনতা আসবে।

তিলু বললে, আমাদের নারী-সমিতি থেকে আমরা এই কাজ করব ভাবছি।

সমরেশ বললে, আমরা ভাবি বেশি, কাজ করি কম। কাজেই ভাবুক ব'লে জগতে আমাদের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু কর্মী ব'লে সুনাম বিশেষ নেই।

তিলু বললে, ভাবা আমাদের শেষ হয়েছে। শীগগির কাজ আরম্ভ হবে।

সমরেশ বললে, আরম্ভ হবে বটে, কিন্তু টিকে থাকবে কতদিন, সেইটার সম্বন্ধেই সন্দেহ। কারণ কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে টিকিয়ে রাখার মত শক্তি নিষ্ঠা ধৈর্য সততা সংহতি

আমাদের নেই। আমরাও স্কুলে পড়বার সময় এক-একটা পাড়াতে নাইট-স্কুল খুলতাম। দু মাস বেশ কাজ চলত, ছাত্রেরা কিছু কিছু শিখত—অক্ষর-পরিচয়, দু-চার রকমের বানান, কিছু কিছু নামতা। তারপর উৎসাহ এলিয়ে আসত। স্কুল উঠে যেত। আবার পর-বৎসর নতুন ক'রে শুরু করতাম। ছাত্রেরা আগের বৎসর যা শিখেছিল, এক বৎসরের মধ্যে তা বিলকুল ভুলে ব'সে থাকত। আবার নতুন ক'রে শুরু হ'ত শিক্ষাদান। আগের বৎসরে যতটা এগিয়েছিল, এবারেও ততটাই এগোত। তারপর আবার স্কুল বন্ধ। এখনও শুনি স্কুল-কলেজের ছেলেরা সেই কর্মই করছে। ফলে, যাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, তাঁদের স্মৃতিপটে দু-চারটে অক্ষরের ও বানানের ফিকে ছাপ ছাড়া কারও বিশেষ শিক্ষালাভ হয়েছে কি না সন্দেহ।

তিলু বললে, আমরা তো পুরুষ নই। আমরা যা ধরি, তা সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর না ক'রে ছাড়ি না। তা ছাড়া, ভাত ডাল চচ্চড়ি দিনের পর দিন রেঁধেও আমাদের রান্নার উৎসাহ যদি না ক'মে যায় তো এ কাজেও উৎসাহ আমাদের কমবে না।

সমরেশ চুপ ক'রে রইল।

তিলু বললে, আমরা একটা থিয়েটার করছি; গরিব লোকদের বাড়ি মেরামত করবার টাকা তোলবার জন্যে। ছোট একখানা বই হবে। প্রথমে কিছু গান ও আবৃত্তি থাকবে। শহরের যাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী, মেয়েদের শেখাবার জন্যে তাঁদের সাহায্য চাওয়া হবে। তুমি তো শুনেছি খুব ভাল গাইতে পার, তুমি যদি—

বাধা দিয়ে সমরেশ বললে, কে বললে?

তপন বলছিল সে দিন, তুমি নাকি তোমাদের দলের মেয়েদের গান শেখাচ্ছিলে?

ওসব বাজে কথা। তা ছাড়া, আমি কোন দলে-টলে নেই।—সমরেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললে।

তিলু মুখ টিপে হেসে বললে, এত বড় একটা গাইয়ে বাড়িতে থাকতেও আমাদের ভাগ্যে গান শোনা হ'ল না কোনদিন। যত্র মধু আছে সব পরের কাছেই ঝরছে, আর আমাদের ভাগ্যে শুধু মৌমাছির

বিঁধুনি। একটু থেমে বলল, আমাদের অবস্থা হ'ল সেই বাঁশী-বাজিয়ের স্ত্রীর মত।

সমরেশ বললে, তোমাদের, না, তোমার ?

কথাটায় কান দিল না তিলু। মুখটা কিন্তু লাল হয়ে উঠল।

সে বলতে লাগল, একজন মস্ত বড় বাঁশী-বাজিয়ে ছিল। এমন চমৎকার বাঁশী বাজাত যে, যে শুনত মুগ্ধ হয়ে যেত। অনেকে ঘুমিয়ে পড়ত বাঁশী শুনতে শুনতে। করুণ সুর হ'লে চোখে বন্যা বইতে শুরু করত শ্রোতাদের; কিন্তু ঘরে ফিরে এসে ওস্তাদজী সেই বাঁশী দিয়ে স্ত্রীকে মুখে মাথায় পিঠে এলোপাথাড়ি পিটতে শুরু করত। আমাদেরও হ'ল সেই অবস্থা।

লতু ফিরে এল। তারপর এলেন মা।

তিলু বললে, তা হ'লে উঠি কাকিমা। আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন। ভোঁদুও যাবে বলছে।

মা সাগ্রহে বললেন, তাই নাকি মা!

সমরেশ বললে, মোটরে যাব না কিন্তু।

তিলু বললে, যাবে না কেন? বড় মোটর। আমি, লতু আর কাকিমা—তিন জন মাত্র থাকব। তা ছাড়া পরের মোটর তো নয়, তপনের নিজের।

সমরেশ বললে, তা হোক। আমি হেঁটেই যাব। আগে গিয়ে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব। তোমাদের অসুবিধে হবে না কিছুই।

তিলু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, হেঁটে যেতে হবে না রোদে রোদে। মোটরেই যেতে হবে তোমায়। কেমন না যাও দেখব।

মা হাসতে লাগলেন—তিলুর কাছে ছেলেকে জব্দ হতে দেখে।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

হাতটা খুলুক

স্বীকৃত যখন দিতে মুঠো-ভরা ছাই,
হাতটা খুলুক মাগো, দাও কিছু তাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অষ্টপ্রহর কীর্তন হচ্ছে মিঃ যোগীন্দ্রনাথ সান্যালের বাড়ি। দক্ষিণ-কলকাতার অভিজাত পাড়ায় বাড়ি মিঃ যোগীন্দ্রনাথের। যাঁরা মিঃ সান্যালের খবর রাখেন নি হালে, তাঁদের কাছে হয়তো ব্যাপারটা রীতিমত আশ্চর্য ঠেকবে। আমরা জানি এটা অকস্মাৎ কিছু নয়। কিছুদিন যাবৎ মিঃ সান্যালের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সদাই যেন অন্যমনস্ক ভাব, দৃষ্টি কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ! সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তাঁর ব্যবহারে। ভদ্রলোকের প্রকৃতিটা ছিল কিঞ্চিৎ রুক্ষ। হাই ব্লাডপ্রেসারের জন্য হতে পারে, আবার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার জন্যও হতে পারে। এখন কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে কথা বলবেন হেসে, সব কথা জেনে নেবেন খুঁটিয়ে, পরিচিত হ'লে এতদিন আসেন নি কেন ব'লে অনুযোগ করবেন, চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে বার বার ব'লে দেবেন যেন না ভুলে যান। আপনি বিস্মিত হয়ে শুধু মনে মনে বলবেন, দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্র!

অন্যে পরে কা কথা! বছর খানেক আগে যখন পেন্‌শনের সময় হয়ে এল, অথচ ছেলেটার কোথাও কোনও সুরাহা হয়ে উঠল না, একদিন গিয়ে হাজির হলাম মিঃ যোগীন্দ্রনাথের বাড়ি, ছেলেটার যদি কোনও হিল্লে হয় এই ভেবে। বেয়ারা ভিতর থেকে খবর নিয়ে এসে বললে, সাহেবের তবিয়ৎ ভাল নেই, মুলাকাৎ হবে না। ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চলেছি, ভেঁপুর শব্দে সচকিত হয়ে তাকাতেই দেখি, একখানা গাড়ি বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল আমার গা ঘেঁষে। অসতর্কভাবে পথ চলার জন্য সোফারের একটি গালিও কানে গেল। কিন্তু গাড়ির আরোহী কে? মিঃ যোগীন্দ্রনাথের মত মনে হ'ল না! অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সশব্দে।

যোগীন্দ্রনাথ আমার ছেলেবেলার সহপাঠী। তাই এই প্রত্যাখ্যান-জনিত বেদনা একটু বেশি ক'রেই বেজেছিল সেদিন।

সেদিন চলেছি সান্ধ্যভ্রমণে সাদার্ন অ্যাভিন্যু দিয়ে। হঠাৎ শুনি কে ডাকছে আমার নাম ধ'রে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, মিঃ

যোগীন্দ্রনাথ। স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, কি হে, তোমার দেখি দেখাই নেই! সেদিন নারাণ জগদীশ ওরা সব এসেছিল। তোমার কথা হ'ল।

আমার কথা হ'ল! মিঃ যোগীন্দ্রনাথের কথায় অন্তরঙ্গতার সুরে যেন ছেলেবেলাকার হারানো যোগীনকে খুঁজে পেলাম। আমার কথা হ'ল! পঁচাশি-টাকা-পেনশন-প্রাপ্ত আমি! এক মুহূর্তে এতদিনকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে আমতা আমতা ক'রে বললাম, এই তো যাব যাব ভাবছিলাম কদিন থেকে। তা তোমার শরীর ভাল আছে তো? ব্লাডপ্রেসার?

সান্যালের মুখে ফুটে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক হাসি: আর ব্লাডপ্রেসার! এখন যেতে পারলেই বাঁচি। তারপর, তোমার ছেলে করছে কি?

কোথাও কোন সুবিধে ক'রে উঠতে পারি নি।—বলতেই যোগীন ব'লে উঠল, সে কি কথা, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও নি কেন?

এক বছর আগেকার ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। চক্ষুলজ্জা ব'লেও একটা জিনিস আছে তো! তা ছাড়া নিজে থেকেই যখন বলছে ছেলেটার কথা, কাজ কি ঘাঁটিয়ে! অনেক কথা হ'ল সেদিন যোগীনের সঙ্গে। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের কথা হতে হতে নির্মল ঘোষের কথা উঠল। একদা সে ছিল একের নম্বরের মণ্ডপ। অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষও তার ছিল। এখন কিন্তু সে হয়ে গেছে পরম ধার্মিক। সবাই ডাকে তাকে সাধু ঘোষ ব'লে। শুনে যোগীন শুধু মন্তব্য করলে, দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্র!

যোগীনের মুখে বিচিত্র হাসি।

সেদিন যোগীনের দেওয়া দামী সিগারেট টানতে টানতে আমার রীতিমত রাগ হয়েছে তাদের ওপর, যারা তার সম্পর্কে কত কথাই না বলেছে! আমি নিজেও হয়তো এই নিন্দুকদের দলেই ছিলাম, কিন্তু ঐ মুহূর্তটিতে নিজেকে তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে একটুও অসুবিধা বোধ করি নি। আহা, এমন অমায়িক লোক, এমন মধুর স্বভাব! ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে একজনের সম্বন্ধে কত ভুল ধারণাই না

গ'ড়ে ওঠে লোকের মনে! একদিনেই কি একজন লোককে জানা যায়

*　　　*　　　*

মধুর মধুর বল্ রে তোরা　　　মধুর মধুর বল্
সখি, মধুর মধুর বল্—

'শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস' পালাকীর্তন চলছে। মাঝখানে যিনি ব'সে আছেন মুণ্ডিত মস্তক, ভালে চন্দন, গলে তুলসীর মালা, তিনিই মিঃ যোগীন্দ্রনাথের গুরুদেব পরমপাদ শ্রীতূরীয়ানন্দ গোস্বামী। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে এই অষ্টপ্রহর কীর্তনের বন্দোবস্ত। ব্যবস্থার ত্রুটি রাখা হয় নি কোথাও। সেরা কীর্তনীয়া শৈলেন ঠাকুরের দলকে নিয়ে আসা হয়েছে নবদ্বীপ থেকে।

শৈলেন ঠাকুর হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি ও দরদ দিয়ে গেয়ে চলেছেন অপরূপ কথার বাঁধুনিতে গাঁথা নদেরচাঁদের গৃহত্যাগের করুণ কাহিনী। বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা ও নদীয়াবাসীর ক্রন্দন ঝ'রে পড়ছে শৈলেন ঠাকুরের কথায় ও সুরে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূসাথে　　　কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া—

নদীয়াবাসী কি তা শুনে স্থির থাকতে পারে? তারা উচ্চ স্বরে কাঁদছে আর—

একজনে পথে ধায়　　　দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?

শৈলেন ঠাকুরের চোখে জল। উপস্থিত ভদ্রবৃন্দের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। অনেককেই দেখা গেল কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছতে।

হঠাৎ একটা মৃদু গুঞ্জন কানে এল। ব্যাপার কি! মিঃ যোগীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল ভাবাবেশে দশাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিচলিত। গুরুদেব স্বয়ং শিষ্যের মস্তক ক্রোড়োপরি ন্যস্ত ক'রে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ভক্তের কপালে, বারিবিন্দু সিঞ্চন ক'রে দিলেন আঁখির পল্লবে, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন

বীজন করার জন্য আর এক ভক্তকে। অনেক পরিচর্যার পর জ্ঞানলাভ হ'ল যোগীন্দ্রনাথের। জ্ঞানলাভ হতেই শ্রীগোস্বামীজীর পা জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। গুরুদেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন, কি হয়েছে তোমার বৎস, কেন এত চঞ্চল হয়েছ? বল আমাকে।

আমিও যাব সব বন্ধন ছেড়ে তাঁর খোঁজে, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, যাঁকে জানলে আর জানার কিছু থাকে না।—অস্ফুটকণ্ঠে বললেন যোগীন্দ্রনাথ।

গুরুদেবকে যেন বিব্রত ব'লে মনে হ'ল। আঁখি মুদে কি যেন ভাবলেন তিনি। ভক্তের কপালে হাত রেখে বললেন অবশেষে অতি ধীরে, এ তো অতি উত্তম কথা বৎস, কিন্তু তাঁকে পেতে হ'লে তো বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি পদ ধনসম্পদ ক'রে নিলেই তো সব পাওয়া হয়ে যাবে, সব জানা হয়ে যাবে।

গুনগুন ক'রে আরম্ভ করলেন প্রভুপাদ শ্রীতুরীয়ানন্দ স্বামী—

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

তার আর কি পাওয়া বাকি রইল? রাধামাধব! রাধামাধব!

যোগীন্দ্রনাথ গুরুদেবের পা ছেড়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু গুরুদেব, আমায় কে যেন অনবরত ভিতর থেকে বলছে, ওরে, তুই এসব নিয়ে এখনও জড়িয়ে আছিস? বেলা যে যায়, পালা, পালা।

গুরুদেব বললেন, তোমার কথায় আমি বিমল আনন্দ অনুভব করছি। ভক্তের মন তো স্বতই ভগবানকে পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে। কিন্তু কই, এমন ভক্ত তো লক্ষ জনার মাঝেও একজনের বেশি চোখে পড়ল না! আজ তুমি বিশ্রাম কর বৎস। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসযাত্রার কথা শুনে তুমি বিচলিত। কাল আবার কথা হবে।

* * *

কাল আর যোগীন্দ্রনাথ সান্ন্যালকে গৃহে পাওয়া গেল না। একখানা পত্রে রেখে গেছেন—তাঁর গৃহত্যাগের সংবাদ। লিখেছেন, তাঁর সংবাদ নেওয়ার জন্য যেন কোনও চেষ্টা করা না হয়, কারণ তাঁকে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি সংবাদে আমি একেবারে শয্যা গ্রহণ করলাম।

সুধারাম ব্যাঙ্কের দরজায় তালা লটকেছে।

পেন্‌শন কম্যুটেশন বাবদ সাড়ে সাত হাজার টাকা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের দশ হাজার টাকা আর ইন্‌স্যুরেন্সের আড়াই হাজার—একুনে বিশ হাজার টাকা মাত্র আগের দিন সুধারাম ব্যাঙ্কের হেড অফিসে একটি অ্যাকাউণ্ট খুলে জমা দিয়ে এসেছি। আমার তেত্রিশ বছর চাকুরি-জীবনের সমগ্র সঞ্চয়। ঘরে দুটি অবিবাহিতা কন্যা এখনও বর্তমান।

অষ্টপ্রহরের সময় কথাটা বলেওছিলাম যোগীন্দ্রনাথকে। উদ্দেশ্য, ছেলের কেসটা আরও একটু জোর হবে। যোগীন্দ্রনাথ আমার কথা শুনে মৃদু মৃদু হেসেছিলেন তাঁর সেই বিচিত্র হাসি।

মিঃ যোগীন্দ্রনাথ সান্যাল সুধারাম ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীবিভূরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মুখ্যা*

প্রথম দৃশ্য

(বড়বাজারের একটি রাস্তা, একটি ছোট তে-কোণা পার্কের ধার। ফুটপাথের এক ধারে একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর একজন ঘুমুচ্ছে। তারই পাশে একটি জঞ্জালস্তূপকে ঘিরে গুটি কয়েক মাছি ভনভন ক'রে বন্দনা করছে, সুখনিদ্রার অবশ্য তাতে তার কোন ব্যাঘাত নেই। তারও এক পাশে একটা মোষের গাড়ির ডাবর দেখা যাচ্ছে, দু-একটা বিসদৃশ জাব্‌নার ডাবাও দৃশ্যমান। এ ছাড়া খোদ ফুটপাথেও অনেকে শয্যা নিয়েছে, বিশেষ ক'রে দেখা যাচ্ছে একটি ভিখারীকে, তার একটি পা অজস্র নোংরা ন্যাকড়ায় অগুনতি গিঁট দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা, অর্থাৎ সে পাটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। ভিখারীর সম্বল একটি অ্যালুমিনিয়মের তোবড়ানো বাটি ও হাত দুই লম্বা একটি

* 'মুখ্য' শব্দটি বাঁকুড়া জেলার কথ্য ভাষায় 'মুখ্যা' রূপ নেয়।

পাকা বাঁশের লাঠি। বালিশের স্বাদ ইঁটে মিটিয়ে সে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় স্টেজের বাঁ দিক থেকে একটা ছেলে দিশাহারা ভাবে দৌড়ে ঢুকল, দিশাহারা অর্থাৎ যার দিকের ঠিক নেই; তার দৃষ্টির মধ্যে এটুকু বেশ স্পষ্ট যে সে কিছুই দেখছে না, এবং যা দেখছে তার কিছুই বুঝতে পারছে না; তার বয়েস বছর বারো; রোগা, পাঁজরা-বার-করা, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, অনাহারপীড়িত চেহারা। তার গায়ে জামা নেই, কাপড় নোংরা কিন্তু কালো নয়,—লাল বা ধূসর, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, সে সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে এবং তার দেশ রাঢ় অঞ্চলে। ঢুকেই তার সঙ্গে ভিখারীর ধাক্কা লাগল: লাগতেই—)

ভিখারী। (ঘুম চোখে না তাকিয়ে) শালা, রসিকতার আর সময় পেলি নি···শালা, ঘুমোচ্ছি, না, সম্বন্ধীর দরদ উথলে উঠল! (তাকিয়ে) কে র‍্যা?

ছেলেটা। এঁ—এঁ—হ্যাবা,—নেবারণ—

ভিখারী। দে দে, চুপ দে (স্বভাববশে লাঠিটায় হাত দিল)

হ্যাবা। ই বাবা, মেরে ফ্যালালেক গো! হাই শুন, আমি জানি নাই বাবা, আমি কলকাতায় আসি নাই বাবা।

ভিখারী। কলকাতায় এয়েচিস না তো কি যমের বাড়ি এসেচিস! তোকে কি যমে ধরেছে? অ্যাঁ?

হ্যাবা। তাই থ গো। বাবা তো ম'রে গেল ম্যালোরিয়াতে ত গেলম মেজবাবুদের হাতাকে। বাগাল ছিলম ত, আপখোরাকি ন সিকা, পূজার সময় একটি কাপড়। গেলম চাকরির তক্কে ত মেজবাবু বললেক—যা যা তুকে রাখব নাই, তুর সাতগুষ্টি চোর। হাই হ্যাখ, আমার বাপ ছিল নেতাই, উয়ার হাতটা ছিল লড়লড়ে, তাঁত বুনতে লারত, তাথেই না ম'রে গেল, কিন্তু উয়ার বাপ ছিল মুখ্যা, উও মুখ্যা, আমি তক সব মুখ্যা, চোর হলাম কুথাকে?

ভিখারী। আ মলো, শালার ঠিকুজি নিয়ে ত আমার সব হবে! উনি আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের নাতি এলেন। শোন্ তুই, তুই হারামজাদা এখানে মরতে এলি কেন? কোন্ যমে ব'য়ে নিয়ে এল তোকে?

স্থাবা। যম লয়, টেরেনে চ'লে এলম। কিন্তু মুহুরী ত হরদম্ বাঁকুড়া যাচ্চেই আসচেই, উ আমায় কলকাতার গাড়টায় চাপিই দিলেক। মেদনীপুর তক ত এলম, হাঁই ত্থাখ খড়কপুরে টিকিটবাবু কান ধ'রে নামিই দিলেক, আবার গাড়টায় চেপে—

ভিখারী। কেতাথ করতে এলে।

(ইতোমধ্যে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে, অস্তত নানা রকম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, জাবনার ডাবরে একজন জাব দিয়ে গেল এবং আঃ-আঃ করতে করতে অজানা কাউকে আহ্বান করতে লাগল। মোষের গাড়িটাকেও ছু-একজন নানা রকম তকরার করতে করতে সরিয়ে নিয়ে গেল। খাটিয়াস্থ নিদ্রাবিলাসীরও দেহসঞ্চালনে জাগরণের আভাস দেখা গেল। স্থাবা ভিখারীর কাছ থেকে স'রে স্টেজের বিপরীত কোণে উইংসের দিকে গিয়ে ভাঙা গলায় শুরু করল)

স্থাবা। আমি ইখানে থাকতে লারব। ইস, কত লোক গো! তুড়কির মেলা কোন্ ছার! এত মটরের মাঝে আমি হাঁটতে লারব। মোষগুলান আমায় চিপেই মেরে দিবেক। ছোট রেলের লাইন পেরুতে লারব। ই বাবা, ক্যানে এলাম গো—(হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল)

(অন্য দিকে নিদ্রাবিলাসী ততক্ষণে জেগেছেন, ভিখারী তার দিকে লক্ষ্য ক'রে)

ভিখারী। কেয়া মিশরিজী, কেয়া দেখতা?

মিশিরজী। এ ছকড়া কাহাঁসে আয়েল বা?

ভিখারী। তেরা বহু পাঠা দিয়া, বোলা—যাও, দেখ মিশরিজী কলকত্তামে কেয়া কর রহা হ্যায়। আউর কয়ঠো সাদি কিয়া অভি পুছা।

মিশিরজী। বহুৎ বোলি রে, বহুৎ বোলি।

ভিখারী। জী হাঁ, তব কেয়া সমঝায়া?

মিশিরজী। (উৎসাহ ভরে) আরে, উও ছকড়াঠো ত দেহাৎসে আয়া, তুম হি একঠো কাম কিয়ো না ভাই। তুমহার কুত্তাঠো ত মর গইল, তব ছকড়াকে রাখ্ দে না। তুমহার পাশেভি রহেবে, আওর চাভি লে আনে সকে। (চেঁচিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে) আরে এ ছকড়া!

ভিখারী। অ্যারে, থাম্ রে থাম্। সে আমি রাখবার মর্জি হ'লে রাখব। তোকে কে ফোপর-দালালি করতে ডেকেছে?

(ইতোমধ্যে একজন ভদ্দরলোক ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই ভিখারী কথা থামিয়ে)

ভিখারী। ভগবান তুমহারে বালবাচ্চাকে সুখে রাখে বাবা, ভগবান তুমহারে বালবাচ্চাকে—

ভদ্দরলোক। রাখছে, রাখছে, এখন তুমি এই সিকিটা ভাঙিয়ে দাও ত বাবা, একটা আনিও নিয়ে নিও সঙ্গে সঙ্গে,—এই নাও।
(পকেট থেকে একটা সিকি বার ক'রে ভিখারীর হাতে দিলেন)

ভিখারী। ভিক্ষে দেন ত লিয়ে লিই—ভাঙানি দিয়ে লোকসান গুনতে পারব না।

ভদ্দরলোক। (রাগতস্বরে) কি?

ভিখারী। অচল যে বাবু, রাগলে কি আর চলে?

মিশিরজী। আরে, চলেগা চলেগা, গঙ্গামে ফেক দেনেসে খিদরপুর তক চলা যায়েগা।

ভদ্দরলোক। দাও দাও, আমার সিকি ফেরত দাও। হুঁঃ, যত সব ভ্যাগাবণ্ডের আড্ডা! (চ'লেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা হ্যাংলা পটাং বাচ্চা ভিখারী ছেলে ঢুকে তাঁর জামা ধ'রে ককিয়ে উঠল—বাবু একটা পয়সা। তিনি তৎক্ষণাৎ)

ভদ্দরলোক। ছাড়্ বলছি। উঃ, এ জাতের কি হবে? এইটুকু বয়েস থেকে ভিক্ষে ধরেছে, অথচ এদের চাকরি করতে বল, কোন ব্যাটা করবে না। গবর্মেণ্টের উচিত এদের সব ধ'রে ধ'রে জেলে পোরা।

(এমন সময় হ্যাবা আস্তে আস্তে উঠে এসে তাঁর কাছে গিয়ে)

হ্যাবা। বাবু, আপনার ঘরকে লিয়ে যান বাবু। যা বলবেন ক'রে দুব বাবু, যা দিবেন তাথেই ক'রে দুব, হঁ, বাবু।

ভদ্দরলোক। আ ম'লো, কোন্ ভাগাড় থেকে উঠে এল তার ঠিক নেই, ব্যাটা চোর কি কি, তা জানি না—

হ্যাবা। হঁ, চোর! তুমার ঘর থেকে কি লিইচি? জান নাই, সুদ্ধ-মুদ্ধ চোর বলছ ক্যানে? আমি মুখ্যার ঘর, হ্যাঁ।

মিশিরজী। আরে নোকর রাখেগা! উসকা নোকরি হয় কি নেহি, তোক নোকর রাখেগা!

(ভদ্দরলোকের প্রস্থান)

পূর্বপ্রবিষ্ট ভিখারী ছেলেটা। (ন্যাবাকে) এই, শোন্ না, এখানে হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চল্ হনুমানদাস ভগবানদাসের ওখানে যাবি। লরির থেকে তেলের টিন নামিয়ে পিপেয় পুরছে সব।

ন্যাবা। হঁ, তা কি হবেক বটে?

ভিখারী ছেলে। আরে টিনের তলে তেল প'ড়ে থাকবে, তুই সেটা ঢেলে নিবি।

ন্যাবা। হঁ, ক্যানে?

ভিখারী ছেলে। আরে ধেত্তর নিকুচি করেছে। তেল নিয়ে কি হবে? তোর বাপের মাথায় ঢালবে। (পলায়ন)

ন্যাবা। (ফোঁস ক'রে) কি বললি, ব্যাটা তুকে—(পশ্চাদ্ধাবন)

ভিখারী। হাঁ, হাঁ, এই ল্যাবা, আরে এই ল্যাবা, আরে শোন্ না, (ন্যাবা ঘুরে তাকাল) আয় আয়। আরে, যানে দেও উ শালাকো, উ ত শয়তান হ্যায়।

মিশিরজী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উ ত শয়তান আছে, নেবা তুম আ যাও।

(ন্যাবা ছেলেটাকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে এল, মিশিরজী গিয়ে ছাড়িয়ে ছেলেটাকে এক গাঁট্টা দিয়ে ছেড়ে দিল)

ন্যাবা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) উ আমার বাপ তুলবার কে বটে?

ভিখারী। আরে, তোর বাপকে যমে তুলে নিয়ে গেল, ওর তোলবার ক্ষ্যামতা কি? শোন্, তুই থাকবি আমার সঙ্গে? খাবি দাবি, যা বলব করবি, বুঝলি? আর—আর—বাবা বলবি আমাকে।

ন্যাবা। হঁ, বাবা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে তিন মাসের তফাত)

('কমিট নো ন্যুইসেন্সে'র 'নো' মুছে ফেলা একটি গলি। এঁদো বিশেষণটি বোধ করি এই গলিটির মাম্মাতেই বিশেষভাবে ভাষা

ঝাঁকড়ে প'ড়ে আছে। গলির এক পাশ বরাবর—একটু কোণাকুণি-ভাবে—একটি ফাট-ধরা সিমেণ্টের রোয়াক। রোয়াকের এক কোণে অনেকগুলি চট ও দর্মা পাতা, এবং একদম কোণটিতে একটি পুরোনো জলের ট্যাঙ্ক, গুটিকয়েক ইটের ওপর বসানো। রোয়াকের গায়ের ওপর চুনবালি-খসা দেওয়ালের যক্ষ্মাগ্রস্ত চেহারা দেখা যাচ্ছে। সেই দেওয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো, এবং তাতে এক রাশ ন্যাকড়া ও গুটিকয়েক ঝুলবর্ণ লুঙ্গি এবং একটু আলাদাভাবে হাফপ্যাণ্ট ও শার্ট—সবই ফর্দাফাঁই—ঝুলছে।

(রোয়াকে একটি আসর জমায়েৎ হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেন আমাদের ভিখারী, পোশাক-আশাক পূর্ববৎ, ঈষৎ উৎকণ্ঠ ভাব ; কিন্তু ধরনে ধারণে স্বতই মালুম হচ্ছে যে, এ আসরের তিনিই মধ্যমণি। এ ছাড়া আছে পীরু, ফোলা-ফোলা মুখ, আত্মচর্যার চিহ্নস্বরূপ একটি অতিকায় গোঁফ বিদ্যমান, বিশেষ কোন কাজ তার নেই, অর্ধ-ভবঘুরে। আর একজন মণি হচ্ছেন কালু, ইঞ্জিন-ঢাকা তেরপলের মত মোটা এবং ততোধিক নোংরা কাপড়ের একটি হাফপ্যাণ্ট পরনে, গায়ে ন্যাণ্ডো গেঞ্জি, অকথ্য ময়লা। কোমরে একটি ফাটা-ফাটা স্কাউট-বেণ্ট, তার একটি আংটা থেকে একটা চটা-ওঠা কলাইয়ের মগ ঝুলছে। কালু একটি ছোট কলকে মুখে ধ'রে আছে)

কালু। শিব ঠাকুরকে এইজন্যে সব শালা দেবতা ভয় করে। শালার এত তেজ কেন ? (মুখ থেকে কলকেটা নামিয়ে দোলাতে দোলাতে) এইটি ! এইটি !

পীরু। (প্রায় আবদারের সুরে) এবার আমি চড়াব। না মাইরি, কাক ডাকার আগের থেকে তুই মৌজ করছিস। দে, দু টান দিয়ে লিই।

ভিখারী। তোদের এক তকরার আর শেষ-হয় না। মরিস না কেন সব ? (উৎকণ্ঠার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকিয়ে) ন্যাবা, এ ন্যাবা, হতভাগা কোথায় যে গিয়ে মরে ! আঃ, কিছুতে পাওয়া যাবে না।

কালু। ছুঁচোর গোলাম চামচিকা, তার মাইনে চোদ্দ সিকা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। (হাসি)

ভিখারী। (খেঁকিয়ে) দে, দে, চুপ দে। (অভ্যাসবশে লাঠিটায় হাত দিল) তিনটে বাজল, হতভাগা কোথায় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! একবার আসুক না হতভাগা, পিটিয়ে তক্তা বানাব। বিন্দে, এঁ—এঁ—(নামটা চাপতে চেষ্টা ক'রে) আমাকে চেন না হতভাগা! (এদিক ওদিক তাকিয়ে) এঃ, এই চড়চড়ে রোদে কোথায় যে ঘুরছে?

কালু। তোর মাথায়, আবার কোথায় ঘুরবে? গিলছে ফুটছে, এই কত, না রোদ্দুর! তোর ল্যাবা কি ফিটিনে ঘুরবে নাকি?

পীরু। (টুক ক'রে হাতটি বাড়িয়ে) তাই ত ফিটিনে ঘুরবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দে দে, দে কলকেটা দে।

ভিখারী। আলবৎ ঘুরবে।

কালু। তবে তাই ঘোরা। (পীরুর বাড়ানো হাত ধাক্কা মেরে সরিয়ে কলকে টানতে লাগল)

(এমন সময় ন্যাবা ঢুকল, পরনে লালচে ধুতি নয়, কালচে প্যাণ্ট; গা খালি নয়, ছেঁড়া শার্টের দ্বারা আবৃত। কথার বাঁকুড়ী টানও অন্তর্হিত)

ন্যাবা। (ব্যস্তভাবে চাপা গলায়) পুলিস, পুলিস আসচে।

(প্রস্থান)

পীরু। (ভয় পেয়ে) অ্যাঁ? অ্যাঁ?

কালু। চুপ কর্ দিকিনি। (ভেংচে) অ্যাঁ, অ্যাঁ!

ভিখারী। আরে থাম্ থাম্। এই কালু, আয় আয়, এদিকে আয়, সব লুকিয়ে ফেল্, আগে কলকেটা দে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ট্যাঙ্কার তলে, দে দে, একেবারে অন্দরে চালান ক'রে দে। (নিশ্বাস ছেড়ে) পু-লি-স—কোনও শালার ক্ষ্যামতা নেই।

কালু। হাঁ হাঁ, জিন্দেগী তোড় যায়েগা, লেকিন হামলোগ—

(সার্জেণ্ট দুজন কনস্টেবল সহ ঢুকলেন)

সার্জেণ্ট। তোম লোগ হিঁয়া পর দম্‌বাজি কর্ রহা হায়?

কালু। কুছ নেই সাহাব, (কি বলবে ভেবে না পেয়ে) দিল্‌কা বাৎ-চিৎ—আওর কুছ নেহি।

সার্জেণ্ট। . চোপ রও। (কন্‌স্টেব্‌লদের) এই, সার্চ কিয়ো। (খাতা বার ক'রে পীরুকে) এই, তোর কি নাম আছে, বোল্‌ বোল্‌ (রুলের খোঁচা মেরে) কেয়া নাম ?

পীরু। পী-পীরু সাব। সাব, হাম—

সার্জেণ্ট। বাস্‌, চোপ্‌। তোর কি নাম—(কালুকে খোঁচা মেরে), তোর ?

কালু। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) শয়তান।

সার্জেণ্ট। (ব্যাটন তুলে) কেয়া ?

কালু। (হেসে) মেরা নাম শয়তান হ্যায় সাব।

(ইতোমধ্যে কন্‌স্টেব্‌লরা দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে, টিনের দু-একটা মগ লাথি মেরে রোয়াক থেকে ফেলে দিয়ে, চট্‌ আর দরমার ওপর অনর্থক মচ্‌মচ্‌ ক'রে, ট্যাঙ্কের গাঁয়ে দমাদম বুটের লাথি মারতে লাগল)

ভিখারী। সাব, আমার বহুৎ লোকসান হোতা হ্যায়।

সার্জেণ্ট। চুপ রহো। তোমলোগ চরস পিতা—

কালু। ডবল দাম দে করকে, মাগ্‌না নেহি।

ভিখারী। (কালুকে) চুপ রহো। (ঘুরে সার্জেণ্টকে) এইসি করনেসে কুছ ফায়দা হোগা নেহি।

সার্জেণ্ট। (রাগত ভাব কমিয়ে) তব কিস্‌মে ফায়দা হোগা ?

ভিখারী। শুনিয়ে সাব, (চটের সিট্‌ ছেড়ে স'রে গেল, চট তুললে ও একটি থলিয়া বার করলে) হামি চরস না পিলে আপকা কেয়া লাভ ? পিনেসে ত—

কন্‌স্টেব্‌লদ্বয়। সাব, কছু ত মিলা নেহি।

সার্জেণ্ট্‌। ঠিক হ্যায়, চুপ রহো। (ভিখারীকে) বাস্‌ বাস্‌। চল্‌ উধার, বোল্‌ কেয়া বোল্‌নে মাঙ্‌তা ?

ভিখারী। কেলো, যা ত রে। (টাকার থলি কালুকে দিল)

(কালু ও সার্জেণ্ট উইংসের ধারে চ'লে এল। তাদের মধ্যে

ফসফাস হাত-পা নাড়ানাড়ি ও সার্জেণ্টের 'নেহি, নেহি' হবার পর, ...ার্জেণ্ট কিছু শুনে নিলে, তারপর কন্‌স্টেব্‌লদের ডাক দিলে)

সার্জেণ্ট। রামশরণ, রামভরস! (তারপরে সদলে প্রস্থান)

কালু। (ফিরে এসে) শালা পুলিস হয়েছে ত মাথা কিনেছে! ...ালারা আসবেন আর পয়সা মেরে যাবেন! আবার মেজাজ!

পীরু। হ্যা! কি মেজাজ রে বাবা—আমারও ভয় ধ'রে গেছিল।

কালু। তাই ত রে। পী—পী—পীরুরও ভয়! হ্যাঃ, মরতে ...াসিস কেন? মরদের গোঁপেই মুরদ!

ভিখারী। চুপ কর্ মাইরি, তোদের এক তকরার আর শেষ হয় ...; মরিস না কেন সব? (ঘুরে ফিরে তাকিয়ে) আঃ, হ্যাবা, এই ...াবা হতভাগা, কোথায় যে যায়, এবার এলে ব্যাটাকে আর আস্ত রাখব না।

পীরু। সোনার টুকরো ছেলে মাইরি ও, ভাগ্যিস—(কালুর দিকে ...াকিয়ে থেমে গেল)

ভিখারী। হবে না? ওর বাপ কি কম ছিল? 'মুখ্যু' না কি ...লে, তার মানে আলাদা কিন্তু, তার মানে—সে সবচে উঁচু।

কালু। রেখে দে, রেখে দে, তোর ল্যাবার আবার বাপ! কালু ...মিস্তিরির কাছে কাউকে লাগতে হয় না। শালা পুলিসকে আমি দেখে ...নিতাম।

(পানুবাবু ঢুকলেন, আধময়লা ধুতি, চৌফাট্টু পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে ...টি আছে, যেটি দেখলে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়ে থাকে যে তিনি ...আবুহোসেনের বংশধর, টেকো মাথা ও রঙ পোড়া, একটু ফ্যাল-...ফলে ভাব)

কালু। আরে! ভদ্দরলোক যে, এখানে কেন, অ্যাঁ?

পানুবাবু। (অপ্রস্তুতের হাসি হেসে) হেঁ হেঁ, কি যে বলিস! তারপর কি ব্যাপার? (থেমে, বেশ একটু চেষ্টার সঙ্গে সাহস সঞ্চয় ...'রে) মাইরি, আজ এক টান দিতে হবে কিন্তু।

কালু। মাইরি আর কি! কি কথাই বললি! শুনে প্রাণটাই দিই, না, টানটাই দিই।

পান্নুবাবু। (ভিখারীকে) আজ একবার—

ভিখারী। পয়সা ফেল।

পান্নুবাবু। কালই আমার বাজারে কিছু পাওনা আছে।

ভিখারী। তবে কালকেই এস।

পান্নুবাবু। (যথার্থ রেগে) ব্যাটাদের কি সাধে ছোটলোক বলেছে, পয়সা থাকলে আমি না দিয়ে থাকি? মুখের একটা কথা বিশ্বাস হ'ল না? এই নে। যাঃ। (ট্যাঁক থেকে আধুলি ফেললে)

কালু। তাই ত পেনোকে অবিশ্বেস! বিশ্বেস! বলি বিশ্বেস কাউকে আছে নাকি? হরদম এই কম্মই ত করছি, গাড়িতে মাল চাপিয়ে কোথায় না যাচ্ছি ছুনিয়ার—শালিমার হাওড়া, হাওড়া ক্লাইব ইষ্টিট্, চাঁদপালঘাট ভক্তাঘাট? কত দেখলুম ব'লে, বিশ্বেস!

পীরু। যা বলেছিস, বিশ্বাস কারুকে করতে নেই, ঘুঁঘুড়ির চটকলে যখন—। (আস্তে) দে না।

কালু। যাক, ও আর চটকাস নি, হঃ, মজুমদার কোম্পানির বড়কর্তা তাই বলছিল—কালু, তোর গাড়িতে মাল চাপিয়ে যেমন নিশ্চিন্তি থাকি, এমন আর কিছুতে হয় না। তুই ব্যাটা ঠকবিও না, ঠকাবিও না। হঃ, বলেছিল—তোকে যা বিশ্বেস করি, আপনার ভাইকেও তা করি না।

পান্নুবাবু। আপনার ভাইকে কিছু বিশ্বেস নেই। তা না হ'লে দেখ্ না, এই বাড়িটাও আমাদেরই ছিল, আমার বাপও ম'রে গেল আমার ষোল বছর বয়সে, আর তার আপনার ছোট ভাই—আমার কাকা—(কাশির ধমকে কথা আটকে গেল)

ভিখারী। এ বাড়ি—আ—আ—তো—তোমার বাপের ছিল?

পান্নুবাবু। ছিল না? অমনি নাকি? শুধু এই বাড়ি? ওষুধের দোকান, আরও কত কি ছিল ব'লে। হুঁ, বাবা যতকাল বেঁচে ছিল, কোন ভাবনা ছিল নাকি? বাবা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরবার সময় পকেট-ভর্তি লবেঞ্চুস বিস্কুট পয়সা—

(একটি ছোট ছেলে ঢুকল, রোগা, হাফপ্যাণ্ট পরনে, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে সস্তার লাল কেড্স, অত্যন্ত মৃদু ভীত কণ্ঠস্বর ও হাবভাব)

ছেলেটি। (পানুবাবুকে) বাবা, বাবা, একটু শোন এ দিকে।

পানুবাবু। (ভেংচে) আবার এ দিকে শোন! যা বলবার ব'লে মর্ না। ব'সে আছি একটু, তা যেন গায়ে বিঁধছে।

ছেলেটি। মা—মা বলচে, (লজ্জায় ইতস্তত করতে লাগল, পরে কোনরকমে ওযুধ খাওয়ার মত তাড়াতাড়ি ক'রে) এক দম কিচ্ছু নেই বাবা, ঘরে কিচ্ছু নেই—তুমি দুটো একটা অন্তত টাকা—

পানুবাবু। আঃ, অষ্টপ্রহর খালি নেই নেই—খালি দেহি দেহি, উবগারের ত কেউ নেই, খালি গেলবার কুমীর। ঘরে ত টিঁকতে দিলে না, এখানে একটু জিরুতে এলুম, না, তাও পেছনে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে! (থেমে) বলি, এখান থেকে যাবি, না, মার খাবার জন্মে পিঠের চামড়া সুড়সুড় করছে? (ছেলেটির প্রস্থান)

ভিখারী। চ্যাঁচামেচি মাৎ করো। এই মাত্তর হারামজাদা পুলিস এসেছিল। আঃ! এই হ্যাবাটা যে কোথায় গেল? হ্যাবা, হ্যাবা, তোকে আজ আমি—

কালু। হয়েছে হয়েছে, এখন তাস-টাস পাড়্ দিকিনি বাবা, আর কত ধুঁকব?

পীরু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাসই পাড়্।

(একটি ইটের পাশ থেকে সন্তর্পণে এক প্যাকেট ময়লা তাস বার ক'রে তারা খেলা শুরু ক'রে দিলে, এমন সময়ে স্টেজের ডান দিক দিয়ে হ্যাবা ও প্রথম দৃশ্যের ভিখারী ছেলেটা ঢুকল)

হ্যাবা। পাঁচ টাকা!

ভি-ছেলে। তা ছাড়া কি? অমনি নাকি? এ রকম আরও কত হয়, এ হপ্তায় ত শুধু পাঁচ টাকা।

হ্যাবা। তেল বিক্‌কিরি ক'রে এত হয়?

ভি-ছেলে। শুধু তেল? আলু, পেঁয়াজ, মশলা, বড়বাজারে জিনসের অভাব? হুঁঃ, ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নাও।

হ্যাবা। মাইরি, এত পাস কোথেকে? অ্যাঁ, বলতেই হবে মাইরি

ভি-ছেলেটা। আরে, সে কি বলবার? কলকাঠি আছে, হুঁ হুঁ,

[illegible]

হ্যাবা। মাইরি বিষ্টু, আমি তোদের দলেই যাব; এখানে আমার একদণ্ড ভাল লাগে না, ভিকিরি-বাবা দিনরাত্তির ডাকছে ত ডাকছেই।

(তাস খেলবার ফাঁকে হঠাৎ ভিখারী হ্যাবাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল)

ভিখারী। হ্যাবা, এই হ্যাবা, কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা? ব্যাটার যদি টিকি দেখতে পাওয়া যায়? কোথায় গিয়েছিলি?

হ্যাবা। কোথাও না।

ভিখারী। কোথাও না? ব্যাটা, তোর জন্যে আমি উপুসী হয়ে থাকব নাকি? পাঁচটা বেজে গেল, যা. চা নিয়ে আয়। দুটো রুটিও চেয়ে নিবি কেষ্টার কাছ থেকে। (আসরকে লক্ষ্য ক'রে) কেষ্টা হারামজাদা হ্যাশাটি ঠিক ক'রে যাবেন, কিন্তু হোটেল থেকে দুটো রুটি দিতে বল, তখন গাঁইগুঁই সাত-সতেরো ব্যাখ্যানা। এবার আসুক না, ব্যাটার হ্যাশা আমি বার করছি।

হ্যাবা। (সঙ্গীকে) দেখছিস ত যেন চাকর পেয়েছে। মাইরি, আমি হলম মুখ্যার ঘর।

ভি-ছেলে তথা বিষ্টু। এঁ, কুঠে ব্যাটার নবাবি ত কম নয়!

ভিখারী। হ্যাবা, গেলি? তোকে যদি আমি আস্ত রাখি—

হ্যাবা। যাচ্ছি, যাচ্ছি। (উভয়ের প্রস্থানোদ্যম)

(এমন সময় স্টেজের বাঁ দিক দিয়ে পানুবাবুর ছেলে ঢুকল)

পানুর ছেলে। বাবা, মা তোমায় ডাকছে।

পানুবাবু। আ খেলে, দিনের শেষে একটু তাস খেলছি, তা না—(নিজের ছেলেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হ্যাবাকে বললে) হ্যাবা, এই হ্যাবা, এটাকে গলির বার ক'রে দে ত।

বিষ্ণু। চল্ না, চল্ না। বেশ মজা হবে।

(বিষ্টু গিয়ে পানুবাবুর ছেলেকে ধ'রে মারধোর শুরু করাতে কালু উঠে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দিলে ও বিষ্টুকে একটা গাঁট্টা কষিয়ে)

কালু। (বিষ্টুকে) যা ভাগ্ হারামজাদ্ (পানুর ছেলেকে) আরে, কেলোকাকাকে লজ্জা কি? নাও নাও, আধুলিটা নিয়ে যাও, যাও মাকে

(ছেলেটি বাবার দিকে তাকাল)

পানুবাবু। (খ্যাঁকানি দিয়ে) দিচ্ছে, নে না, ছেলের আবার এদিক নেই ওদিক আছে, হুঁ !

কালু। দেখ্ পেনো, ভগবানের চোখের চামড়া নেই তাই ; তা না হ'লে তোর ঐ ছেলে ? (আবার সকলে তাস খেলতে শুরু করল)

ন্যাবা। (দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কাছে এসে বিষ্টুকে) ওকে মারতে গেলি কেন ? তুই ব্যাটা বজ্জাতের আঁদি !

বিষ্টু। রাখ্ না, তুই কখন আসবি তাই বল্।

ন্যাবা। (চলতে চলতে) কালকেই।

বিষ্টু। অমনি এলে হবে না, পয়সা নিয়ে আসতে হবে।

ন্যাবা। পয়সা ! পয়সা কোথায় পাব ?

বিষ্টু। আমার মাথায়। কুঠেটার নেই কিছু ? ভিক্ষের পয়সা জমা করে, দেখিস নি ?

ন্যাবা। সেই পয়সা ?

বিষ্টু। তবে না ত কি ? (আবার ভিখারী ন্যাবাকে ডাক দিল)

ন্যাবা। আচ্ছা। (ব্যস্তভাবে যেতে যেতে) তা হ'লে কালকেই।

তৃতীয় দৃশ্য

(বড়বাজারের রাস্তা, প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। সময় ১১টা—১২টা, ন্যাবা ও বিষ্টু ঢুকল। বিষ্টুর হাতে একটি সিগারেটের ঢাকনা-খোলা টিন আর এক হাতে কিছু ভাঙানি। উভয়ে আলোচনা করতে করতে বাঁ দিক থেকে প্রবেশ)

ন্যাবা। অ্যাঁ, সত্যি ? সত্যি বলচিস ?

বিষ্টু। তা ছাড়া কি বলব ? তোর কাছে মিছে কথা ব'লে ত আমার রাজত্বি লাভ হবে।

ন্যাবা। না, তা নয় (একটু তাড়াতাড়ির সঙ্গে) আচ্ছা, কই দেখি পয়সাগুলো, দেখি একবার ?

বিষ্টু। দেখে ত সব হবে, দেখলে ত আর তোর অচল পয়সা চলবে না, সে যে অচল, সে-ই অচলই থেকে যাবে।

হ্যাবা। (একটু দূরমনস্কভাবে) অচল, অ্যাঁ, এতগুলো পয়সা সব অচল! মুখ্যার ঘর হয়ে চোর হলম (আবেগে দেশের টান বেরিয়ে এল) এ-হে-হে গো, জাতও গেল, পেটও ভরল নাই, ভিকিরি-বাবাকে শেষ তক্ ঠকিই—হায় হায়—

বিষ্টু। একটু দেখে নিতে পারিস নি, ব্যাটা হাঁদা কোথাকার!

হ্যাবা। (চমকে, বিরক্ত হয়ে) চুপ কর্, দেখে নেবে! তখন বলে কি রকম রাত হয়ে গেল, শালা ভিকিরি-বাবা আর ঘুমোয় না। হ্যাবা এটা কর, হ্যাবা ওটা করিস নি, হ্যাবা খা, হ্যাবা শো—ব'কেই যাচ্ছে, ব'কেই যাচ্ছে, আর আমার প্রাণটা কাটা কই মাছের মত ধড়পাচ্ছে; রাত্তির আর কতটুকু! এর মধ্যে কখন একটু ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে দেখি, সব নিঝ্‌ঝুম্, আমি তাড়াতাড়ি ওর চটের তলে গর্ত হাঁতড়ে যা পেলুম, তাই নিয়ে দে ছুট্ দে ছুট্। এখনও ভাবতে বুক ধড়াস ধড়াস করছে। তখন দেখবে আর বাজাবে! বলে, পালাতে পারলে বাঁচি। (আস্তে, প্রায় মনে মনে) এঃ, ভিকিরি-বাবা কাল আমায় আমসত্তর খাবার জন্যে পেড়াপেড়ি করছিল গো। (বিষ্টুকে একটু অতিরিক্ত জোরের সঙ্গে) তোদের হপ্তায় পাঁচ টাকার কম হয় না ত?

বিষ্টু। তা কি কিছু লেকাপড়া করা আছে? কখনও পাঁচ টাকা, কখনও দশ টাকা, কখনও লবডঙ্কা।

হ্যাবা। তবে হেথাকে আনলি কেন মুহু-মুহু? ব্যাটা অড়কথ। (প্রায় মনে মনে) মেজবাবুর কথাকে চ'লে এলম, আর বিষ্টুর কথাকে হলম চোর! এঃ!

বিষ্টু। (উইংসের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ রে, ছিদাম আসচে, না বাবা, পালাই।

হ্যাবা। কেন?

বিষ্টু। মারবে রে, ঐ ত দলের সবচে বড়। ওঃ, এত মারে! না বাবা।

হ্যাবা। চল্ ত দেখে লিই, কতকের মারনেওয়ালা!

(উভয়ের প্রস্থান)

(কালু ও মিশিরজীর প্রবেশ)

কালু। বাংলামে বোল্, বাংলামে বোল্!

মিশিরজী। হাঁ, হাঁ, বাংলা বোলি বোলানেওয়ালা। লেকিন্ কালু, এ বাৎ হামি যে বোলছে, শুনবে। তুমহার গাড়িমে ত বহুৎ মাল, আলু আওর পিঁয়াজি চাপায় দিয়েছে। লোকন্ দেখ—বড়ি-বাজারমে বহুৎ শালা হারামি ছকড়া ঘুমতা হায়, উও লোক চাকু সে করকে—(হাত দিয়ে বস্তা কাটা নকল ক'রে দেখাল)

কালু। (তার কথা লুফে নিয়ে) বস্তা-ফস্তা ফাঁসা দেতা হ্যায়, আর আলু-টালু সব বস্তামে গির্ যাতা হ্যায়, আর ও-লোক সব টপাটপ লে করকে (একবার ঝুঁকে কুড়োনোর ভান ক'রে তারপর বুড়ো আঙুল উল্টো ক'রে) ভাগ যাতা হ্যায়। জানি রে বাবা জানি।

মিশিরজী। ব্যস্, এই বাৎ। (একটু ঘেঁষে গিয়ে) জেরা এলার্ট রহেনে পাড়েগা, ব্যস্।

কালু। হ্যাঁ, মিশরিজীর ভুঁড়ি নড়েগা আর উসকি বাদ্ কালু ওস্তাদ এলার্ট হোগা। যাও যাও, খৈনি খাওগে যাও। (প্রস্থান)

মিশিরজী। (যেতে যেতে) বদ্‌মাস! (প্রস্থান)

(হ্যাবা ও বিষ্টুর প্রবেশ)

হ্যাবা। মারবে, মারবে, ও যদি হয় ছেদাম, আমি হই গণ্ডা। কেমন হয়েছে বাবা, এখন আর এদিক মাড়াতে হচ্ছে না।

বিষ্টু। ওঃ মাইরি, সে আর বলতে। তোর গায়ে এত ক্ষ্যামতা তা কে জানত। পেঁদিয়ে একেবারে বিন্দাবন দেখিয়ে দিইচিস। পন্টু ভৈরভী সব তোকে হ্যাবাদা বলতে নেগেছে।

হ্যাবা। (একটু গর্বের হাসি হাসল) হ্যাখ্, বিষ্টু, এবার থেকে আমি যা বলব তোরা তাই করবি, বুঝলি? মানে, আমি, শোন্ বিষ্টু, আমি তোদের মুখ্যা, তোরা—তোরা আমায় মুখ্যা বলবি। (উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল)

বিষ্টু। সে কি রে? ও কি, অমন করচিস কেন?

বিষ্টু। (বুঝতে না পেরে) আরে এই হ্যাবা, আরে অমন কাঁ[illegible] ([illegible] উইংসের অন্তরালে

তাকিয়ে) আরে আরে, ঐ দেখ্ কেলো গাড়োয়ান আলুর বস্তা নিয়ে গাড়ি ঠেলে চলেছে। চল্ চল্।

হ্যাবা। (ঔদাসীন্যের সঙ্গে) আলু নিয়ে কি হবে?

বিষ্টু। কি হবে? তোর এক কথা! আরে, সন্ধ্যের ঝোঁকে পোস্তায় বসবি, দেখবি কত লোক, কত ভদ্দরলোক এসে আঁধারে আঁধারে বাজার ক'রে যাচ্ছে। চল্ চল্ তাড়াতাড়ি। (উভয়ের প্রস্থান)

(স্টেজ ফাঁকা, এমন সময় গোঁঙানি গোছের একটি আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে পা ঘ'ষে ঘ'ষে ভিখারী ঢুকল, পাশে পাশে মিশিরজী। মিশিরজীর মুখে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ভাব।

মিশিরজী। আরে ভাই, আভি হামার বহুৎ কাম আছে। ছেড়ে দে দেকিন, দেখ, হামি সব কুছ্ ক'রে দেব।

ভিখারী। (অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে) মাইরি মিশরিজী, ল্যাবা হতভাগা আমায় কাঁদিয়ে চ'লে গেল। হারামজাদা যাবার আগে আমার অচল পয়সাগুলো—তা লিকগে। মাইরি, আমি ল্যাংড়া লোক, খুঁজে দে। মিশরিজী, তোকে আমি কি বলব মাইরি!

মিশিরজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর, ইয়ে তো আচ্ছি বাৎ হ্যায় ভাই। লেকিন আভি হামার বহুৎ কাম আছে।

ভিখারী। (পূর্ববৎ কাঁদতে কাঁদতে) শালা, আমি কি তোকে বলতাম? আমি কি ল্যাংড়া ছিলাম নাকি? শালা, বিন্দাবন দে যদি লেশা না ধরত, (যেন স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে এমনই ভাবে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে) তবে এ্যাদ্দিনে ডাইভার—ডাইভার হয়ে যেত। কন্‌ডাকটরের চাকরি ছ বছর ক'রে ক'রে, মাইরি মিশরিজী, আজ আমি ল্যাংড়া হয়ে পড়েছি ব'লে, দে দে ভাই, খুঁজে দে।

মিশিরজী। (নিরুপায়ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর।

(এমন সময় বিষ্টুকে ধ'রে মারতে মারতে কালু ঢুকল)

কালু। ব্যাটা, তুমি ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি? অ্যাঁ? শালা, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব তোমায় হারামজাদা। (গালে ঠাস ক'রে এক চড় মারল)

মিশিরজী। কেয়া হুয়া রে কালু? চাকু চালায়া? শালা বদমাস, হাড্ডি তোড় দেনে পড়েগা। (গাঁট্টা মারল)

ভিখারী। (যেন আশার আলো দেখতে পেয়েছে) মার্, মার্ ব্যাটাকে। এই ব্যাটাই ল্যাবাকে কুপরামর্শ দিয়ে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। (হিঁচড়ে হিঁচড়ে এগুতে লাগল)

(ছ্যাবা দৌড়তে দৌড়তে ঢুকল)

ছ্যাবা। ছেড়ে দাও তোমরা, বিষ্টুকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

কালু। আরে তুই, তুই ব্যাটা—

মিশিরজী। আরে লেবা, তু কাঁহা ভাগা রে?

ভিখারী। ল্যাবা, হতভাগা, তোকে আজ আমি—। কোথায় পালিয়েছিলি তুই? আজ যদি না তোকে—। বল্ কোথায় ছিলি? (ছ্যাবা গিয়ে কালু যে হাতে বিষ্টুকে ধ'রে আছে, সেই হাতে টান দিল)

ছ্যাবা। আগে তোমরা বিষ্টুকে ছাড়, আমি সব বলছি, আগে তোমরা বিষ্টুকে ছাড়।

মিশিরজী। ছোড়েগা কেঁও? উও বদমাস চাকু চালায়া কি নেহি?

কালু। ছাড়ব কেন, তোর মুখ দেখে? চোরের হয়ে উনি এলেন ওকালতি করতে। তুই ব্যাটা মাতব্বরি করবার কে?

ছ্যাবা। চোর, হুঁ, চোর, বটেই তো, উ চোর, আমিও চোর, কেলোকাকা, (আবেগে দেশের ভাষা বেরিয়ে এল) উ চোর লয়, না, উ চোর লয়, আমি উয়াকে যা বলছিলাম উ তাই করেছে, আমি উয়াকে যা বলব উ তাই করবেক। আমি, আমি মুখ্যা, ও কিছু লয়, চোরও লয়।

ভিখারী। ল্যাবা, চ বাবা তোকে কিছু বলব নি, চ বাবা, ল্যাবা।

ছ্যাবা। না, যাব নাই, বিষ্টুকে আগে ছাড় তোমরা, আমি মুখ্যা, উ কি করবেক, উয়াকে মারছ ক্যানে? মেজবাবু বললেক, তুর গুষ্টি চোর, আমি চ'লে এলম, হুঁ, আমি চোর (চেঁচিয়ে) উয়াকে মার দিয়ে কি হবেক বল? (সবার মধ্যে এগিয়ে দাঁড়াল) মারবার চাও তো লাও মার, আমি মুখ্যা, মুখ্যা, আমি মুখ্যা।

(যবনিকা)

অসিতকুমার

ল্যাং

বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটি বলকে লইয়া ২২ জনে লাথালাথি করিতেছে। অকস্মাৎ একজন খেলোয়াড় বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে একটি ল্যাং মারিতেই সে পড়িয়া গেল।

আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। অর্থাৎ আমার দিব্যচক্ষুতে দেখিলাম, এ তো দেখিতেছি সংসারের খেলা। লোকে একটি আদর্শের পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে এবং আদর্শচ্যুত করিবার জন্য একজন আর একজনকে ল্যাং মারিতেছে। জীবন-যুদ্ধে যে যত ল্যাং মারিতে পারিবে সেই জিতিবে। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সবাই তোমাকে হারাইয়া দিয়া আগাইয়া যাইতে চায়, তুমি তাহাদের ল্যাং মারিয়া পথে শোয়াইয়া দাও; দেখিবে তোমার জয়-জয়কার। সংসারে উন্নতি চাও, ল্যাং প্রাকটিস কর।

ভুলিয়া গিয়াছ? কংগ্রেস ইংরেজকে ল্যাং মারিয়া মারিয়া ভারত-ছাড়া করিল; আবার মুসলীম লীগ কংগ্রেসকে ল্যাং মারিয়া মারিয়া কায়েম করিল পাকিস্তান। ব্যবসাক্ষেত্রে মারোয়াড়ী-ভাটিয়া বাঙালীকে ল্যাং মারিতেছে। কেরানীগিরিতে মাদ্রাজী বাঙালীকে ল্যাং মারিতেছে। ঘরে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ল্যাং মারিতেছে। বিবাহ যখন করিয়াছই, যেমন করিয়া পার শাড়ি-গহনা দিতেই হইবে, দেখাইতে হইবে সিনেমা-থিয়েটার। আবার ভাই ভাইকে ল্যাং মারিতেছে। তোমার আটটি ছেলেমেয়ে, আমার মাত্র দুটি। কাজেই খরচ তোমার বেশি, আমার কম। অতএব আলাদা হও।

এই যে ঠ্যাঙের কারসাজি করিয়া ল্যাং মারামারি চলিতেছে, ইহার পরিণাম কি? খেলার মাঠে দেখিলাম পেনালটি এবং সংসারে দেখিলাম অশান্তি, অপচয়, ধ্বংস।

দিব্যচক্ষু দিয়া আরও দেখিলাম, আদর্শ সত্যই ওই ফুটবলটির মতই গোল অর্থাৎ গোলমেলে। চোরের কাছে চুরি করাটাই তাহার জীবনের আদর্শ। দাতার জীবনের আদর্শ দান করা। অর্থাৎ একজন পরের জিনিস নিজে লইতে চায় এবং একজন নিজের জিনিস পরকে দিতে চায়। আদর্শবান দুইজনই। অথচ একজন নিন্দার পাত্র ও

একজন প্রশংসার যোগ্য। কথাগুলা একটু গোলমেলে ঠেকিতেছে, না? আমি কি করিব? আদর্শ কথাটাই যে গোলমেলে।

আবার দেখ, নিজের ঘর কেমন সামলাইয়া রাখিয়া আদর্শ পরের ঘরে ঢুকাইতে চাহিতেছে! অর্থাৎ তুমি আদর্শবান হও, কিন্তু আমার ওসবের দরকার নাই। আমি যাহা ইচ্ছা করিব। তুমি বাধা দিতে আসিলে আমি পাশ কাটাইয়া তোমার ঘরের দিকে যাইব তোমাদের পরিবারবর্গকে আদর্শবান করিতে। দেখ তো তোমার ভাল করিবার জন্য আমাদের কত মাথাব্যথা! তবু যদি বাধা দিতে আস ল্যাং মারিয়া ধরাশায়ী করিব, তবু তোমাকে আদর্শবান করিবই।

তা লোকগুলা অমন চেঁচাইতেছে কেন? অমন চেঁচাইয়াই থাকে। দুই দল যখন মারামারি করে, আর দুই দল দুই পক্ষের হইয়া গলাবাজি করে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে—বাক-আপ। বাংলায় যাহাকে বলে—লেগে যা, লেগে যা। এই লাগাইয়া দেওয়ায় বড় আনন্দ। লাগিয়া থাকিতেও আনন্দ বুঝি? নইলে ইংরেজ সেই কবে আমাদের দুই ভাইকে লাগাইয়া দিয়াছিল, আমরা এখনও মহানন্দে লাগিয়া আছি। আহা, এমন উদ্যমে উৎসাহে যদি ভাল কাজে লাগিয়া থাকিতাম, তবে আমাদের আজ পাইত কে?

অকস্মাৎ জোরে চীৎকার হইল কেন? চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখি, এক পক্ষ বিপক্ষকে গোল দিয়াছে। তাই এত গোলমাল। খেলোয়াড়দের মধ্যে তত নয়, দর্শকদের মধ্যেই যেন বেশি চাঞ্চল্য। দেখিলাম, এক ভদ্রলোক ভুল করিয়া নিজের পিঠ না চুলকাইয়া আনন্দাতিশয্যে পরের পিঠ চুলকাইতেছে। পরের পিঠটি নির্বিবাদে পরের হাতে চুলকানির মজা ভোগ করিতেছে; ডাকিয়া বলিতেছে না, ওহে, তুমি ভুল করিতেছ, এ তোমার পিঠ নহে, আমার। অর্থাৎ স্বার্থে যখন ঘা পড়িতেছে না, বরং মজাই পাইতেছি, তখন তোমার ভুল ধরিয়া দিয়া, তোমার উপকার করিয়া আমার লাভ কি? বরং ক্ষতি।

হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পাশের ভদ্রলোকের হাত আমার পকেটে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত চাপিয়া

ধরিলাম, এ কী রকম? ভদ্রলোক এ ধরনের প্রশ্নের জন্য বোধ হয় প্রস্তুতই ছিলেন, তাই অপ্রস্তুত হইলেন না। স্তাকা সাজিলেন, ও, আপনার পকেট? আমি ভাবছিলাম আমার পকেট, তাই নস্যি খুঁজছিলাম। একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলাম, নস্যি তো নেই-ই। বরং নগদ মাল যা ছিল, তাও নস্যাৎ ক'রে দিয়েছ। ওঃ, গোলমালের সুযোগ লইয়া লোকে কী এই ভাবেই পরের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে? আবার ধরাইয়া দিলে হাসিয়া শুধু বলে, সরি।

ধ্যেৎ তেরি!—বলিয়া রাগিয়া গ্যালারি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি গেটের দিকে, এমন সময় গ্যালারির নীচু সারিতে বসা এক ভদ্রলোকের পা হঠাৎ বাহির হইয়া আসায় একটি ল্যাং খাইয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেবী-পোশাক-পরা ভদ্রলোক শ্রীচরণ গুটাইয়া লইয়া বলিলেন, সরি। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তোমার গলায় দড়ি।

ভাবিতেছেন, ভদ্রলোক আমার কথা শুনিয়া চটিলেন না? আরে, আমি ও কথা মনে মনে বলিয়াছিলাম। আমি বুঝি জানি না, এ সংসারে অন্যায় হজম করিতে হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গেলে মার খাইতে হয়?

ল্যাং খাইয়াছিলাম, তত দুঃখ ছিল না। কারণ তাহা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু ল্যাং খাওয়ার দরুন মাটিতে পড়িয়া গিয়া কোমরে ব্যথা পাওয়ায় একটি শ্রাদ্ধ-বাড়ির নিমন্ত্রণ খাওয়া বাদ গেল, সেইটাই দুঃখ। দুঃখটা একটু বেশিই হইয়াছিল; কারণ এ বাজারে কিছু না দিয়া একটা নিমন্ত্রণ খাওয়া মাঠে মারা গেল।

মাঠে ঐ ল্যাং খাওয়ার জন্যই তো!

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

মাকড়সা

চারতলা বিশাল প্রাসাদ। রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত। তারই মধ্যে খান কয়েক ক'রে ঘর নিয়ে এক-একজনের ফ্ল্যাট। বাসিন্দারা দেশ-বিদেশের লোক, সকলের সঙ্গে সকলের চেনা-পরিচয় কম। কখানা কামরার মধ্যে এক-

একজনের সাজানো সংসার। একক জীবনের নমুনা। নিজেদের ঘরে ব'সে তারা পায়রার মত বকম বকম করে।

নির্মল এ ধরনে মানুষ হয় নি, তবু তার মন্দ লাগে না। রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার সময় এক-একদিন মোড়ের পানওয়ালার দোকানে সিগারেট নিয়ে জ্বলন্ত দড়ি থেকে ধরিয়ে সে এই বাড়ির দিকে ফিরে তাকায়। সারা বাড়িটায় তিন-চার রকমের রঙ বুঝিয়ে দেয়, এ একজনের সম্পত্তি নয়, অতগুলি শরিকের। ভাড়াটেদের ভাড়ায় যে যার নিজের অংশ সারিয়ে নিয়েছে, সেই মতই রঙ। তবে নির্মলের ফ্ল্যাটের পাশের অংশটা অনেক দিন সারানো হয় নি, বোধ হয় মালিকের অবস্থা খারাপ। ছাদ দিয়ে জল পড়ে, জানলার সার্সিও অটুট নয়।

নির্মল এ দিকেই তাকায়, একতলা আর তিনতলা অন্ধকার, বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। মাঝের ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছে, ওখানে অরুণারা থাকে। আহা, তার জন্যে নির্মলের দুঃখ হয়, অল্প বয়সে মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। সঙ্গে মা, অনেক সন্তান হারিয়ে এই পাগলী মেয়ে নিয়ে ব'সে আছেন। ছেলে লেখাপড়া শেখে নি, সামান্য কাজ করে। ভাঙা ব'লে অল্প ভাড়ায় বাড়ি পেয়েছে, ওদের পক্ষে মন্দ নয়।

নির্মল বাড়ির মধ্যে ঢোকে, ওর ফ্ল্যাট তিনতলায়। দোতলায় উঠে মণীশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়।—কি খবর নির্মলবাবু, ভাল তো? নির্মল ম্লান হাসে।—মন্দ কি, তারপর আপনার? মণীশবাবু হাতের বইটি তুলে ধরেন—টেম্পোরারি ইন্‌স্যানিটি। বলেন, এখন এই বইটি ফলো করছি। যে রকম ক'রে হোক অরুণাকে সারাতে হবেই।

আপনি যে ভাবে লেগেছেন, ভয় নেই, ঠিক পারবেন।

মণীশবাবু হাসেন, বলেন, আমি মনস্তাত্ত্বিক, মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। এতে ক'রেও যদি মনোবিকার সারাতে না পারি তবে আর—। কথা শেষ না ক'রেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। নির্মল তিনতলায় উঠে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে নির্মলের রোজই দেরি হয়। রাত্রের শো'য়ে থিয়েটার করলে কিংবা বেশি রাত পর্যন্ত শুটিং থাকলে ভোরবেলা ওঠা যায় না। ঐ থেকেই অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। চা খেতে খেতে নিত্য কাগজ পড়ার সময় ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে যায়।

ঘুম ভেঙেছে আপনার?—নির্মল চমকে ওঠে। অরুণা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে ম্লান হাসি।

কি খবর তোমার? এস, ব'স।

অরুণা কথানুযায়ী এগিয়ে আসে, চেয়ারে বসে।

আমি চা খাব।—কি রকম বাধবাধ কথা! তেষ্টা-ভরা চোখে নির্মলের চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিশ্চয়ই খাবে। এই তোমার চা ক'রে দিচ্ছি।—নির্মল কাপে ক'রে চা এগিয়ে দেয়।

অরুণা চকচক ক'রে চা খেয়ে ফেলে বলে, উঃ, কি গরম! বড্ড ঘাম হচ্ছে, পাখাটা খুলে দিন না।

নির্মল হাসে, বলে, সর্দারি ক'রে গরম চাটা খাওয়ার কি দরকার ছিল?

অরুণা নিজে উঠে গিয়ে পাখা খোলে। নির্মল তারই দিকে তাকিয়ে থাকে, ভাবে, অরুণার বয়স বছর আটাশ হবে, সে যে সুন্দরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফরসা রঙ, ঋজু দেহ, সাবলীল ভঙ্গি, একপিঠ চুল—খুব কালো না হ'লেও একেবারে বাদামী নয়। শুধু একটি মাত্র ত্রুটি তার রূপকে অনেকটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, সে তার চোখ, কেমন যেন ভ্যাবলা ঘোলাটে, সে চোখে কোন ভাষা নেই।

অরুণা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে, আমার বরের কোন খবর পেলে নির্মলদা? কেমন যেন ফ্যাকাসে মুখ। ভাষাহীন চোখ দেখে বোঝা যায় না তার দুঃখের পরিমাণ।

না, এখনও পাই নি।—নির্মল ছোট্ট উত্তর দেয়।

অরুণা জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখে, বলে, আমি রোজ নজর রাখি, এ রাস্তা দিয়ে কোনদিন গেলে আমি তাকে চেপে ধরব।

নির্মল নিরুত্তর। অরুণা নিজে থেকেই বলে, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। আমি জানি, আমি এখানে আছি শুনলে ও নিশ্চয়ই আসবে।

নিচে থেকে মা ডাকাডাকি করছেন। অরুণা চ'লে যায়। ব'লে গেল, নির্মলদা, কাউকে ব'লো না। ওর খবর পেলে একেবারে আমার কাছে দিয়ে যাবে। সত্যি বলছি, আমার মা দাদা কেউ আমার ভাল চায় না।

বেচারী অরুণা! নির্মলের দুঃখ হয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খুব বড় কোন শক পেয়েছে। প্রথম যেদিন থেকে আলাপ, অরুণা সেদিনই বলেছিল, নির্মলদা, আমার বর কোথায় হারিয়ে গেছে, খুঁজে দেবে? নির্মল বুঝতে পারে নি, বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। মা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন, অরুণার মাথার ঠিক নেই।

নির্মল আশ্বস্ত হয়, ভরসা দেবার জন্তে বলে, নিশ্চয়ই খুঁজে দেব। সেই থেকে অরুণা প্রায়ই আসে, নির্মলকে ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করে।

মাঝে মাঝে হাসি পায়। কিন্তু সে বড় করুণ হাসি। নির্মল ভাবে, ঈশ্বর এত রূপ দিয়ে কেন এত বড় ঠাট্টা করলেন অরুণার সঙ্গে?

বিকেলবেলা হঠাৎ বৃষ্টি এল। নির্মল ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে দৌড়ে বাড়ির কাছাকাছি আসে। একেবারে মোড়ের মাথায় মণীশবাবুদের ফ্ল্যাট, সেইখানেই ঢুকে পড়ে। বাইরের ড্রইং-রুমে মণীশের স্ত্রী সোফায় ব'সে সোয়েটার বুনছিলেন। নির্মলকে দেখে আপ্যায়ন করলেন, আরে, এস, ব'স। ঝ'ড়ো কাকের মত কোথা থেকে?

নির্মল কোট খুলে চেয়ারের পিছনে টাঙিয়ে দেয়। বলে, আর বলবেন না, বৃষ্টির কি কোন আক্কেল আছে? আজকে ধোপদুরস্ত বার করেছি কেউ বিশ্বাস করবে? জলে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেল।

এলা বউদি হাসেন, বলেন, বিয়ে কর নি, খাওয়া কর নি, তোমার আর ভাবনা কি?

এই সদাহাস্যময়ী বউদিটিকে নির্মলের বড় ভাল লাগে। সাতে-পাঁচে থাকেন না, সব সময় কর্তব্য ক'রে যান। সময় পেলেই নির্মল বউদির কাছে আসে, কত সময় বলে, আপনাকে দেখলেই আমার নিজের বউদির কথা মনে প'ড়ে যায়।

বউদি হাসেন, বলেন, কেন বল তো, উনিও আমার মত সেকেলে বুঝি?

না বউদি, আপনি বুঝবেন না। আপনাদের দুজনের মধ্যেই পেয়েছি অনেক উন্নত, অনেক বড় মনের পরিচয়, যা সাধারণের মধ্যে পাই না।

বউদি চুপ ক'রে থেকে বলেন, তা যদি বল, সে আমার বাবার জন্যে।

বউদি আপন মনে বাপের বাড়ির কথা ব'লে যান, তাঁর বাবা কি ভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন। কত ছোটখাট গল্প। নির্মলের শুনতে বেশ ভাল লাগে। খুব ছোটবেলায় মণীশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু কোনদিন স্বামীর নিজস্ব ব্যাপারে মাথা গলান নি। বউদি আজও জানেন না মণীশবাবুর কত রোজকার; প্রতি মাসে খরচের জন্য যে টাকা তিনি দেন ঐতেই বউদি খুশি। বলেন, মনে হয়, ওঁর মনটাও খুব ভাল, গরিব দুঃখীর ওপর বড় মায়া। এই দেখ না—অরুণা। বেচারীকে উনি বড় স্নেহ করেন, ওকে সারাবার যে কত চেষ্টা!

কথা হয়তো চলত, মণীশবাবু এসে পড়লেন, বললেন, এই যে নির্মলবাবু, আপনি রয়েছেন। ঠিক যা বলেছিলাম তাই। এই দেখুন এই বইটায় লিখেছে, যদি কোন শকের জন্য পাগল হয়ে যায়, আবার যদি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তা হ'লে অনেক সময় পাগলামি ভাল হয়ে যায়। মণীশবাবু বইগুলো টেবিলের উপর রেখে কোচে ব'সে পড়েন, বলেন, এলা, একটু চা ক'রে আন তো।

বউদি চ'লে গেলেন। নির্মল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অরুণার কি বিয়ে হয়েছিল?

কেন বলুন তো ?

ও আমাকে বলে, ওর বর খুঁজে দাও।

আপনাকেও বলেছে ?—মণীশবাবু কি যেন চিন্তা করেন, বলেন, আমাকেও বলে। এর জন্যে দায়ী কে জানেন ? ওর বাপ মা। আমার বিশ্বাস, ছোটবেলায় অরুণাকে মিশতে দেওয়া হয়েছিল ওর বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেই সময় হয়তো কাউকে সে ভালবাসে; অরুণার রূপ ছিল, সে ছেলেটির পক্ষেও তাকে ভালবাসা অস্বাভাবিক নয়। মনে করুন, তারা দুজনে বিয়ের স্বপ্ন দেখলে, কিন্তু কোন কারণে তা হ'ল না। সেই শকই তো যথেষ্ট অরুণাকে পাগল ক'রে দেবার পক্ষে।

নির্মল ব্যথিত হয়, কারণ এ বড় দুঃখের কথা। বলে, একে কি সারানো যাবে না ?

সারাতে হ'লে চিকিৎসা করতে হয়। সে পয়সা এদের কোথায় ? আমি চেষ্টা করছি, শুধু মনস্তত্ত্বের সাহায্যে মনোবিকার সারানো যায় কি না। দেখা যাক কতদুর কি হয়।

নির্মল ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বলে, এ কি, ছটা বাজে! আমি চলি।

আরে মশাই, চা খেয়ে যান।—মণীশবাবু বাধা দেন।

অসম্ভব, একেই দেরি হয়ে গেছে। ছটার সময় এক জায়গায় পৌঁছবার কথা ছিল।—হড়বড় ক'রে নির্মল বেরিয়ে যায়।

নির্মল ছবিতে কাজ করছে নতুন, তাই বোধ হয় পাবলিসিটির দিকে নজর বেশি। কোন্ কাগজে তার বিষয়ে কতখানি লিখেছে, সে দিকে খেয়াল রাখে সব সময়। স্টুডিও থেকে ফেরার পথে জগুবাবুর বাজারে স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটায়। দোকানদার নির্মলকে চেনে, তাই মিছিমিছি ব্যস্ত করে না, বরং অনেক সময় বলে, কই, এ মাসের 'চিত্রলিপি' দেখলেন না ? খুব বিক্রি হচ্ছে কিন্তু।

সেদিন দুপুরবেলা নির্মল স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধ হয় তিনটে হবে। স্টুডিওতে কাজ ছিল না, তবু বুড়ি ছুঁতে একবার যেতেই হয়েছিল। ফেরবার পথে এখানে নেমেছে। নির্মল আশা করেছিল,

এবারের 'চিত্রলিপি'তে তার ছবি বার হবে, কিন্তু হয় নি। আশ্চর্য, নির্মল মনে মনে ভাবে, সম্পাদক ভদ্রলোক সেদিন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেলেন, ছবি ছাপিয়ে নবাগত চিত্রতারকা হিসাবে প্রচার করবেন ব'লে। অথচ ছবি বের হয় নি।

পত্রিকা ফেরত দিয়ে নির্মল চ'লে আসছিল, কার চেনা গলা শুনে থেমে গেল।—দিন না ঐ বইটা, কত দাম? কি সুন্দর! এক সঙ্গে এতগুলো কথা! নির্মল ফিরে তাকায়।

সন্দেহ অমূলক নয়। অরুণা ইংরেজী পত্রিকা দেখছে। পরনে তার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সাজ। লালপাড় সাদা শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ। ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো। সিঁথিতে সিঁদুর সে সব সময়েই দেয়, কিন্তু এ ভাবে গৃহস্থের বউয়ের সাজে নির্মল তাকে দেখে নি।

অরুণা, তুমি একা?—নির্মল কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে।

আরে, নির্মলদা, আপনি! এ কাগজ দেখেছেন?

নির্মল কথার উত্তর না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে, তুমি কি একা এসেছ?

অরুণা হেসে ফেলে—সেই ভ্যাবলা হাসি, বলে, কি যে বলেন! আমি কি একা বার হই? দাদা আছে ঐ চায়ের দোকানে। এই ছবিটা দেখুন না।

নির্মল ছবির দিকে তাকায়। বিমানবাহিনীর কোন এক পাইলটের ছবি। কার ছবি?—নির্মল প্রশ্ন করে।

অরুণা হাসে—বড় ক্লান্ত হাসি, বলে, চিনতে পারলেন না তো। আমার স্বামী।

তোমার স্বামী?

অরুণা খুব চাপা গলায় বলে, তাই জানতাম। এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের রাতেই ওকে চ'লে যেতে হয়, আর আসে নি। তবে খবর পেয়েছিলাম, ও মিলিটারিতে আছে।

নির্মল বিস্মিত হয়, বলে, ওর কাছ থেকে কোন চিঠি পাও নি?

চিঠি?—অরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, চিঠি ও লেখে,

নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু আমি পাই না। মা দাদা যে পায়, সেই নষ্ট ক'রে ফেলে, আমাকে পড়তে দেয় না।

নির্মল বোঝে, অরুণার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ ভাবে কথা বলা ভুল। লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অরুণার দাদা সরোজ পান চিবুতে চিবুতে এসে পড়ে। নির্মল বলে, চলুন সরোজবাবু, বাড়ি ফেরা যাক।

চলুন।—সংক্ষিপ্ত উত্তর সরোজের। দেখলেই মনে হয়, সে নির্বিবাদী মানুষ। পাশে পাশে চলে, তবে কথা বলে কম।

নির্মল অরুণাকে প্রশ্ন করে, আজকে এমন সাজে তুমি বেরিয়েছ কেন?

শুনলে আপনি হাসবেন।—অরুণার চোখে জল।—কাল একজন আমায় জানিয়েছিল পত্রিকায় ওর ছবি বেরিয়েছে, আজ তাই গঙ্গায় চান ক'রে শুদ্ধ হয়ে ছবি দেখতে বেরিয়েছিলাম। আরও দুটো স্টলে ছবি দেখেছি, তারপর এখানে। অথচ পয়সা নেই ব'লে কিনতে পারি নি।

নির্মলের মনে প'ড়ে যায়, এ ছবি যে যেন কোথাও দেখেছে, বাড়ি ফিরে পত্রিকা খুলে দেখে।

প্রবন্ধের শিরোনামায় লেখা—যে সব বিমান-চালক আজ পরলোকে। বুঝতে বাকি থাকে না। অরুণা আজ যাকে স্বামী ব'লে দাবি করছে, সে এ জগতে নেই। ভাগ্যিস অরুণা এ খবর পায় নি! তা হ'লে হয়তো আরও বেশি শক পেত।

অরুণার মা ছবি দেখে চমকে ওঠেন, বলেন, এ ছবি তোমায় কে দেখালে?

নির্মল ছোট্ট উত্তর দেয়, অরুণা।

তাই দেখছি পাগলামির বহরটা ওর বেড়েছে। তুমি ভাবতে পার না বাবা, এই লোকটা আমার কতখানি সর্বনাশ করেছে!

অরুণার মা তরকারি কাটছেন, অদূরে নির্মল ছোট মোড়ার উপর ব'সে, তিনি ব'লে গেলেন অনেক কথা।—অরুণার বাবার অবস্থা ভালই ছিল, তা আরও ভাল হয় শেয়ারমার্কেটে টাকা জিতে। গাড়ি

বাড়ি ঝি চাকর সবেরই প্রাচুর্য। তখন অনেক লোকই আসত দেখা করতে—তাদের মধ্যে একজন, নাম তার রমেশ, দেখতে সুশ্রী, বলিষ্ঠ চেহারা, অরুণার বাবার খুব প্রিয় পাত্র হয়ে পড়ে, সেই সূত্রে অরুণারও।

মা বুঝতে পারেন নি, এ পরিচয় ক্রমশ পরিণত হয়েছে প্রেমে। উনি যখন টের পেলেন, সর্বনাশ তখন হয়ে গেছে। শেয়ারে প্রচুর লোকসান দিয়ে অরুণার বাবা বাড়িঘর বিক্রি ক'রে কোন রকমে নিজের মান বাঁচালেন। রমেশ এ বাড়িতে আসা বন্ধ করল। আর সেই থেকে অরুণার মাথাও বিকৃত হতে থাকে।

পাগলামির ঝোঁকে ও বলত, রমেশের সঙ্গে নাকি ওর বিয়ে হয়েছিল।

এ কি সত্যি নয়?—নির্মল প্রশ্ন করে।

সামাজিক নয়, তা আমি জানি। তবে ওদের মধ্যে মানসিক কোন সম্বন্ধ হয়েছিল কি না জানি না—সে কথা কোনদিন বলে নি।

তারপর রমেশ আর আসে নি?

না, শুনেছিলাম উড়ো-জাহাজ চালায়। মা থামেন, আবার কি ভেবে বলেন, মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—রমেশদা চিঠি লিখেছে কি না; কিছু বলতে পারি না। ও ভাবে, আমি বোধ হয় ওকে চিঠি পড়তে দিই না। অথচ রমেশের কোন চিঠি আমি এ পর্যন্ত পাই নি।

বলা উচিত হবে কি না ভেবে নির্মল বলে, আপনি জানেন কি, রমেশ মারা গেছে?

মা নির্বিকার, বলেন, হ্যাঁ, সে খবরও আমি পেয়েছি, কিন্তু অরুণাকে জানাই নি। তাঁর চোখ জলে ভ'রে আসে, বলেন, দোহাই তোমার; অরুণা এ কথা যেন টের না পায়, তা হ'লে আর বাঁচাতে পারব না।

বউদি মণীশবাবুর কাছে সব কথাই শুনেছেন, অথচ অরুণাকে কিছু বলতে পারেন না। সে আসে, তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করে, বলে, ঠিক পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল—১৫ই শ্রাবণ; আর পাঁচ দিন বাকি।

বউদি সহজ হবার চেষ্টা করেন, বলেন, সেদিন খুব মজা হবে।

কথা শেষ হতে পায় না, অরুণা বলে, তোমার কতদিন বিয়ে হয়েছে বউদি ?

তা প্রায় দশ বছর।

বিয়ের দিনটিতে বাৎসরিক উৎসব কর না ?

বউদি হাসেন, বলেন, সে বয়স আর নেই।

বাঃ, তোমাদের বয়স এমন আর কি!—একটু থেমে বলে, আমি কিন্তু এবার খুব সাজব, ভাল ক'রে সিঁদুর লাগাব, বেনারসী শাড়ি পরব। খুব মজা হবে। কি বল ?

বউদি সায় দিয়ে যান, বেশ তো, আমি তোমার জন্যে সোয়েটার বুনছি, ঐ দিন উপহার দেব।

আর একটা জিনিস দেবে ?—অরুণা আবদার ধরে, বউদির কানে কানে ফিসফিস ক'রে কথা বলে। কথা শুনতে শুনতে বউদির মুখের চেহারা বদলে যায়।

হ্যাঁ, দেব, নিশ্চয়ই দেব।—প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে ব্যথায় করুণায় তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

কদিন বাদে অরুণার দাদা সরোজ এসেছিল নির্মলের কাছে। সব সময় ভদ্রলোকের সংকোচ-ভরা চেহারা, সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলতেও পারে না, শুধু বলে, কটা টাকার দরকার ছিল।

নির্মল অবাক হয়। যে সরোজ সহজে কথা পর্যন্ত বলে না, সে এসেই টাকা চাইছে কি ক'রে ? বলে, কত টাকা ?

সরোজ ঢোক গেলে, বলে, বত্রিশ টাকা, আমার কাছে একটা সোনার আংটি আছে, এইটে রেখে যদি টাকা কটা—

নির্মল বাধা দেয়। সে কথা হচ্ছে না। কি দরকার ?

ডাক্তার দেখাতে হবে।—আর কোন কথা না ব'লে সরোজ চুপ ক'রে থাকে।

নির্মলের কেন জানি না দয়া হয় মনে, বলে, অপেক্ষা করুন, টাকা দিচ্ছি। কবে নাগাদ ফেরত পাব ? ও মাসে হয়তো দরকার পড়বে।

সরোজের মুখ সাদা হয়ে যায়, বলে, কথা দিতে পারছি না, সেইজন্মেই তো আংটি রেখে যাচ্ছি।

নির্মল আপত্তি করে, তা হ'লে মাপ করবেন, জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার দিতে পারব না।

আশ্চর্য সরোজ! আর বেশি কথা বলে না। হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলে, সকালবেলা মিছিমিছি জ্বালাতন করলাম।

সেই দিনই নির্মল বউদিকে সরোজের কথা বলেছিল। বউদিও সায় দিলেন, আমার কাছেও এসেছিল। হাতে টাকা ছিল, দিতে গেলাম, নিলে না। বললে, আংটি জমা দিয়ে তবে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমিই বল ভাই, ওঁকে না জিজ্ঞেস ক'রে কোন্ সাহসে অন্যের আংটি রাখব? উনি শুনে তো রেগে অস্থির। বললেন, ও একটা হতভাগা, বাপের টাকা উড়িয়েছে, ওকে প্রশ্রয় দিও না।

কি জানি!—নির্মল নিজের মনেই বলে, লোকটা বোধ হয় খারাপ নয়।

অরুণার কথা যারা শুনেছে, সকলেরই করুণা হয় এই অল্পবয়সী মেয়েটির জন্মে। বৃদ্ধেরা বলে, আহা, মেয়েটির মার কি কষ্ট! প্রৌঢ়েরা বলে, এর জন্মে দায়ী ওর বাপ মা। যুবকেরা বলে, অরুণা কোন গল্পের ছেঁড়া পাতা, আগে কি ঘটেছিল, পরে কি ঘটবে জানা নেই; আধ-ফোটা ফুল, আমাদের কর্তব্য তাকে ফোটানো। ছেলেমেয়েরা ভয় পায়, বলে, ঘুটঘুট ক'রে পাগলী আসছে, এখুনি ধ'রে ঝোলায় পুরবে।

কিন্তু সকলেরই বিরক্তি ধরে অরুণার উপর যখন সে তারস্বরে চিৎকার ক'রে অন্য ফ্ল্যাটের ঝি-চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে, কেন তুই বাসনমাজার জল শেষ করেছিস? এখন আমরা বাসন মাজি কি দিয়ে?

এ তো নিত্যকার ঝগড়া। অরুণাদের দিকে তিনটে ফ্ল্যাটের জন্মে নিচে একটি কল আর চৌবাচ্চা। সেখানে ঝি-চাকরেরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে, নিজেরা চান করে। অরুণাদের ঠিকে-ঝি আসে বটে, তবে যেদিন সে আসে না অরুণা নিজেই বাসন মাজতে যায়,

অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া করে। অথচ ঝি-চাকরেরা হাসে, অরুণাকে তাদেরই সমজাতীয় ব'লে মনে করে। উপরের ফ্ল্যাটের খরখরে হিন্দুস্থানী আয়া দেহাতী ভাষায় শুনিয়ে দেয়, তুমি আগে এলেই পার, কে তোমার জন্যে চৌবাচ্চায় জল ভ'রে রাখবে ?

এতেই অরুণা দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, ছোটলোকের মেয়ে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! আমাকে 'তুমি' বলে !

যাকে কাছে পায় তাকে সালিশী মানে। একই কথার পুনরাবৃত্তি। কত দিন ছাই-হাতে নির্মলের হাত চেপে ধরেছে, বলেছে, দেখছ নির্মলদা, আজ আমি গরিব ব'লে ছোটলোকগুলোও চোখ রাঙাচ্ছে। বাবার যখন টাকা ছিল, কত ঝি চাকর ঐ রকম রেখেছি। এ মুখপুড়ীদের সে কথা বুঝিয়ে দাও না।

নির্মল সান্ত্বনা দেয়, মাথা গরম ক'রো না, চল, ওপরে চল।

কোন কোন দিন অরুণা ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে, আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই, বাবা গো, তুমি আমায় ডেকে নাও।

কোন রকমে ভুলিয়ে নির্মল তাকে ওপরে আনে। মাকে আলাদা পেলে ধমক দিয়ে বলে, কেন অরুণাকে আপনি নিচে পাঠান ? জানেন ওর মাথা খারাপ, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে।

অরুণার মা বেচারীর মত তাকান। বলেন, কি করব বাবা, আমাদের আর কে আছে ? তবু অরুণা পারে, আমি পারি না। নিজের হাতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা—এ যে স্বপ্নে ভাবি নি। ভাঙা বাড়িতে থাকতে হবে, এও কি কখনও ভেবেছিলাম। ট্রামে বাসে কি জীবনে চড়েছি ?—কথা আর শেষ হয় না, গলা ধ'রে আসে, অবিরাম চোখের জল পড়ে। নির্মল কোন রকমে নিজের ঘরে পালিয়ে আসে।

মণীশবাবু বলছিলেন, দেখবেন নির্মলবাবু, গাড়ি যোগাড় করতে পারলে মাঝে মাঝে অরুণাকে নিয়ে বেড়াতে গেলে ভাল হয়। কলকাতার বদ্ধ হাওয়ায় সুস্থ লোকই পাগল হয়ে যাচ্ছে।

নির্মল সেই থেকে গাড়ি পেলেই পিকনিকে বেরুত, বড় গাড়িতে অনেক লোক নিয়ে। এবার কিন্তু ছোট গাড়ি পেয়েছে, তাই সবাইকে

বলতে পারে নি। মণীশবাবু, বউদি আর অরুণাকে নিয়ে বেরুবার কথা। পথে সরোজের সঙ্গে দেখা হওয়ায় নির্মল কিছুতেই ছাড়ে না, জোর ক'রে গাড়িতে তুলে নেয়। অন্য সব বারেই সে এড়িয়ে গেছে, কিন্তু এবার পারল না।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কলকাতার পিকনিক—বোটানিক্যাল গার্ডেন। সারা দুপুর সেখানে কাটাবার পালা। খাবার মণীশবাবুরা সঙ্গে নিয়েছিলেন।

প্রকৃতির মধ্যে পড়লেই অরুণার পাগলামি বেড়ে যায়। ফুল ছিঁড়ে মাথায় গোঁজে, অযথা ছুটে দূরে চ'লে যায়, চিৎকার ক'রে হাসে।

মণীশবাবু বলেন, মানুষ প্রকৃতির জীব। সভ্যতার মুখোশ এঁটে কেউ সুখী হতে পারে না।

অরুণা এক সময় বলে, ঐ ধারে আমি এসেছি যে আমার স্বামীর সঙ্গে, বাগানের ঐ কোণে।

মনস্তাত্ত্বিক মণীশবাবু লাফিয়ে ওঠেন, বলেন, চল তো কোথায় দেখি!

গল্প করতে করতে দুজনে এগিয়ে যায়।

নির্মল বউদিকে বলে, উনি আছেন ভাল, ঠিক ডিটেকটিভের মত পাগলামির সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সরোজ স্বভাবমত বেশি কথা বলে না, দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়, নোট-বইতে হিজিবিজি কাটে।

বউদি ইচ্ছে ক'রেই জিজ্ঞেস করেন, কি খবর সরোজবাবু, আমাদের সঙ্গে আড়ি ক'রে দিয়েছেন নাকি?

সরোজ অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বলে, না, আমি ঠিক আছি, মানে—শরীরটা খুব ভাল নেই।

বউদি আর নির্মল প্রাণখোলা গল্প ক'রে যায়। সরোজ শোনে, কিন্তু সব কথার সাড়া দেয় না। মণীশবাবু অরুণাকে নিয়ে ফিরে এলেন প্রায় ঘণ্টাখনেক বাদে। তাঁর মুখে সাফল্যের হাসি। অরুণা বউদির পাশে ব'সে প'ড়ে বলে, বাবা!

বউদি হাসেন, বলেন, কেন গেলে ওর সঙ্গে?

মণীশবাবু নির্মলকে গোপনে বলেছিলেন, আজ অনেক সূত্র পেয়েছি। অরুণাকে সারাতে যদি নাও পারি, অন্তত ব'লে দিতে পারব কেন সে পাগল হয়েছিল।

খাবার সময় সরোজকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নির্মল ভেবেছিল, হয়তো কোথাও গেছে, শীগগির ফিরবে। কিন্তু সারাদিনে আর সে ফেরে নি। বউদি হেসে বললেন, কি জানি স্টীমার দেখতে গিয়ে হয়তো চ'ড়ে বসেছেন। একেবারে ও-পারে গিয়ে নামবেন।

অরুণা মন-মরা হয়ে ব'সে থাকে। হঠাৎ রেগে গিয়ে ব'লে ওঠে, দাদাকে আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কথাটা এত কর্কশ, সকলের কানে লাগে।

সেই দিনই রাত্রিবেলার কথা। একে স্টুডিও থেকে কাজ সেরে বেরুতে দেরি হয়েছে, তার ওপর একঘেয়ে বৃষ্টিতে জলের ছিটেয় জামা-কাপড় নষ্ট হয়েছে। বিরক্তি মাথায় ক'রে নির্মল ঘরে ঢোকে। আশ্চর্য, চেয়ারে মণীশবাবু ব'সে আছেন! রাত বারোটা বেজে গেছে। নির্মলকে দেখেই লাফিয়ে ওঠেন, এত দেরি যে?

হঠাৎ অনেক কাজ প'ড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি এত রাত্রে?

আপনার জন্যে ব'সে আছি, অরুণার ঘরে চলুন।

কেন, কি হয়েছে?—নির্মল ভয় পায়।

ব্যাপার অনেক কিছু। অরুণার দাদা সরোজ মদ খেয়ে বাড়ির মধ্যে মাতলামি শুরু করেছে। খবর পেয়ে আমি ছুটে এসেছি। বাঁদরটাকে আজই বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

কিন্তু এ অভ্যাস তো তার ছিল না।—নির্মল থেমে থেমে বলে।

মণীশবাবু দাঁতে দাঁত ঘষেন, বলেন, ও একটা স্কাউণ্ড্রেল। গোড়া থেকে লোকটাকে সুবিধের মনে হয় নি। যা রোজগার করে, একটা পয়সাও মা-বোনকে দেয় না, নিজে ফুর্তি করে।

তা হ'লে অরুণাদের চলে কি ক'রে?

দূর-সম্পর্কের এক বড়লোক পিসিমা আছেন। উনি বুঝি মাসে মাসে সাহায্য করেন, তাইতে চলে। তাও তো ক মাসের বাড়ি-

ভাড়া বাকি। ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিও টাকা পায় নি। কানেক্‌শন কেটে দিয়ে যাবে বলেছে।

একে মেজাজ ভাল ছিল না, তার ওপর এইসব শুনে নির্মল আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। মণীশবাবুর সঙ্গে সোজা অরুণাদের ফ্ল্যাটে নেমে আসে। ভিতরে ঢুকেই যা চোখে পড়ল, অদ্ভুত! সরোজ মত্ত অবস্থায় একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, বলছে, খোল দরজা, না হ'লে ভেঙে ফেলব। আমি শেষ বোঝাপড়া ক'রে যেতে চাই। কথা জড়িয়ে আসছে, ঘরের ভিতরে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ।

নির্মলের পক্ষে এ অসহ্য। শার্টের কলার ধ'রে সরোজকে মেঝেতে পেড়ে ফেলে বলে, বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে। ভদ্রলোকের বাড়িতে মাতলামি করতে এসেছ, আর জায়গা পাও নি? জুতো মেরে তোমাকে সোজা করব। নির্মল সজোরে চড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে সরোজ ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ভ্যাবলা চোখে তাকায়, ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে। ততক্ষণে অরুণা মার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, দুজনেই ভয়ে জড়সড়।

মণীশবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, বলেছিলাম, বদ্‌ সঙ্গে মিশছে, সরোজকে বিদায় করুন। তখন করলেন না, এখন এই সব কেলেঙ্কারি—

কথা শেষ হতে পায় না, অরুণার মা মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ওঠেন। সরোজ নিজেকে সামলে নেয়, অরুণার দিকে ফিরে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলে, নিজের মনেই হাসে, বিনা ভূমিকায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সম্পূর্ণ নাটকীয় 'পরিস্থিতি'। সবাই দরজার দিকে চেয়ে আছে, সিঁড়িতে সরোজের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কথা বলার জন্যে নির্মল ফিরে তাকায়। এক-এক জনের মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি স'রে যায়। ব্যথা-ভরা অরুণার চোখ। নিজেকে সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তার মা। তীব্র দৃষ্টি মণীশবাবুর চোখে। নির্মল কথা বলতে পারে না। সকলের কাছেই নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হয়।

সরোজ আর ফেরে নি। দিন দুয়েক বাদে এসে দুপুরবেলা

তার জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মা আর কান্নাকাটি করেন না। শুকনো গলায় বলেন, সবই অদৃষ্ট, তা না হ'লে আর এমন হবে কেন? আগের জন্মের পাপের ফল।

অরুণার কিন্তু দাদার কথা উঠলেই এখনও চোখ ছলছল করে। মণীশবাবু খুশি, বলেন, ভাগ্যিস নির্মল সেদিন মেরেছিল, তা না হ'লে ক্রমশ বাঁদরামি বেড়ে যেত।

একই রকমে দিন কাটতে থাকে। বৈচিত্র্যহীন জীবন। অরুণার পাগলামি, নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খুঁজে আনার জন্মে সকলকে অনুরোধ, মণীশবাবুর অবিরাম চেষ্টা অরুণাকে সুস্থ ক'রে তোলার, নির্মলের স্টুডিওতে রঙ মাখার পালা, বউদির বোনা, আর অরুণার মার অসহায় কান্না—এর আর বিরাম নেই।

তবু এর মধ্যে অরুণাকে ভাল লেগেছিল একদিন, যে দিন সে সেজেগুজে এসে হাজির, পরনে তার পুরনো হ'লেও দামী শাড়ি, এলো-খোঁপায় সাদা ফুলের মালা জড়ানো। ভাষাহীন চোখের কোণে কালো কাজল, বিনা ভূমিকায় ঘরে এসে হাজির। হালকা হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে নির্মলদা?

খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, কোথাও যাচ্ছ নাকি?

অরুণা একেবারে নির্মলের সামনে এসে দাঁড়ায়, আজকে কত তারিখ জানেন?

নির্মল সামনের ক্যালেণ্ডারে চোখ বুলিয়ে বলে, কেন! ২০ তারিখ।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই দিনটিতে আমার বিয়ে হয়েছিল, অথচ সে কোথায়?

নির্মল কোন উত্তর দেয় না। অরুণা ব'লে যায়, কত ক'রে বললাম, তবু খুঁজে দিলেন না তো, আর যে একা থাকতে ভাল লাগে না নির্মলদা। নির্মলের হাতের উপর হাত রেখে মিনতি ক'রে বলে, আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব, দোহাই, তাকে খুঁজে দিন।

নির্মলের ক্রমশ অস্বস্তি লাগে, চাকরটা দুবার ঘুরে গেল, কি

ভাবল কে জানে। বলে, আমি তো কথা দিয়েছি, তাকে পেলেই ধ'রে আনব।

কেউ আমার কথা শোনে না, মণীশবাবু বিশ্বাসই করতে চান না। কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই নির্মলদা।—চোখের জল সামলাতে সামলাতে অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নির্মল চুপ ক'রে ভাবে, নজর পড়ে ঘরের কোণে ঝুল জমেছে। চাকরটা বোধ হয় পরিষ্কার করে না।

তারপর থেকে অরুণা কয়েকদিন কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে। হঠাৎ ডাকলে চমকে ওঠে। যার-তার সঙ্গে ঝগড়া করে। মণীশবাবু দিন কয়েকের জন্যে কলেজের কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। নির্মল জিজ্ঞেস করে, অরুণার কি হয়েছে, কদিন থেকে মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে?

অরুণার মা ক্লান্তির হাসি হাসেন, বলেন, কি ক'রে জানব বাবা? ও মেয়ে যে কখন কি ভাবে বুঝতেই পারি না।

তা হ'লেও তো কিছু করা দরকার।

কি আর করব! ভাবছি, অরুণাকে ওর পিসিমার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। মণীশবাবু থাকলে তো যেতে পারে না।

কেন?

উনি পছন্দ করেন না। বলেন, আমি এত কষ্ট ক'রে ওকে সারাচ্ছি, পিসিমা-টিসিমার বাড়ি গিয়ে মাথা খারাপ ক'রে আসবে। অথচ আপনার বলতে তো ঐ এক পিসিমাই। তাই ভাবছি, মণীশবাবু যখন কলকাতায় নেই, ওকে কদিন পাঠিয়ে দিই পিসিমার কাছে।

নির্মল সায় দেয়, দরকার মনে করলে পাঠিয়ে দিন।

সেই দিনই অরুণা পিসিমার বাড়ি গেল। ঠিক হ'ল, মণীশবাবুর ফেরার আগেই ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

এর পর কদিনই নির্মল স্টুডিওর কাজে ব্যস্ত ছিল। অবসর পেলে বউদির সঙ্গে ব'সে গল্প করত। বউদি বলতেন, দেখ ভাই, উনি যেন

এসে টের না পান। অরুণা পিসিমার বাড়ি গেছে, শুনলেই উনি রেগে অস্থির হবেন।

সে যা হোক বোঝানো যাবে এখন।—নির্মল বলে।

যেদিন মণীশবাবুর ফিরে আসবার কথা, অরুণাকে আনতে পাঠানো হ'ল। নির্মল স্টুডিও থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। বউদি টেলিফোন ক'রে জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। নির্মল ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করে, কি খবর বউদি, হঠাৎ জরুরি তলব?

বউদি আলনায় কাপড় গোছ করছিলেন, নির্মলকে দেখে এগিয়ে এলেন, বললেন, তোমাকে কদিন থেকেই বলব কিনা ভাবছিলাম, কিন্তু আজ বলতে হবে।

কি বলুন?

কাউকে বলতে পারবে না, এমন কি আমার স্বামীকে পর্যন্ত না।

কি কথা তাই বলুন।

বলছি। অরুণার মাকে কেউ বুঝিয়েছে, কোথায় নাকি এক জাগ্রত দেবতা আছেন, সেখানে গিয়ে মানত ক'রে পুজো করলে অরুণার পাগলামি সেরে যাবে। অথচ এর জন্যে খরচা আছে প্রায় দেড়শো টাকা। অরুণার মা আমার কাছে টাকা চাইছেন অনেকদিন ধ'রে। স্বামীকে বলতে পারি না, কারণ তিনি এসব বিশ্বাস করেন না।

তা হ'লে আপনি টাকা দেবেন কোথা থেকে?

সেই তো সমস্যা। আমিই বা 'না' বলি কি ক'রে? এসব মানতের ব্যাপারে আমারও বিশ্বাস নেই। তবু যখন ওর মার ইচ্ছে, আমার মনে হয় করতে দেওয়া ভাল। মনে সান্ত্বনা পাবে।

নির্মল সহজ হবার চেষ্টা করে। তা এতে আর ভাবনার কি আছে! আপনার যখন ইচ্ছে তাই হবে। টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে যাব। বউদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, বলেন, না না, তুমি টাকা দেবে কেন? আমার কাছে একজোড়া ভাঙা কানের মাকড়ি আছে, ব্যবহার হয় না। বিক্রি ক'রে দিলে আজকালকার বাজারে দাম পাওয়া যাবে।

সে আমি পারব না। আপনার গয়না বিক্রি করতে যাব কেন?

বেশ, ক'রো না।—বউদি ছোট্ট উত্তর দেন। বোঝা যায় তিনি

অসন্তুষ্ট হয়েছেন, বললেন, তোমার কাছ থেকে এ উত্তর আশা করি নি। ভেবেছিলাম, আমার কথার অবাধ্য তুমি নও।

নির্মল জবাব দিতে পারে না। বউদির থমথমে মুখের দিকে চেয়ে তার আশ্চর্য লাগে। এই সদাহাস্যময়ী মেয়েটি যে এত গম্ভীর হতে পারে, তা নির্মলের কল্পনাতীত। সহজভাবে টেবিল থেকে কাগজ-মোড়া গয়নার প্যাকেট হাতে তুলে নেয় নির্মল। বলে, বিকেলের মধ্যে টাকা দিয়ে যাব।

আমি জানতাম।—বউদি হাসেন, বলেন, মনে ক'রে উনি ফেরার আগে এনো।

তা আনব।—কথা দিয়ে নির্মল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু তা সে বিক্রি করে নি, নিজের ঘরে রেখে দেয়, পরে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। তবে সন্ধ্যেবেলা সে আসে। বউদির হাতে একশো ষাট টাকার নোট গুনে দিয়ে বলে, যা পেয়েছি এই এনে দিলাম। ভাববেন না যেন মাঝখান থেকে কমিশন রেখেছি।

বউদি টাকাটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে হেসে বলেন, এইজন্যেই তো তোমায় খবর দি দরকারে আদর ক'রে। জানি, আর কেউ না শুনুক তুমি আমার কথা নিশ্চয় শুনবে।

কেন জানি না নির্মলের কথাটা শুনতে ভাল লাগে।

সেদিনই রাত্রিবেলার কথা। বোধ হয় রাত নটা হবে। নির্মল চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে লিন্‌ড্‌সে স্ট্রীটের দিকে চলেছে। যুদ্ধের বাজারে হৈ-চৈ-ভরা কলকাতা এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। চারিদিকে আলোর ফোয়ারা, তবু নির্মল অনুভব করছে আনন্দের অভাব। তা না হ'লে রাত নটার মধ্যেই শহর ঘুমিয়ে পড়ল কেন?

নির্মলবাবু!—নির্মল ফিরে তাকায়। বড় গাড়ি-বারান্দার তলায় আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে।

শুনুন।—নির্মল এগিয়ে গেল। সরোজ।

কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সরোজ একটানা ব'লে যায়, বড় খিদে পেয়েছে। যা হোক কিছু খাওয়াবেন? বিশ্বাস করুন, পকেটে এক পয়সাও নেই।

সম্পূর্ণ অচেনা কণ্ঠস্বর। বোঝা যায়, সে মিথ্যে বলছে না।

চলুন।—বেশি কথা না ব'লে নির্মল তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ে কাছাকাছি কোন রেস্তোরাঁয়। এতক্ষণে সে সরোজকে ভাল ক'রে দেখে। রোগা আগের মতই। চোখের কোণে কালি, নাকের কাছে বড় কালশিটে পড়েছে। নোংরা জামা কাপড়, বোধ হয় কয়েক দিন চান করে নি।

চেয়ারে ব'সে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অর্ডারমত খাবার পেয়ে সরোজ অভদ্রের মত গিলে যায়। কোনদিকে তাকাবার ফুরসুত পায় না। নির্মল নিষ্পলক দৃষ্টিতে সরোজকে দেখে। চোখাচোখি হতেই সরোজ লজ্জা পায়।

কি দেখছেন ?

কিছু না।—নির্মলের ছোট্ট উত্তর।

আমাকে সবাই অসভ্য ভাবছে।

কেন ?

বড্ড খাচ্ছি।

খান না।

আবার খানিকটা চুপচাপ। সরোজ নিজে থেকেই বলে, মাতলামি আমি করি না, মদও আমি খাই নি।

নির্মল তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়, বলে, তবে সেদিন ভীমরতি ধরেছিল কেন ?

বোধ হয় তা ছাড়া উপায় ছিল না।

তার মানে ?

সে অনেক দিনের কথা। দীর্ঘ পাঁচ বছরের ইতিহাস। তবে বিশ্বাস করুন, একদিন আমার অবস্থা ভাল ছিল।

নির্মলের কথা চালাবার প্রবৃত্তি হয় না। তবু বলে, জানি আপনার বাবা শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বান্ত হন।

না।

তার মানে ?

সরোজ ভণিতা করে, ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে বলা দরকার।

কি, বলুন ?

অরুণা আর আমি ভাই-বোন নই।

কি ?—নির্মল চমকে ওঠে, বলে, অরুণা আপনার বোন নয় ?

না।—সরোজ অল্প অল্প ক'রে অনেক কথা ব'লে গেল···

মেয়ে বউকে পথে বসিয়ে অরুণার বাবা মারা যান। সেই সময় যারা অরুণাদের সাহায্য করতে যেত, সরোজ তাদের মধ্যে একজন। সে লক্ষ্য করেছিল, অনেকেই বন্ধু সেজে উপকার করতে এসে যথেষ্ট অপকার ক'রে গেছে। অরুণা চিরদিনই রূপসী, যে কোন যুবকের পক্ষে তার ওপর অবৈধ সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিল।

সরোজ বলে, আমি তখনই বুঝতে পারি, অরুণাকে বাঁচাতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ ভার কাউকে নিতে হবে। তখন নিজের টাকা ছিল, আর অরুণার ওপরও খানিকটা মোহ ছিল নিশ্চয়ই, তাই সেদিন থেকে এদের ভার নিয়েছিলাম।

সরোজ যা ব'লে গেল, তা নির্ভীক সত্য। প্রায় তিন বছর তার সঞ্চিত অর্থে অরুণাদের সে ভালভাবেই রেখেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরোজের নিজের রোজগার ছিল না, সরোজ পেয়েছিল তার মাসীর সম্পত্তি। নিজের বলতে তার সাত কুলে কেউ নেই। বিয়ের পরই বউ ম'রে যায়, তার পর থেকে অরুণাদের সঙ্গে আলাপ। সে বলে, আমার সঙ্গ মোটেই ভাল ছিল না। টাকার লোভে মাছির মত তারা আমার কাছে আসত। অনেক দিন বুঝতে পারি নি। হয়তো কখনও রেসে গেছি, বাজি রেখে তাস খেলেছি, যেদিন ঘুম ভাঙল, দেখলাম, এক রকম ফতুর হয়ে গেছি। যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল, দৈনন্দিন খরচায় নিঃশেষ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, বিশ্বাস করুন নির্মলবাবু, আজ ছ মাস যাবৎ আমি নিঃস্ব, হাতে একটি পয়সাও নেই।

তা হ'লে এতদিন চলল কি ক'রে ?—নির্মল উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে।

সে ইতিহাস আরও করুণ। আমার টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার পর

অরুণাদের বাঁচবার আর কোন উপায় রইল না। একটি মাত্র পথ যা খোলা ছিল, অরুণাকে তাই নিতে হয়। পাগলামির আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মার প্ররোচনায় অরুণা ধাপে ধাপে নামতে শুরু করল। অথচ আমার কথা ভাবুন দেখি, একদিন যাকে ভাল বেসেছিলাম, আজ তাকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। অসহায় আমি সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু সেদিন আর পারি নি।

অরুণা আপনাকে ভাল বেসেছিল?

তা জানি না, তবে আমার উপকারের কথা ওর মনে ছিল। তাই এ ক মাস আমাকে সে রেখেছিল দাদা সাজিয়ে। কিন্তু অরুণার মা আমাকে দেখতে পারেন না, কারণ কোন দিনই তিনি আমাকে চান নি, চেয়েছিলেন আমার টাকা।

নির্মল অনুভব করে, সে ঘামছে। বাধ-বাধ গলায় জিজ্ঞেস করে, তা হ'লে ওদের এখন চলছে কি ক'রে?

সরোজ হাসে, বলে, আপনাকে ভাবতাম বুদ্ধিমান। এইটুকু বুঝতে পারছেন না, অরুণাকে দিয়ে পাগলামির অভিনয় করিয়ে তার মা নতুন শিকার ধরেছে। তাই তো আমাকে তাড়িয়ে তাকে শোষণ করার ব্যবস্থা। সরোজ হাসে—ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, বলে, মণীশবাবুর চিকিৎসা এখনও চলছে?

হ্যাঁ, দেখাশুনা করছেন।

আরও কয়েকদিন এ চিকিৎসা চলবে। তবু কিছু বলার উপায় নেই। এখন তো আর ওঁর মত সামর্থ্য নেই। অতএব উনি যা করবেন তাই শোভা পাবে। অরুণাদেরও কিছু বলা যায় না। কারণ ওদেরও তো খেয়ে প'রে বাঁচতে হবে।

বিলের টাকা চুকিয়ে দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সরোজ কান্ত চোখে তাকিয়ে বলে, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আবার হেসে বলে, সেদিন মেরেছিলেন না, মুখে এখনও কালশিটের দাগ।

নির্মল সে কথা শোনে না, বেশ চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, অরুণা প্রায়ই পিসীমার বাড়ি যায়, তিনি কে?

সরোজ আবার হাসে, বলে, আপনাদের মণীশবাবু তা হ'লে এখনও পিসীমার বাড়ি যেতে দেন ? ভদ্রলোককে উদার বলতে হবে। একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে বলে, বাইরে রাত কাটাতে হ'লে একটা ঠিকানা বলতে হবে তো ? সেই সম্পর্কের পিসীমা। আচ্ছা, রাত হয়ে যাচ্ছে। আজ আসি, নমস্কার।

সরোজ সামনে দিয়ে হেঁটে চ'লে গেল। নির্মলের মনে ঝড় বইছে। এ কি সত্যি ! শহরের সভ্য সমাজে বাস ক'রেও বর্বরতার এ কি উলঙ্গ প্রকাশ !

ট্যাক্সি।—নির্মল ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। গাড়ি বাড়ির দিকে চলেছে। নির্মলের বুকে স্পন্দন বেড়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে কি মনে ক'রে সে এগিয়ে যায় মণীশবাবুর ফ্ল্যাটের দিকে। বাইরের জানলা থেকে ভিতরের ঘর দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বউদি ব'সে সোয়েটার বুনছেন, হয়তো অরুণার জন্যে। অদূরে মণীশবাবু ছেলেকে আদর করছে। পারিবারিক জীবনের কতখানি মিথ্যে অভিনয় ! নির্মলের সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

নির্মল ঘরে এসেও ঘুমুতে পারে না। আলো নিবিয়ে চুপ ক'রে ঈজি-চেয়ারে ব'সে থাকে। বউদির জন্যে তার দুঃখ হয়। সে তো স্বামীকে কোনদিন সন্দেহ করবে না। অরুণার জন্যে মায়ায় ভ'রে ওঠে তার মন। নির্মলের সমস্ত শরীর যেন গুলিয়ে উঠছে। রাত্রে খাবে না ব'লে সে চাকরকে ছুটি দেয়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। ভেবেছিল, দরজা খোলা আছে, উঠে বন্ধ ক'রে দেবে; কিন্তু হয় নি। কত রাত হবে হুঁশ নেই। কার কোমল স্পর্শে নির্মলের ঘুম ভেঙে যায়।—কে ?

নির্মল অন্ধকার রাতেও বুঝতে পারে, তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অরুণা। ঠোঁটে আঙুল রেখে বলছে, চুপ। কেউ শুনতে পাবে। নির্মল দরজার দিকে তাকায়, মনে হয় ভিতর থেকে বন্ধ। হয়তো অরুণা ঘরে ঢুকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কিছু বলবার আগেই অরুণা এসে তার পাশে বসে। নির্মল অনুভব করে, অরুণার মাথা তার

বুকের উপর মুয়ে পড়েছে, কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। মনে হয় অরুণা কাঁদছে, তার চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে ঝ'রে পড়ছে নির্মলের বুকে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্মলের চিন্তাশক্তি রহিত হয়ে যায়। অরুণার উষ্ণ নিশ্বাস তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। নির্জন অন্ধকার রাতে অরুণার আহত যৌবনকে সে অপমান করতে পারে না। নিবিড় আলিঙ্গনে নির্মল ভুলে যায় তার বংশমর্যাদা, তার সংস্কৃতি, তার এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান।

তখনও ভোর হয় নি। নির্মল উঠে ঈজি-চেয়ারে ব'সে আছে। মনে পড়ছে ফেলে-আসা দিনের কথা। মা বাবা ভাই বোনেরা রয়েছে রংপুরে। সিনেমা-জগতে এসেও যে মানুষ ঠিক থাকতে পারে, তা দেখাতেই নির্মলের একা এসে এখানে থাকা। সে অভিমান বোধ হয় মিথ্যে হয়ে গেল। যে মণীশবাবুর কথা ভেবে ঘেন্নায় তার সারা শরীর কুঁচকে উঠেছিল, আর তাকে সে ভাবে ঘেন্না করার স্পর্ধা নির্মলের নেই।

নির্মল চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছিল। অরুণাদের ঝি এসে দাঁড়ায়, বলে, মা চিঠি দিয়েছেন।

নির্মলের সারা শরীর কেঁপে উঠে। দু লাইন চিঠি—হাতে আজ একটি পয়সাও নেই, কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও।

স্পষ্ট বোঝা যায়, এ অনুরোধ নয়, দাবি। কোন কথা না ব'লে নির্মল দশ টাকার নোট খামে ভ'রে অরুণার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যোদ্ধা নির্মল, মণীশবাবুর মুখোশ খুলে দিতে বদ্ধ-পরিকর নির্মল, সরোজকে শাস্তি দেওয়া নির্মল ক্লান্তভাবে চেয়ারে ব'সে পড়ে। নজর পড়ে ঘরের কোণে মাকড়সার জালে নতুন পোকা পড়েছে, ছটফট করছে পালাবার চেষ্টায়। নিবিড় আলিঙ্গনে শুষে ফেলার জন্যে চারিদিকে ছুটে আসছে মাকড়সা, অক্টোপাসের বাচ্চা সংস্করণ।

শ্রীতরুণ রায়

বাঙালীর ইংরেজীয়ানা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

"কিন্তু, এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।...আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনি বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়।"

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষাপ্রবর্তনের সেই প্রথম আবেদন। এ আবেদন এতদিনে গ্রাহ্য হইয়াছে।

তাহার পর বিংশ শতাব্দী এবং স্বদেশী আন্দোলন। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' এবং 'ভাণ্ডারে' মায়ের ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখার সাধনা চলিল। ইংরেজীয়ানার মোহমুক্ত বাঙালী আপন ভাষা ও সাহিত্য লইয়া বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল, তাহার আত্মসম্মান ফিরিয়া আসিল। আত্মমর্যাদাবোধ জাগিল। এ যুগের ঈশ্বরগুপ্তেরা আর 'হুট বলে বুট' পরার নিন্দা করিতে পারিলেন না। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র অর্থাৎ নূতন স্বাদেশিকতার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম।

প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেজাজ এবং রুচি আবার বদলাইতে লাগিল। মহাযুদ্ধের দৈনন্দিন রোমাঞ্চকর সংবাদের সহিত আমাদের সাহিত্য-রন্ধনশালায় আসিতে লাগিল ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে নবত্বের কারি-পাউডার; মরণোন্মুখ পতঙ্গের রঙিন পাখার হাওয়া গায়ে লাগিয়া সদ্য ঘরমুখী আমাদেরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাষায় বৈদেশিকতা প্রবেশ করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নানা বৈদেশিক বিশৃঙ্খল ভাব আসিয়া ধাক্কা দিতে লাগিল আমাদের হৃদয়-দ্বারে, 'সবুজ পত্র' ব্যজনেও পোকামাকড় তাড়ানো গেল না, বরং দুই-একটি তাহাকেও আশ্রয় করিল। তাহার পরেই যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে অসহযোগ-আন্দোলনের ও বাংলা দেশে অধিকন্তু সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার বান ডাকিল—শেষোক্তটি চেহারায় বাঙালী কিন্তু ভাবে নয়। নূতন ছদ্মবেশে আরও প্রবল, আরও বিষাক্ত ইংরেজীয়ানা আমাদের অন্তঃপুরে

প্রবেশাধিকার চাহিল; তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করিল মুখর চলচ্চিত্র—টকি। ইহার মারাত্মক প্রভাব কত দূর গিয়া পৌঁছিয়াছে, রাজশেখর-বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল বাঙালী মাত্রেরই আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ আরও মারাত্মক রূপ ধরিয়া একেবারে ভারতবর্ষের বুকের উপর আসিয়া বসিল, দাড়িটা ছিল বাংলা দেশে, বসিয়া সেই দাড়ি উপড়াইতে লাগিল। বাঙালীর ঘরে-বাহিরে বেনোজল ঢুকিয়া শুধু টাকার পলিমাটি বিছাইল না, যত অনাচার, যত জঞ্জাল, যত অবাঞ্ছিত দ্রব্য জড় করিল এবং ঘরের সঞ্চয়—যাহা বহু কষ্টে বহু বেদনার সাধনায় সংগহীত হইয়াছিল তাহাও ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজীয়ানার সঙ্গে ইয়াঙ্কিয়ানাও যোগ দিল,—ভাষার চেহারা এক, তাই দুইটিতে একাকার হইয়া গেল। টকির সঙ্গে এরোড্রোম, এয়ার-পোর্ট এবং এয়ার-বেসের সর্বনাশা শিক্ষা আমাদের মনকে কলুষিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্কিত করিল আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে। ফেরঙ্গ রোগের চাইতেও বীভৎস বৈদেশিকতা বাংলা দেশকে তিলে তিলে গ্রাস করিতে লাগিল।

আসিল মহামন্বন্তর, ব্ল্যাকমার্কেট এবং নূতন অভিজাত সম্প্রদায়—তাহাদের দ্বারা সাধিত সর্বনাশের পরিমাপ শুধু ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া শ্রীরাজশেখর বসু করিতে পারেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার সুবাতাস বহিয়াও সে বিজাতীয় দুর্গন্ধকে দূর করিতে পারে নাই। বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিশালী সাধকের অক্লান্ত সাধনা ও সতর্ক পাহারার প্রয়োজন ঘটিতেছে। রাজশেখরবাবু বাহিরের দুই-চারিটি উপসর্গ মাত্র তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। আসল ব্যাধি আরও ব্যাপক এবং আরও গভীরে নিহিত। ইহার প্রতিকারে রাষ্ট্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়রা এই কাজে অগ্রণী হইলে ভাল হয়।

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন"

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-দিন হইতে নব্বই বৎসর পূর্ণ হইল। সংবাদ পাওয়া গেল, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিয়া আইনের সাহায্যে স্থায়িত্ব দানের ব্যবস্থা করিলেন, বাঙালী কবির আশ্রম ভারত-তীর্থে পরিণত হইতে চলিল। খসড়াকে আইন করিবার মুখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন, শান্তিনিকেতন তাহার নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবে, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির নকলে তেমনই আর একটা কিছু হইয়া উঠিবে না। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় এই নিজস্বতা কি, তাহা আমরা স্মরণ করিব। যাঁহারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবেন, তাঁহারাও কথাগুলি নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিবেন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিতেছি—

"ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত পাঠ্য বিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল. সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক শুদ্ধ-শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।"

দুই বৎসর পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র-আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দূরদিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ধ্যান করিয়াছে, কি কথা বলিয়াছে, কি ব্যবস্থা করিয়াছে, কি পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সম্মুখে কি সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া কত দিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া পদচারণ করিয়াছি।"

আরও দুই বৎসর পরে ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে বলিতেছেন—

"বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর, যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্ব্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্ম্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্য্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্ত্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।"

তেরো বৎসর পরে বিশ্বভারতী স্থাপিত হইল। বঙ্গভারতীর এই নিভৃত আশ্রমটিকে বিশ্বভারতীর পূজামণ্ডপ করিয়া গড়িয়া তুলিলেন রবীন্দ্রনাথ; অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া নিখিল বিশ্বকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইংলণ্ড আমেরিকা চীন জাপান নরওয়ে ডেনমার্ক আরব পারস্য ইতালি রুশিয়াকে মিলাইবার প্রয়াস করিলেন কবি এই ভারত-তীর্থে পরস্পর শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের মধ্য দিয়া। ভারতবর্ষের প্রদেশান্তর হইতে দলে দলে শিক্ষার্থী আসিল—নৃত্যে নাট্যে সঙ্গীতে শিল্পকলায় নবমিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল পুরাতন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। বুদ্ধের আদর্শে নারীরাও সমান অধিকার লাভ করিলেন। ব্রহ্মচারীর শান্ত তপোবন সঙ্গীতমুখর বিচিত্রের লীলাঘর হইয়া উঠিল। কবি তাঁহার জীবনের দীর্ঘ সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ একবার তাঁহার কল্পনার শান্তিনিকেতন এবং কর্ম্মের বিশ্বভারতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং নূতন ভাবে নিজেকে ও

তাঁহার আশ্রমটিকে যাচাই করিলেন। গোড়ায় ছিল ধর্ম প্রধান, মধ্যে হইয়াছিল দেশ প্রধান, এবার তিনি দেখিলেন মানুষই প্রধান। বলিলেন (পৌষ ১৩৩৮)—

"মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"

এই মনোভাব কবির ভিতরে ভিতরে কাজ করিতেছিল বলিয়াই শান্তিনিকেতনের পাশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শ্রীনিকেতন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাকালের বিপুল পটভূমিকায় অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অন্তরতম প্রদেশের গূঢ়তম আদর্শ প্রকাশ করিলেন—

"জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই।...শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত, তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত।...বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।...যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে,

সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।...এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।...

"এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যে যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণ-সম্মেলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয় এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল, আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে-ক্লাস করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভ-রূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হলে আইনকানুন-সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হ'ত।...এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"

এই ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল রবীন্দ্রনাথ, এবং এই রবীন্দ্রনাথের ধুলো-মাটি ঘাসের আশ্রমকে "আইনকানুন-সিলেবাসের" বাঁধন দিয়া সঞ্জীবিত রাখিতে পারিবেন কি না সহৃদয় ভারতসরকার তাহা বিবেচনা করিবেন। বি. এম. সেন-রথীন্দ্রনাথের আগ্রহে মাটি অনেকখানিই ইট হইয়া আসিয়াছে, দিল্লীর সংস্পর্শে পাথর না হইয়া যায়, কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া তাহা দেখিবেন। এই আশ্রমের

বনস্পতি-ওষধি আশ্রম-সন্নিহিত গ্রাম এবং মাটির মানুষ কবির বিহনে যাহাতে রসহীন প্রাণহীন এবং আশ্রয়হীন হইয়া না পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রাখিলেই কবির আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে এবং আমরাও ভবিষ্যতের শুভসূচনা জ্ঞানে এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানাইতে পারিব।

সোমনাথ

সোমনাথের ইতিহাস সচিত্রভাবে সম্প্রতি অনেকগুলি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্তসার এইরূপ দাঁড়ায়—মূল কাহিনী পৌরাণিক। দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ কন্যা অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী প্রভৃতির এক স্বামী চন্দ্র বা সোম শ্রীমতী রোহিণীর প্রতি একটু অধিক আসক্তি প্রকাশ করিয়া অন্য দক্ষকন্যাদের কোপে পতিত হন। তাঁহারা পিতার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হন। শাপমুক্তির পন্থাও দক্ষ নির্দেশ করিয়া দেন—মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গবিগ্রহের নিয়মিত পূজা। ইহাতে চন্দ্রের এক পক্ষের ক্ষয়, অন্য পক্ষে পূরণ হইবার কথা। সৌরাষ্ট্রের সমুদ্র-বিধৌত উপকূলে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সোম মহাদেবের পূজা করিতেন, সুতরাং সেই বিগ্রহ সোমনাথ নামে খ্যাত হন। ঐতিহাসিক কালে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। একাদশ শতকের মধ্যে মন্দির কালধর্মে বিনষ্ট হইয়া আরও দুইবার পুনর্নির্মিত হয়। ইহার ঐশ্বর্যের খ্যাতি বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সোমনাথ ধ্বংসের অভিযানে আসিয়া কৃতকার্য হইয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যান। তাহার পরের ইতিহাস—বার বার মন্দিরের পুনঃসংস্কার ও নূতন আক্রমণকারীর হাতে লাঞ্ছনা ও ধ্বংস; ১২৯৭, ১৩৭৫, ১৪১৩ এবং ১৪৫৯ সালের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। ইহার পরও মন্দির পুনঃস্থাপিত হয় এবং শেষে মোগল-সম্রাট ঔরংজেবের হাতে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্ন ও লাঞ্ছিত হইয়া সেই অবস্থায় সেদিন পর্যন্ত পড়িয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের উপপ্রধান মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় সোমনাথ

পুনরুজ্জীবিত হইলেন,—গত ১১ মে বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে মহাসমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, ইহা কিসের উৎসব? প্রিভি-কাউন্সিলের আপীলে মামলা জিতিয়া বিষয়ী ব্যক্তি ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া ঘটা করিয়া প্রতিপক্ষকে আরও লাঞ্ছিত করিবার জন্য আপন সৌভাগ্যের জানান দেয়। এই উৎসব নিশ্চয়ই তাহা নয়। হিন্দুমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুধর্ম জয়যুক্ত হইল বলিয়া এই উৎসব? বাহুবলে সোমনাথের উদ্ধার সাধিত হইলে নিশ্চয়ই উৎসব করা চলিত। দানে সব বস্তুই পাওয়া যায়, সম্মান ফিরিয়া পাওয়া যায় না। নিষ্প্রাণ মন্দির ভাঙিলেই গড়া যায়, বিগ্রহ সংগ্রহও গুরুতর পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার নয়, কিন্তু সোমনাথ তাহার দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস লইয়া আর বিগ্রহমাত্র নয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের হিন্দু-ধর্মের পতন-অভ্যুদয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—অভ্যুদয় নামমাত্র, পতনই সবটা, অর্থাৎ সোমনাথ আমাদের পরাজয়েরই নিদর্শনস্তম্ভ। এই পরাজয়ের সমাপ্তি আজও ঘটে নাই, এখনও প্রত্যহ পূর্বে পশ্চিমে সমানে চলিতেছে। এই অবস্থায় ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের কি প্রয়োজন ছিল? সংবাদপত্রে দেখিতেছি, করাচীতে সুলতান মামুদের বংশধরেরা আবার তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের কর্তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যখন গঠন করিয়াছেন, তখন এই বিস্মৃত ক্ষতটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

তথাপি এই উপলক্ষে ভারতবর্ষে যখন একটা সাড়া পড়িয়াছে, নূতন করিয়া আমাদের পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্র-ইতিহাসের পর্যালোচনা দ্বারা এই উৎসাহের সদ্ব্যবহার করিলে আমাদের কল্যাণই হইবে। হিন্দুর বার বার পরাজয় ঘটিল কেন; ঐশ্বর্য, সংখ্যাধিক্য, শৌর্য, বীর্য, বাহুবল সত্ত্বেও প্রতিবেশী আক্রমণকারীদের হাতে পাঞ্জাব, গুর্জর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনার স্ব স্ব কোটে নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ঘটিল কেন; তাহার সঠিক কারণ নির্ণীত হইলে এখনও আমাদের উপকার হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ভারত-তীর্থে" গৌরবের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।"

পূর্বে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যাহা ঘটিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বতন্ত্রভাবে শক হুন পাঠান মোগল ইংরেজ নাম লইয়া ভারতের মানচিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ধরিয়া জাগিয়া থাকার নাম লীন হওয়া নহে। কি করিয়া লীন করিয়া দিতে পারা যায়, ভারত-রাষ্ট্রের তাহাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান চিন্তা হওয়া আবশ্যক। এই সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কেরা চিন্তা করুন, ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সঠিক কারণের সন্ধান করুন, এবং তাহা আবিষ্কৃত হইলে সকলে মিলিয়া প্রতিকার চেষ্টা করি, ভবিষ্যতে সোমনাথের লাঞ্ছনার দ্বারা ভারতবর্ষের নূতন করিয়া লাঞ্ছনা যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করি, তবেই সোমনাথযজ্ঞ যথাযথ উদযাপিত হইবে। সোমনাথের ইতিহাস বারংবার অপমান ও লাঞ্ছনার দ্বারা কলঙ্কিত বলিয়াই আমাদের মনে এই সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ঐ পথে খণ্ডিত না হইলেই সোমনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আত্মা চিরশান্তি লাভ করিবে।

কুচবিহার

ইংরেজ শাসনে অত্যুৎসাহী পুলিসের হাতে সাধারণ মানুষের অমানুষিক লাঞ্ছনার ইতিহাস সংখ্যায় এবং পরিমাণে বিপুল। এই উৎসাহের পিছনে পুরস্কার ও প্রমোশনের প্রলোভন ছিল অর্থাৎ শাসনকর্তাদের সক্রিয় সমর্থন ছিল, স্বভাবত পিশাচমনা কোনও কোনও কর্মচারীর ব্যক্তিগত শয়তানিও বহু ক্ষেত্রে এই উপদ্রব ও অত্যাচারের পশ্চাতে ছিল। হাত-বদলের সময় উপরওয়ালাদের বদল হইলেও নীচেওয়ালা মানুষ ও তাহাদের পুরাতন পদ্ধতি আজিও বজায় আছে, এবং বহু ক্ষেত্রে উপরের সঙ্গে নীচের নন-কো-অপারেশনে অত্যাচারের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। কুচবিহার-হত্যাকাণ্ড তাহারই জের। দেশব্যাপী "ধিক্কার" শুনিতেছি, অনুসন্ধান ও প্রতিবিধান সমিতির ঘটা পড়িয়া

গিয়াছে ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-মুসলিমলীগ আমলের কৃতী কর্মচারীদের সম্পূর্ণ ছুটি মঞ্জুর না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ চলিতেই থাকিবে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে এই সকল কৃতী পুরুষের মুখের জবানই শুধু বদ্‌ হয় নাই, মনের গঠনও সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া একজিকিউটিভ মহিমায় সেকালে যে সকল ভদ্রসন্তান প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ অহিংস পরিস্রুতির ফলে স্থূলতা পরিহারের চেষ্টা করিলেও অভ্যাসজাত স্বভাব মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উহাদের সঙ্কল্পকে সংহার করিয়া বসে, ফলে তাঁহারাও কেহ কেহ পুলিসী হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়েন। নূতন শাসনকে কলঙ্কমুক্ত করিতে হইলে ইঁহাদেরও সংস্কার প্রয়োজন। মোটের উপর কুচবিহারে যদি সেই পুরাতন নবাবী শাসনের পরিসমাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে নূতন কংগ্রেসী শাসনও বিপন্ন হইবে। কুচবিহারের ঘটনা দেশবাসীকে সচকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা যদি দেশের শাসনকর্তাদের সংযত ও আত্মস্থ করিতে পারে তবেই এতগুলি নিরীহ প্রাণীহত্যা ভবিষ্যৎকল্যাণপ্রসূ হইতে পারিবে।

"অশ্লীল সাহিত্যের বেসাতি"

কিছু দিন হইতে দৈনিক সংবাদপত্রে তথাকথিত "যৌন সাহিত্য"বিষয়ক পুস্তক ও পুস্তিকার বিরুদ্ধে পুলিসী ও অন্যান্য অভিযান সম্পর্কে সংবাদ বাহির হইতেছে। সংবাদ শুভ সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ব্ল্যাকমার্কেট, সাম্প্রদায়িক কলহ এবং এক দিকে অভাব অনটন ও অন্য দিকে অবাঞ্ছিত বিত্তস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষের মনের গতি অধোগামী হইয়াছে এবং তাহারা বিবিধ যৌনবিকৃতির কল্পিত কাহিনীর মধ্যে সাময়িক পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছে। মালের চাহিদা আছে বলিয়াই বাজারে তাহা সরবরাহ হইতেছে। বরাবরই হইত, অধুনা বিকারের পরিমাণ বাড়িয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যে কেনাবেচা চলিতেছে। উপসর্গের প্রকাশ ব্যাপকতর হইয়াছে ; আসল ব্যাধি কিন্তু অনেক দিন আগেই সমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়াছে। উপসর্গ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির মূল অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং তাহা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজগত-ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে ও বাঙালী সমাজে কতকগুলি মহৎ আদর্শ ছিল এবং কয়েকটি মহৎ চরিত্র সর্বত্র সম্মানিত ও পূজিত হইত। যে কারণেই হউক, উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া আদর্শচ্যুতি ঘটাইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ অশ্বিনীকুমার দত্ত অপসারিত হইয়াছেন, কিন্তু নূতন কেহ আসিয়া তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। বাহিরের বিপর্যয় আসিয়া বারংবার আমাদের ঘরেও বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহা দূর করিবার ও সংহত করিবার মত শক্তি আমাদের ঘরে জাগ্রত হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ রাজনীতিতে কাজ করিয়াছে, কিন্তু সমাজে কার্যকরী হয় নাই। সুতরাং একটা ভারতীয় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এখানেও সোমনাথ।

আর এক কথা, যেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সেগুলির কোনটাই সাহিত্য নহে; ফরাসীচিত্র পোস্টকার্ড যেমন ছবি নয়,—যৌন পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকাগুলি তেমনই সাহিত্য নয়। যাহা সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছে তাহার বিষয়বস্তু শ্লীল হউক অশ্লীল হউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, তাহা বরেণ্য এবং গ্রাহ্য। শেক্সপীয়রকে বাউড্‌লারাইজ করার মত দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়।

নিবেদন

এই বৈশাখ মাস হইতে 'শনিবারের চিঠি'র চাঁদার হারের পরিবর্তনে যাঁহারা পূর্ব হইতে চাঁদা দিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু নূতন হারের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন এই যে, যাঁহারা পূর্বে চাঁদা দিয়াছেন তাঁহারা দয়া করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাড়তি চাঁদা দিলে আমরা খুশি হইব, কাহারও কাছে কোনও দাবি জানাইব না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

সংবাদ-সাহিত্য

সেকাল

এই মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড হাতে পাইলাম। প্রথম খণ্ডের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছিলাম। পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দৈনিক 'নায়ক' এবং সাপ্তাহিক 'প্রবাহিণী' পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি অপরূপ প্রবন্ধের সমষ্টি। আর একটু হইলে এগুলি কালসমুদ্রে একেবারে হারাইয়া যাইত, দৈনিক-সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠা হইতে পুনরুদ্ধার ইহার পরে অত্যন্ত কঠিন হইত। অথচ দেখিতেছি, বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাঙালীর তন্ত্র সম্বন্ধে মহা মূল্যবান কথা প্রবন্ধগুলিতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। তবু যাক, এগুলি আরও কিছু কালের জন্য স্থায়ী হইয়া রহিল।

হঠাৎ "সেকাল আর একাল" প্রবন্ধটি নজরে পড়িল ; পড়িলাম—

"হায় রে সেকাল! যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না ; যাহা আছে, তাহা আর থাকিবে না! নূতনের জগঝম্প ইউরোপে বাজিয়া উঠিয়াছে, নবীনতার প্রতিষ্ঠা ইউরোপে হইলেই, উহার অনুকল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবেই। অতএব সেই সেকাল, যে কালের গল্প, যে কালের উপকথা পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া শুনিতাম,—শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—সেই সেকালের কথাটা জীবনের এই তৃতীয় আহ্নিকে আর একবার আবৃত্তি করিলে হয় না? কি জানি, অতীতের এত মোহ কিসের জন্য? যত দিন যায়, যতই জীবনটা কোন ভূতকালের বিষয়ীভূত হইতে থাকে, ততই কেন সাগ্রহে কেবল অতীতের দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করে? এ কি ছাই একা আমার রোগ! বুড়া হইলেই ঐ রোগে সকলকে যেন পাইয়া বসে! যেদিন ভবিষ্যতে নিবদ্ধ স্থিরদৃষ্টি নৈরাশ্যের আঘাতে ব্যাহত হইয়া অতীতের উপর যাইয়া পিছলাইয়া পড়িল,—সেদিন ভাবী আশার কল্পনা দুই চোখ ভরা অশ্রুর আড়ালে তাহার সোহাগের সপ্তবর্ণ লুকাইল, সেই দিন বুঝিলাম বুড়া হইয়াছি ; সেই দিন হইতে কেবল অতীতের

জল্পনা কল্পনা করিতে লাগে ভাল ; সেই দিন হইতে অহরহঃ কেবল লুপ্ত স্মৃতিরই মন্থন করিতেছি, কেবল অতীত ইতিহাসেরই রোমন্থন করিতেছি। গো-ব্রাহ্মণকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে কেন? উভয়েই রোমন্থনপ্রিয়। গো, ভোজ্য রোমন্থন করে, ব্রাহ্মণ, চিন্তা রোমন্থন করে। একবার সেকালের রোমন্থনটা করি, তোমরা দেখ, পার ত বুঝিতে চেষ্টা কর।"

বৃদ্ধ পাঁচকড়ির চিন্তা-রোমন্থন দেখিবার মত। এ রোমন্থন ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া, জাতিকে কেন্দ্র করিয়া, দেশকে কেন্দ্র করিয়া, সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া এবং মানুষকে কেন্দ্র করিয়া। ইহাতে রূপোল্লাস আছে, ভক্তি-তত্ত্ব আছে ; পঞ্চকন্যা আছে, পঞ্চ 'ম'কার আছে ; সাহিত্য-সম্মিলন আছে, নন-কো-অপারেশন আছে ; শিব ও শক্তি আছে, শ্যাম ও শ্যামাপোকা আছে ; জয় রাধে কৃষ্ণও আছে, আবার মুস্কিল আসানও আছে ; স্মৃতি-পূজায় বঙ্কিম ভূদেব কেশব রঙ্গলাল ইন্দ্রনাথ শিশিরকুমার রামেন্দ্রসুন্দর আছে ; চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কাহিনী এই রচনাবলীর মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে,—অত্যন্ত দরদের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে লেখাগুলি লেখা। শুধু অতীতের জন্য হা-হুতাশই নাই, ভবিষ্যতের সাধ-আশাও আছে।

* * *

আরও তিন ব্রাহ্মণের চিন্তা-রোমন্থন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। একজন সত্য সত্যই বুড়া হইয়াছেন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর দুইজন—তারাশঙ্কর ও বনফুল বুড়া হইতে চলিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন সোজাসুজি 'স্মৃতিকথা' (ডি. এম. লাইব্রেরি)—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ডকালের কথা—বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের পটভূমিকায় চিত্তরঞ্জন দাশ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। কথা এখনও শেষ হয় নাই। চলিতেছে। ইহাতে কাহিনীর ঢঙে সরস করিয়া অতীত ইতিহাসকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে, জীবন-দর্শন বড় একটা নাই। লেখক স্বয়ং ইহাকে সোপ-বাবুল বা সাবান-ফোস্কা বলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে এগুলি

ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হইলেও রঙে ও সুষমায় মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

*　　*　　*

তারাশঙ্কর লিখিয়াছেন 'আমার কালের কথা' (বেঙ্গল পাবলিশার্স) —চিন্তা-রোমন্থন-দর্শনে ভরপুর এই কথা। ব্যক্তিগত এবং বিস্মৃত অতীতকে, সেকালের খণ্ডকালকে তারাশঙ্কর সম্ভ্রম ও দরদের দ্বারা ভাবী দূরকাল পর্যন্ত সঞ্জীবিত করিয়া রাখিলেন এই পুস্তকে—কথাশিল্পী এবং ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে বুঝিবার পক্ষে ইহা চাবিকাঠির কাজ করিবে। অতীত এবং বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রতি যে আকর্ষণ-সামঞ্জস্য তারাশঙ্করের প্রায় সকল রচনার বৈশিষ্ট্য, এখানে তাহার মূলের সন্ধান মিলিতেছে; বইখানি শুধু স্মৃতি-কথা নয়, জীবন-দর্শনও। একটু উদ্ধৃতি দিতেছি। এই খণ্ডকালের বর্ণনার পরিসমাপ্তিতে তারাশঙ্কর বলিতেছেন—

"আমার কাল, সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।

"আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সেকালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলীরেখা, গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সেকালের ছবি। তাই সে-কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।...

"আমার কালের অপরার্ধ নূতন কাল যেন আমার মা। জ্যোতির্ময়ী —প্রসন্ন। তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হ'য়ো না, ক্লান্ত হ'য়ো না, পথ চল।...

"অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিতচক্ষু হিমশীতলদেহ আমার বাবা, আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্তদৃষ্টি শুভ্রবাস-পরিহিতা তেজস্বিনী মা, আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে

আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ ক'রেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে দিন আমার মাল্য রচনা সমাপ্ত হবে। বলব, নাও আমার মালা। শেষ ক'রে দিলাম মালা গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে। তোমার জয় হোক—জয় হোক—জয় হোক!"

আমরাও বলি, জয় হউক!

* * *

বনফুলের জীবনের মূলমন্ত্র হইতেছে—ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে, নিজের অথবা পরিবারের অথবা খণ্ডদেশে বা খণ্ডকালে জীবলীলায় মত্ত মানুষের ইতিহাসে সন্তুষ্ট নন, তাই তাঁহার স্মৃতিকথা অস্পষ্ট অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে কেন্দ্র করিয়া 'স্থাবরে' (বেঙ্গল পাবলিশার্স) রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। গতিশীল চিরচঞ্চলকে স্থাবর নাম দিয়া বনফুল ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ব্যাকুলভাবে পাগলের মত ছুটাছুটি করিলে কি হইবে—তুমি সেই তুমিই আছ। তুমি অর্থাৎ আমি—সেই যে অন্ধকার হিমশীতল অতীতে রুদ্র প্রকৃতির লীলাসহচর ছিলাম, কত জন্মবিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপ হইতে রূপে স্খলিত হইয়া এই সভ্যতার পত্তন করিয়াছি, এখনও আমার যাত্রা শেষ হয় নাই। আত্মীয়ের এবং অনাত্মীয় পশুর কাঁচা মাংস হইতে আমার আহার শস্যে এবং পশুদুগ্ধে আসিয়া পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ হিংসা হইতে অহিংসায় আমার বিবর্তন হইয়াছে—কেমন করিয়া হইয়াছে তাহার কাহিনী শোন। গুহামানব কেমন করিয়া প্রেমিক হইল তাহাও শোন। বনফুল যুগে যুগে পুস্তকে-বিধৃত মানুষের বিচিত্র চিন্তাধারা হইতে সযত্নে ও প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁহার গল্পকে খণ্ডিত করিতে পারে নাই। শিল্পী বরাবরই জয়যুক্ত

হইয়াছেন। এত বড় একটানা কাহিনী পড়িতে কষ্ট হয় না। তাঁহারও কাহিনী শেষ হয় নাই। প্রথম খণ্ডের শেষটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

"মাঝে মাঝে জোলমা, শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়ে, স্বপ্নের মত মনে পড়ে। মনে হয় আমার অন্তরতম সত্তা যেন জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিনানির হাত ধরিয়া জোলমা-শিলাঙ্গীকেই অনুসন্ধান করিতেছে, আর সেই অনুসন্ধানের ফলেই বুঝি মানব-সভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করিয়া আছি, সে বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে, যে দিন নিনানির সহিত জোলমা-শিলাঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে না, নিনানিই যে দিন বিবর্তিত হইয়া জোলমা-শিলাঙ্গীতে পরিণত হইবে, কল্পলোকের স্বপ্নসঙ্গিনী যে দিন মর্তলোকের মানবীরূপে দেখা দিবে। কিন্তু সে যুগ এখনও আসে নাই। সেই অনাগত যুগের উদ্দেশ্যেই আমার যাত্রা। আমার যাত্রার যতটুকু ছবি কালের পটভূমিকায় স্থাবর হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সামান্য একটু অংশ বীভৎসতায়, নগ্নতায়, নিষ্ঠুরতায়, ছন্দে, গানে, শিল্পে তোমাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে ইতিহাস অতিশয় সীমাবদ্ধ ইতিহাস। আমার যাত্রাপথ অনন্ত অসীম। আমি চলিয়াছি চলিতেছি এবং চলিব—ইহাই সত্য। আমি মরি নাই, আমি মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল 'অপরাজিতা' বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গমদিরা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও তাহাকেই চাহিতেছি। দূর দিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা ভাসিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষকোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।"

বলা বাহুল্য, জোলমা শিলাঙ্গী নিনানি প্রভৃতি এই 'আমি'-নায়কের বিভিন্ন জন্মের নায়িকা; পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া

এবং প্রয়োজনমত পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিবার প্রয়াসের কাহিনী এই 'স্থাবর'; এই কারণে 'আমি'কে কোনও এক জন্মে নারী করিয়া সৃষ্টি করাতে একটু রসাভাস হইয়াছে। যে ছন্দে লেখা হইয়াছে তাহাতে 'আমি' নারী হইতে পারে না। সে চিরন্তন পুরুষ, চিরন্তন নারীর সহিত সমান্তরাল ধারায় চলিয়াছে অনন্ত যাত্রায়।

মোটের উপর, সেকালকে অবলম্বন করিয়া চারিজন বিভিন্ন সাহিত্যিক একালকে যাহা উপহার দিয়াছেন, তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

মুশকিল আসান

মুশকিল আসানকে আমরা সকলেই খুঁজিতেছি। মুশকিলের উপর মুশকিল, বিপদের উপর বিপদ আসিয়া আমাদিগকে তিলে তিলে বিপর্যস্ত করিতেছে। আমাদের ঘরে বাহিরে, ছাত্রে শিক্ষকে, খেলোয়াড়ে দর্শকে, রাষ্ট্রে ও প্রজায় পদে পদে বিরোধ বাধিতেছে; অনশন-ধর্মঘট, আটক-ধর্মঘট, পথবন্ধকারী কর্ণপটহবিদারী শোভাযাত্রা লাগিয়াই আছে। হাসানে বা কাঁদুনে গ্যাসের বোমায় আর শানাইতেছে না। গোলা গুলি—রক্তারক্তি, কে শত্রু কে মিত্র বুঝা যাইতেছে না। যাঁহারা উস্‌কানি দিয়া লোক ক্ষেপাইতেছেন, তাঁহারাই দেখিতেছি কাউন্‌সিলে অ্যাসেম্‌ব্লিতে যাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতেছেন তাঁহাদের সহিত গলাগলি হইয়া হাসি মস্করা করিতেছেন। কে বিমলা কে কতলু খাঁ বুঝিবার জো নাই। তাই কাতরভাবে আর্তকণ্ঠে মুশকিল আসানকে ডাকিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে এতখানি হুজ্জৎ হয় নাই, দল ভাঙিতে গিয়া মাথা-ভাঙাভাঙির এত ঘটা ছিল না, হৃদয়-ভাঙাভাঙি হইয়া সরিয়া দাঁড়াইবার রেওয়াজ ছিল। লোকে নিজের জন্য ভগবানকে ডাকিত—আধ্যাত্মিক ডাক; সকলের দোহাই দিয়া একলা গলাবাজি করিত না। ঋষিরা 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া হাঁক দিতেন বটে কিন্তু সে চোখ বুজিয়া, ছন্দ বজায় রাখিয়া—রুশিয়ার গরমে তেলেঙ্গানায় রক্তপাত ঘটিত না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মুশকিল আসানকে ডাকিয়াছিলেন এই ভাবে—

"আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,

এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার প্রভো, চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?"

আজ আমাদের প্রত্যেকের কথাই তাই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ জওহরলাল রাজাগোপালাচার্য এই কথাই বলিতেছেন, আচার্য কৃপালনি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শ্যামাপ্রসাদেরও ওই এক কথা, জয়প্রকাশ রামমনোহর, অজয় ঘোষ পি. সি. যোশীও ওই কথাই বলিতেছেন—কে রক্ষা করিবে?

তাই মুশকিল আসানকে ডাকিতেছি, তিনি সকলের পক্ষে এক এবং অদ্বিতীয় নন,—কাহারও পক্ষে কালী, কাহারও পক্ষে বিষ্ণু, কাহারও আমেরিকা, কাহারও রুশিয়া, কাহারও মহাত্মা গান্ধী, কাহারও ট্রুমান, কাহারও স্তালিন, কাহারও মাও-সে-তুং।

যাঁহাদের মুশকিলের কথা বলিলাম তাঁহারা অসাধারণ; কিন্তু আমরা যাহারা সাধারণ, যাহারা জনতা, যাহারা পনের আনা, যাহাদিগকে সারিবদ্ধ দাঁড়াইয়া চাউল কিনিতে হয়, কাপড়ের জন্য হত্যা দিয়া পরিধানের ধুতি জুতা দুইই ছাড়িতে বা ছিঁড়িতে হয়, তাহাদের কথা পাঁচকড়ির জবানীতে সকলকে একবার শুনাই, শুনাইয়া বুকে বল বাঁধি—

"অন্ধকার—অন্ধকার—সূচীভেদ্য তমিস্রা, যেন চাপ চাপ অন্ধকার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে,—একপদ অগ্রসর হইতে হইলে যেন অন্ধকার ঠেলিয়া যাইতে হয়। এমন অন্ধকারে আলো দেখাইবার কেহ তো নাই, এই অজ্ঞান-তমিস্রা ভেদ করিয়া যাইবার পক্ষে জ্ঞানালোকের সুব্যবস্থা গবর্মেণ্ট তো করেন নাই। তাই কাতরকণ্ঠে পুরাতনের আহ্বান করিতেছি,—মুস্কিল আসানের ফকীরকে তারস্বরে ডাকিতেছি। যে অন্ধকারে উত্তুঙ্গবিন্যস্ত দামিনীদীপ্তি সুবিধাজনক নহে, যে তমিস্রার ভিতরে গ্যাসালোক স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় দেখায়, আলোক বিকিরণ করে না, সেই অন্ধকারে ফকীরের প্রদীপ ছাড়া আর কে আমাদের মুস্কিল আসান করিবে। ধর্ম্ম, কর্ম, সমাজ, শিষ্টাচার, সবই

নষ্টপ্রায়, কেহ কোন বিঘ্ন মানিতেছে না ;—সবাই যেন পুরাতন সামাজিক প্রাচীর ভাঙ্গিতে উদ্যত, গড়িবার দিকে, বজায় রাখিবার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই—সবাই ধ্বংসবাদের মদিরায় প্রমত্ত। এমন সময়ে, এমন অন্ধকারে ভারতবাসীর অগণ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অলিতে গলিতে ভারতবর্ষের নানা জাতি নানা বর্ণের সহজ বিন্যস্ত জনপদসকলে, মানবতার এমন গোলকধাঁধায় আলোক দেখাইয়া লইয়া যাইবার, নিরাপদে অগণ্য বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবার আর ত কেহ নাই, আছে সনাতন কালের ফকীর মুস্কিল আসান।"

আসন্ন নির্বাচন সম্মুখে। এখন অনেকে অনেক কথা শুনাইতেছে, নব নব "সুভাষিতাবলী" রচিত হইতেছে, যে আশার কথা কখনও শুনি নাই তাহাই শুনিতেছি, ইহার পর যাহাকে কখনও চোখে দেখি নাই তাহাকে ঘরের পাপোশে বসিতে দেখিব, ছবি দেখিব, ইস্তাহার দেখিব। থার্ড ক্লাসে পাখা, রেশনের চাল বৃদ্ধি সবই হইবে, কিন্তু আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করিতে হইলে যে গোড়া ধরিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহা আর কেহ করিবে না। সবাই ম্যাজিক দেখাইয়া কেল্লা ফতে করিবার সাধনায় মাতিয়াছে। মরিবার বেলা আমরা মরিতেছি। আজ আমরা সেই মুশকিল আসানের সাক্ষাৎ চাহিতেছি, যিনি তাক লাগাইবেন না, প্রাণ বাঁচাইবেন। এরোপ্লেনে চড়িয়া নিমিষে হাজার যোজন অতিক্রম করিয়া আজ দিল্লী কাল সিমলা পরশু বাঙ্গালোর তার পরের দিন বোম্বাই এবং মাঝখানে ঢাকায় গিয়া কর্তাদের দেড় ঘণ্টার মুখনাড়া দিয়া দেড় কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে আমাদের কিছু হইবে না। শুধু কমিটী কনফারেন্স কমিশনের কবচে আমাদের সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল ; কিন্তু আমাদের যে প্রাণশক্তি দেশের মাটিতে এবং দেশের মানুষের বুকে লুকাইয়া আছে তাহাকে কেহই উজ্জীবিত করিল না। আমরা সেই মুশকিল আসানকে খুঁজিতেছি, যিনি মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বিনোবা ভাবের মত আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের বিপদের ভাগ লইয়া আমাদিগকে বিপন্মুক্ত করিবেন, ড্রইংরুমে বসিয়া ভাল ভাল গালভরা কথা বলিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ভান করিবেন না।

কুড়ি সাত

মহর্ষির সহিত বোলপুর যাইতেছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ, সেই তাঁহার প্রথম রেল-ভ্রমণ। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ট্রেনে চাপার গুরুত্ব মামাকে এমনই সমঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বুড়া বয়স পর্যন্ত ট্রেন আরোহণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। অথচ বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রথম রেলভ্রমণ নিরাপদই হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন জেণ্টু কোড, সুপ্রীম কোর্ট, ফৌজদারী আইন, পিনাল কোড, বেনি গারদ, কালাপানি, ফাঁসি, পুলিপালাং, হাইকোর্ট, অর্ডিন্যান্স এবং অন্তরীণ ইত্যাদির ধাপ্পায় ইংরেজ ভাগনেরাও আমাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল যে, রাজ্যশাসন একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার নয়। ইহার উপর ইদানীংকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিরাট ধাপ্পাটাও যুক্ত হইয়াছিল। তাই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে আমরা বিষম ভয়ে ভয়ে ছিলাম—এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটিল! কিন্তু পুরা চার বৎসর হইতে চলিল দুর্ঘটনা দূরের কথা, আমাদের বেলেখেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; রাজার মুণ্ড ছাঁটিয়া অশোকস্তম্ভ বসাইয়াছি, ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে চক্রশোভিত তেরঙা ঝাণ্ডা উড়াইতেছি, 'গড সেভ দি কিং'-এর বদলে 'জনগণমন' বাজাইতেছি ও সারা ভারতবর্ষময় এবং মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের বাহিরেও আকাশপথে এমন দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছি যে, বেচারা আল্‌নাস্কার কাচের বাসনের ঝুড়িতে পা রাখিয়া দিবাস্বপ্নের ঘোরেও ততখানি দাপাদাপি করিতে পারে নাই। ঠিক মনে হইতেছে, থান ইটের উইকেটে গলি আটকাইয়া ন্যাকড়ার বল এবং ভাঙা ব্যাট লইয়া যাহারা ক্রিকেট খেলিতেছিল হঠাৎ মন্ত্রবলে কে যেন তাহাদিগকে সসমারোহে ওভাল-ক্রিকেট-গ্রাউণ্ডে নামাইয়া দিয়াছে এবং তাহারা ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা ও কমনওয়েল্‌থ টীমকে টেস্ট ম্যাচে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িতেছে। যাহারা তালপাতার খাঁড়া লইয়াও কোনদিন সেপাই-সেপাই খেলে নাই, তাহারাই সি-ইন-সি জি-ও-সি বনিয়া লড়াই ফতে করিয়া চলিয়াছে। ঠাকুরমার ঝুলির কাঠের বেরাল আসল ইঁদুর ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে—এ এক তাজ্জব ব্যাপার!

আমাদের রাজ্যশাসনের মধ্যে সাধনালব্ধ অধিকার যতটুকুই থাক্, বাহির হইতে বা উপরে উপরে ব্যাপারটা দেখাইতেছে ঠিক ওইরূপ। ফলে আর এক দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং দাবি করিতেছে তাহারাও এই খেলা খেলিবে, দাবা-বড়ে খেলায় এখানে রাজা এখানে মন্ত্রী, এখানে মেনন ওখানে গান্ধী, সেখানে বিজয়লক্ষ্মী এবং সেইখানে রাধাকৃষ্ণণকে বসাইয়া মন্ত্রী সাজিয়া সোজাসুজি লম্বালম্বি কোণাকুণি এক আড়াই ও ততোধিক চাল চালিয়া বাজিমাৎ করিবে। দেখাই তো গেল, এমন আর কঠিন কি! দু কুড়ি সাতের খেলা তাহারাও খেলিতে পারিবে। পাটনা-বোম্বাইয়ে ইহা লইয়াই জটলা শুরু হইয়াছে। আমরা যখন যেমন খুশি এপক্ষে ওপক্ষে দোহারকি করিতেছি।

কিন্তু যাঁহাদের একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, যাঁহারা বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে একটু তলাইয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা জানেন সামান্য দু কড়ি সাতের খেলা করা অত সহজ নয়। কত ধানে কত চাল হয়—এই খাদ্য-পরিস্থিতি সামলাইতে গিয়াই তাহা ধরা পড়িতেছে, কাশ্মীরী হাঙ্গামা তো ইস্তক-বিস্তি সামলানোর মত ব্যাপার, তাহার কথা ধরিতেছিই না। আসলে জওহরলালও আদরে-নষ্ট খোকা, কৃপালনিও তাই; বাদ বাকি সকলেই মতলববাজ। সুতরাং যে খোকা শুধু ঠোঁটই উল্টাইয়া থাকে না, সময়মত রেশনটা আনিয়া দেয়, ডাকাতটা তাড়ায়, তাহাকে সরাইয়া অন্য খোকাকে বরণ করিবার যুক্তি কোথায়?

উল্টা চাপ

আমাদের মধ্যে যাহারা গৃহস্থ, অর্থাৎ অর্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী লইয়া সংসার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জানেন যে, জীবনের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে একটা বেফাঁস কিছু করিয়া ফেলিলেই পারিবারিক সংঘর্ষ নিবারণের একমাত্র পন্থা হইতেছে—শঙ্কিত পাপচিত্ত সত্ত্বেও মুখ গোমড়া করিয়া উল্টা চাপ দেওয়া। এ পরীক্ষা জীবনে অল্পবিস্তর সকলকেই করিতে হইয়াছে এবং প্রয়োগাধিক্যে দুষ্ট না হইলে এই পদ্ধতি অভীষ্টসিদ্ধও করিয়াছে। ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় দেখিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ "শিক্ষাক্ষেত্রে

বাঙ্গলায় তরুণদের শোচনীয় দৈন্য" প্রমাণ করিতে এই সনাতন পারিবারিক কৌশল অবলম্বন করিয়া "অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণে"র দোহাই দিয়া উল্টা চাপ দিয়াছেন। শোচনীয় দৈন্য যে তাঁহাদের নিজেদের শিক্ষাপদ্ধতির এবং বহু ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞানের—এই সত্যটাকে ঢাকা দিবার জন্য তাঁহারা খুব সরস বর্ণনা দিয়া ছেলেদের বেইজ্জৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য বিভাগের কথা জানি না, বিচার করিবার অধিকারীও আমরা নহি; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যে কয়জন পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের "একান্ত ছাত্রদের জন্য লিখিত" পুস্তকগুলিতে তথ্যের ও সত্যের এত মারাত্মক ভুল যে, সেই তুলনায় ছাত্ররা যদি বিসমার্ককে চার্লি চ্যাপলিনের মা বলিত তাহাতেও দোষ হইত না। ছেলেরা না হয় মৌখিক পরীক্ষায় যা-তা জবাব দিয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে; কিন্তু এই সব তথাকথিত অধ্যাপক বই ছাপাইয়া এবং স্বস্ব দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া সেগুলিকে ছাত্রপাঠ্যের গৌরব দিয়া যে দেশের ভবিষ্যৎ, তরুণদের সর্বনাশ করিতেছেন, তাঁহাদের বিচার কে করিবে! এই বিভাগের শীর্ষস্থানে যিনি বসিয়া আছেন—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক মাত্রেরই সম্বন্ধে দীর্ঘ বাহান্নগজী ফতোয়া দেওয়া তাঁহার বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তিনি পদাধিকারে আজকাল সাহিত্যতত্ত্ব রসতত্ত্ব অলঙ্কার প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিষয়ক পুস্তকের ভূমিকাবিশারদ হইয়াছেন; বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার হিমালয়পরিমাণ অজ্ঞতার বিচার কি বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন? তাঁহার 'উপন্যাসের ধারা'র দ্বিতীয় সংস্করণেও তিনি 'কঙ্কাবতী' 'ডমরুচরিত' লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেন নাই, বনফুল বলিয়া যে একজন লেখক আছেন তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। এই অপরাধে যে-কোনও সাহিত্য-অধ্যাপকের বরখাস্ত হইবার কথা। বৈদেশিক ব্যাপারেও তাঁহার বিদ্যা কম নয়, তিনি মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডকে যৌনতাত্ত্বিক ফ্রড বলিয়া জাহির করিতেছেন। আর একজন বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত ডক্টর সুকুমার সেন বার বার দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখাকে

রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বলিয়া চালাইয়া গবেষণার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেছেন। এই সকল অপরাধের ক্ষমা নাই। ইঁহাদের আদর্শে ছাত্রদের যদি ভুল হয়, তাহা হইলে দোষী করিব কাহাকে? লজ্জা পাওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের। উল্টা চাপ দিয়া তাঁহারা মিথ্যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছেন।

পুস্তক-পরিচয়

গীতাভাষ্যের জের এখনও থামে নাই, প্রতিবাদ-প্রবন্ধ তো আসিতেছেই, ইতিমধ্যে অনেকগুলি সম্পূর্ণ ও নির্বাচিত গীতার সংস্করণও হাতে পৌঁছিয়াছে। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'গীতামৃত' (ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৩৲), শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের সহজ গদ্যে 'ভাষা গীতা' (মহাজাতি প্রকাশক, ১।৹), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজের সটীক মূল 'গীতায় স্বরাজ' (আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৩৲), ভূতনাথ সরকারের নির্বাচিত 'একান্ত পথ' "গীতা উৎসমুখে প্রবহমান যৌবন ধর্ম" (মহেশ লাইব্রেরি, ১।৹), কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্বাচিত 'রথী ও সারথী' কবিতায় সহজ মর্মানুবাদ (নিরীক্ষা প্রকাশনী, বহরমপুর, ৸৹) এবং শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পদ্যানুবাদ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ২৲)। প্রত্যেকটিই পড়িবার মত ও রাখিবার মত।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ে'র ইংরেজী 'Four Chapters' এবং 'সভ্যতার সঙ্কটে'র ইংরেজী 'Crisis in Civilization' (যথাক্রমে ৩।৹, ১৲) অতি চমৎকার সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত প্রমথনাথ বিশীর 'বাংলার লেখক' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিস্তৃততর আলোচনা পরে করিব। বিভিন্ন প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট গল্প সংগ্রহগুলিও পরে আলোচনা করিব। পরিমল গোস্বামীর 'আধুনিক আলোক চিত্রণ' ও ধারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের 'ভাগ্যলিপি'র পরিচয় আগামী বারে দিব।

টুক্‌রি

টুকরা কথা, হালকা ব্যথা
উড়্‌কি ধানের মুড়কি রে।
গম্বুজ প্রাসাদ, নাই তো সে সাধ
জমাই না চুন সুরকি রে।
স্রোতের গতি থাকলে পর
বুদ্‌বুদও হয় অনশ্বর ;
নির্ঝর এবং সাত সাগর
পরস্পরে দূর কি রে॥

*　　*　　*

পাঁজির পাতা উল্‌টিয়ে আজ
হিসাব করি পূর্ণিমার—
জানলা রাখি বন্ধ, কারণ
বাইরে যে শীত দুর্নিবার।
বুলিয়ে তাহার রূপার কাঠি
চাঁদ চ'লে যায় হাঁটি হাঁটি,
ঝলমলিয়ে হেসে আবার
ঘুমিয়ে পড়ে নীলপাথার।
খাঁচায়-পোরা কোকিল ডাকে
শুনি কেবল কান্না তার॥

*　　*　　*

ন্যাংটা ছিলি তাই ছিল না
বাটপাড়েরও ভয়,
কপ্‌নি প'রে ভাবনা যত
ভাসছে মনোময়।
সে নেংটিরও আকাল হ'ল,
রে বিবাগী, তল্‌পি তোল,
টান মেরে ওই ট্যানা ফেলে
হ রে নি-সংশয়॥

অবহেলার ভেলায় এলাম
পঞ্চাশেরই পার—
হিসেবী কয়, 'ভেলা ছাড়ো
জাহাজ কর সার।
ভেসে থাকাই লক্ষ্য নহে
পণ্য আনো সমারোহে,
একটু যত্ন নিলেই ওহে
মিলবে ভারে ভার।'
বেহিসেবী মন বলে মোর,
'জাহাজ দূরে রাখ্—
জাহাজও তো ডুবতে পারে,
ডুবছে লাখে লাখ।
ডুবছে বিষম পণ্যভারে
মালের চাপে মানুষ মারে,
সার ক'রে এই ভেলাটারে,
আপনি ভেসে থাক্॥'

* * *

অনেকে এসে জটলা করে,
কোলাহলের মাঝে
নিজেরে খুঁজে পাই না বুঝে
মরিয়া যাই লাজে।
সকলে যবে চলিয়া যায়
ব্যথিত মন খুঁজিয়া পায়—
যে সুরখানি শূন্যতায়
অনাহতই বাজে॥

* * *

গাঁথিতে পারি না আমি মালা
চারিধারে জমিতেছে ফুল,

তুমি কাছে আস নাই বালা,
স্নান ক'রে বাঁধ নাই চুল—
একা রই বসিয়া নিরালা
ভুলের উপরে ঘটে ভুল ॥

* * *

নিশীথ শান্তির মাঝে আপনার পূর্ণ পরিচয়
যে জন নিয়েছে জেনে, সেই সত্য জেনেছে নিজেরে ;
দিবসের কোলাহলে নিতে হয় মিথ্যার আশ্রয়,
অহমিকা অভিমান সত্যে ঢাকে সংশয়ের ঘেরে ।

মনের বিচারালয়ে হাকিমেরা ঝিমায় যখন
রজনীর অন্ধকারে, সত্য করে আত্মসমর্পণ ॥

* * *

আধো আধো ভাষা বলিতে শিখেছি
বেদনায় দানা বাঁধে নি আজো,
মনে মনে তাই গুমরিয়া মরে
ইঙ্গিতময় বোবার ভাষা ।
দুঃখ-বাসুকী মথিলে তবে
হৃদয়সিন্ধু উথলি উঠে,
উঠে অমৃত আঘাতে আঘাতে
কাকলী কাব্য হয় তখন ।
যে পাহাড় কভু ভাঙে নি আবেগে
রস-নির্ঝর বহে না সেথা ॥

* * *

একটি কথা বলতে চাই, বলার নেই কথা তো,
ব'লে গেছেন ঋষিরা সব, সব জিজ্ঞাসা অথাতো ॥

* * *

সাজিয়ে বসেছে আপনাকে
বেঁধে ব'সে আছে মনের তার,
বাজাবে যে জন কোথায় সে,
নাই যে আঘাত, না ঝঙ্কার ।

যমুনার তীর ব্যথার ভারে
থমথম করি ডাকিছে যারে,
তাহারে খুঁজিয়া অবশ মন
অবশ যে তনু প্রাণ-রাধার,
সলিলে ডুবায়ে ফুটা কলস
চক্ষে দেখিছে অন্ধকার ॥

* * *

ফুলের গন্ধে চিত্ত স্বপ্নাতুর,
জ্যোৎস্না-যামিনী কামিনী স্মরণে আনে,
নিকটে এখনো আসিতেছে বহু দূর,
তূণীরে ভরিতে পারি নি পঞ্চবাণে।
বেদান্ত গীতা নিষ্ঠায় করি পাঠ
তবু তো পারি না রাখিতে বজায় ঠাট ;
কেন যে সরস হতেছে শুষ্ক কাঠ
পঞ্চাশোর্ধ্বে, কে বলিবে তার মানে !
এখনো সুমুখে টলমল সুরা এলে
সতৃষ্ণ চোখে তাকাই তাহার পানে।

এখনো কোথাও দেখিলে শিথিল কিছু
তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কলমে ফুঁসিয়া উঠে,
অঙ্গুষ্ঠ যে নড়িছে ভানের পিছু,
হুলটিও চায় মধুর পিছনে ফুটে।
বেদীতে চাপিয়া বসেছি অনেক বুঝে
মিটমিট করে, তবু থাকি চোখ বুজে
বৃদ্ধা যেন রে কুরূপ ঢাকিছে কুব্জে—
প্রকাশ খুঁজিয়া 'আমি' মরে মাথা কুটে ;
বালি-বন্ধন অনেক হয়েছে দেওয়া
তবু দামোদর কুলকুল করি ছুটে ॥

* * *

চির-পুরাতনের দেশে আয় রে তরুণ দল।
ওরে চপল, ওরে নবীন, এগিয়ে তোরা চল্‌॥

জাতির জীবন-স্রোতোধারায় ঢেউ তোরা উচ্ছল,
তীরের বাঁধন-ছেঁড়া সাধন আয় ক'রে সম্বল।
আমরা শীতের শীর্ণধারা
মরুর পথে আত্মহারা,
হারিয়ে যাব ফল্গুপারা
কোন্‌ পাতালের তল!
বরষা সাথে আন্‌ ভরসা, আকাশ-ভাঙা জল,
প্রবল বন্যাধারায় হেথা নাম্‌ রে হয়ে ঢল্‌॥

চির-পুরাতনের দেশে আয় রে তরুণ দল।
ওরে চপল, ওরে নবীন, এগিয়ে তোরা চল্‌॥

আসছে মুদে ধীরে মোদের জীবন-শতদল,
অরুণ-উষার পরশ পেয়ে জাগ্‌ তোরা চঞ্চল।
নবীন কমল ওঠ্‌ রে ফুটে
সুরভি তোর চলুক ছুটে,
বিশ্ব পড়ুক পায়ে লুটে
জাগুক কোলাহল!
ক্লান্ত বাতাস অধীর হয়ে বহুক পরিমল;
গন্ধভারে বন্ধ কারার খুলুক অর্গল॥

চির-পুরাতনের দেশে আয় রে তরুণ দল।
ওরে চপল, ওরে নবীন, এগিয়ে তোরা চল্‌॥

মুমূর্ষু ক্ষীণ অবশ দেহে আয় রে নববল,
ঘুচুক জরা, যাক অশুচি, হই মোরা নির্মল।
ঝিমিয়ে আছে সকল দেশ এ
শীর্ণ দেহে জীর্ণ বেশে,

শিব সেজেছে শ্মশান-বেশে
কণ্ঠে হলাহল
সব জড়তা সব ভীরুতা কর তোরা নিষ্ফল,
নতুন স্নেহে মলিন শিখা কর্ রে সমুজ্জ্বল ॥

চির-পুরাতনের দেশে আয় রে তরুণ দল।
ওরে চপল, ওরে নবীন এগিয়ে তোরা চল্ ॥

ভাত-রুটি

ক্ষুধার্ত হয়ে আসনে ব'সে আছি, বউ ('গিন্নী' পদবীলাভের তার এখনও বয়েস হয় নি) ভাতের থালা এনে সামনে ধ'রে দিলে; গরম ভাত থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে; ভাতগুলি থালাময় ছড়ানো নয়, সেগুলিকে একত্রে ক'রে মন্দিরচূড়ার আকার দেওয়া হয়েছে। ভাতগুলি ধবধবে সাদা নয়; সাদা ভাত খাবার সৌভাগ্যসূর্য আমার ভাগ্যাকাশ থেকে অস্তমিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে, ভারতের স্বাধীনতাসূর্য যেমন পলাশীপ্রাঙ্গণে অস্তমিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। ১৯৪৭ সালে অবশ্য সেই সূর্যের পুনরুদয় হয়েছে, কিন্তু সাদা ভাত খাবার সৌভাগ্যসূর্য আমার জীবনে আর হয়তো কোনদিন উঠবে না। ভাতগুলি লালচে তো বটেই, কতকগুলি আবার একেবারে লাল; তার ওপর মন্দিরচূড়াটি রীতিমত ধান্যখচিত। চূড়াটির অন্তর যে উপলময়, তাও আমার কাছে অজানা নয়; তাই ভাত খেতে বসলেই মনে হয়, আমি—নিউটন, বুভুক্ষা-সমুদ্রের তটে প্রতিদিন উপলখণ্ড সংগ্রহ ক'রে চলেছি, তৃপ্তি বহু দূর।

ক্ষিধের সময় ভাতের থালা সামনে নিয়ে ব'সে আছি, তখনও চূড়া-চূর্ণ করি নি; ব্যাপারটা বউয়ের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকল; সে ধ'রে নিলে এটা আমার ভাত-রাগ, যা বাঙালী পুরুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু এ রাগের কারণ সে কিছুই খুঁজে পেলে না; তাই সভয়ে প্রশ্ন করলে, কি হ'ল, ব'সে রইলে কেন? গম্ভীরভাবে আমি বললুম, ভাবছি। প্রশ্ন হ'ল, কি ভাবছ গা? জবাব দিলুম, অন্নচিন্তা। বউ বললে, বাড়া-ভাত সামনে রেখে অন্নচিন্তা? হাঁড়িতে

যখন চাল থাকে না, তখনই লোক অন্নচিন্তা করে। তোমার কি সবই উলটো? আমি বললুম, ভুল করলে; সাজিয়ে গুজিয়ে সামনে রেখে তবেই না লোকে ঠাকুরের ধ্যান-চিন্তা করে; খড়-মাটি-জড়ানো কাঠামোর সামনে ব'সে কেউ দেবতার ধ্যান করে না। তাই অন্নচিন্তা করতে হয় রান্নাভাত সামনে রেখে, চালের হাঁড়ি দেখে নয়। বউ একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, অনেক বেলা হয়েছে, খেয়ে নাও; তোমার হ'লে তবে তো আমি খাব। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে শুয়ে অন্নচিন্তা ক'রো। আমি বললুম, তুমি আবার ভুল করলে; বিসর্জনের পর ঠাকুর ফিরে যান কাদামাখা কাঠামোতে, তখন তিনি ধ্যান ধারণার বাইরে; খাওয়ার পরে অন্নচিন্তাটিও তেমনই অসম্ভব ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে বউ সগড়িহাতেই সামনে ব'সে বললে, নাও, তুমি ব'সে ব'সে অন্নচিন্তা কর, আর আমি ব'সে ব'সে অনশন ধর্মঘট করি।

আমি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা, বলতে পার, এই ভাত এল কোথা থেকে? বউ বললে, কেন, রেশনের দোকান থেকে তুমি চাল এনেছিলে, সেই চাল সেদ্ধ ক'রে আমি এই ভাত রেঁধেছি। আমি এবার প্রশ্ন করলুম, রেশনের দোকানেই বা চাল এল কোথেকে? উত্তর এল, আড়তদারের কাছ থেকে; আড়তদার পেলে চাষীর কাছ থেকে; চাষী পেল মাটির কাছ থেকে। বল, আর কিছু প্রশ্ন আছে তোমার? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মাটি কোথা থেকে পেলে বল দেখি? বউ একটু নিরুত্তর থেকে বললে, তোমার পাগলামি রাখ; ভাত খাবে তো খাও, না হ'লে আমি ভাতের থালা তুলে নিয়ে যাই। মাথায় পাগলামি নিয়ে ভাত খাওয়া আর হ'ল না, অন্নচিন্তাটাই আমার কাছে চমৎকার লাগল।

বীজধান মাটিতে পড়ল, জন্ম হ'ল ধানগাছের; ক্রমে সেই গাছে ধানের শিষ ধরল; যথাসময়ে ধান পাকল আর গাছ শুকিয়ে গেল। শুকনো গাছগুলিকে কেটে আঁটি বেঁধে চাষী ঘরে নিয়ে এল, আছড়ে ঝেড়ে ধানগুলিকে খড় থেকে ঝরিয়ে নেওয়া হ'ল; সেই ধান থেকে হ'ল চাল, চাল সেদ্ধ ক'রে হ'ল ভাত। এই পর্যন্ত বেশ সোজা ব্যাপার, কোথাও কোনও জটিলতা নেই।

বীজধানটির জন্মকথা নিয়েই হ'ল যত গণ্ডগোল, কেননা এটা মানুষের সৃষ্টি নয়। বিশ্ব-স্রষ্টা যে কত রকমের গাছ-গাছড়া-আগাছা-পরগাছার সৃষ্টি করেছেন, তার সংখ্যা নেই; কেউ বিরাট মহীরুহ, কেউ পদদলিত তৃণ; কেউ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কেউ বুকে হাঁটে; কেউ ছ মাসে ম'রে যায়, কেউ ছ শো বছরেও অক্ষয়; কোন গাছের ফল পশুপক্ষীর (মানুষেরও) ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, কোন ফল করে ফলাহারীর প্রাণসংহার। কারুর আদর ফুলের জন্যে, কারুর ফলের জন্যে। অসংখ্য রকমের আগাছার মধ্যে ধানগাছও একটি আগাছা, এবং গমের গাছ ধানগাছেরই সগোত্র।

কত কাল আগে মানুষ যখন পেটের জ্বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন নাগালের মধ্যে পাওয়া পাকা ফলগুলোকে আগেই সাবাড় করেছিল; তাতে তার পেট ভরে নি; আর কি খাবে—এই হ'ল তার ভাবনা। আগুনলাগা পেট নিয়ে সে বনে-বাদাড়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর খালি ভাবে, কি খাই? সেই থেকে শুরু হ'ল তার 'খাই-খাই' দশা। ক্ষিধের জ্বালায় সে মিষ্টি টক তেতো ঝাল পাকা কাঁচা—কত রকমের ফলই খেতে লাগল, বিষফলও কত খেলে, আর ক্ষিধের জ্বালা থেকে চিরমুক্তি পেয়ে গেল। ফল ফুরোতে কচি কচি লতা-পাতা খাওয়াও তাকে ধরতে হ'ল। এইভাবে যখন দিকে দিকে চলছিল মানুষের আহার-অন্বেষণ, তখন কি এক মহাক্ষণে মানুষের চোখে পড়ল শুকনো ধানের শিষ; এই আবিষ্কারটি তার অলিখিত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা; মানুষের লিখিত ইতিহাসে রাজা-রাজড়ার জন্ম মৃত্যু বাহাদুরির কথা অনেক লেখা আছে, কিন্তু ধান আবিষ্কারের কথা তাতে লেখা নেই; তাই মনে হয় এই আবিষ্কারটি একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। যাই হোক, ধান আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর মোড় ফিরে গেল।

হাতের নখ দিয়ে পাকা ধানটি ছাড়িয়ে মানুষ পেলে ছোট্ট একটি পাথর-কুঁচির মত জিনিস; বিস্মিত হয়ে সে সেটিকে মুখে ফেলে দিলে, চিবিয়ে দেখলে খেতে মন্দ নয়। একটি একটি ক'রে

ধানের খোলা ছাড়িয়ে খেতে খেতে নখ টাটিয়ে উঠল, পেট ভরল না। সেদিন তার পুজো-আহ্নিক ছিল না, ছিল না আপিস-ইস্কুলের বালাই; তাই সে সপরিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিশ্চিন্তমনে ব'সে ব'সে ধান ছাড়াল আর খেতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে তার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটলেও সে শ্রম-সংক্ষেপক প্রণালীর কথাই চিন্তা করতে লাগল। অনেক মস্তিষ্ক চালনা ক'রে একদিন সে আবিষ্কার করলে ঢেঁকি—ইহলোকে-পরলোকে ধান ভানাই যার একমাত্র কাজ। ধান থেকে চাল এবং চাল থেকে ভাত—ব্যাপারটা আজ যত সোজা মনে হোক না কেন, ধানকে ভাতে আনতে মানুষকে যে কত পরীক্ষা-গবেষণা চালাতে হয়েছে, কত দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে, তার কাহিনী কেউই লিখে রেখে যায় নি। গমকে নিয়েও তার মুশকিল বড় কম হয় নি; গম থেকে আটা তৈরির জন্যে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে জাঁতা, তারপরে অনেক খেটেখুটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে রুটি পেয়েছে।

ধান ও গমের আবিষ্কার ক'রে মানুষ দেখলে, এই দুটি মাত্র খাবার আছে, যা আকারে ছোট হ'লেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় ক'রেও রাখা যায়; আর ধান গম যদি থাকে, তা হ'লে "কাল কি খাব?"—এই দুর্ভাবনাও চ'লে যায়। তাই সে লেগে গেল ধান-গমের পরিমাণ বাড়াতে; বুনো-শিকারী-ভবঘুরে মানুষ 'চাষী' হয়ে উঠল, মাটির সঙ্গে হ'ল তার আত্মীয়তা। সব চেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হওয়াতে তার মনে বেশ স্ফূর্তি এল; সে তার সৃজনী-প্রতিভাকে দিকে দিকে চালিত করলে, দিকে দিকে উড়ল তার বিজয়-পতাকা। শেষ হ'ল তার আরণ্যক-অসভ্যতা, বন্ধ হ'ল পেটের জ্বালায় দিনরাত ছোটাছুটি, সে বসবার অবকাশ পেলে। ভরা-পেটে সে যখন বসতে পেলে, পৃথিবীটাকে সে তখন নতুন চোখে দেখতে লাগল; চন্দ্রসূর্য-গ্রহনক্ষত্র-আকাশবাতাস সব কিছুর মধ্যেই সে যেন নতুন মানে খুঁজে পেলে; সে ভাবুক হয়ে উঠল। এইখান থেকে তার নতুন সভ্যতার সূচনা হ'ল।

ধান আর গম খেতে খেতে মানুষ ক্রমে দু দলে ভাগ হয়ে গেল,

একদল অন্নভোজী আর একদল রুটিজীবী। অন্নের সঙ্গে আত্মীয়তা হ'ল মাছের আর রুটির সঙ্গে মাংসের। সেই আত্মীয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে, আজও আমরা বলি 'মাছ-ভাত' আর 'গোস-রুটি'। ভাতরুটির ছাড়াছাড়ি মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, দেবতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল; এক দেবতা ভোগ পেলেন অন্নের, আর এক দেবতা রুটির; এক দেবতা দেখালেন ভাতের ছড়াছড়ি, অন্য দেবতা দেখালেন রুটির ম্যাজিক। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলেই অন্নজীবী; একমাত্র দেখা যায় সত্যনারায়ণের ভোগ অন্নের না হয়ে আটায় হয়; এতেই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুধর্মে ইনি নবাগত; আসলে ইনি সত্যপীর অর্থাৎ রুটিজীবীদেরই ঠাকুর। ভাত ও রুটির প্রভাব মানুষের চরিত্রের মধ্যে গিয়ে বাড়ে; ভাত খেতে খেতে কতকগুলি লোক হয়ে ওঠে শান্তশিষ্ট 'ভেতো', আর রুটি খেতে খেতে কতকগুলি লোক হয়ে ওঠে অশান্ত-অশিষ্ট 'কাটখোট্টা'; ভাতের মাদকতায় এক দল লোক মিইয়ে পড়ে, রুটির রুক্ষতায় অন্য দল চাঙ্গা হয়ে ওঠে; অন্নভোজী হয় ভাবালু আর রুটিজীবী হয় চিন্তালু।

ভাত-রুটি আমাদের জীবনে যে কত বড় জিনিস, তা কাউকে ব'লে বোঝাতে হবে না। ছেলে দুষ্টুমি করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় ভাত বন্ধ ক'রে; একটা জাত যদি বজ্জাতি করে, তা হ'লে জাতটাকে সায়েস্তা করা হয় ভাতে মেরে; ১৩৫০ সাল তার প্রমাণ। আমাদের রক্ষকরা আজকাল যখন বেতারযোগে কিংবা সংবাদপত্রমারফৎ চালের বরাদ্দ কমিয়ে দেবার সুসমাচার দেন, তখন আমাদের সকলের মনেই খুব পুলক লাগে। শহর থেকে দূরে গ্রামগুলিতে যখন চালের দাম ৩০৲ টাকার ওপর যায়, তখন গরিব-মধ্যবিত্তরা নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। ভাতের প্রাধান্য যে কতখানি তা দেখা যায় যখন আমরা কাউকে বলি—অমুক নিষ্কর্মাটি ব'সে ব'সে আমার ভাত মারছে। এই কথা শুনলেই নিষ্কর্মা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে মনে মনে যতীন দাস হবার স্বল্পমেয়াদী সঙ্কল্প ক'রে বসে। ভাতের খোঁটা যে কত হিন্দু বিধবার পোঁটা বার করেছে, কত নিরাশ্রয়াকে য 'নাকের জলে চোখের জলে' করেছে, তার ইয়ত্তা

ই। আপিসের বড়বাবুরা শালা-সুমুন্দির মুখ চেয়ে কত ভদ্রসন্তানের
যে অন্ন খেয়েছে, খাচ্ছে এবং খাবে, তার হিসেব চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও
পাওয়া যাবে না। কাউকে অভিসম্পাৎ করার সময় আমরা বলি—
র ভাত-জল উঠুক; আবার কাউকে আশীর্বাদ করার সময়ও
—তুমি দুধে-ভাতে থাক। লাখ কথার পর লাখ দুয়েক মন্ত্র
শালগ্রামশিলা সামনে রেখে যখন আমরা ভদ্রলোকের মেয়েদের
কবি, তখন আমরা তাদের ভাত-কাপড়েরই ভার নিয়ে থাকি।
এমন জিনিস, যা ছ মাস বয়েস থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত খেয়েও
আমাদের অরুচি হয় না; যদি কখনও কারুর ভাতে অরুচি হয়,
হ'লে সেটাকে আমরা রোগের লক্ষণ ব'লেই ধ'রে নিই।
অন্নভোজীর কাছে অন্নের যে প্রাধান্য, রুটিজীবীর কাছে রুটিরও
প্রাধান্য।

বিশ্বস্রষ্টা যেদিন ধান ও গমের গাছ বসিয়েছিলেন, তিনি কি একটুও
ছিলেন, কি বিষবৃক্ষের বীজ তিনি বপন করছেন? সারা জগৎ
বিষবৃক্ষে ছেয়ে গেছে, দিকে দিকে দেশে দেশে ফলছে তার
য় ফল। বিষের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের জীবন-সমাজ দূষিত,
কাড়ি-মারামারি-কাটাকাটির অন্ত নেই। ধান বা গম যার
ছে, সে আরও চায়; অপরকে বঞ্চিত ক'রেও সে তার পেট ও
ভার ভরাতে চায়। যার নেই, সে প্রথমে ভিক্ষে করে, তারপর
করে, শেষকালে করে চুরি। যার আছে, সে ক্যাপিটালিস্ট;
নেই, সে কমিউনিস্ট; একজন সাপ, আর একজন নেউল;
নেই দুজনের যম। ধান-গম নিয়ে জগৎময় আজ যে 'খেয়ো-খেয়ি'
যাচ্ছে, এর সূত্রপাত হয়েছিল কোন্ পুরাকালে, যখন মানুষ ছিল
ক্ষিত বর্বর; যদিও শিক্ষায় সভ্যতায় তার উন্নতি আজ আকাশচুম্বী,
ও ভাতরুটির ঝগড়া মেটে নি, বরং ঝগড়ার ভয়াবহতা আর
ংসতা অনেক বেড়েছে। বিশ্বস্রষ্টা যদি এই দুটি বিষবৃক্ষ রোপণ
করতেন, তা হ'লে আমাদের এই মাটির পৃথিবী সত্যিই কি
স্বর্গ হ'ত না?

শ্রীপ্রবোধকুমার চৌধুরী

বিক্রি

বড় রাস্তা পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে মিলবে হৃদয় মিত্র লেন। তার পরেও আবার গোটা দুয়েক বাঁক ঘুরে এই বাই-লেনটা।

গলিটার মোড়ে একটা গ্যাসপোস্ট রয়েছে বটে, তবে আলো জ্বালাবার জন্য কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ বছর দুয়েকের ওপর পোস্টটাতে আলো জ্বলে নি। ভেতরে আরও দুটো পোস্ট আছে, তাদের অবস্থাও বিন্দুমাত্র উন্নতস্তরের নয়। বরং একটা আরও বিশেষত্ব দেখিয়েছে, কি ক'রে যেন এক দিকে বেশ খানিকটা কাত হয়ে পড়ে।

তা হোকগে। এ গলির বাসিন্দা যারা, তাদের কারও জীবনই ঠিক আলো ঝলমল নয়। বরং বেশি আলো দিয়ে রাস্তাটা সাজালেই বোধ হয় বেমানান দেখাত। কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষও যেন কেমন ক'রে সেটা বুঝতে পেরেছেন—তাই এই ব্যয়সঙ্কোচের যুগে, কোন কিছু মেরামত ক'রে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য ঘটানো ভাল মনে করেন নি; তা আলোর পোস্টই হোক আর রাস্তার ড্রেনই হোক।

ফলে বছরের সব কয়টা মাসই গলিতে আর ড্রেনে একটা গলাগলি সাম্যভাব। কাদা-প্যাচপেচে অবস্থা এখানে আবহাওয়ার উন্নততর মানের কথাই সূচিত করে। বর্ষাকালে জলে থৈ-থৈ অবস্থাও লোকের গা-সহা হয়ে গেছে। অবশ্য চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে পায়ে যে সব অপ্রীতিকর বস্তু লেগে যায়, সেগুলির সম্বন্ধেই যথেষ্ট সহনশীল, কেন জানি না, এখনও লোকেরা হয়ে উঠতে পারে নি। সলিলদের মত নবাগতদের তো কথাই নেই, দীর্ঘদিনের কায়েমী বাসিন্দারাও এ রকম কোন কিছু মাড়িয়ে ফেললে ভারতীয় সহিষ্ণুতার মূর্তিমান উদাহরণ থেকে নিজেদের বিচ্যুত ক'রে কর্তৃপক্ষকে গাল পাড়তে ব'সে যায়।

বেশ একটু হাল্কা মেজাজে এ ধরনেরই কিছু ভাবতে ভাবতে জুতোটা হাতে ক'রে বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল সলিল। যতক্ষণ বাইরে থাকে, ঠিক বাড়ির কোন কিছুই যেন মনে থাকে না; এমন কি বাচ্চাটার জ্বরের কথাও না। এখন বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই সেই শীর্ণ রোগকাতর মুখটি মনে প'ড়ে গেল। বেচারী! কত দীর্ঘদিন

ধরে ভুগছে! অথচ না জুটল ভাল ওষুধ, না উপযুক্ত পথ্য কিংবা ঠিকমত চিকিৎসা।

স্বামীকে ঢুকতে দেখেই বাসন্তী কাছে এগিয়ে এল। বললে, প্রণব-ঠাকুরপো এসেছিল, এই এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে এইমাত্র চ'লে গেল।

প্রণব এসেছিল?—আশ্বস্ত হতে ভয় করে ঠিকই, তবু নিঃসন্দেহ হ'য়ে খবরটা জেনে নেবার জন্যই খোলাখুলি প্রশ্ন করেছিল সলিল, ওরা কি রাজী হয়েছে?

না। রাজী তারা হয় নি। লেখকের খুশিমত বই প্রডিউস্ করলে দর্শকরা শুনবে কেন? তারা তো গাঁটের পয়সা খরচ ক'রেই ফুর্তি কিনতে আসবে। তবে একেবারে অশুভ সংবাদ ব'য়ে এতদূর আসে নি প্রণব। ব'লে গিয়েছে যে, মিঃ মণ্ডল জানিয়েছেন, বইটি তাঁদের বেশ পছন্দই হয়েছে। সলিল যদি তাঁদের শর্তমত কাটছাঁট করতে রাজী থাকে, তবে প্রথমে যে টাকা তাঁরা দিতে চেয়েছিলেন তার ওপরে আরও পাঁচ শো বেশি দিতেও রাজী আছেন।

অর্থাৎ মোটমাট প্রায় হাজার দেড়েকের মত গিয়ে পড়ছে, লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। এই দেড় হাজার টাকা পাওয়া মানে, হৃদয় মিত্র বাই-লেনের নরক থেকে কোন ভদ্রতর পল্লীতে আস্তানা জোটানো যায়। রেহাই পাওয়া যায়, রোজ রাত্রে লিখতে বসার সময়টাতে প্রতিবেশী গৃহগুলি থেকে কদর্য ভাষায় আলাপ কলহ ও বিলাপ শোনার হাত থেকে।

সলিলদের বাড়িটা একেবারে গলির শেষ প্রান্তে। তারপরেই একটা মাঠ। আর মাঠের পরে একটা ডোবা। ডোবাটি হচ্ছে একপাল শুয়োর আর মোষের জলকেলির ক্লাব। আর মাঠটি রাস্তার ড্রেনে কাজ সারবার মত বয়সও যাদের পেরিয়ে গেছে, তাদেরই প্রয়োজনে লেগে যায়। সুতরাং উত্তর দিকের জানালাটা খোলবার উপায় নেই। হাওয়া জিনিসটা ভারি উপকারী, খুবই আরামদায়ক। কিন্তু তা যদি আবার বিশেষ ধরনের গন্ধবহ হয়, তবে আর যাই হোক, ঠিক স্বাগত করতে ইচ্ছে করে না পবনদেবকে।

বন্ধ জানলাটার দিকে তাকিয়ে গরমে ঘামতে ঘামতে তাই দেড় হাজার টাকা প্রাপ্তির ফলে নতুন বাড়িতে উঠে যাবার কথাই সব-প্রথমে মনে প'ড়ে গেল সলিলের। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, বাচ্চাটার জন্য টাকার অভাবে যে ক্লোরোমাইসেটিন কেনা যায় নি, সে ওষুধটাও কেনা যাবে। স্বাস্থ্যের দ্যুতি হয়তো কিছুটা দেখা দিতে পারে বেলু-খোকনদের হাড়-জিরজিরে দেহেও।

স্বামীকে নীরব থাকতে দেখে বাসন্তীও বোধ হয় একটু আশান্বিত হয়ে উঠেছিল, বহুদিন পরে প্রায় গা ঘেঁষেই এসে দাঁড়াল সে, বললে, হ্যাঁগো, কাল যাচ্ছ তো সেই সিনেমা-কোম্পানিতে ?

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বাসন্তীর দিকে তাকাল সলিল। চিকিৎসা শুধু ছেলেমেয়েদেরই নয়, তাদের মায়েরও দরকার। আজকের বাসন্তীর কঙ্কাল দেখে সেদিনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যৌবনের দীপ্ত প্রতীককে তো প্রায় স্বপ্ন ব'লেই মনে হয়। মিঃ মণ্ডলের শর্ত মেনে নিলে আবার হয়তো এ দেহেই নবজীবনের জোয়ার দেখা যেতে পারে। যৌবন ছাড়াতে বাসন্তীর তো এখনও বেশ বাকি !

কিন্তু তবু।

এবার প্রকাশ্যেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে সলিল, বললে, তা যাব একবার কাল। দেখি, বুঝিয়ে-সুজিয়ে মত বদলানো যায় কি না মণ্ডল সাহেবের !

যেন কেউ মুখের ওপর শঙ্করমাছের চাবুক হাঁকড়ে দিয়েছে, ঠিক সে রকম ভাবেই ছিটকে স'রে এল বাসন্তী, বললে, সে কি ? তুমি তবে ওদের কথায় রাজী নও, পাঁচ শো টাকা বাড়িয়ে দিলেও না ?

ম্লান একটু হাসল সলিল, বললে, সাহিত্যকে তো ঠিক মেছো-বাজারের পণ্য ব'লে ভাবতে শিখি নি।

কি আর করা যায় ? দুর্ভাগ্য! বাসন্তীরই কপাল খারাপ। এদিকে আধপেটা খেয়ে দিন চলছে। কালরোগে মরতে বসেছে ছেলে। আলোর অভাবে, হাওয়ার অভাবে অন্যগুলির স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে চলেছে। তবু জেদ, তবু সাহিত্য ধুয়ে জল খাওয়া।

ইচ্ছে হচ্ছিল, ডাক ছেড়ে কাঁদে কিংবা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে নীচুশ্রেণীর প্রতিবেশিনীদের মত। কিন্তু কিছুতেই যে কিছু না। তাও ভাল ক'রে জানা আছে বাসন্তীর। পাথরের গায়ে কি আর সহজে পড়ে? মাঝখান থেকে তারই গলা চিরে যাবে ক'রে।

সম্পূর্ণ নীরবেই তাই করণীয় সব কাজ ক'রে চলল বাসন্তী। রান্না ক'রে ছেলেমেয়েগুলিকে খাওয়াল। স্বামীকেও যথাসময়ে ভাত দিল। তারপর সবার খাওয়ার শেষে বাসনপত্রগুলি মেজে রেখে না খেয়েই বসল গিয়ে রোগীর পাশে।

নাটকীয় কিছু করবার ইচ্ছে তার নেই। আস্তে আস্তে যদি এভাবেই হয়ে আসা যায়, তবে তাই ভাল। যদি তখন শিক্ষা হয় এই পর অন্ধ মানুষটির।

পরদিন দুপুরে সলিল ঠিক সময় মতই গিয়েছিল নিউ আর্ট সন্সের অফিসে। খুবই যত্ন আদর করলেন মিঃ মণ্ডল। প্রণববাবুর যে অফার দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ করবার জন্য পীড়াপীড়িও লেন খানিকক্ষণ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গল্পটির মূল বক্তব্যও বজায় অথচ তাঁরা যা চান সে রকমও কিছু কিছু জিনিস ঢোকানো এ রকম একটা নরমতম রফা প্রস্তাবেও তাকে টলানো গেল না।

খুব ক্ষুণ্ণ মনে ঘর থেকে বের হয়ে এল সলিল। হাতে টাকা পয়সা নেই বললেই চলে। দু-একটা পত্রিকা-অফিসে পাওনা কিছু বটে, কিন্তু ইংরেজী মাস না পড়লে কিছু দেওয়া তাদের পক্ষে হবে না। অথচ তার তো এখনও দশ দিন বাকি।

ভারাক্রান্ত মনে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে চলছিল সলিল। , কেমন যেন বদলে গেছে সব কিছু। এই কয়েক বছর আগেও কার্জন পার্ক ছাওয়া ছিল ফুলে ফুলে। আজ এখানে সেখানে বিগত দিনের দু-একটি নিঃসঙ্গ সাক্ষী ছাড়া কোথায় সে সব চোখ-জুড়নো বিদেশিনীদের বিচিত্রবর্ণের সমারোহ?

হঠাৎ চোখ পড়ল পার্কের একেবারে প্রান্তে, রাস্তার ঠিক পাশ বেশ একটা ভীড় জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত

এ সব ভীড়ে মাথা গলাতে সে যায় না। হয়তো কোন বাজিকর খেল দেখাচ্ছে, নয়তো কোন সন্ন্যাসী কি ফকির বাতলে দিচ্ছে মোক্ষলাভের মেড ইজি পন্থা। কিন্তু আজ কি যেন মনে হ'ল, এগিয়ে গিয়ে ভীড়ের ঠিক পাশটিতে উঁকি মারল সলিল।

একটি লোক অবসন্নের মত প'ড়ে রয়েছে। একবার তাকিয়েই সন্দেহ আর রইল না। এ ভাস্কর, হ্যাঁ, আর্টিস্ট ভাস্কর সিংহই বটে। ওই তো, ওর কাঁধের চিরসঙ্গী সেই ঝোলাটা।

তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সলিল। সে ততক্ষণে চোখ মেলেছে। রাস্তার মানুষদেরই দু-একজন শুধুমাত্র কৌতূহলী দর্শকের সংখ্যা না বাড়িয়ে বুদ্ধি ক'রে চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। তাদেরই একজন বললে, সর্দিগর্মির জন্য প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তা হবে না? যা গরম পড়েছে!

সর্দিগর্মির জন্য যে ভাস্কর পড়ে নি, তা ভাল ক'রেই জানা ছিল সলিলের। কিসের জন্য যে এ রকম হয়েছে তা অনুমান করতেও দেরি তার হ'ল না। কোন রকমে ভীড় ঠেলে ভাস্করকে ধ'রে নিয়ে কৌতূহলীদের ব্যূহ ভেদ ক'রে সে বেরিয়ে এল।

তারপর ঢুকল গিয়ে কাছের একটা খাবারের দোকানে। একটা চেয়ারের ওপর ভাস্করকে বসিয়ে দিয়ে আর একটা চেয়ার টেনে তার পাশে বসতে বসতে এতক্ষণে তাকে প্রথম প্রশ্ন করলে সলিল, কদিন ধ'রে না খেয়ে ঘুরছিস?

ভাস্করের মাথা তখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয় নি। কিছুক্ষণ সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু ভেবে মৃদুস্বরে বললে, দিন দুয়েক হবে বোধ হয়। তবে মুড়ি তো খেয়েছি।

টাকাপয়সার হিসাব করা উচিত ছিল হয়তো। তবু এ রকম সময়ে সে সব কিছু সম্ভব নয়। বিশেষত রুটি-মাংসের প্লেটটা টেনে নিয়ে বুভুক্ষুর মত যে রকম গিলতে লাগল ভাস্কর, তাতে তার জন্যে আরও কিছু অর্ডার না দেওয়া অসম্ভব ছিল সলিলের পক্ষে।

ছেলের জন্যে ফল কেনার টাকাটা পুরোপুরিই খরচ হয়ে গেল ভাস্করকে খাওয়াতে। তা যাকগে, একদিন ভাল ক'রে খেলে ওর

হাত থেকে এমন কিছু জিনিস বের হয়ে আসতে পারে, যা হয়তো শিল্পকলার ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবে।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে সলিল লক্ষ্য করলে, ভাস্কর তখনও সামলে উঠতে পারে নি, তার পা একটু একটু কাঁপছে। হয়তো এই অবস্থাতেই ও হেঁটে পাড়ি দেবে ওর বেলেঘাটার বস্তির দিকে। নয়তো কোথাও কোন পার্কে ব'সে যাবে হঠাৎ খেয়ালের ঝোঁকে একটা স্কেচ করতে।

ভাস্করকে একলা ছেড়ে না দিয়ে তাই তার সঙ্গে একটা বাসেই উঠে পড়ল সলিল। যেতে যেতেই ভাস্করের সাম্প্রতিক খবরগুলিও নিয়ে নিল।

চাকরিবাকরি ভাস্করের এখনও জোটে নি। তার কারণ অবশ্য সলিল আগে থেকেই জানে। একবার কোন এক চোরাকারবারী বড় লোকের অয়েলপেন্টিং আঁকবার ভারপ্রাপ্ত হয়ে, শেষকালে তাঁর আসল স্বরূপ জেনে তাঁরই ওপর একটা কার্টুন এঁকে দিয়েছিল ভাস্কর। সেই থেকে শুধু মর্মান্তিকভাবে চ'টেই নেই ভদ্রলোক, প্রতিশোধ নেবার জন্যে অজস্র টাকা খরচ ক'রে সমস্ত চিত্রপ্রদর্শনীর দরজা ওর কাছে বন্ধ ক'রে দেবার ব্যবস্থাও করেছেন, যাতে কোন রকমে ভাস্করের নাম না হয়। কোন চাকরি যাতে সে না পায়। একটি ছবিও যাতে তার বিক্রি বা কাগজে প্রকাশ না হয়, তার নিখুঁত আয়োজন করতেও ভুল হয় নি ক্রুদ্ধ ধনকুবেরটির। ফলে আজ ভাস্কর প্রায়ই অনশনে কাটাচ্ছে।

এর ওপর আবার বৈচিত্র্যের নেশা মেটাবার শখও তার পুরোদস্তুর। বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর খোঁজে পায়ে হেঁটে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে দিয়ে নিজের শরীরকে জাহান্নমের পথে আরও একটু এগিয়ে দিয়েছে ভাস্কর। ফলে মধ্যে মধ্যে তার দুর্বল শরীর প্রায়ই রাস্তার এখানে ওখানে গড়িয়ে পড়ে। আজকের এ অবস্থা তার নতুন নয়।

একেবারে বাড়ি পর্যন্ত ভাস্করকে পৌঁছে দিয়ে এল সলিল। ওকে দেখে যত না কষ্ট হ'ল, তার থেকে ঢের বেশি কষ্ট হ'ল ওর ঘরদোরের অবস্থা দেখে। ঘরের ছাত বহু জায়গাতেই ফুটো হয়ে গেছে। মাটি

ও বাঁশের বেড়ার এখানে সেখানে ভাঙন ধরেছে। কিন্তু ভাড়া ঠিকমত জোটাতে পারে না ব'লে বাড়িওয়ালা ঘর সারিয়ে দেয় নি। তার চেয়েও দুঃখ হ'ল, ওর ছবি আঁকার সরঞ্জাম দেখে। রঙ ফুরিয়ে গেছে; ক্যানভাস, পেস্টবোর্ড প্রায় নেই বললেই হয়। তুলির মধ্যেও অনেকগুলিকেই বদলানো দরকার। নানা ঝঞ্ঝাটে মাসখানেক ওর কোন খবরই নেওয়া হয় নি, সত্যি, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আর কেউ না জানুক, অন্তত সে নিজে তো জানে, কত অসহায় কতখানি শিশুর মত এই শিল্পপাগল মানুষটি! খেয়াল করবার, খবর নেবার, সাহায্য দেবার মত লোকের কত বেশি ওর দরকার! যতই ভাবছিল, ততই একটা অসহনীয় দুঃখে সলিলের সমস্ত বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠ'ছল।

পরদিন ভাস্করের জ্বর এল। বের হওয়া অসম্ভব। দুর্বল শরীরে কোথায় প'ড়ে থাকবে কে জানে? তৃষিত চোখে সে তাই খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বস্তির জীবনযাত্রা দেখছিল।

ওর ঘরের ঠিক সামনেই জলের কল। ভোর হ'তে না হতেই বালতি, ঘড়া, কলসি নিয়ে দলে দলে নারী শিশু পুরুষ এসে ভীড় জমায় কলের ধারে। গল্প, রসিক'তা, চেঁচামেচি, ঝগড়া—নানারকম আওয়াজ ভাস্করের কানে এসে পৌছুতে লাগল। একে একে সব জল নিয়ে ঘরে ফিরতেই স্নানার্থীদের মহড়া লাগল কলের দখল নেবার জন্যে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই কারখানার শ্রমিক। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই অধিকাংশের ডিউটি। তারা স'রে যেতে না যেতেই অপেক্ষাকৃত দেরিতে যাদের কর্মস্থলে যাবার পালা, তাদের আগমন হতে লাগল। কারখানা, অফিস, প্রেস, স্টেশন-যাত্রীদের ভীড় শেষ হয়ে গেলে পর এল স্নানার্থিনীদের পালা। আবার কিছুক্ষণ সরগরম হয়ে উঠে অবশেষে প্রায় একটা নাগাদ কলতলাটা যখন একটু শান্ত হয়েছে, ততক্ষণে রুগ্ন শরীরে ভাস্করও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ। চোখ চেয়ে দেখে, সলিল মেঝেতে একটা মাদুর পেতে শুয়ে, কোথা থেকে সে যেন একটা

কাগজও যোগাড় ক'রে এনে পড়ছে। তাকে চোখ মেলতে দেখেই সে প্রশ্ন করলে, বিক্রি করার ছবি আছে তোর?

তা তো আছে, কিন্তু কিনবে কে?

সে আছে একজন।—ব'লে একটু হাসল সলিল।—তোর 'আগামী দিন' ছবিটা কততে বিক্রি করবি?

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ছবি 'আগামী দিন।' যখন ওর আকাশে রাহুর একাধিপত্য ঘনিয়ে আসে নি, সে সময় অজস্র প্রদর্শনীতে ওর 'আগামী দিন' ছবিটি কলারসিকদের কাছ থেকে পেয়েছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ছবিটি করতে যেমন পরিশ্রম লেগেছে, তেমনই লেগেছিল খরচ। ভাস্কর ঠিক করেছিল, সত্যিকার ভাল দাম না পেলে ছবিটি সে হাতছাড়া করবে না। অনেকেই তাই ছবিটি কেনবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেও সেদিন সে তা বিক্রি করে নি।

কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। এখন মোটামুটি খরচ উঠে গেলেই ছবিটা ছেড়ে দিতে ভাস্কর রাজী। টাকার অভাবে তার সাধনা যখন ব্যাহত হতে যাচ্ছে, তখন কোন অভিমানই আর তার সাজে না।

একটু ভেবে সে তাই বলেছিল, করব।

কত চাস তুই?

বলতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। তবু জোর ক'রেই উচ্চারণ করতে হ'ল, যা তারা দেয় তাই নেব। দর-কষাকষি ক'রে ফল তো কিছুই হয় না।

এর পরেই সলিলের প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল ভাস্করকে। পাঁচ শো টাকা? ছবিটার জন্যে দেড় শো টাকা চাওয়ায় কত ক্রেতা ফিরে গিয়েছে। আর আজ পাঁচ শো টাকা দিয়ে ছবি কিনতে চায়। বাংলা দেশে এমন শিল্পরসিক এল কোথা থেকে?

পর-মুহূর্তেই সলিলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা সন্দেহ বিদ্যুৎচমকের মত খেলে গেল ভাস্করের মনে, বললে, তুই নিজে কিনছিস নাকি ছবিটা?

সলিল তখনও হাসছে। উত্তেজনায় ভাস্কর তখন বিছানায় ওপর উঠে বসেছে। সেই অবস্থাতেই রুদ্ধশ্বাসে সে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু টাকা—পাঁচ শো টাকা তুই পেলি কোথায়?

মুহূর্তে সলিলের মুখ থেকে হাসির চিহ্নমাত্রও কে যেন ব্লটিংপেপার দিয়ে শুষে নিয়ে গেল, ওর মনের ভেতরকার অন্ধকারটা যেন আস্তে আস্তে উঠে এসে ছেয়ে ফেলল তার সারা মুখমণ্ডল।

কিন্তু উত্তর দিতেই হবে। তখনও অসীম আগ্রহ নিয়ে ভাস্কর তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল সলিল, তারপর যেন শরীর-মনের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রেই ব'লে উঠল, নিউ আর্ট প্রডাকসন্সের কাছেই 'প্রবাহ' বইটা সিনেমা করবার জন্য বিক্রি ক'রে দিলাম। ওদের শর্তই মেনে নিয়েছি।

এবার বজ্রাহত হয়ে ব'সে থাকার পালা ভাস্করের। অন্য কেউ হ'লে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সলিল বলছে। অন্তত এই জিনিসটি নিয়ে তো সে ঠাট্টা করতে যাবে না।

হঠাৎ যেন তার সমস্ত গলাটা জ্বালা ক'রে উঠল। বলবার কথাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে অসম্বদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তবু তার তিক্ততা তার ক্ষোভ একটি পাঁচ বছরের শিশুও বুঝতে পারত। বললে, শেষ-কালে তুইও? টাকার কাছে বিলিয়ে দিলি আর্টকে?

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সলিল। তারপরই কেমন যেন এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। বললে, যে যুগে জন্মেছি, তার ছাপ থেকে সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ আর করতে পারলুম কই? আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আদর্শকে খাটো করতে হ'ল।

কথাগুলো বোধ হয় ভাস্করের কানে পৌঁছোয় নি। সে তখনও ভাবছে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অমর হয়েছিলেন এক টুকরো হাসি স্কেচ ক'রে। কে জানত তার পাথরচাপা কপালেও সে রকম সুযোগ এক-আধবার এসে পৌঁছতে পারে। আহা, আগে যদি কোনরকমে জানা যেত, সলিলের মুখে এখনই অমন কান্নাঝরা হাসি ফুটে উঠবে!

শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ

বাংলা লেখায় ঢিলেমি

বাংলার পাঠকসম্প্রদায়ের সহিষ্ণুতা সর্বজনবিদিত। তাঁরা মনের কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন না, তাই অল্প কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ গ্রন্থকার ও লেখক তাঁদের উপর অত্যাচার ক'রে চলেছেন। লেখকরা মনে করেন যে, তাঁরা কৃপাপূর্বক যা [illegible] দেন, তথ্যের যাথাযথ্যে, বাক্যবিন্যাসে, ব্যাকরণে, বানানে, রীতিতে, পানচুয়েশন-এ অজস্র গাফিলিসুদ্ধ যা কিছু আমাদের [illegible]নে হাজির করেন, তাই আমাদের গ্রহণ করার যোগ্য। তাঁদের এই অপকর্মে সহায়ক এবং উৎসাহদাতা হিসাবে আছেন সাময়িক [illegible]এর সম্পাদক আর পুস্তক-প্রকাশকরা। তাই একটা অনর্থকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, যা দেশের পক্ষে শুভ নয়। কারণ আমাদের শিক্ষাদীক্ষার অনেকটাই হয় ছাপার অক্ষর মারফতে,—আর এ কথা [illegible]ই আছে যে, ছাপার অক্ষরের উপর এ দেশের লোকের অগাধ বিশ্বাস। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' এই দুই পক্ষকেই [illegible] একটা বিপর্যয়কর অভিসম্পাত দিয়ে গেছেন। পাঠকগোষ্ঠীর হয়ে [illegible]মুক্তির চেষ্টায় বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছা করি।

মানুষ ভাষা দিয়ে কি করে?—এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, [illegible] ভাষা দিয়ে জানাবার জিনিস জানাতে হয়। দ্বিতীয়ত, [illegible] প্রকাশ করে মানুষ ভাষা দিয়ে। আর তৃতীয়ত, কল্পনাকে [illegible] দেওয়া ভাষার কাজ,—ভাষা সাহিত্যের বাহন। ভাষার এই ত্রিবিধ কর্তব্যের মধ্যে প্রথম কাজটি সম্পর্কেই এই প্রবন্ধে আমাদের যা কিছু বক্তব্য। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য বাংলা ভাষার সেই লেখা [illegible] জানাবার জিনিস জানানো হয়, ঘটনা এবং তথ্যের বিবরণ দেওয়া [illegible] যে লেখা বিবৃতিমূলক—যাতে অলঙ্কারের স্থান নেই। এই শ্রেণীর [illegible] শিক্ষার বাহন এবং যাথাতথ্যই এর প্রাণ।

এই সম্পর্কে ছাপার অক্ষর বড় কম কথা নয়,—পরন্তু সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে যে কোন বিষয়ে কোন নজির খুঁজতে হ'লে ছাপার অক্ষরই মানুষের প্রধান অবলম্বন, অধিক সময়েই একমাত্র অবলম্বন। সেইজন্য কোন কিছু ছাপিয়ে প্রকাশ করার আগে লেখক

ইংরেজী ভাষার প্রথম অভিধান সঙ্কলিত হয়েছিল খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সেই দু শো বছর আগেকার প্রকাশিত চার ভলুমে সম্পূর্ণ জনসনের অভিধান আজও পাঠকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থের পর তার প্রয়োগের উদাহরণ দেখানো হয়েছে পূর্ববর্তী লেখকদের মুদ্রিত নিদর্শন উদ্ধার ক'রে। এ কাজ সেদিনও সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে সে যুগেও ও-দেশের লেখক আর মুদ্রাকরদের কাজে সাবধানতা এবং যত্ন ছিল, ছাপা জিনিসের উপর লোকে নির্ভর করতে পারত। অধুনা ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান The Oxford English Dictionary বারোটা বৃহৎ খণ্ড এবং আরও অনেকগুলো সম্পূরক খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেও প্রত্যেক শব্দের এক বা একাধিকপ্রকার প্রয়োগের নিদর্শন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস থেকে বহুলরূপে উদ্ধার ক'রে দেখানো হয়েছে। তার মানে এই যে, মুদ্রিত বস্তুর উপর নির্ভর করা যায়, লেখক যেমনটি লিখেছিলেন মুদ্রাকর তেমনটি ছাপিয়েছেন—এইটুকু বিশ্বাস এর পিছনে আছে।

বাংলায় একদিন জনসনের অথবা অক্সফোর্ড অভিধানের মত একখানা অভিধান লিখতে কেউ হয়তো অগ্রসর হবেন। কিন্তু এটা এক রকম জোর ক'রে বলা যায় যে, তিনি এ কাজে এক পাও অগ্রসর হতে কৃতকার্য হবেন না। সাহিত্যে শব্দের প্রয়োগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন হদিস না পেয়ে নাজেহাল হবেন, কারণ বাংলায় ছাপা বস্তুর উপর নির্ভর করা যায় না। লেখক কি লিখেছিলেন তা জানবার উপায় নেই, মুদ্রাকর সঠিক ছাপিয়েছেন কি না তাও জানা অসম্ভব।

বাংলা ভাষায় আমের বিচিকে কি বলে? 'আঁঠি,' না 'আঁটি,' না 'আটি'? 'চলন্তিকা' অনুসারে আমের "আঁঠি, আঁটি" দুই রকমই হয়। আর "আটি, আঁটি"র অর্থ তৃণাদির গুচ্ছ। বোধ হয় সঙ্কলয়িতা আমের "আঁঠি"টাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেন। বর্তমান প্রবন্ধকারেরও তাই মত।

এবার বাংলা সাহিত্যে কথাটার প্রয়োগ সম্বন্ধে দেখা যাক কি

জানি। ধানেরও "আঁঠি" লিখেছিলেন, এ কথা ছাপার অক্ষরে দেখি—"আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভার ভার।" তাঁর "রবিবার" নামক গল্পের গোড়াতেই লিখেছিলেন, "—বিষয় ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁঠি পর্যন্ত পাকা—"। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা বইয়ের নাম 'আম আঁটির ভেঁপু'। যশোহরাদি জেলার লোক মহাপ্রাণ শব্দ উচ্চারণ করতে স্বভাবত কিছু নারাজ, "আম আঁটির" এও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কথাটা এখানে শেষ হ'ল না, কারণ দেখছি রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে এবং অন্যত্র ছাপা হয়েছে "আঁটি"—যদিও তিনি লিখেছিলেন "আঁঠি"। প্রমাণ? চাক্ষুষ প্রমাণের বৃত্তান্ত বলি।

"রবিবার" গল্পটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৩৪৬ সালের পূজার সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে। সঙ্গে ছাপা ছিল কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রথম ১৭ লাইনের ছবি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ১৭ লাইনের মধ্যেই ছাপার অক্ষরে ৯টা ভুল চোখে পড়ে—অক্ষরের, stop-এর, প্যারাগ্রাফ-ভাগের। পাণ্ডুলিপিতে আছে 'আঁঠি' আর ছাপা হয়েছে "আঁটি"। আমি মনে করি যে, প্রেসের মুদ্রাকর এবং প্রুফ-রীডারের ঢিলেমি এই অনর্থের মূল। অন্যে পরে কা কথা, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর এই সাংবাদিক মহাশয়রা হাত চালাতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু আরও একটু মজা আছে। বিশ্বভারতী থেকে "রবিবার" গল্পটি প্রকাশিত হয় 'তিনসঙ্গী' নামের একটা বইতে প্রথম গল্পরূপে। আর এই বইখানাতে তথা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ২৫শে খণ্ডে ছাপা হয়েছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রথম প্রকাশের রূপটা ভুলচুক সুদ্ধ মাছিমারা ক'রে—লেখকের পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কেউ হয়তো প্রয়োজন বোধ করেন নি। অতএব ভবিষ্যতের বাংলা 'অক্সফোর্ড' অভিধানে "আঁটি"র সঙ্গে তার সাহিত্যিক প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের "আঁটি পর্যন্ত পাকা" উদ্ধৃত হবে, আর নজির থাকবে বিশ্বভারতীর ছাপ।

এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তখন তাঁরা কবির অত্যাচারে বিব্রত ছিলেন

লেখা কেবলই অদল-বদল করতেন, লেখাটাকে আর একটু পরিষ্কার, আর একটু ভাল করবার জন্য। পুস্তক প্রকাশের ভার যাঁদের হাতে তাঁদের এমন অস্থিরমতি লেখকের সংসর্গে অস্থির হতে হয় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এটা খাটে ব'লে বোধ হয় না। কবি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রুফ অমনি তন্ন তন্ন ক'রে বদলে দিয়েছিলেন তা ভাবা যায় না, কারণ অনেকগুলো সুস্পষ্ট ত্রুটি ছাপার অক্ষরে এসে স্থায়ী আসন নিয়েছে যা হাতের লেখায় ছিল না।

যা হোক, এ ব্যাপারে হয়তো কারও কোন ত্রুটি নেই। কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা আমাদের নেই, শুধু বর্তমান অবস্থাতে বাংলা ছাপার অক্ষরের উপর নির্ভর করা যে অসম্ভব তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন একটা দেওয়া গেল।

আমাদের দেশের আয়েশী আবহাওয়ায় শব্দব্যবহারের খুঁটি-নাটির দিকে নজর দেওয়া হয়তো বড় বেশি আয়াসসাধ্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তথ্যের বিবৃতিতে অসাবধানতার কোন ওজর নেই। যে কোন ঘটনার বিবরণ দিতে গেলেই সাবধান হওয়া চাই, কারণ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। উপস্থিত দুই জন শ্রোতা একই ঘটনা কিংবা কথোপকথনের দুইটা বিভিন্ন, হয়তো বিরুদ্ধ মর্মের রিপোর্ট দেয়—এ তো সর্বদাই দেখা যায়। একজন হয়তো কম দেখে ও শোনে, অন্য জন বেশি দেখে, শোনে ও বিস্তার ক'রে বলতে পারে। একজন মর্মটা ঠিক ধরতে পারে, অন্যজন তা পারে না। ঘটমান ব্যাপারেই কাজটা এত কঠিন, অতীতের তো কথাই নেই। অথচ এ বিষয়ে আমাদের ঢিলেমির অন্ত নেই—সমসাময়িক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। গত চৈত্র সংখ্যা একটা মাসিকে দেখছি, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বাল্যের সহপাঠী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়েছে কলকাতার কোন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়। বিবেকানন্দ বলছেন উপাধ্যায়কে, "তোর সন্ধ্যা কাগজে কলমের খোঁচায় কর্তারা বেসামাল হয়ে পড়েছে।" অথচ স্বামীজীর জীবিতকালে 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্মই হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ বার হয়; বৈশাখ মাসে তো রবীন্দ্র-সংখ্যার মরশুম পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মুখে কত আজগুবি

কথা যে এই সব প্রবন্ধের মারফতে পোরা হয় তা পাঠকমাত্রেই জানেন। তা ছাড়া কবির লেখার টুকরা টুকরা উদ্ধৃতি এই সব প্রবন্ধে ছড়ানো থাকে, কবিতার কটা ছত্র হয়তো। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, সেই টুকরা উদ্ধৃতির মধ্যেও সব কটা শব্দ নির্ভুল ভাবে তোলা হয় না। অনেক সময়ে সন্দেহ হয় যে, প্রবন্ধ-লেখক হয়তো ইচ্ছে ক'রেই কবির লেখাটুকুর কিছু সংশোধন ক'রে, কিছু উন্নতিবিধান ক'রে পত্রস্থ করেন। এই ব্যবহারের ইংরেজী নাম cheek, আর বাংলায় একে বলে ডেঁপোমি। এই ধরনের ডেঁপোদের ভদ্র লেখকসমাজে অপাংক্তেয় হওয়া উচিত। কিন্তু এসব ভুল সাধারণত হয় অসাবধানতার জন্য; একটু কষ্ট ক'রে মূলটুকু আর উল্টে দেখেন না, স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে ঢিলে হাতে যেটুকু পারেন তাই লিখে পত্রস্থ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র বানান বহুস্থলে 'গীতাঞ্জলী' ছাপানো হয় লেখক কিংবা মুদ্রাকরের গাফিলির দোষে, না হয় তো সম্পাদকের। একটা পাক্ষিক পত্রিকার কভারে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পুষ্পাঞ্জলী'র বিজ্ঞাপন অনেক সংখ্যা ধ'রে দেখা গেল, কাগজের কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকেন, অত শত ছোটখাট জিনিস তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। বৈশাখ সংখ্যা একখানা মাসিক খুলেই দেখা গেল প্রথম কবিতার প্রথম ছত্রে আরম্ভ হয়েছে, "নীলাম্বরের সীমাহীন পরোপারে"। অথচ মাসিকটির চেহারাটি ভাল আর এই সংখ্যাতেই কয়েকটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও রয়েছে।

সাহিত্যের ভাষা অলংকারের, সেখানে অতিশয়োক্তি কিছু চলতে পারে; কিন্তু তথ্যের ভাষা সঠিক ভাষা, সেখানে গা ঢেলে দিয়ে লিখতে বসা অন্যায়। বিজ্ঞানের ভাষা আরও সঠিক। বিজ্ঞান আলোচনায় অন্যমনস্কতা অতিশয় বিপজ্জনক। নিদর্শনস্বরূপ প্রমথ চৌধুরীর মত বহুশ্রুত বাগ্‌বিদগ্ধ ওস্তাদ শিল্পীর এক টুকরো লেখা তুলে নিয়ে দেখাতে চাই যে, এমন সাবধানী লেখকেরও বাক্যবিন্যাসে স্খলন হওয়া সম্ভব। তাঁর রচিত 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' নামক বইয়ের প্রথমেই ভূমণ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ক্ষিতি আর অপ্‌ আর মরুৎ, মাটি আর জল আর হাওয়া, এই তিন ভূতে এই গোলকটি গড়া। এর চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, একভাগ স্থল।" যেটা বলা হ'ল সেটা

স্রেফ ভুল বলা হ'ল লেখক তা ধরতে পারেন নি। কারণ গোলকটির গঠনে তিন ভাগ জল এমন কথা তাঁর বক্তব্য নয়, ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ জলে আবৃত এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

যেখানে পদস্খলন এত সহজ সেই বিজ্ঞান আলোচনার কঠিন ক্ষেত্রেও আমাদের ঢিলেমি চালের চলন অকাতরে চলছে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রণীত একখানা বিদ্যালয়পাঠ্য বিজ্ঞানের বইতে পড়া গেল, "ভাইটানিন সির অভাবে স্কার্ভি নামক চর্মরোগ (!) হয়।" "কয়লা পোড়া ধোঁয়াকে জমাইলে যে পদার্থ হয় তাহার নাম ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ।" "কাঠ কয়লা ইত্যাদি পোড়াইলে যে ধুম নির্গত হয় তাহা প্রধানত কার্বন-ডাই-অকসাইড বাষ্প।"

এই ধরনের ভুল তথ্য, মারাত্মক ভুল তথ্য, বই এবং সাময়িক পত্রে প্রচুরভাবে বিতরিত হয়, অক্লেশে যত ইচ্ছা তত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু আজকাল কেন এমন হয়? বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী না হয়েও অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তাতে তো এমন ভুল পাওয়া যায় না। আর বিজ্ঞানের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আর একটা গোটা পদার্থবিদ্যার বই লিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক লেখা যেমন হওয়া উচিত তেমনই সঠিক ভাষায় অতি অপূর্ব সরস রচনা রেখে গেছেন সে-সব লেখাতে, তার মধ্যে কোন জায়গায় আজকালকার অধিকাংশ লেখকদের মত অবহেলার চিহ্ন রেখে যান নি। ইংরেজীতে সাধারণপাঠ্য এবং বিদ্যালয়পাঠ্য ছোট-বড় কত বিজ্ঞানের বই হাতে আসে কিন্তু তাতে এমন সব ত্রুটি চোখে পড়ে না। এর একমাত্র কারণ এই যে, অক্ষয়কুমার বঙ্কিম প্রভৃতি এবং ইংরেজ লেখকরা পাঠককে অবহেলার চক্ষে দেখেন না, তাদের বুদ্ধিকে হেয় জ্ঞান করেন না, কিছু লিখে প্রকাশ করবার সময় কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখেন।

অথচ বর্তমান বাঙালী লেখক এবং বিজ্ঞানীরা পাণ্ডিত্যে যে কিছু কম সে কথা মানা যায় না। তাঁরা স্বদেশে বিদেশে স্ব-স্ব বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করছেন, সেটা মুফৎসে হয় না। আসল কথা

তাঁরা তাদের বাঙালী পাঠকদের থোড়াই কেয়ার করেন। বাইরের পণ্ডিতসমাজে যাচাই হবার জন্য তাঁরা তাঁদের ইংরেজী রচনায় যতটা সতর্কশ্রমশীলতা ও শ্রদ্ধা নিয়োগ করেন, বাঙালী পাঠকদের চরিতার্থ করবার সময় বাংলা কলমে আর ততটুকু যত্ন অপব্যয় করতে চান না। বাংলা লিখতে বসলেই মনকে attention-এর অবস্থা থেকে ছুটি দিয়ে stand at ease-এর অবস্থায় নিয়ে যান—সঙ্গে সঙ্গে রচনা হয় শিথিল, তথ্য হয় নির্ভরের অযোগ্য।

ব্যাকরণের নিয়মের উপর যথেচ্ছাচার করা তো নিয়মে দাঁড়িয়েছে। বানান সম্বন্ধেও ঐ কথা। অনিশ্চয়তার ওজর বড় খাটে না, কারণ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নিয়মিত রয়েছে। অনিশ্চয়তা আসলে তদ্ভব আর দেশজ শব্দের বেলায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি অনেক বিচার এবং বিতর্কের পর দেশজ শব্দের বানানের একটা নিয়মাবলী খাড়া ক'রে দিয়েছেন, যা সকলেই সামান্য চেষ্টাতে আয়ত্ত করতে পারেন। এই নিয়মাবলী যদি অধিকাংশ লেখক গ্রহণ করেন, তা হ'লে বানানের রাজ্যে অরাজকতার শেষ হয়।

অলমতিবিস্তারেণ। আশা করি দেখানো গেছে যে লেখকমহাশয়দের কাছ থেকে যে সদ্ব্যবহারটুকু আমরা প্রত্যাশা করি সেটুকু পাই না এবং আমাদের অভিযোগেরও কারণ আছে। অতঃপর এই অসন্তোষকর অবস্থার সংস্কার কি উপায়ে সম্ভব সে দিকটা একটু বিবেচনা করা যাক।

২

সংস্কার সহজে হবে না, আর তা একজনের হাতেও নেই। সংস্কার সম্ভব শুধু সকলের সমবেত চেষ্টায়। বিষয়ের গুরুত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হ'লে সে চেষ্টায় কেউই পরাঙ্মুখ হবেন না।

শুদ্ধ স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? হাব্‌শীরাও তো স্বাধীন! আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে স্থাণু হয়ে ব'সে থাকা উদ্দেশ্য নয়, জগতের আর আর প্রগতিশীল দেশসমূহের সমকক্ষ হয়ে তাদের সঙ্গে সমান তালে চলা আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তারা হ'ল যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন,

রাশিয়া চীন···। ওরে বাস্‌ রে, ভেবে দেখেছেন ব্যাপারখানা? আমেরিকা! শিল্পে, সাহিত্যে, কলায়, শিক্ষায়, সভ্যতায়, উৎসাহে, নিষ্ঠায়, বিজ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, অর্থে, সামর্থ্যে তারা কোথায় আছে, আর আমরা কোথায় আছি! এদের সঙ্গে সমকক্ষ হতে হ'লে চালাকি দ্বারা আমরা তা পারব না। চাই আমাদের সর্বাঙ্গীণ সর্বতোমুখী উন্নতির একাগ্র প্রচেষ্টা যার মূল কাণ্ড এবং শাখা হ'ল শিক্ষা-প্রচার। আর শিক্ষা প্রচারের প্রধান বাহন হচ্ছে ছাপার অক্ষর। ছাপার অক্ষরের উপর লোকের আস্থা যদি চ'লে যায় তো হয় শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত। ছাপার অক্ষরে ভুল তথ্যের প্রচার ও শিক্ষা হ'লে অপরাপর স্বাধীনদেশের সমকক্ষ আমরা কেমন ক'রে হব? বিদ্যালয়পাঠ্য বিজ্ঞানের বইতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি শেখে যে ধোঁয়া বাষ্প আর গ্যাস এই তিনটা একই পদার্থ, তা হ'লে তারা ও-দেশের ছেলেমেয়েদের সামনে দাঁড়াবে কোন্‌ লজ্জায়, যে দেশে ১৬ বছর বয়সে বিদ্যালয়োত্তীর্ণ হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক বিধান? সেখানে প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যেকেরই আছে, আর সে জ্ঞান তারা ঢিলে হাতের লেখা বিজ্ঞান-পাঠ থেকে আহরণ করে নি। শিক্ষিত লোক হয়ে মাতৃভাষায় সহজ কথার বানান ভুল করি, ব্যাকরণশুদ্ধ দু ছত্র রচনা লিখতে গিয়ে বিপদে পড়ি এ কথা স্বীকার করা আমাদের দেশ ছাড়া যে কোন দেশবাসীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।

সুতরাং বই এবং সাময়িক পত্রাদি বের করা যাঁদের কাজ, তাঁদের স্ব স্ব দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার সময় এসেছে। আমরা বাংলার লেখক, পত্রসম্পাদক ও পরিচালক, পুস্তকপ্রকাশক আর সর্বশেষে পাঠকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে করজোড়ে কিছু নিবেদন করতে চাই।

লেখক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন। মাননীয় মহাশয়: অনেক কুকথা আপনাকে শুনিয়েছি, বিরূপ হন তো নাচার। তবে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, আপনাকে অজ্ঞতার দোষে দোষারোপ করা হয় নি। আপনি পণ্ডিত লোক। যে বিষয়ে লিখতে বসেন, তাতে অবশ্যই

আপনার উত্তম জ্ঞান আছে।" তথাপি আপনার লেখা প'ড়ে সন্দেহ হয় যে, বিষয়টির পরিষ্কার ধারণা বুঝি আপনার মাথায় নেই। সেটা হয় এই কারণে যে, আপনি একটু শ্রম স্বীকার ক'রে পরিষ্কার ক'রে লেখেন না, শিথিল বাক্যবিন্যাসের জন্য অর্থটা ঘোলাটে থাকে, বিষয়বস্তু যাচাই না ক'রে শুধু স্মৃতির নির্ভরে লিখে যান আর সঙ্গে সঙ্গে লেখাটা ছাপাখানায় পাঠান, ত্রুটি বিচ্যুতি যেটুকু থেকে যায় সে আর সংশোধন হয় না। বানান আর শব্দার্থ যাচিয়ে নেবার জন্য অভিধান তো হাতের কাছেই আছে, কিন্তু কষ্ট ক'রে পাতাটা উল্টে দেখতে চান না। আপনার স্বভাবের এই ঢিলেমিটাই যত নষ্টের গোড়া। তাই আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন যে আপনার পূর্বগামীদের মত আপনিও বাংলা ভাষাকে ভালবাসতে আরম্ভ করুন আর পাঠকদের উপর কিছু শ্রদ্ধা রাখুন। দেখুন, বাঙালীর আজ বড় দুর্দিন। তবু আজও জগতের মাঝে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি যে সামান্য কটা বস্তু হাতে ক'রে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাদের মধ্যে প্রধান। এমন বস্তুর মান-মর্যাদা রক্ষার ভার আপনার হাতে। তাই লেখাটা আপনার শখের কাজ হ'লেও কাজটা একটু শ্রদ্ধা দিয়ে করবেন, আপনার পূর্বগামীরা যেমন ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি, তাঁর অজস্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যেও পুরানো লেখা তিনি বার বার মাজা-ঘষা করবার অবসর খুঁজে নিতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক জায়গায় লিখেছেন যে, যুবা-বয়সে একবার পশ্চিমাঞ্চলে যাবার পথে কর্মাটারে নেমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর আবাসে কটা দিন কাটিয়ে যান। একদিন সকালে উঠে দেখেন যে বিদ্যাসাগর বারান্দায় পায়চারী করছেন আর মাঝে মাঝে টেবিলে ব'সে কথামালার প্রুফ সংশোধন করছেন; বিস্তর কাটকুট করছেন। "আমি বলিলাম—কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না, যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত—তাই সর্বদাই কাটকুট করি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কথামালা'র জন্য যে ক্লেশটুকু স্বইচ্ছায় নিতেন,

তারই কিয়দংশ যদি আপনি লন আপনার উত্তম উত্তম প্রবন্ধের জন্য তা হ'লে দেশ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন। মান্যবরেষু, যে কালে বাংলাভাষা ও সাহিত্য অতি প্রবল বেগে তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণে নিযুক্ত ছিল, সেই কালে তাকে প্রচুর সহায়তা করেছিল কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা, যেমন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'বঙ্গদর্শন,' 'ভারতী,' 'সাধনা,' নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন,' 'সাহিত্য' এবং আরও কয়েকটি। এই কাগজগুলির যে কোন একখানা বাঁধানো ভলুম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। সেটা এই যে, এই সব পত্রিকাতে সংখ্যার পর সংখ্যায় নানা হাতের নানা বিষয়ে নানা লেখা বার হয়েছে, কিন্তু তার সবগুলোই ভাল। এমন নয় যে প্রত্যেকটাই উঁচুদরের লেখা, কিন্তু এটা ঠিক যে সব কটাই ভাল দরের। এও কি সম্ভব যে তখনকার দিনে যিনিই লিখতেন তিনিই ভাল লিখতেন? তা নয়, এটা হ'ত এই জন্য যে, তখনকার দিনের সম্পাদকরা কোন লেখাই যত্নসহকারে সম্পাদনা না ক'রে পত্রস্থ করতেন না, যে কাজ স্বয়ংসিদ্ধরূপে এবং সর্বস্বীকৃতিক্রমে তাঁদের কর্তব্য ছিল। তাই সে যুগের সম্পাদকরা নিজেদের হাতে বাংলা দেশে লেখক গ'ড়ে দিয়ে গেছেন। অথচ তাঁদের অবসর ছিল অল্প, কাগজ-চালানো তাঁদের পেশা ছিল না, শুধু নেশা ছিল। আপনার কর্তব্য দয়া ক'রে স্মরণে রাখবেন। অ্যামেচারই হন বা পেশাদারীই হন, সম্পাদনা যদি না করেন তো সম্পাদক হয়েছেন কেন? আপনার সম্পাদনায় ভাল ভাল জিনিস সর্বদাই বার হয়, কিন্তু মন্দ জিনিসও তো বেপরোয়াভাবে বার হয়। তার কি কারণ আছে আপনার ঢিলেমি ছাড়া? নামজাদা লেখকের লেখায় দোষ থাকলেও হাত দিতে সংকোচ বোধ করলে কর্তব্যবুদ্ধিকেই সঙ্কুচিত করা হয় জানবেন। সম্পাদনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার আপনারই। লেখক গড়তে পারেন তো ভালই, না পারেন তো নালিশ করব না কিন্তু বাজে লেখা পত্রস্থ ক'রে, আনাড়ীকে প্রশ্রয় দিয়ে পাঠকদের মনে বিরক্তি ধরিয়ে দেবার

কারও অধিকার নেই। সম্পাদনা অথবা পরিচালনার কাজে আপনার পূর্বগামীরা পেশাদার না হয়েও যেটুকু সময় ও শ্রম ব্যয় করতেন তার কিয়দংশ আপনি আপনার কাজে ব্যয় করবেন—এটা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

গ্রন্থপ্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন। শ্রদ্ধাপদেষু, একটা গোটা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি ও সম্প্রদায় কর্তৃক সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হয়, আপনি তাঁদের মধ্যে একজন। আপনার এই প্রকাণ্ড দায়িত্বের বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকুন কর-জোড়ে এই অনুরোধ করি। জানি যে আপনার কাজ একটা কারবার চালানো, যার লাভ-ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখা আপনার নিয়ত কর্তব্য। কিন্তু এ কথাও জানি যে বহুবিধ সহজ অথচ অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের পথ লোকের কাছে খোলা থাকলেও যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ আহরণ করা আপনার মত শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীর লক্ষ্য নয়। সুসাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রচার বাড়ুক, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করুন—এইটাই আপনার লক্ষ্য। বটতলার যা দেবার ছিল সে তা দিয়েছে, আমরাও কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়েছি; কিন্তু আজ তার কোন সার্থকতা নেই, দেশ আজ আপনাকে চায়। প্রকাশের জন্য আপনার কাছে কিছু এলে জিনিসটা যাচাই ক'রে নেবার সুবিধা এবং অবসর যখন আপনার নেই তখন ও-দেশে যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনই Publishers' Reader নিযুক্ত করলে আপনি নানা দিক দিয়ে লাভবান হতে পারেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফী দিলে নির্ভরযোগ্য রীডার পাওয়া কঠিন হবে না, আর নির্ভরযোগ্য প্রকাশকের সুখ্যাতি অর্জন করলে আপনিও উপকৃত হবেন। ম্যাকমিলান কোম্পানি দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের বই প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বইটা কি সাবধানে বিচার করেন তার একটা নিদর্শন দিই। সংস্কৃত মৃচ্ছ-কটিকের একখানা উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ তাঁরা এই ব'লে প্রকাশ করতে নারাজ হলেন যে, তাঁদের রীডার-এর মতে মূল বইখানাকে সহস্রাধিক বছরের পুরনো রচনা ব'লে কিছুতেই মনে হয় না।

"নিঃসন্দেহ হতে না পারায় প্রকাশের ভার নিতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন, অনুবাদ অতি চমৎকার হয়েছে ইতি"। এই বইখানি পরে কোন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তবুও এই শ্রেণীর প্রকাশক আমাদের দেশে যত হয় ততই মঙ্গল।

বাংলা ভাষার পাঠক মহাশয়ের প্রতি জনান্তিকে নিবেদন। অভিন্নহৃদয়েষু ভাই পাঠক, আপনার মনের যে-কথাগুলো মনেই থাকে, আর অহরহ আপনাকে অশান্তি দেয়, দেখুন তার কতক-গুলো আজ বার ক'রে দেওয়া গেল। One good turn deserves another—সুতরাং আপনার কাছেও কিছু আশা করতে পারি না কি? সে আর কিছুই নয়—শুধু দয়া ক'রে আপনার নির্বিকার চিত্তে সহ্য করবার অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়ে মহাত্মাপ্রদত্ত সেই মারণাস্ত্রটি ধরুন, যার নাম—অহিংস অসহযোগ। মান্যবর লেখক মহাশয়দের মত যাই হোক, এ কথা অজ্ঞাত নেই যে, আপনি তাঁদের চেয়ে কোন অংশে কিছুমাত্র কম নন, কেবল আপনার ক্ষমার প্রাচুর্য দেয় তাঁদের অবহেলার প্রশ্রয়। আপনি তাঁদের উপজীব্য, অস্তিনাস্তির নিয়ন্তা হয়ে তাঁদের কাছ থেকে অবহেলার দান কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী হবেন না, পড়বেন না তাঁদের লেখা। ছেড়ে দেবেন সে সব সাময়িক, যাতে তাঁরা প্রশ্রয় পান। সম্পাদক, পরিচালক, লেখক—যাকে সুবিধা হয় তাকে জানিয়ে দিন আপনার অসন্তোষের কথা। দ্বিধা কিসের? লেখাটা আপনার তেমন আসে না, এই তো? সে তো ভাই জানাই আছে, আমাদের মুশকিল তো সেইখানেই! তবু আমরা আজ মরিয়া হয়ে উঠব, কিছুতে আমাদের আটকাবে না। চিঠি লেখা কার না আসে, চিঠি তো সব মানুষকেই লিখতে হয়। তেমনই লিখে দেবেন সম্পাদকের বা প্রকাশকের নামে কয়েক ছত্র—মশায়, অমুকের লেখা অমুক পুস্তক বা প্রবন্ধে এই ত্রুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন পুস্তক বা প্রবন্ধ আপনার কাছ থেকে বার হতে দেখে ক্ষুণ্ণ বোধ করি। বাস্, এইটুকুতেই যথেষ্ট।

ক'রে দেখুন এই কার্য কিছুকাল, দেখবেন তার সুফল হবে অনিবার্য।

আপনার লুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধার আসন আবার আপনি ফিরে পাবেন আর বঙ্গসাহিত্যের মরাল আপনি আনন্দে বিহার করবেন সেই কমলবনে, যেখানে নল-খাগড়া আগাছা-পরগাছা উৎখাত হয়ে গিয়ে বঙ্গবাণীর শতদল পদ্ম স্বচ্ছন্দে বিকশিত হবার জায়গা দিয়েছে।

শ্রীসুকুমার বসু

কল্যাণ-সঙ্ঘ

৩০

সকাল থেকেই নহবত বাজছে। সানাইয়ের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে বাতাসে। মিলনের সুর। দুটি হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রতীক্ষাকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন কবি, মর্মস্পর্শী সুর-বিন্যাসে। সেই সুর বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিল্পীর অঙ্গুলিস্পর্শে উৎসারিত হচ্ছে, বিস্তারিত হচ্ছে বাতাসে—তরঙ্গে তরঙ্গে। আঘাত করছে মানব-মানবীর অন্তরের দ্বারে। অন্তরের অন্তস্তলে উঠছে আলোড়ন। থিতিয়ে-যাওয়া অতীত দিনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-কণাগুলি ভেসে উঠছে, সারিবদ্ধ হয়ে পার হয়ে যাচ্ছে মানসচক্ষুর সামনে দিয়ে।

নহবত বাজছে তপনদের বাড়িতে। আজ তার আশীর্বাদ। গুণেনবাবু তাকে আশীর্বাদ করবেন। তিনুদের বাড়ির সকলে, রায় বাহাদুরদের বাড়ির সবাই, তপনের বন্ধুবান্ধবরা, শহরের গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত। উৎসবের হাওয়া বইছে সারা বাড়িটাতে। সকলের মনে। তপনের মায়ের অনেক দিনের সাধ, ছেলের বিয়ে দিয়ে মনের মত বউ ধরে আনা। এতদিনে সে সাধ পুরবার সম্ভাবনা হয়েছে। রায় বাহাদুরকে ব'লে নহবতের ব্যবস্থা করেছেন তিনিই।

প্রতুলদের বাড়ির পিছনে একটা বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল—আরও অনেক রকমের জানা-অজানা গাছ আছে সেখানে। কাছে-পিঠে লোকালয় নেই। একেবারে নির্জন জায়গাটি। বাগানের এক পাশে, একটা গাছের নীচে শৈলী ব'সে ছিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গাছের মাথায় মাথায় আঁধার জমাট

বেঁধে উঠছে। গাছের পাতার আড়ালে পাখিরা সান্ধ্য কলরব তুলেছে। ঝিরঝির ক'রে বাতাস বইছে। গাছের পাতায় পাতায় উঠছে সরসর শব্দ। ঘাসের মধ্যে উইচিংড়ের একটানা তীক্ষ্ণ সুর বেজে চলেছে। সকল শব্দকে ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের পূরবী রাগিণীর আলাপ।

শৈলী দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে আছে। পরনে আধময়লা শাড়ি ও শেমিজ। মাথার চুলে তেল দেয় নি কদিন। রুক্ষ চুলগুলো কোন রকমে খোঁপায় জড়িয়েছে। আজ সারাদিন সানাইয়ের সুর ভেসে এসেছে, বিঁধেছে তার কানে, তার মনে। রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে তার মন। অপমানের ভারে তার নারীত্বের অহমিকা ধুলোয় লুটিয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে সংসার থেকে দূরে স'রে দাঁড়িয়েছে। মায়ের জন্যে একবার কাঁদে নি, একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি। নির্বোধ পশুর মত নির্বাক নির্লিপ্ততায় দুই চোখ মেলে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুধু। আঘাতের পর আঘাত তার মনকে নিঃসাড় ক'রে দিয়েছে। তপন আঘাত করেছে তার হৃদয়ে, সাধুজী আঘাত করেছেন তার জীবনের মূল দেশে। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার জীবন। এর সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা থেকে বিযুক্ত হয়ে গেছে। প্রতুল যতই তাকে তার স্নেহ দিয়ে ঘিরে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, ততই আরও দূরে স'রে দাঁড়াচ্ছে সে। বার বার বলেছে প্রতুল, শৈলী, একবার কাঁদ্, তা হ'লেই মনটা হাল্কা হয়ে যাবে। এমন ক'রে বাঁচবি কি ক'রে? শৈলী প্রতিবার শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, কাঁদতে পারছি না যে দাদা।

সারাদিন ঘরের একটা কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। নিজের জীবনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। অভিশপ্ত জীবন। জন্ম-মুহূর্তে পড়েছে বিধাতার অভিশাপ। চিরদিন ভেসে ভেসে বেড়াতে হবে, কোথাও শিকড় গাড়তে পারবে না। স্বামিত্যাগিনী মায়ের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে সারা জীবন ধ'রে। শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। প্রথম শাস্তি দিয়েছে তপন। ফুলের মতন তাকে তুলে নিয়ে, বুকে

রেখে, ভালবেসে, আদর ক'রে, চিরদিন বুকে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার সর্বস্ব উপভোগ ক'রে, অবজ্ঞায় অবহেলায় ফেলে দিয়েছে। একেবারে ভুলে গেছে তাকে। এখন একবারও বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটে না পর্যন্ত। মানুষ এমন ক'রে ভোলে কি ক'রে? বিধাতার বিধান, অভিশাপের অমোঘ পরিণাম। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলেছিল অভিশাপের বিষাক্ত হাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে।

কখনও কখনও নিজের মর্নের মধ্যে ডুব দিয়ে শৈলী অতীত দিনের স্মৃতির টুকরো গুলিকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেখে। যেন হীরের গুঁড়ো। ঝিকমিক করছে এখনও। যেন হাসছে তারা, ব্যঙ্গের বিষাক্ত হাসি। যেন বলছে, ঝ'রে গেছি তোমার জীবন থেকে। আর কেন? ভুলে যাও। সূর্য উঠেছিল একদিন তোমার জীবনে। আলোয় ঝলমল ক'রে উঠেছিলে, রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিলে। অস্ত গেছে সূর্য। নেমেছে অমারাত্রির অন্ধকার। কি হবে, দীপ্তি ও রঙের ঐশ্বর্যকে স্মরণ ক'রে?

তবু স্মরণ করে শৈলী। স্মৃতির পাতা উল্টে উল্টে দেখে। হঠাৎ-গরিব-হয়ে-যাওয়া বড় ব্যবসায়ী যেমন হিসাবের খাতায় হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলিকে খুঁজে বেড়ায়।

প্রথম যে দিন তপনের সঙ্গে দেখা হ'ল তার, সে দিনের কথা মনে পড়ে। বোধ হয় আশ্বিন মাস। পূজা আসন্ন। দাদা ছুটিতে বাড়ি এসেছে। দাদাই তাকে বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসত। বাবা স্নেহ করতেন; আদর করতেন; কিন্তু বড় রাশভারী লোক ছিলেন ব'লে সে বেশি কাছে এগোত না। মায়ের কাছেই থাকত বেশি। মা ভালবাসতেন তাকে। কিন্তু সে ভালবাসায় কেমন যেন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব ছিল। তৃপ্তি পেত না সে। অভিমান করত, কলহও করত মায়ের সঙ্গে। বলত, ভারি একচোখো তুমি মা! কিছু ভালবাস না আমাকে। দাদার জন্যেই ভেবে ম'রে যাও তুমি। আমি চোখের সামনে থাকলেও, চোখ চেয়ে দেখ না। মা মুচকি মুচকি হাসতেন। কিছু বলতেন না। দাদা কিন্তু তাকে বরাবর স্নেহ করেছে। এত স্নেহ যে কোন ভাই কোন বোনকে করে ব'লে সে জানে না। আজকাল তো স্নেহ যেন আরও বেড়ে উঠেছে, ব্যেপে

উঠেছে। দাদা যেন তার সব ক্ষত ও ক্ষতিকে স্নেহের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে চায়। এ সংসার থেকে স'রে গেলেও দাদাকে সে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

সেদিন ঝিমঝিম ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল দুপুরের পর থেকে। আকাশ মেঘে ঢাকা। বাদলা হাওয়া বইছিল। একটু শীত শীত করছিল। সে ছিল ঘরে। বিকেলবেলার গা-ধোয়া হয়ে গিয়েছিল। পরেছিল একটি চাঁপা রঙের শাড়ি। দাদা কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল তার জন্যে। পরিপাটি ক'রে খোঁপা বেঁধেছিল। খোঁপায় গুঁজেছিল রজনীগন্ধার কুঁড়ি। দাদা ডাকলে, শৈলী, শুনে যা।

যাই দাদা।—ব'লে সাড়া দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বসবার ঘরের দরজাতে গিয়েই তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। প্রতুলের কাছে ব'সে আছে তপন। তপনকে আগে দু-একবার দেখেছিল সে। তপন তার দিকে তাকাল। সে মাথা নীচু ক'রে দাদার কাছে গিয়ে বললে, কি দাদা?

দাদা বললে, চা-টা খাওয়াতে পারিস?

আসছি।—ব'লে সে চ'লে আসতে উদ্যত হ'তেই দাদা বললে, টায়ের ব্যবস্থা কি করবি? কি হ'লে চলবে হে তপন?

তপন বললে, শুধু চাই হোক না।

দাদা বললে, চায়ের সঙ্গে তেলে-ভাজা আর মুড়ি, কি বল?

তপন বললে, বেশ তো!

দাদা বললে, তাই নিয়ে আয়। পারবি তো?

সোৎসাহে সে বলেছিল, খুব পারব দাদা; এখনই নিয়ে আসছি।

মেদিনীপুরে বন্যা হ'ল সে বৎসর। দাদা ও তপন দুজনে একটি কর্মীদল গড়ল। সাহায্য তুলল শহরের লোকদের কাছ থেকে। মেয়েরা মিলে থিয়েটার করল। অনেক টাকা উঠল। কর্মীদল নিয়ে দাদা গিয়েছিল কাঁথি, কাজ করতে। তপন একবার গিয়ে কিছুদিন থেকে ফিরে এসেছিল। সে সময়ে মাঝে মাঝে সে খবর নিতে আসত তাদের। থিয়েটারে সে দুটি গান গেয়েছিল। তপন অজস্র প্রশংসা করত তার গানের। কতবার সেই গান দুটি গেয়ে তাকে শোনাতে হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষ হ'ল পরের বছরে। ফ্রী-কিচেন খোলা হ'ল শহরে। এখানের দল তখন অনেকটা গ'ড়ে উঠেছে। দাদা পাস ক'রে এখানকার কলেজে কাজ নিয়েছে। তপন এখানে থেকে ওকালতি করছে। ভুক্তি, নীরজা এসেছে। রোসেনারা এবং আর অনেক কলেজের ছেলে-মেয়ে যোগ দিয়েছে। এখানকার কাজ সকলে চালাতে লাগল। দাদা ও তপন বাসুদেবপুরে গিয়ে ওখানের জন কয়েক ছেলেকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। ওখানেও ফ্রী-কিচেন তপন নিজের খরচে চালাতে আরম্ভ করল। কাকার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গরিব চাষীদের, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের চাল দিতে লাগল। চাষীদের বীজ-ধান দিলে, চাষের খরচ দিলে। সেই সময়ে সেও মাস দুই ছিল ওখানে। তপনের সঙ্গে কাজ করেছিল। সেই দিনগুলি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে কাজ করা, নানা প্রয়োজনে নানা পরামর্শ, হাতে হাতে ছোঁওয়া, চোখে চোখে চাওয়া, হাসির জবাবে হাসি, বিরক্তির সায় দিয়ে বিরক্তি। দিনের কাজ শেষ ক'রে সকলে ফিরে আসত বাড়িতে। তপনদের বাগানের দীঘিতে স্নান করত, সাঁতার দিত। কোন কোন দিন রাত্রে দীঘির শান-বাঁধানো ঘাটের রানায় কত রাত্রি পর্যন্ত সবাই মিলে গল্প করত। তপন গান করত কোন কোন দিন। এমন চমৎকার গান সে কখনও শোনে নি। কণ্ঠের সুর থেকে যেন মধু ঝরত। গলিয়ে উঠত তার হৃদয়, তার মন। একটি মোহময় মদিরতায় তার সমস্ত চেতনা যেন মধুর আবেশে ঝিমিয়ে পড়ত। তাকেও গান গাইতে অনুরোধ করত তপন। ওর কাছে গান গাইতে লজ্জা করত তার। তবুও ওর উপরোধে প'ড়ে গাইতে হ'ত দু-একদিন। এমনই ক'রে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে তাদের দুটি মন বিদ্যুতাবিষ্ট হয়ে উঠল। পরস্পরকে করতে লাগল আকর্ষণ। তপনকে একবার না দেখলে তার ভাল লাগত না, তপনও বার বার তার কাছে আসত।

গ্রামে শুরু হ'ল কলেরা। হিমাংশুকে ডেকে পাঠানো হ'ল। তপন ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করল। সেবার ভার নিল সে নিজে। দিন-রাত রোগীদের পাশে থাকত; তাদের সেবা করত। একটুও

বিশ্রাম করবার সময় পেত না। স্নান-আহারের সময় পেত না; কেশ-বেশের পরিপাট্যের দিকে নজর-রাখা দূরে থাক্। তপন থাকত সঙ্গে সঙ্গে। মুখে কিছু বলত না। কিন্তু যখনই ওর দিকে চাইত সে, দেখত ওর স্নেহে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল চোখ দুটি তার মুখের পানে চেয়ে আছে। ওর দৃষ্টির আলোতে সে উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত হয়ে উঠত। কাজে উৎসাহ বেড়ে যেত দশগুণ। ক্লান্তির জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে নূতন উদ্যমে কাজ করত।

এমনই ক'রে পরস্পরকে ভালবাসল তারা। বাসুদেবপুরের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়ে উঠল। ওখানের কাজ ওখানের ছেলেদের ওপর দিয়ে তারা বাড়ি ফিরে এল। পুজোর ছুটিতে তপন ও দাদা বাসুদেবপুরে গিয়ে কল্যাণ-সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করল। তপন নিজের খরচে নিজের জায়গায় সঙ্ঘের বাড়ি তৈরি ক'রে দিল। নানা কাজ শুরু হয়ে গেল বাসুদেবপুরে। সুকুমার, শহীদ আরও কতকগুলি ছেলে কাজের ভার নিল। পর-বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির প্রায় সবটাই কাটিয়েছিল বাসুদেবপুরে। দাদা সঙ্গে ছিলেন। বাউরী-মুচিদের মেয়েদের নিয়ে সেবার সে নৈশ স্কুল খুলেছিল। তপনের কি উৎসাহ! স্কুলের বাড়ি ক'রে দেবে বলেছিল। সে-ই নিষেধ করেছিল তপনকে। কি দরকার মিছিমিছি টাকা খরচ ক'রে? পাড়ায় পাড়ায় মনসা-মেলা আছে, সেখানে স্কুল বসলেই পারে। যে কোন কাজে, বিশেষ ক'রে সে কাজের সঙ্গে যদি তার যোগ থাকত, তপন দু হাতে টাকা খরচ করত। সেই বরং রাশ টেনে রাখত। শেষে খরচের ভার সে নিজের হাতে নিয়েছিল। তপন ওর সই-করা চেক-বই তাকে দিয়েছিল। বাসুদেবপুরের কাজে যা খরচ হ'ত, সুকুমার বা শহীদ তার কাছ থেকে নিয়ে যেত।

ক্রমে বিরোধ বাধল রায় বাহাদুরের সঙ্গে এবং পাশের গ্রামের মুসলমান জমিদারের সঙ্গে। ওদের অত্যাচারের অস্ত্র যাচ্ছিল ভোঁতা হয়ে। প্রজারা বিগড়ে যাচ্ছিল। জানাচ্ছিল নিত্য নূতন দাবি। প্রতিবাদ করছিল অন্যায় শাসন ও শোষণের। সামান্য ব্যাপারেও সরাসরি সরকারের কাছে নালিশ করছিল। এসব ব্যাপারে তপন

তাদের বুদ্ধি দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছিল। ফলে যারা শত অত্যাচারেও কোনদিন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে নি, সেই নিরীহ দরিদ্র প্রজারাও, গোমেস্তাবাবুরা সামান্য চোখ রাঙালে রুখে উঠছিল।

দুই জমিদার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল দিন দিন। কল্যাণ-সঙ্ঘের উচ্ছেদের জন্যে নানা ভাবে নানা চেষ্টা করতে লাগল।

এ বৎসর পৌষ মাসে কৃষাণ-সভা বসল বাসুদেবপুরে। সভায় গিয়েছিল তারা। এখানের কর্মীরা সকলে গিয়েছিল। সভায় স্থির হ'ল, প্রজারা জমিদারকে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি দেবে না। জমিদার এতে রাজী না হ'লে তারা জোর ক'রে জমি চাষ করবে। এতে জান দিতে হ'লেও তারা পিছপাও হবে না। তপন সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল এই প্রস্তাবে। তাহার মহানুভবতায় সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সভা শেষ হবার পর সবাই ফিরে গেল। দাদাও চ'লে গেল। তাকে থেকে যেতে হ'ল। সুকুমারের মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মেয়েলী অসুখ। মেয়েদের দিয়ে ছাড়া সেবার সুবিধে হয় না। সুকুমার তাকে থাকতে অনুরোধ করল। সুকুমারের মাও। সুকুমারের মা তাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করেন। তাঁর অনুরোধ সে এড়াতে পারল না। এড়াবার ইচ্ছেও ছিল না বেশি। তপনকেও তার জমিদারির কাজে থেকে যেতে হ'ল কিনা। এবার এত লোকের ভিড়ে, এত কাজের ভিড়ে তপনকে সে একান্তভাবে একদিনও পায় নি। সকলের কাছ থেকে দূরে, সকল কাজ থেকে দূরে, নির্জন নিভৃতে ওর সঙ্গ-সুধা পান করবার জন্যে হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল তার।

তপন রোজ সকালে সুকুমারের মায়ের খবর নিতে আসত। এক-দিন এসে বললে, আজ বিকেলে শিকার করতে যাব। যাবে নাকি? মুখে যা বললে, চোখে বললে তার চেয়ে বেশি।

সে বলেছিল, কোথায় যাবে?

তপন বললে, কনেমারার জঙ্গলে। মিষ্টি হেসে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, ভয় নেই। আমার কনেটিকে কেউ মারতে পারবে না। বরের হাতে বন্দুক থাকবে।

ওর মিষ্ট চাহনি ও মিষ্ট হাসির মদিরতায় মাতাল হয়ে উঠেছিল তার মন ; মনে হয়েছিল, ও যদি চায়, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই তার, যা ওকে সে দিতে পারবে না।

সুকুমারের মা সেদিন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। সে যেতে রাজী হ'ল।

সেদিন দুপুর থেকে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হ'ল। শীতের সূর্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছিল ধূসর রঙের মেঘের স্তূপের আড়ালে। তপন যখন এল, তখন মেঘ জ'মে উঠেছে পশ্চিম আকাশে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

সে বলেছিল তপনকে, বৃষ্টি আসে যদি ?

তপন বলেছিল, আশ্রয় পাওয়া যাবে। ভিজতে হবে না।

বিস্তৃত মাঠ পার হ'লেই একটা জোড়। জোড়টা পার হয়েই জঙ্গল শুরু হ'ল। শাল পিয়াল পলাশের জঙ্গল। তা ছাড়া আরও অনেক রকমের গাছ। এখানে সেখানে কাঁটাগাছের ঘন ঝোপ। পায়ে-চলা সরু পথ দিয়ে তারা চলল পাশাপাশি। শুকনো ঝরা পাতায় ছেয়ে গেছে পথ। চলতেই খসখস শব্দ হচ্ছিল। দু-একটা খরগোশ রাস্তার পাশে খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে তাদের পায়ের শব্দে চকিত হয়ে উঠে লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল।

কতকটা গিয়েই একটা দীঘি। খুব উঁচু পাড় দীঘিটার। দীঘির ধারেই একটা ছোট টিনের ঘর। টিনের ঘরটার পাশেই একটি ছোট সমাধি-মন্দির। তপন বললে, এই ঘরে এক সাধু থাকতেন। বাবা এই ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন সাধুর জন্যে। ঐ সাধুর সমাধি-মন্দির। ওটাও বাবা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন।

সে বলেছিল, চল, ওঁকে প্রণাম করিগে।

তপন কৃত্রিম বিস্ময়ে দু চোখ ডাগর ক'রে বলেছিল, বল কি, কম্যুনিস্ট মেয়ে ?

সে আবদারের সুরে বলেছিল, না, চল।

দুজনেই প্রণাম করেছিল সমাধি-মূলে। তপন জিজ্ঞাসা করছিল, কি চাইলে ?

সে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, বলব কেন তোমাকে? ওকে সে বলে নি। কিন্তু মনে মনে বার বার বলেছিল ওর অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনাটি—ওকে যেন পাই। হে সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, আশীর্বাদ কর আমাকে।

দীঘির পাড়ে উঠল তারা। দীঘির ওপাশে একটি ছোট পল্লী দৃষ্টিপথে পড়ল।

তপন বললে, সাঁওতালদের পাড়া।

তাদের প্রজা ওরা। দীঘির জল পদ্ম ও শালুকের দলে আচ্ছন্ন। পুকুরের মাঝেখানে যেখানে কালো জল চকচক করছে; কয়েকটা পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, মাঝে মাঝে ডুবছে, আবার উঠছে। ওদিকের ঘাটে দুজন সাঁওতাল যুবতী মাটির কলসীতে জল ভরছে। নিজের মনে জল ভ'রে নিয়ে চ'লে গেল ওরা; ওদের লক্ষ্য করল না। চারিদিকে অপরাহ্নের শান্ত উদাস স্তব্ধতা। দূরে ঘুঘু ডাকছে।

তপন বললে, পানকৌড়ি একটা মারা যাক।

সে তার হাত ধ'রে বলেছিল, না না, থাক্, শিকার ক'রে কাজ নেই আজ।

পাড় থেকে নেমে গিয়ে একটা শালগাছের নীচে ঘাসের উপর তারা বসল।

মেঘ ক্রমে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। দিনের ক্ষীণ আলোটুকু নিবে গেল একেবারে। সে বললে তপনকে, ফিরে যাওয়াই ভাল।

তপন বললে, ভয় কিসের তোমার? আমি সঙ্গে রয়েছি।

সে বললে, ভয় নয়। বৃষ্টি আসতে পারে।

তপন বললে, ঐ। আসতে পারে কি? আসবে এখনই। এখন গেলে ভিজতে হবে রাস্তায়। তা না ক'রে, ঐ ঘরটায় বসিগে চল।

ঘরের ভিতরটা ধুলোতে ভ'রে আছে। নিজের ওভারকোটটা পেতে দিল তপন। দুজনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসল।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু ক'রে বইতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি। দরজার কপাট ছিল না। বাতাস ও বৃষ্টির ঝাপটা

আসছিল ঘরের মধ্যে। বরফের মত ঠাণ্ডা; সর্বশরীর অসাড় ক'রে দিচ্ছিল। সারা দেহ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল থরথর ক'রে।

তপন বললে, শীত করছে তোমার? আমার কাছে স'রে এস।

সে একবার তপনের মুখের দিকে তাকাল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল ওর; যেন ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। ভয়ে বুকটা দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠল তার।

তপন বললে, এস না। আমার কাছে আসতে লজ্জা!

গলা শুকিয়ে এল তার। কোনমতে বললে, না, না, বাড়ি চলুন।

তপন হাসল, বললে, পাগল! এখন বাড়ি যাওয়া যায়! একটু থেমে বললে, বাড়ি-বাড়ি করছ কেন? বাড়িতে কে আছে তোমার? আমাকে এইটুকু সময়ের জন্যে বিশ্বাস করতে পারছ না, সারা জীবনের জন্যে বিশ্বাস করবে কি ক'রে?

পুলকের ঢেউ উপচে পড়ল তার হৃদয়ের তীর ছাপিয়ে। চোখে চোখ মিলিয়েছিল তপনের সঙ্গে। তপনের চোখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করেছিল সে; ওর মনের কথা জানবার চেষ্টা করছিল ওর মুখের ভাবে।

আবেগে গাঢ়, উত্তেজনায় কাঁপা স্বরে তপন বলেছিল, এখন একটু কাছে স'রে আসতে ভয় করছে তোমার, অথচ দুদিন পরে—

সেদিন নিজেকে সে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল তপনের কাছে।

বৃষ্টি একটু ক'মে এল কিছুক্ষণ পরে। অন্ধকার তখন ঘন হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। তপনের কাছে টর্চ ছিল; টর্চের আলো দেখিয়ে তপন তাকে হাতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, সাঁওতালদের পল্লীতে। সাঁওতালদের যে মোড়ল, সে আপ্যায়ন সহকারে তার ঘরের দাওয়ায় খাটিয়ার উপরে বসিয়েছিল তাদের। বাড়ির মেয়েরা জড়ো হয়েছিল তাদের সামনে। বড় বড় চোখ ক'রে গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখছিল তাকে। একটি বুড়ী তপনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর বউ বটে?

তপন 'হাঁ' বলেছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। তারপর তারা

চ'লে এল। দুজন সাঁওতাল তাদের সঙ্গে এসে তাদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। আসবার সময়ে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল; তপন তার ওভার-কোটটা তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। সে নিষেধ করেছিল; কিন্তু তপন তার কথা শোনে নি।

পরদিন তপনের জ্বর হ'ল। খবর পেয়েই সে স্থকুমারকে সঙ্গে নিয়ে তপনের বাড়ি গেল। ওখানে থেকে ওর সেবা করতে লাগল। জ্বর বেড়ে উঠতে লাগল। গোমস্তাবাবু তপনের মাকে খবর দিলেন। অবিলম্বে রায় বাহাদুর তপনের মাকে নিয়ে এলেন এবং তপনকে নিয়ে শহরে চ'লে গেলেন। তপন তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, রায় বাহাদুর তার কথায় কান দিলেন না। তার পরদিন সে স্থকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

রায় বাহাদুর তপনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন। দাদার সঙ্গে একদিন তাকে দেখতে গিয়েছিল সে। বাইরে থেকে খবর নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করে নি। কিন্তু কেমন ক'রে যে সেই দিনগুলি কেটেছিল তা সে-ই জানে, আর হয়তো ভগবান জানেন।

সেরে উঠে তপন শরীর সারতে মধুপুরে চ'লে গেল। সেখান থেকে চিঠি লিখেছিল তাকে। চিঠিতে তার সেবা ও সঙ্গের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিল। ক্রমে পত্রালাপ বিরল, পরে বিরত হ'ল। তার অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে, রায় বাহাদুরের সাহায্যে, আর একজন তপনের হৃদয় অধিকার করল। সে নির্বাসিত হ'ল তার হৃদয় থেকে।

এমনই ক'রে দিনের পর দিন জীবন-স্মৃতির এই পৃষ্ঠাগুলি উল্টে উল্টে পড়েছে শৈলী, অলস অবসরে, মায়ের রোগ-শয্যার পাশে ব'সে। একদিন ভেবেছিল, তপনের সঙ্গে দেখা করবে; বুঝিয়ে বলবে ওকে; যে মহৎ বৃত্তির প্রেরণায় আজ কয়েক বৎসর ধ'রে সে দরিদ্রের সেবা করেছে, তাদের সাহায্য করেছে, সেই মহত্ত্বকে সচেতন ক'রে তুলবে মোহাবেশ থেকে জাগিয়ে। হয়তো জাগাতে পারবে না তার প্রাক্তন প্রেমকে, কিন্তু জাগাবে তার কর্তব্যবুদ্ধি। তারই তাড়নায় সে হয়তো তাকে গ্রহণ করবে।

কিন্তু আড়াল থেকে নিজের জন্ম-ইতিহাস শোনাবধি সেই সঙ্কল্প সে ত্যাগ করেছে। এ সমাজে কারও সংসারে বধূ হয়ে প্রবেশ করবার অধিকার তার নেই। যদি তপন তাকে এমন ক'রে ত্যাগ না করত, তা হ'লেও এ কথা জানবার পর সে নিজে থেকেই তার কাছ থেকে দূরে স'রে আসত। আমাদের সমাজে এমন মহৎ যুবক কজন আছে, যে ভ্রষ্টা মাতার কন্যাকে বিনা দ্বিধায় বিবাহ করতে পারে?

তবু একটি বার তপনের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। কিছু কথা বলবার আছে তার সঙ্গে; কিছু প্রয়োজনও আছে। আর মনের গোপন কোণে লুকিয়ে আছে একটি কামনা—তাকে একটি বার দেখবার। অনেক দিন দেখে নি। সারা মনে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে তপনের প্রতি ওর প্রেমকে সে পুড়িয়ে ছাই করবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। অক্ষয় অক্ষত হয়ে আছে তার প্রেম। তপন তাকে ত্যাগ করলেও, সে তার অন্তর জুড়ে ব'সে আছে। প্রথম প্রেমকে ভোলা মেয়েমানুষের সাধ্য নাকি! অন্তরের গভীরতম স্তরে সে বাসা বাঁধে।

শৈলী শুনেছে, তপনের আজ আশীর্বাদ। কয়েক দিন পরে বিয়ে। আজই সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তপনের বাড়ি যাবে; কোন রকমে তাকে ডাকিয়ে আনিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। সঙ্গে যাবে পদ্মা।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে একলা ব'সে সে পদ্মারই প্রতীক্ষা করছে।

৩১

তপনের বাড়িতে উৎসবের ঢেউ বইছে। রায় বাহাদুরের পুত্র-পুত্রবধূরা নাতি-নাতনীরা সবাই এসেছে। আরও নানা আত্মীয়-স্বজন এসেছে। সমস্ত বাড়িটা আনন্দকলরবে মুখর। ঘরে বাইরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। সারা বাড়িটা ঝলমল করছে। বাড়ির সামনে বাঁধা হয়েছে মঞ্চ। তার উপরে নহবত বাজছে। সানাইয়ে বাজছে—পূরবী নয়, ছায়ানট।

রাত্রি সাড়ে নটায় আশীর্বাদ। পুরোহিত পাঁজি দেখে শুভক্ষণ নির্দেশ ক'রে দিয়ে গেছেন। দুটি নর-নারীকে কেন্দ্র ক'রে যে নাটক

রচিত হবে, আজই তার প্রস্তাবনা। সেটা শুভক্ষণে হওয়া দরকার। নাটকের পরিণতি এর উপরে নির্ভর করবে সম্ভবতঃ।

রাত্রি আটটা। শোবার ঘরে তপন সাজছে। স্নান করেছে। পরেছে শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি। মাথায় ব্রাস চালিয়েছে বহুক্ষণ ধ'রে। দামী পুষ্পসার ছড়িয়েছে কাপড়ে-জামায়। একটি মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাস ভ'রে গেছে। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, প্রসাধন-পারিপাট্য নিখুঁত হয়েছে কি না, অতি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করছে।

ছোকরা চাকর খবর দিলে, বাইরে আপনাকে ডাকছে একজন।

আয়নার দিকে তাকিয়ে থেকেই তপন বলল, কে?

একজন মেয়েমানুষ।

আঁতকে উঠল তপন, বললে, ভদ্রঘরের মেয়ে?

তা আমি জিজ্ঞাসি নি। জিজ্ঞাসে আসব?

বিরক্তির ভ্রূকুটী ক'রে তপন বললে, জিজ্ঞেসে আসব? দেখে বুঝতে পারিস নি? এই যে তোর বউদিদিমণিরা এসেছেন, ওদের মত দেখতে?

এজ্ঞে না।

গায়ে জামা আছে, পায়ে জুতো আছে?

এজ্ঞে, তা তো দেখি নি।

সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল তপনের মুখে। কপালে ফুটে উঠল কুঞ্চনরেখা। একটু ভাবল; তারপর বললে, চল্ দেখি।

চশমাটা প'রে, স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে নেমে গেল নীচে।

পদ্মাকে দেখে হাঁফ ছাড়ল তপন। নিশ্চিন্ততার সহজ সুরে বললে, পদ্মা? কি খবর?

পদ্মা মৃদুস্বরে বলল, শৈলী দিদিমণি একবার দেখা করতে এসেছেন।

মুখ কঠিন হয়ে উঠল তপনের এক মুহূর্তে। নীরস কণ্ঠে বললে, এখন তো দেখা করতে পারব না। ভারি ব্যস্ত আমি।

পদ্মা বললে, দু মিনিট কথা ব'লেই চ'লে যাবেন। দরকারী কথা।

বিরক্তিতে মুখ বিশ্রী ক'রে তপন বললে, কি মুশকিল বল

দেখি! এখনই বাড়িতে ডাক পড়বে। একবার নড়বার উপায় নেই আমার।

পদ্মা মিনতি ক'রে বললে, একটি বার আসুন দয়া ক'রে।

তপন বললে, কোথায় আছে?

বাগানের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।—পদ্মা বললে।

তপনদের বাড়ির পিছনে বাগান। বাগানের পিছনে মাঠ। মাঠের আল-পথ ধ'রে শৈলীদের বাড়িতে যাওয়া যায়। বাগানটার তিনটে দিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়াল খুব উঁচু নয়। পিছনের দেওয়ালে একটা লোহার গেট আছে। গেটটার পাশেই অন্ধকারে বাগানটার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল শৈলী। বাগানটা তার অতি-পরিচিত। কতবার দাদার সঙ্গে এসেছে এখানে। নিজের হাতে কত গাছ লাগিয়েছে—বেলা, করবী, চাঁপা, গন্ধরাজ, জুঁই, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা। গেটের কাছেই একটা করবীগাছ ফুলে ভ'রে গেছে। বাড়ির জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে গাছটার উপরে। গাছটা যেন হাসছে।

পদ্মা এল। শৈলী জিজ্ঞাসা করলে, কি বললেন?

পদ্মা বললে, আসছেন। ভারি বিরক্ত হলেন।

ম্লান হাসল শৈলী। অন্ধকারে পদ্মার তা চোখে পড়ল না।

গেট খোলার শব্দ হতেই শৈলী একটু পিছিয়ে গেল। তপন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে শৈলীকে ঠাহর ক'রে দেখে বললে, নমস্কার! হঠাৎ এ সময়ে দেখা করতে এসেছেন?

শৈলীর বুকের ভিতরটা দাপাদাপি শুরু করল। গলায় স্বর বেরুচ্ছিল না। কোন মতে কাঁপা সুরে বললে, বিশেষ দরকারে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

উদ্ধত স্বরে তপন বললে, কি এমন বিশেষ দরকার আমার সঙ্গে?

শৈলী এক মুহূর্তে সামলে উঠল। এর কাছে দুর্বলতা দেখিয়ে, এর আত্মপ্রসাদের খোরাক জুগিয়ে লাভ কি? স্থির মৃদু কণ্ঠে বললে, আপনার দরকার শেষ হতে পারে, কিন্তু আমার দরকারের জের এখনও মেটে নি।

শশঙ্কভাবে ব'লে উঠল তপন, মানে ?

স্থির দৃষ্টিতে তপনের দিকে চেয়ে থেকে শৈলী ব্যঙ্গের স্থরে বললে, মানে! বুঝতে পারছেন না, না? খুব ছেলেমানুষ আপনি!

তপন তীক্ষ্মস্থরে জবাব দিলে, ছেলেমানুষ যে নই, সেটা আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। আপনার দেখা করতে আসা শুনে আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হয় নি আমার।

শৈলী বললে, তাই নাকি ?

তপন তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্থরে বললে, হ্যাঁ। আপনার মত মেয়েদের লীলাখেলা ভাল ক'রেই জানি কিনা। বড়লোকদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলে তাদের ঘাড়ে চড়বার চেষ্টা!

শৈলী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। অপমানের জ্বালায় জ্ব'লে উঠল মন। কঠিন কথার কঠিন জবাব এল মুখে। সবলে সামলে নিলে নিজেকে। ধীরে ধীরে বললে, কার ফাঁদে কে পড়েছে, সে কথা থাক্। ঘাড়ে চড়তে আমি আসি নি। জোর ক'রে কারও ঘাড়ে চড়ব, এতটা নীচ আমাকে না ভাবলেও পারেন। আমার যত ক্ষতিই আপনি ক'রে থাকুন—

প্রতিবাদ করল তপন, কি ক্ষতি করেছি ?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শৈলী বললে, বেশ। ক্ষতি কিছুই করেন নি—

তপন বললে, সত্যি কিছু করি নি। তা ছাড়া যা নিয়েছি, তার দাম দিতে কসুর করি নি।

শৈলী তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, তা দিয়েছেন। ন্যায়বুদ্ধি আপনার অত্যন্ত প্রখর। তবে জেনে রাখুন, দাম দিচ্ছেন জানলে কোন জিনিস কোন দিন নিতাম না আপনার কাছে। আর আজ আপনার কাছে ছুটেও আসতাম না। একটু থেমে বললে, তপনবাবু! আপনি দাদার বন্ধু। মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম আপনার মধ্যে। তাই একদিন ধরা দিয়েছিলাম আপনার হাতে। আপনি ভিতরে ভিতরে এত জঘন্য জীব জানলে বাড়িতে ঢুকতে দিতাম না কখনও—

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের স্বরে তপন বললে, তাই নাকি? তা হ'লে এত চালিয়াতি চলত কি ক'রে? একটু থেমে বললে, আমি সটকে পড়েছি ব'লে এত চিন্তা কিসের আপনার? দাদাকে বলবেন, ভাল লোক জুটিয়ে দেবে আবার।

অপমানে চোখে জল এল শৈলীর। ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে বললে, চুপ করুন। আপনার কাছে দাঁড়াতেও গা ঘিনঘিন করছে আমার। যা প্রয়োজন দু মিনিটে শেষ ক'রে দিতে চাই।—ব'লে একটা কাগজের পুলিন্দা তপনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, যা যা দিয়েছিলেন আমাকে, সব আছে ওতে। বাড়িতে লিস্ট দেখে মিলিয়ে নিন গে।

তপন বিস্ময়ের স্বরে বললে, সে কি! যা দিয়েছি—

বাধা দিয়ে শৈলী বললে, আর দাতাগিরি দেখাতে হবে না আপনাকে। ওসব ভান অন্য জায়গায় করবেন। একটু থেমে বললে, কোন দিন আর আসব না আপনার কাছে। সব শেষ ক'রে দিয়ে চললাম। কেউ কোনদিন কোন কথা আপনাকে বলবে না। নির্ভয়ে বিয়ের আসনে বসুন গে।

তপন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

পদ্মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। শৈলী বললে, এস পদ্মা।—ব'লেই দ্রুতপদে চলতে শুরু করল।

তপন তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। শৈলী, তার পিছনে পিছনে পদ্মা মাঠের মধ্যে নেমে গেল। অন্ধকারে তাদের আর দেখা গেল না।

[ক্রমশ]

শ্রীঅমলা দেবী

মানুষে যা চায় (Whatever man wants)

কি চায়?

ব'সে ব'সে ছবি দেখছিলাম। 'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে। ইঁদুরছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে।'

ছবিগুলি ভেঙে ভেঙে বুঝে নিচ্ছিলাম। ইঁদুরছানা ঈগলের খাবার খোঁচা চায় না; পাছে ঈগল ধরে, তার কাছেও থাকতে চায়

না; ইন্দুরছানা তার বাসার আশেপাশে বিপদ চায় না, অর্থাৎ নিরাপদ বাসস্থান চায়। অজগর তেড়ে আসছে, একটা কিছু ধরবার জন্য নিশ্চয়। আমটি আমি পেড়ে আনতে চাই, খাবার জন্য।

ভেবে দেখলাম, মানুষের স্বভাব এই। আমি যেন সুস্থ থাকি, এবং যেন নিরাপদ বাসস্থানে থাকি, আর যেন যা চাই তা পাই। দেখে শুনে আরও ইঙ্গিত পেলাম, মানুষ বাহবা-প্রশংসা চায়, আর চায় অধিকার। এক তাপস বলেন, Belongingness—আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা বাপ মা ভাই বোন, আমার জমা জমি বাড়ি ঘর গাড়ি ঘোড়া, আমার প্রয়োজনে ও স্বার্থে। এগুলি মানুষ চায় এবং পেলে সুখী হয়।

দেখছি, মানুষ মূলে চায় দুটো জিনিস—স্বাস্থ্য ও জয়। স্বাস্থ্য থেকে দুটো শাখা পাই—অরোগ ও অপ্রবাস। জয় থেকে পাই তিনটে—জয়, যশ ও অধিকার। আমরা মোটামুটি ধ'রে নিতে পারি, মানুষের চাওয়ার বা সুখের পঞ্চরূপ—অরোগ, অপ্রবাস, জয়, যশ, অধিকার।

সুখী হও (Be Happy)

পঞ্চ সুখের সন্ধানে মানুষ পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও তাই। পথ খুঁজতে গিয়ে আমাদের স্বপ্নে একটা বাণী ভেসে উঠেছে। 'সুখী হও' ('Be happy') 'Happy' শব্দটা ভাঙা যাক,—Health, Atmosphere, Progress, Praise, Your belongingness। এর বাংলা অনুবাদ হয় ঐ—অরোগ, অপ্রবাস, জয়, যশ ও অধিকার।

আমরা পথ পাবই

পথ আমরা পাবই। এবং পথের সন্ধানও দিতে পারব। তবে সংক্ষেপে। Fundamentals-এর outline—সার কথা দিতে পারলেই খুশি হব। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না, আবার একটা প্রশ্নেরও সব উত্তর কেউ দিতে পারে না। বারো আনা প্রশ্নের বারো আনা জবাবই যথেষ্ট। স্বয়ং ভগবান কি পারেন, না-পারেন, তিনিই জানেন, তোমার আমার এবং দর্শন-বিজ্ঞানেরও সীমা ঐ পর্যন্ত। সংসারে ফেলের সংখ্যা এত বেশি এই জন্য যে, এক আনা প্রশ্নের এক আনা জবাবও পাই না।

মানুষ দাম দিতে নারাজ, পরিশ্রমেও বিমুখ। অতএব আমাদের পথ হবে স্বাভাবিক, পরিমিত, সহজ, মিষ্ট ও নির্ভুল। পঞ্চস্বভাব পথ চাই, Natural, Normal, Easy, Sweet and Infallible।

পথের সন্ধান দিলেই কেউ মেনে নেয় না। প্রমাণ চায়, ফল চায়, আবার সবার পক্ষে খাটে এমন ওষুধ চায়। আমাদের তাই পেতে হবে, যা সবার পক্ষে খাটে, যার পেছনে Tradition—পারম্পর্য আছে, যা বিজ্ঞানসম্মত, যা পরীক্ষাযোগ্য এবং যার ফল পাব শীঘ্র, আজই, এখনই। পঞ্চগুণ পথ। Applicable to all, Traditional, Scientific, Experimental and Immediate Result.

সুস্থ হও (Be Healthy)

জয়। মানুষ যা চায় তা পেলেই তার জয়। জয়-আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাব।

যশ। তোমাকে ভাল বললে, প্রশংসা করলে, স্বীকার করলে, তোমার অহমিকাকে স্বীকার করলে, তুমি খুশি—ঐ তোমার যশ। আত্মরক্ষার পরই মানুষের অহমিকা, কোথাও বা অহমিকা আত্মরক্ষার উপরে। এখানে আহত হ'লে মানুষ বানচাল হয় সব চাইতে বেশি, হিংসা প্রতিহিংসা উদ্বেগ সব জাগে এখান থেকে। অপমানবোধে নরহত্যা, আত্মহত্যা থেকে শুরু ক'রে সব অনর্থই হয়।

অধিকার। এক তাপস বলেন, সুখের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত তার Belongingness—অধিকার। এই অধিকার যত exclusive—অনন্য হবে, ততই সুখের মাত্রা বাড়বে। আমার স্ত্রী, আমারই স্ত্রী।

অপ্রবাস। অপ্রবাস সম্বন্ধে এতদিন ভুল ধারণা ছিল। এতদিন বুঝে এসেছি, নিজের গ্রামে বাপ-পিতামহের ভিটেয় বাস অপ্রবাস। আজকের বৃহত্তর দৃষ্টিতে সেই ধারণা বদল হয়েছে। প্রশস্ত পটে দেখেছি, জ্ঞাতি-প্রতিবেশীর অত্যাচার, অনাচার ও সমাজের জুলুমে তোমাকে ভিটেছাড়া করে। আজকের এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, কত কত চোদ্দপুরুষের ভিটে এখন বারুদের আগুন। অতএব অপ্রবাস মানে নিরাপদ বাসস্থান, যেখানে নিশ্চিন্তে বাস করতে পারি,

আত্মপ্রকাশ করতে পারি ও প্রতিবেশীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাই। মহাভারতের যুগে কি ছিল, না ছিল, জানি না, দরকারও নেই, আমাদের ব্যাখ্যাই আজকে খাপ খাবে ভাল।

অরোগ। মানুষের সকলের চাইতে বড় কাম্য স্বাস্থ্য বা অরোগ। দাঁতে ব্যথা বা কলিক হ'লে কিছুই ভাল লাগে না। স্বাস্থ্য, যা সাধারণ জ্ঞানে বুঝি, তাই নিয়েই এখন কাজ শুরু করি। পথ চলতে এর একটা বাণী পেলাম, 'সুস্থ হও' (Be healthy) বিস্তারিত ভাষ্য না দিয়ে, এখানে বাণীটা শুধু ভেঙে দিয়ে যাই। Harmonius enjoyment and adjustment and longevity and transference of longevity to children and memory and hereafter and youth—মানুষ নিজের বৃত্তির এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত আকুতির পরিপূরণ ও তৃপ্তি চায়, কিন্তু কোথাও সুর বা তাল না কেটে। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। জানে মানুষ অমর নয়, অতএব সন্তান ও মানুষের স্মৃতিতে (কীর্তিতে) বেঁচে থাকতে চায়, এখানেই স্বর্গ, ধর্ম, এসব কল্পনা। মানুষ যৌবন রাখতে চায়।

পুঁজি

সুখের ও স্বাস্থ্যের খানিকটা চেহারা দেখলাম। পথের সন্ধানে যাত্রা করতে পাথেয়-চিন্তা আসে প্রথম। যা সহজাত, তাই নিয়ে যাত্রা করতে হবে। পুঁজির কথা ভাবি নে। একাধিক ত্রুটি, পঙ্গুতা (handicap) নিয়ে, কেবল মাত্র একটা কানাকড়ি সম্বল ক'রেই, ষোল আনা জয়ের পথ খুঁজতে বের হয়েছি। অসম্ভব? তবে অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমাদের খেলা। ভয় দেখালেও ভয় পাই নে, আবার মুরুব্বিয়ানার গোঁফে তা দেখেও হাসি পায়। আমরা নাবালকও নই, পরমুখাপেক্ষীও নই। গাধা, বৃদ্ধ ও তার পুত্রের গল্পটা আমাদের পড়া আছে।

আমরা ষোল আনা আশাবাদী। পাথরে বীজ ছড়াতেও পেছপাও হই নে। জানি, কখন কোন্ বীজটা গড়িয়ে গিয়ে কোথায় কোন্

ফাটলে প'ড়ে অঙ্কুরিত হবে একদিন। আমাদের চেষ্টা ও নিষ্ঠা সফল হবেই।

সুখের স্বরূপ

চলতি কথায় বলে, মানুষ সুখশান্তি চায়। অসুখ হ'লে শান্তি থাকে না, আবার অশান্তিতে কেউ সুখী হয় না। অতএব সুখ শান্তি একে অন্যের মধ্যে নিহিত। অতএব সুখ বলতে সুখ-শান্তি দুইই বুঝি। আলোচনা ক'রে তো দেখলাম সুখের পঞ্চরূপ এবং তার মধ্যে স্বাস্থ্যের ও স্বভাব চতুষ্টয়ের একটা স্থূল ধারণা পেয়েছি। এই সাধারণ আলোচনাতে এখনও সুখের ঠিক স্বরূপ বুঝতে পারি নি, এখনও ধোঁয়াটে ভাব যায় নি। একবার চারদিকটা ঘুরে ফিরে সুখের কতকগুলি ছবি দেখে আসি, যাতে ধারণাটা আরও পরিষ্কার হয়। পথের সন্ধান বা টেকনিক ভাবা তখন হয়তো সহজ হবে।

সুখ বুঝি তুলনায়

'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশে নি যারে'। সত্যি কথা। আমার সুখ আমিই বুঝি, আমার দুঃখ আমিই বুঝি। তুলনা ক'রে ইঙ্গিত ক'রে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি মাত্র। খানিকটা কাজ হয়। পুরো নয়।

সুখ বোঝাতে হ'লে অসুখের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। দর্শন-বিজ্ঞানও বেশির ভাগই তাই করেছে। অসুখ না থাকলেই সুখ, আর সুখ না থাকলেই অসুখ। দর্শন বলে, 'দুঃখের নিবৃত্তি সুখ' আর দুঃখ অত প্রকার তত প্রকার—ভৌতিক, দৈবী ইত্যাদি।

সতের গণ্ডা দৃষ্টান্ত দিয়ে দুঃখ বোঝাতে পারি। সুখ নয়। পায়ে কাঁটা ফোটা দুঃখ, দাঁতে ব্যথা দুঃখ, খেতে না পাওয়া দুঃখ, মনে উদ্বেগ দুঃখ, ওর মেয়ে দুধ পায় আমার ছেলে দুধ পায় না, ওর মোটরগাড়ি আছে আমার নেই। দুঃখ দেহেরও হয়, মনেরও হয়।

দেহের দুঃখে তুমি, আমি ও পশু পনের আনা সমান। পনের আনা বলছি এই জন্য যে, দেহের দুঃখও খানিকটা শিক্ষা ও কালচারে পাওয়া। যেমন শীত সবারই আছে এবং গরম পেলে শীত যায়, তবু একটু তফাত হয়। ডাউনের লেপ না হ'লে তোমার দুঃখ হয়, কুলি-কম্বলে আমার

চলে, আর যে কোন প্রকারে গরম পেলেই পশুর যথেষ্ট। মনের সুখ-দুঃখবোধে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে অনেক প্রভেদ। অবশ্য দেহমন অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গী, বোঝবার সুবিধের জন্য ভাগ করা।

সাইকোলজিস্ট বলেন, সুখী এবং অসুখীর একই সমস্যা, কেবলমাত্র তাদের মনের ভাবের তফাত। অর্থাৎ, সমস্যা সমাধান করবার টেকনিকের প্রভেদ। সহজ কথায় বলি, পাতার একটা পৃষ্ঠা কালো থাকলে আর একটা নিশ্চয়ই আলো। যে কোনও দুঃখের উল্টো দিকে আশীর্বাদ আছেই, অতএব আশীর্বাদের পৃষ্ঠার দিকে নজর দিলেই দুঃখ উবে যাবে। 'প্রত্যেক জিনিসে আশীর্বাদ (blessings) দেখ, প্রত্যেক ব্যর্থতার মধ্যেই শিক্ষা বেছে নিয়ো'—এই হ'ল পশ্চিমী এক তাপসের টেকনিক। আশীর্বাদ দেখবার অভ্যাস ক্রমে রপ্ত হয়ে গেলে উদ্বেগের হাত এড়াতে পারি। ছোটখাট ব্যাপার থেকে অভ্যাস আরম্ভ করতে হয়। 'Blessings in disguise'—'শাপে বরে'র অসংখ্য দৃষ্টান্তে আলোর পৃষ্ঠার সাক্ষী দেয়। জন্মান্ধ কালা বোবা হেলেন কেলার ও নেপোলিয়ানের প্রসঙ্গে দেখেছি, সন্তোষ মনে।

সুখ মানে সুখ

আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'দুঃখের নিবৃত্তি সুখ'। ওঁরা বলেন, Happiness is just what you think is happiness—তুমি যাকে সুখ ভাব, ঠিক তাই সুখ। আর এক তাপস বলেন, Happiness is the feeling of being happy—সুখী হওয়ার ভাবই সুখ। সুখ মানে অসুখ নয়, অসুখ মানে সুখ নয়। ছেলেমানুষী ব্যাখ্যা। তা তো বটেই। উপায় কি?

আসল কথা হচ্ছে, তুমি সুখী কি অসুখী, তা একমাত্র তুমিই বলতে পার, আর কেউ না।

অসুখ ধাক্কা দেয়

তুমি অসুখের কথাটা বল, অসুখটা বোঝাতে চাও। সুখের কথাটা বলবার দরকার হয় কমই। তোমার পায়ে কাঁটা ফুটে ব্যথা, পা দেখিয়ে বল, ব্যথা এখানে। কিন্তু যার কাঁটা ফোটে নি, সে কি কখনও

পা দেখিয়ে বলে যে 'আমার সুখ এখানে?' অসুখ বোঝাতে যেন তেড়ে আসি, সুখ বোঝাতে তেড়ে আসি কি?

সুখের চেহারা ও নিরিখ

সুখ ব্যক্তিগত। বাইরের ধাক্কায় ইতরবিশেষ হয় না, এমন কথা বলছি না; কিন্তু বাইরের আঘাতকে নিজের মনে অনুবাদ ক'রে যার যার ভাষার মত মানুষ সুখ দুঃখ বোঝে। স্থান কাল পাত্রাদি নিয়ে যেমন ভাল মন্দ, তেমনই সুখ দুঃখও। আজ যাকে সুখ বলি, কাল হয়তো তা দুঃখ। মুহূর্তের মধ্যে সুখ দুঃখ আসন বদলে নেয়।

জাহাজ ঢেউয়ে দুলছে। এক ভীত নার্ভাস যাত্রী ভয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বিব্রত ও অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। চতুর কাপ্তান যাত্রীর কোমরে দড়ি বেঁধে দিলে ঝুপ্ ক'রে সমুদ্রের জলে ফেলে। কয়েক ঢোক নোনা জল খাইয়ে তাকে টেনে তুললে জাহাজে। উঠেই বলে কিনা, বাঁচলাম। মুহূর্ত আগে চেঁচাচ্ছিল, মলাম। যার জুতা নেই, সে যার পা নেই তাকে দেখে আশ্বস্ত হয়। আবার যে সস্তা ফোর্ড চালায় সে প্রতিবেশীর ঐশ্বর্যে ঈর্ষা ক'রে বলে, অমন ডেম্‌লার গাড়ি না হ'লে জীবনই বৃথা।

সুখ-দুঃখের পরিমাণও ধরা বাঁধা কিছু নেই, তাও ব্যক্তিগত। ফিজিওলজীর ভাষায়—All contractions are maximal. দশ পাউণ্ডে স্প্রীংটা দেবে যায়, তারপর তার উপরে দশ মণ চাপালেও আর দাববে না। তাই তো দেখতে পাই, হাতে কাঁটা ফুটে—মলাম, আঙুল কেটেও-মলাম, পা এম্‌পুটেশনেও—মলাম। আবার কারও—দেখি গ্রাহ্যই নেই, অপারেশন হচ্ছে, তাতেও তেমন মুখবিকৃতি নেই। প্রত্যেকে তার মনের ভাষা, সহজাত শক্তি ও অভ্যাস—এই তিন দিয়ে সুখ দুঃখ বোঝে। তোমার আমার মুক্তিপথ এইখানে, এই অনুবাদের ভাষায় ও অভ্যাসে। এই পথে আসবে টেকনিক। মুক্তি।

সুখ দুঃখ মানুষ শেখে

অনেক সুখ ও সুখের আদর্শ শিক্ষায় পাওয়া। যুগে যুগে মানুষের সভ্যতার সঙ্গে এই অর্জিত সুখ বদলায়, নানা ভাবে। কাল যাতে সুখ পেতাম আজ তা দুঃখের কারণ, আবার কাল যা অসুখের ছিল

আজ হয়তো তাতে সুখী হই। মানুষের কালচার ও রুচি যেমন বদলায়, সুখ দুঃখের নিরিখ ও রকমারিও তেমনি বদলায়। এই সুখবোধের রকমারি দিয়ে, তোমার, আমার সভ্যতা ও কালচারের পরিমাপ হয়।

সেদিনকার ইতিহাস

বিশ বাইশ হাজার নরনারী আনন্দে মত্ত হয়ে তামাসা দেখছে। সুন্দরী তরুণী কুমারীকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়েছে, সিংহ হালুম ক'রে ভীতত্রস্তা তরুণীকে ধ'রে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেলে। কি মজা! রাত দুপুর পর্যন্ত 'সিংহ-কুমারী' খেলার কত খোসগল্প। মজাই বটে!

ক্রীতদাসকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে তার শোচনীয় মৃত্যু, কি মজার তামাসা ছিল! খ্রীষ্টানদের বড় রাস্তায় থামে বেঁধে তেল-নেকড়া জড়িয়ে, আগুন ধরিয়ে, 'জ্যান্তমানুষ মশাল' দিয়ে রাস্তা রোশনাই, যেমন ছিল শাস্তির ব্যবস্থা তেমনি ছিল তামাসা।

মুর্গীর লড়াই, বুল ফাইটের জের এখনও আছে। বিড়ালের ল্যাজে আগুন দিয়ে খেলাতে ছেলেরা মজা পেত সেদিনও।

সতিদাহ। এক ঝলসানির পর সৌদামিনী হল যেন পেত্নী। বেটার জ্ঞান বলতে হবে, এই অবস্থায়ও চিতা থেকে গড়িয়ে প'ড়ে খুঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা। আরে, তুই পারবি আমাদের সঙ্গে? চিতায় ফেলে, বাঁশ দিয়ে ঠেসে ধ'রতে, দুবার ঝটপট করেই ঠাণ্ডা। আসলে সদুর তেমন ধর্মজ্ঞানই ছিল না, নইলে কেউ স্বামীর চিতা ছেড়ে পালাতে চায়। আরে ছিঃ!

নিজ দেহে কৃচ্ছ্র সাধনের বহু জের আজও আছে। এ বিষয়ে মার্কিন দার্শনিক বলেন, মানুষের কালচারে ও শিক্ষায়, একটা প্রয়োজন উদ্দেশ্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, তার আদর্শে, এই সব কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে শরীরের দুঃখবোধ সত্ত্বেও সে একটা সুখবোধ করে।

তুমি আমিও সুখ শিখতে পারি

সমাজের শিক্ষায় ও কালচারে সুখ শিখেছি, এই তো দেখলাম। তা হ'লে এইটেও প্রতিষ্ঠা হয় যে, আমাদের আদর্শমত সুখও আমরা

শিখতে পারি। তোমার আমার মুক্তি এইখানে। ঐ অনুবাদের ভাষায় ও অভ্যাসে।

অঋণ

ঋণের দুঃখ বড় দুঃখ। মহাভারতে অরোগ ও অপ্রবাসের সঙ্গে অঋণেরও ইঙ্গিত করেছে। আমরা অঋণকে পৃথক শ্রেণীতে ফেলি নি এই জন্য যে, অঋণ অরোগ ও অপ্রবাসের মধ্যেই নিহিত। আজকের ফিজিওলজিতে রোগকে ঋণবিশেষ বলে, যেমন রৌদ্র-ঋণ ও বাতাস-ঋণ হ'লে টি. বি. হয়, তেমনই দেহ সম্বন্ধে সব অনাচারই ঋণবিশেষ। অপ্রবাসের বড় লক্ষণ সহযোগিতা, সেই নষ্ট হয় ঋণে। প্রশস্ত পটে দেখে বুঝতে পারি, টাকার ঋণই একমাত্র ঋণ নয়, ঋণ নানা আকারে হ'তে পারে। অনুশাসন : ঋণকে মৃত্যুর মতন জানবে—(Dread Default Debt like Death)। ঋণ অভাবের ফল নয়, অভ্যাসের ফল। হিসাব ও সংযম থাকলে, আয়ের বেশি ব্যয় না করলে ঋণ হয় না। অভাব—একটা অছিলা মাত্র। টেকনিকের বেলা ঋণ-অঋণ নিয়ে কথা শুনব।

জয় মানুষের স্বভাব

জয়-আকাঙ্ক্ষা এবং এগিয়ে-চলা মানুষের সহজাত। তুমি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে নেই, থাকতে চাও না, পারও না। বিশ্বগতিতে, Cosmic Habit forceএ তুমি আমি চলেছিই চলেছি। এই এগিয়ে চলার বেগে একে অন্যকে পেছনে ফেলে যেতে চায়, যেন ঘোড়দৌড়। এই প্রতিযোগিতা, এগিয়ে চলার ধর্ম। যেন সবাই সবার শত্রু। আবার চলার পথে, যার যার গতিপথ (orbit) ছাড়লে বা ছন্দ কাটলে ধ্বংস—নাগাসাকী হিরোসিমা। অতএব যার যার প্রয়োজনে ও স্বার্থে, প্রত্যেকে, 'Live and let live'-policyতে, সহযোগিতা ক'রে চলেছি। যেন সবাই সবার মিত্র। এই যেন শত্রুতা মিত্রতা নিয়ে, সহযোগিতা প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশ্বরূপ, এর মধ্যেই জয়ের পথে পা বাড়িয়েছি।

জয়ের দ্বাদশ রূপ

জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে। মনের উৎসের সন্ধান নিতে হ'ল। ইংরেজীতে বলে, মটিভ (Motive) অর্থাৎ মতলব। বারোটি মতলব পাই। অতএব জয়ের রূপও বারোটি। আরও শাখা-প্রশাখা ক'রে বহুরূপ হতে পারে, কিন্তু 'মতলব' মত এই বারোটি রূপ ধ'রে নিলেই যথেষ্ট। মতলবগুলি দেখে নিই। ১। প্রেম ও সেবা, ২। আদিবৃত্তি ৩। পার্থিব আয়, ৪। আত্মরক্ষা, ৫। দেহমনের স্বাধীনতা, ৬। আত্মপ্রকাশ, ৭। পরকাল, ৮। ক্রোধ, ৯। ভীতি, ১০। যশাকাঙ্ক্ষা, ১১। খেলা, ১২। জ্ঞানপিপাসা। হিংসা ও উদ্বেগ নিষ্ক্রিয় প্রধান ব'লে তাদের 'গতিরূপ' নেই। হিংসা ও উদ্বেগ সক্রিয় হ'লে, হয় ক্রোধ অথবা ভয়ের খাতে পড়ে; এরা সক্রিয় হ'লেই আস্তে আস্তে উবে যায়; এবং হিংসা ও উদ্বেগকে সক্রিয় করাটাই এদের ধ্বংস করবার একটি টেকনিক।

এই দ্বাদশ রূপের অভিক্ষেপনই আমাদের সব চাওয়া

চাকুরি চাই, চাকুরি না যায়, চাকুরিতে উন্নতি; ব্যবসায় নির্বাচন, উন্নতি, স্থায়িত্ব; জমি চাই, গাড়ি ঘোড়া বাড়ি ঘর। স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, ব্যাধি সারাতে চাই। বার্ধক্য দূরে সরাতে চাই—১০০ বছর। যৌবন অব্যাহত রাখতে চাই। বিবাহ, সন্তানপালন, যাকে ভালবাসি তাকে চাই, প্রিয়জনের ভালবাসা তাজা রাখতে চাই। উদ্বেগ দুশ্চিন্তা জ্বালা নেবাতে চাই। ব্যর্থতা ঠেকাতে চাই, যদি আসেই তার ব্যবস্থা চাই। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, মানুষের সম্পর্কে সর্ববিষয়ে সফলতা চাই। পথ চাই, নির্ভুল ও আশুফল পথ চাই, সহজসাধ্য পথ চাই, বেশি দামও দেব না, পরিশ্রমও করব না, কিন্তু জয় চাই ষোল আনা।

কঃ পন্থা—টেকনিক

এইবার পথের কথা ভাবব। কিন্তু সন্দেহ জাগে, টেকনিক পেলে তা গ্রহণ করব কি? কাজে লাগাব কি? পুস্তকগত বিদ্যা ও পর-হস্তে ধন, কাজে না এলে লাভ কি? পথের সন্ধান পেয়ে যদি পথে না চলি, তবে যে তিমিরে সে তিমিরে।

ছবি দেখলাম, 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা, ঔষধ খেতে মিছে বলা'। একটা প্রবাদ পেলাম 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। শাস্ত্রবাক্য পেলাম, 'দীনার্ত হয়ে মন্ত্র না চাইলে, মন্ত্র ব্যর্থ হবে'। পৃথিবীতে বহু মন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

তবে উপায়? কঃ পন্থা

আচ্ছা কেন এমন হয়? কার্লাইল বলেন, উপদেশ কেউ নেয় না। এত সুভাষিত রত্ন, গবেষণা, উপদেশ, কেন ব্যর্থ হয়? যারা উপদেশ দেয়, তারা ঋষি, নমস্য, আর যারা মন্ত্র চায় তারাও তাপস, এদের কারও নিষ্ঠায় সন্দেহ করি না। তবে কি ভাষার দোষ, উপদেশ-পদ্ধতি কি তাপসের মন স্পর্শ করে না? নতুবা কেন উপদেশ নেবে না? শিশু যদি হয় তবে ভাষা বুঝতে পারে না, এটা বুঝি। যারা বড় তারাও কি ভাষা বোঝে না, তারা কি কোথাও শিশুত্বের মোহগ্রস্ত? সন্দেহ জাগে। শিশুবুদ্ধি সত্যি আলাদা।

শিশুবুদ্ধি

নাতনী জামা পরাতে গেলে হাত সরিয়ে নিয়ে খিলখিল হাসে—যেন কত বাহাদুরি! নাতিটা কি বোকা, দামী ফাউণ্টেনটা ফেলে চায় কাঠিটা? কাল রাত্তিরে কি কান্না, এইটে নেয় ফেলে দেয়, ওটা নেয় ফেলে দেয়, নিজেই জানে না কি চায়। জুতোটা পরবে উল্টো। জুতো রাখবে বিছানায়, জামা বালতিতে। শিশুবুদ্ধি ভারি মজার, ভাল মন্দ, আসল নকল, হ্রস্ব দীর্ঘ, আগে পরে, কিছু বোঝে না। বাধা পেলেই কুরুক্ষেত্র। বিশ্বাস না হয় চল।শশুর হাট দেখে আসি।

'তুই না হোক, তোর বাপ করেছে, তোকেই খাব'। পণ্ডিত পরের ছেলের বেলা পাতি দেয়, রজত কাঞ্চন দান—ব্রাহ্মণায়; কিন্তু নিজের ছেলের বেলা, 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়'। তুমি বলবে শিশু না, দুষ্টু। দুষ্টু হতে পারে, শিশুও বটে, কারণ দুষ্টামিটা যে সহজে ধরা পড়বে সে বোঝে না, শিশুত্ব বইকি। তা ছাড়া, দুষ্টু বলতে ভয়

হয়, পাছে তেড়ে আসে, নিরাপদ শব্দ শিশু। চেহারা তো ঠিকই দিলাম, তোমার ইচ্ছামত আখ্যা দিতে পার।

১। জাপানে চীনে যুদ্ধ দেড় বছর পেরিয়েছে, তখন ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ শুরু। জাপান চেঁচায় শকুনির মত ইংরেজ-জার্মানে মরা গরু নিয়ে টানাটানি'। হাঁ, এই কথা জাপানের মুখেই মানায় (?)।

২। ব্রিটিশ বি.বি.সি. জবাব দেয় রেডিওতে, 'বর্বর, স্বার্থপর, জাপান কোরিয়াতে নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস চালিয়ে ওদের কালচার জয় করতে চায়। কথাটা ঠিকই তো, ভারতে দুশো বছরের শাসনের পর ইংরেজের মুখেই এ কথা শোভা পায় (?)।

৩। চীনে বয়কট। লীগ অব নেশন চীন-জাপানের মধ্যস্থতা করতে আসে। প্রবল পক্ষ চীনের ওকালতিতে বলে, ওহে জাপান, বাড়ি যাও, অবশ্য অস্থায়ীভাবে, বিচারশেষে এসো। জাপান প্রশ্ন করে, ততক্ষণ আমাদের সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তোমরা জামিনদার থাকবে তো? লীগ হুঙ্কার দেয়, শোন কথা, লীগে অবিশ্বাস, ছিঃ, এমন অবিশ্বাসীর কথায় যেন কোন ভদ্রলোক না থাকে। হুঁ (?)।

৪। কলিকাতা অভিজাত সমাজে বউয়ে বউয়ে ঝগড়া। দুইই বিধবা-বিবাহের বউ। একে অন্যকে বলে, ইস্ বিধবা বিয়ের বউ তার দেমাক কত (?)।

৫। চীন বলে, চ্যাংকে চাই, যুদ্ধ-অপরাধী, শাস্তি দিতে হবে। মার্কিন কাগজ হুঙ্কার দেয়। প্রশ্ন হয়, তোজো? আরে, আরে বলে কি, তোজো যে তোজো, আর চ্যাং যে চ্যাং, সোজা কথা। তা ছাড়া তোজো যে ওদের তোজো, চ্যাং যে আমাদের চ্যাং (?)।

৬। প্রশ্ন হয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র তোমরা, টাকা ডিভ্যালুয়েট করবে না যদি, সে কথাটা ভদ্রতার খাতিরেও আগে আমাদের জানানো উচিত ছিল। পালটা প্রশ্ন হয়, তোমাদের ডিভ্যালুয়েশনটা আমাদের জানিয়েছিলে? এ প্রশ্ন অত্যন্ত অবান্তর, এ যে জানা কথা, জানাব কি? অন্যায় আবদার—অসহ্য (?)।

৭। অস্ত্র কমাও নতুবা অন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা থাকে না।

আমাদের অস্ত্রবৃদ্ধি অবশ্য বিশ্বশান্তির জন্য, আর তোমাদের অস্ত্রাদি থাকলে বিশ্বশান্তির ব্যাঘাত, বিপদ। একেবারে জলের মত বোঝা যাচ্ছে (?)।

৮। কবি কিপ্‌লিং সাম্য মৈত্রীর গান গেয়েছেন, সাবধান করেছেন, ধৈর্য হারাবে না, মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। বইয়ে। বাস্তবে নিজে এক গাড়ি ঘাসের জন্য এমন মাথা গরম ক'রে শ্যালক ভগ্নিপতিতে লড়াই করেন, যাতে সর্বস্বান্ত হয়ে অ্যামেরিকা ছাড়তে হয়।

৯। অ্যাডমিরাল বার্ড সাহেবের স্পোর্টস্‌ম্যান ও ত্যাগী সঙ্গীরা। মেরুর ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল খ'সে খ'সে যাচ্ছে, তবু অচল অটল। রাত্রে শোবার সময় বালিস সরিয়ে, কে কার কয় ইঞ্চি জায়গা নিয়ে নিলে, তা নিয়ে মনোমালিন্য, কথাবন্ধ, স্থানত্যাগ।

১০। স্বদেশী যুগের জীবনপণ স্বার্থত্যাগীরা জেলে এক টুকরো কিসের জন্য অনশন করতেও কুণ্ঠিত হয় নি।

১১। শিষ্যরা গুরু ঠাকুরের পালকি বইছে। লিষ্টিমত সব জিনিস মিলিয়েছে, সব ঠিক হ্যায়। এদিকে গুরু ঠাকুর যে নদী পার হবার সময় নদীতে প'ড়ে গিয়েছে, তা কারও চোখে পড়ে নি, লিষ্টিতে গুরু ঠাকুরের নাম ছিল না কিনা, তাই।

১২। নিরক্ষর কবির গান, "তেল ভরলাম তো পাই না বাতি, হাতাই পড়ি সকল রাতি, অখন ভার হৈল মোর হাতের এই বাতি, যদি পাইতাম আগুন হৈত রে গুণ—জুড়াইত নয়ান"। শিশু চটকে ভুলে, আলোর কথাই এড়িয়ে গিয়েছে। বিপদ আসে এই রন্ধ্র পথে।

মাত্র ডজন খানেক শিশুচিত্র দেখলাম। বছরে তিন শ পঁয়ষট্টি দিনে অন্তত দু হাজার শিশুচিত্র দেখি, আমরা সবাই; একটু সজাগ থাকলেই বুঝতে পারি। খবরের কাগজে তো ঝুড়ি ঝুড়ি বালখিল্য-কাকলী।

ইমশন-ভাষ্য আজকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ঃ

লজিকে বলে, মানুষ যুক্তিবাদী—Man is rational। আজকে বুঝেছি, কথাটা মিথ্যা, হাঁ মিথ্যা, অন্তত মানেটা ভিন্ন।

মানুষ আদিকাল থেকে 'আবেগ' বা 'ইমশন'ধর্মী। 'ইমশন' অতি প্রাচীন। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সেদিন মাত্র 'যুক্তি'

পেয়েছি। কিন্তু আজও 'যুক্তি' ইমশনের জিম্মায় এবং আবেগ-চালিত। অতএব মানুষ আসলে আবেগপ্রধান যুক্তিবাদী। মানুষ বিবেচনা, বিচার, সমর্থন, ভাঁওতা, ভড়ং চুরি, জোচ্চুরি, জাল, সবই করে যুক্তি দিয়ে। আসলে 'ইমশন' পেছনে প্রচ্ছন্ন থেকে সুতো টেনে 'যুক্তি'কে চালায়। 'ইমশন' কিন্তু একথা স্বীকারই করে না। গাড়োয়ানের কথাটা মনে পড়ে। গাড়োয়ান বলে, তোমরা যা বল তাতেই আমি রাজী; ডিক্টেটার হ'য়ে ঘোড়াকে চালাতে বল তাতেও রাজী, আবার ঘোড়াকে অনুসরণ করতে বল, আমি তাতেও রাজী। মোদ্দা কথা ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে থাকলেই হ'ল। 'আবেগ' ও 'যুক্তির' সম্বন্ধ ঠিক তাই। এই সত্যটা এই সেদিন পেলাম।

আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বহুকালের সঞ্চিত দুর্বোধ্য ধোঁয়াটে ভাব আজ পরিষ্কার হয়েছে। মানুষ তিন রকমে বড় হয়— দেহে, মনে (বুদ্ধিতে) আর ইমশনে। বলতে পারি, ইমশন সাবালকত্ব। শিশুর ব্যবহার বা নেশাখোরের ব্যবহারের মধ্যেই ইমশন-নাবালকত্বের পুরো চিত্র পাই, কোথাও দুষ্টামিও প্রকট। দেহে ও মনে বড় হ'লেও ইমশনে নাবালক থাকতে পারে। শিশুর হাটে তো দেখে এলাম, ট্রুমান, এটলি, বেভিন, এম.এ., ডি-লিট, ডি-এস-সি, কবি, পণ্ডিত, অধ্যাপক। কে শিশু-হাটে না যান? এঁরা যখন আহ্নিকে বসেন তখন বেশ প্রবীণ বিচক্ষণ, তাকানিতে যেন বাঘ। অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে সবাই শিশু-হাটে যান, আবার বেচাকেনাও করেন, কতবার দেখা হয়েছে, ঠোকাঠুকিও হয়েছে। 'হাম বাঁচে, হামারা বেটা নন্দ বাঁচে, আর যদু মুদী বাঁচে, (ডাল চাল তো চাই), আর সব মর যাও'—এই তো সারকথা শিশুর। 'সিংহ মশাই, সিংহ মশাই, মাংস খেতে চাও, রাজহংস খেতে দেব, হিংসা ভুলে যাও'। অর্থাৎ আমাকে হিংসা করাটাই কেবল হিংসা। শতকরা এক বা তারও কম দৃষ্টান্ত পাই নিছক যুক্তি, তাও কেবল কল্পনা-স্বাতন্ত্র্যে।

স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স বলে, মানুষ শতকরা ৮০ জন ইমশন-নাবালক, বাকি বিশজন অল্পবিস্তর সাবালক. তারাও ক্ষেত্রবিশেষে নাবালকত্বের পরিচয় দেয়। শ্রেষ্ঠ মানব টলষ্টয় স্ত্রী সম্পর্কে।

এতক্ষণে বুঝলাম, হাঁ, এতক্ষণে বুঝলাম—'কেন চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী', আর কেনই বা 'ঔষধ খেতে মিছে বলা'। যে যে ভাষা বোঝে তার সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলতে হয়, নতুবা বুঝবে কেন? এতদিন পরস্পর যেন সংস্কৃত ও গ্রীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা ব'লে কেউ কাউকে বুঝতে পারি নি, মন্ত্রও হয়েছে ব্যর্থ।

মানুষ 'আবেগ-প্রধান-যুক্তিবাদী' অথচ তাকে কেবলই নিছক যুক্তি গেলাতে চেয়েছি, সে গিলবে কেন? এবার তোমার আমার কর্তব্য সুস্পষ্ট। যখন যাকে কিছু বলতে চাও, সে যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় বলবে। যখন মন্ত্র-টেকনিক উপদেশ দেবে, তাকে আবেগ-পথে বা আবেগ-প্রধান-যুক্তি পথে দেবে, অবশ্য তার আবেগের দিকে চোখ রেখে, তবেই সে তোমার কথায় সায় দেবে। যদি সে ইমশন-নাবালক হয়, তাকে নাবালকের ভাষায় তোমার কথা বোঝাবে, শিশু হয় শিশুর ভাষায় বলবে। দেখবে সে সাড়া দেবেই দেবে।

মানুষের সম্পর্ক নিয়ে যে সকল মনীষী কথা বলেছেন, তাঁরাও এই তথ্যটা ধ'রে ফেলেছেন তাঁদের টেকনিকে। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে থিয়োরি ও ভাষ্য পেলাম আজ। ইমশন-ভাষাতে কথা বলবার নির্দেশ পেয়েছি, কিন্তু এই ভাষার আকর যে ইমশন এবং এখানে যে মানুষের নাবালকত্ব ও সাবালকত্ব, এই সব কথা বুঝলাম আজ। মানুষের সম্পর্ক গবেষণায় সাধকের কাছে সংসারের ব্যবহারে ও বেচাকেনায় সাফল্যের জন্য যে সকল উপদেশ পেয়েছি, তা ইমশনের স্বপক্ষেরই ভাষা। তবু পুরো ফল পাই নি, ভরসাও পাই নি। যেমন খেলনা পেয়েছি কিন্তু ফ্যাক্টরিটা জানতাম না। খেলনা হারালেই মুশকিল হ'ত। আজ তা না হবার সম্ভাবনা।

ওরা বলে, 'উদ্দেশ্য বেচবে না—Don't sell motive।' 'যুক্তিতে মানুষ স'রে যাবে অতএব এই ভাবে শুরু কর।' 'সমালোচনা ও তুলনাতে সাবধান, এতটুকু হীন করেছ কি তাকে বিমুখ করলে।' 'তার অহমিকাকে স্বীকার কর।' 'তার মুখ রক্ষা ক'রে ঘুরিয়ে দোষ দেখাবে।' 'সেবা করতে গিয়ে তাকে তার দারিদ্র্যের খোঁচা দিও না।' 'ছোটখাট বিষয়ে খুশি কর।' 'খুঁতখুঁত করবে না।' এমনি অনেক

প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক পেয়েছি, যার ভাষা ইমশনের পক্ষের ভাষা। কিন্তু সত্তের গণ্ডা বাণী মুখস্থ থাকলেও কার্যকালে ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। আজ ইমশন-থিয়োরি পেয়ে খুঁটিটা ঠিক পেলাম, আজ হাতড়ে হাতড়ে হয়তো টেকনিক নিজেই তৈরি করতে পারব। পরে ফিজিওলজির মিশ্রণে টেকনিকের সন্ধান পাব আরও সহজ ও পরিষ্কার ভাবে। এই হবে আমাদের পথনির্দেশ।

ফিজিওলজি

সাইকোলজি যা চাঁদা দিলে, তা তো পেলাম। এবার ফিজিওলজির চাঁদাটা চাই। চরমুখে পেয়েছি বার্তা, ফিজিওলজিরও বড় বড় আবিষ্কার আছে। মোটা চাঁদা পাব। অ্যাটম বমের ফরমুলা রাশিয়া আমেরিকা দুজনার হাতে, দুজনার সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব। সাইকোলজি ও ফিজিওলজি।

যুক্তি ও আবেগ

এদের উপর আমাদের মন্ত্রের প্রয়োগ-সন্ধান। অতএব এদের স্বরূপ পরিষ্কার বুঝে নিতে চাই। আবেগ অতি প্রাচীন, যুক্তি নবীন। আবেগ শক্তির উৎস, যুক্তি সংযম। আবেগে নদীজল খোলা-মুখে চলে, যুক্তিরূপ দুই তট জলকে সংযত সংহত ক'রে তার সীমার মধ্যে রাখে। কেবলই তটের সেবা করে কূপ, আর তট অতিক্রম করলে হয় বিল, সমুদ্রে যাওয়ার কল্যাণ কারও ভাগ্যে নেই। আবেগ গতিপ্রধান ব'লে বিপদের আশঙ্কা বেশি, যুক্তি সাবধানী ব'লে বিপদ-আশঙ্কা কম। যেন জ্যান্ত ঘোড়া ও কাঠের ঘোড়া। আবেগ একদেশদর্শী, যুক্তি বহুদিকদর্শী, ফলে আবেগ কখনও কখনও আসল হারিয়ে নকলে আকৃষ্ট হতে পারে, সোনা ফেলে কাচে গেরো দিতে পারে, যুক্তিতে সেই ভয় নেই।

কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু যুক্তি আবেগ দুইই চাই, কাকেও বাদ দেওয়া চলে না। আবেগহীন যুক্তিতে মানুষ হয় যন্ত্র, আর যুক্তিবর্জিত উদগ্র-আবেগ-উদ্দামতা তোমাকে আগুনে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে পারে। হাসপাতাল ও মর্গের পথপ্রদর্শক গাইড আবেগ, যেন বহু পুরুষের একচেটিয়া পেশা। আমরা চাই যুক্তি-আবেগ-সাম্য, চাই যুক্তি-আবেগ-মৈত্রী। মানুষকে স্পর্শ করবার শ্রেষ্ঠ পথ, যুক্তি-সংহত-

আবেগ—(Logic controlled emotion)। কিন্তু আবেগ আগে, লজিক পেছনে, যা সর্বদা ক'রে এসেছি তার উল্টো, হাঁ, উল্টো। পৃথিবীতে সর্ব সফলতা, সব বিফলতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও বাতুলতার মূলে ইমশন।

পথের সন্ধান যা পেয়েছি, তাতেই সফলতা হস্তামলকবৎ মনে হচ্ছে। এবার ফিজিওলজির চাঁদাটা পেলেই কাজ শুরু করব পুরা উৎসাহে।

সাইকোলজি-ফিজিওলজি-সব্যসাচী করে মোর—

গান শুরু হ'ল, ক্রমে কড়িমধ্যম-ঘাঁটি পার হয়ে আমাদের ঝঙ্কার সুতীব্র নিখাদে উঠবে। সাইকোলজি ও ফিজিওলজির আজকের ছুটো শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারে অনেক দুঃখের অবসান হয়েছে ও হবে। মাভৈঃ। যা চাই তার পথ পাবই। দেখিব দেখিব, কত শর করিবে প্রসব, দেবদত্ত নীলোৎপলনিভ ধনুক গাণ্ডীব, সব্যসাচী করে মোর।

পার্থসারথি বাসুদেব সহায় শরণ।

শ্রীঅতুল সেন

মুক্তি

কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর কলিকাতার কেন্দ্র।
বেলা দশটায় শহরের সব অলিগলি বেয়ে
মানুষের স্রোত এসে এখানে জমা হয়।
সকালের নির্জন রাক্ষসপুরী বেলা দশটায় মুখর হয়ে ওঠে।
শুনেছি মানবদেহে রক্তের চাপ বেড়ে যখন অসুখে পরিণত হয়,
তখন নাকি শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত এমনি দুর্বার গতিতে
মাথায় জমা হয়।

দিনের'পর দিন কেটে যায়—রাত আসে জনহীন দুঃস্বপ্নের ভিতরে।
কত ইতিহাস ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে,
পরিণতির রাস্তা বেয়ে ক্রমে তারা পৌঁছয় গিয়ে সেই শেষ সীমায়।
কত হাসি কান্না, কত আশা নিরাশা, কত স্বপ্ন ও তাদের সমাধি—
দেড়শ বছর ধ'রে পলে পলে এখানে তাদের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গেছে।

লালফিতার ফাঁসে ঘেরা লালদীঘি :
লালমুখের দাপটের তরল গরল জমিয়ে বুকে ধ'রে রেখেছিল।
কত ডাণ্ডী অভিযান এল, গেল—
কত অসহযোগ আন্দোলন এল,
করুণ প্রত্যাশায় দেওয়ালে দেওয়ালে, প্রত্যেকখানি ইটে
মাথা কুটে ফিরে গেল নির্মম প্রত্যাখ্যানে—
নিবিড় লজ্জায়।
ভাইয়ের দুঃখে, নিজেদের জাতিগত গ্লানিতে
সহানুভূতি পেল না,
সাড়া পেল না জগতের সুসভ্য শ্বেতজাতির উদ্দেশে
মনুষ্যত্বের এই আকুল উদাত্ত আহ্বান।
তারা ফিরে গেল,
চোখের জলের আগুন-জ্বালানো শোক নিয়ে,
বুকের রক্তে লালদীঘির রঙ গাঢ়তর ক'রে।
যে রাস্তায় মহারাজ নন্দকুমার গিয়েছিলেন,
সেই কুটিল লাল রাস্তা ধ'রে
কত নবকুমারকে নিয়ে গেল—সেইখানে
সু-উচ্চ চূড়ায় যে প্রাসাদে লালমুখ-রা নাকি ন্যায় অন্যায়
বিচার করত!
নীলকররা ম'রে নীল হ'ল,
কিন্তু চা-বাগানে, চটকলে আর কয়লাখনিতে
নৃত্য ক'রে চলল তাদের প্রেত।
সেই শ্মশানে একক সাধনা চলল
ভয়-ভাঙার সাধনা,
কোন অত্যাচারকে ভয় না করার সাধনা।
কঠোর সে তপস্যা,
বিশ্বামিত্রের সৌরজগৎ সৃষ্টির তপস্যা।
শবাসনে মরণ-জয়ের তপস্যা,
রাত্রের অন্ধকারে আলোকের আশীর্বাদ-কামনা।

সেই সাধনা, সেই তপস্যা—
কি ক'রে বার বার ভঙ্গ হ'ল,
কেমন শীর্ণ অসহায়তায় সে সংগ্রাম
ক্ষীণ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস করল,
আবার কখন, কত দ্রুত,
কি বিস্ময়কর গতিতে সে অর্জন করল
দুর্বার শক্তি, বন্যার বাঁধভাঙা স্রোতের দুঃসহ আবেগ
দেশ ভেসে গেল। তলিয়ে গেল কোন্ আবর্তে
বছরের পর বছর ধ'রে গ'ড়ে তোলা,
সেই লাল কারাগার।
এর প্রত্যেকটি কথা আর কাহিনী,
প্রত্যেকটি কিংবদন্তী
বাঁধা পড়ত ঐ লালফিতার ফাঁসে।
বাঁধতে বাঁধতে সে ফিতা জীর্ণ হয়ে এল।
অবশেষে একদা বজ্র-আঁটুনির চাপ দিতে গিয়ে—
লালফিতা ছিঁড়ে গেল।
রূপকথার সেই যে কাহিনী
দীঘির জলে ডুবনো কৌটায়
রাক্ষসদের প্রাণ সেই ভোমরা!
লালদীঘির পাড়ে সেই প্রাণ-ভোমরা ছিল
লালফিতা।
বাঁধন ছিঁড়ল, রাজপুরীতে আবার এল স্পন্দন,
নতুন জীবনের চাঞ্চল্য।
হাতীশালের হাতী, ঘোড়াশালের ঘোড়া
আবার অধীর হয়ে উঠল
দুর্দান্ত দামাল তাদের প্রভুদের ডাকে।
লালদীঘির নিরাপদ গণ্ডীর মাঝে
ছিল এক প্রাসাদ
বিজাতীয় প্রমোদশালা।

হঠাৎ সেই প্রাসাদ খান্ খান্ ক'রে
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।
আবর্জনায় রাস্তা ভ'রে গেল
শব্দে ভেসে গেল জনকোলাহল।
জঞ্জাল সাফ হ'লে দেখা গেল,
সেই বিশাল প্রাসাদের কিছুই নাই।
সে আলোর আয়োজন কোথায় গেছে মিলিয়ে।
সেই সম্পদবিকারময় আড়ম্বরের উপকরণ
ধুলো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।
একটা সিংহদ্বারও অবশিষ্ট নাই,
একটা গবাক্ষও অতীত বিলাসের সাক্ষ্য বইছে না,
একখানি পাথরও খাড়া নাই
সেই নির্মম অত্যাচারের স্পর্ধিত পক্ষ অবলম্বন ক'রে।

শুধু খাড়া রইল
শ্বেতপাথরে গড়া একটি পুরুষ মূর্তি,
গভীর চিন্তার বোঝা নিয়ে, মৃত্তিকানিবদ্ধ দৃষ্টিতে
সে পরিস্ফুট ক'রে রেখে দিল
চ'লে যাওয়ার সেই রূপটিকে :
থাকবার অধিকারহীন, অনিমন্ত্রিত অতিথি
প্রলোভনের দুর্নিবার আকর্ষণে
যেতে যেতে যেন যেতে পারছে না।
অনিচ্ছাপ্রস্থানের সেই লক্ষ্মীছাড়া থমকানো গতি
পাথরে রূপান্তরিত হয়ে
দেড়শ বছরের ইতিহাস
এঁকে নিল নিজের অবয়বে।

জগতের সভ্যসমাজের মুকুটমণি
স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজের এই রূপ
এই হীনতাময় গ্লানি—
এ যেন মানব-সভ্যতার পিছল কক্ষপথের

রক্তচিহ্নিত প্রতীক।
বার বার মানুষ সাধনা করেছে
বিভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে,
অন্যায়কে অবিচারকে উচ্ছেদ করতে,
নিজেদের সমস্ত সম্ভাবনাকে
শতদলের মত পূর্ণ বিকাশের পথে সঞ্চালিত করতে।
কিন্তু বার বার কোন রন্ধ্রপথে, সূক্ষ্মদেহে,
কোন্ অবিচার এসে জোটে।
কেমন ক'রে অন্যায়
আর তার সহচর বিভেদবুদ্ধি
হাত-ধরাধরি ক'রে এসে হাজির হয়।
কত অবতারের তিল তিল সাধনা,
কত শতবর্ষব্যাপী প্রয়াস
এক নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়
প্রলোভনের প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে।

ইংরাজের সেই লজ্জা, মানবজাতির সেই লজ্জা
অধোবদনে স্বীকার ক'রে
ম্লান মুখে
নতুন সৃষ্টির স্তূপীকৃত সরঞ্জামের মধ্যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মূর্তি।
যাঁর মূর্তি তাঁর নাম জানি না,
তাঁর কর্মসাধনাও আমার অজানা,
সে সব জানার কৌতূহলও অনুভব করি না।
কিন্তু এই মূর্তি যেন একটি সু-উচ্চ সাবধানবাণী :
নতুন সৃষ্টির উৎসাহে মত্ত জাতির প্রতি
তার এই আবেদন—অতি করুণ, অতি মৃদু—
'ভুলো না যেন মানব-সভ্যতার ভ্রান্তিগুলোকে।
কোন সৌধ যেন গড়তে যেও না
অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপরে।

জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে ভালবাসো
মানুষকে।
তার পদস্খলনকে ক্ষমা ক'রো।
সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে
মনুষ্যত্বের অধিকারী ক'রে তোল।
এ ছাড়া আর কোন পথ নাই।
আর সবই ঐ লালফিতার কুটিল চক্রে
ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছেছে
সর্বনাশা এক অতল গহ্বরের কিনারায়।
নবীন জাতি, নতুন সৃষ্টিকামী মানব
পথ ছেড়ে বিপথে ঘুরে
পরাজিতের সংখ্যা যেন না বাড়ায়।'
এই মিনতি
নীরবে ব'য়ে চলেছে
জাতিভ্রষ্ট বিদেশীর ঐ মূর্তি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ

একটি আলোচনা

A creature arid cold and vain
Careless of others joy or pain
In endless reverie indulging
One whose embittered mind finds zest
In nothing, but can never rest.

—Pushkin : Eugene Onegin.

ঊনবিংশ শতকের রচনা হ'লেও উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে আধুনিক মানসের স্বরূপ আশ্চর্য স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। অন্তত যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ সালের শেষাশেষি যে কাব্য-সাহিত্য আধুনিক ব'লে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে তা সেই মনোধর্মেরই অভিব্যক্তি যা আপনাতে আপনি তিক্তবিরক্ত, যে কোন কিছুতেই উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে না অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ শান্তিও যার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

অবশ্য, নানা দিগ্‌দেশে নানা রথী মহারথীর রচনাপুষ্ট যে সাহিত্য-ধারাকে আধুনিক বলা হয়, তার সর্বাঙ্গীণ বিচারে প্রবৃত্ত হবার দুঃসাহস বর্তমানে আমার নেই। বাংলা দেশের সাহিত্য-পেয়ালায় আধুনিকতার যে তুফান উঠেছিল, আমার উদ্দেশ্য তারই গতিচরিত্র নির্ণয় করা। যে দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, তথাকথিত অতি-আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্য একটা মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যখন তার চলবার জন্যে একটা নতুন রাস্তা দরকার, আর বাংলা সাহিত্যের চলা মানেই রবীন্দ্রনাথের চলা। তিনি তখন 'পূরবী'তে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং এ বইটিতে তাঁর দীর্ঘজীবন-ব্যাপী সাধনার একটা সার্থক সালতামামি করেছেন। জীবনের সুস্থ সদর্থক সঙ্গীতময়তার উপর অটুট আস্থা রেখে ব্যক্তিচৈতন্যের মধ্যে বিশ্বকে বিধৃত করবার যে ঐকান্তিক সাধনা তার যথাসম্ভব বিকাশ ঘটেছে সেই সময়ে তাঁর মধ্যে ও বিকৃতি ঘটেছে তাঁর অনুকারীদের মধ্যে। সমস্ত বাংলা সাহিত্য জুড়ে কবিমাত্রেরই প্রেম হৃদয়-দেউলে প্রাণপ্রদীপ জেলে অপেক্ষা করছে, সকলেরই বসন্ত বর্ষে বর্ষে বারংবার অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় প'রে বাঁশরি বাজাচ্ছে আর মৌমাছিরা তাদের লঘুস্বচ্ছ পক্ষে সনাতন স্বর্ণরেণু মেখে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। চৈতন্যের এই তুরীয় সঙ্গীতময়তা স্থায়ী জীবনধর্মের প্রকাশ নয়। এর পূর্ণচ্ছেদ পড়বার সময় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও এই পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, 'পূরবী' নামকরণেই তাঁর ক্লান্তির স্পষ্ট স্বীকৃতি। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ব্যক্তিচৈতন্যের বিহ্বল ভাবাবর্ত থেকে জীবনের মৌল আবেগের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ, এবং সেই প্রকাশের উদ্ধত দাবি নিয়েই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের থমকে দাঁড়ানোর ফলেই আধুনিকতার উদ্ভব, এ কথা মনে করলে মিথ্যার অধিক মিথ্যা—বিকৃত সত্যকে গ্রহণ করা হবে। এটা আধুনিকতার উদ্ভবের ঋণাত্মক দিক, তার সদর্থক দিকও আছে এবং সেইটেই আমাদের বিচার্য। অবশ্য একটা জীবন্ত সত্তার ক্ষেত্রে যেমন হয়, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দিকই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কিন্তু তবুও সার্থক বিচারের প্রয়োজনে দিক্‌বিভাগ অবশ্য-কর্তব্য। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে যে চেষ্টা সত্যই আধুনিক, তা

হচ্ছে ব্যক্তির সুখদুঃখ অনুভূতি থেকে, কালনিরপেক্ষ মানবের বেদনার রাজ্য থেকে সমষ্টির সুখদুঃখ ও ইতিহাসগত মানুষের আশা-বেদনার লোকে উত্তরণ। রবীন্দ্রসাধনার সঙ্গে এই চেষ্টার প্রকৃত পার্থক্য আমাদের কাছে প্রতীত নয়। পার্থক্য যে আছে তা অবশ্য সকলেই বোঝেন, কিন্তু তার চরিত্রনির্ণয়ে আমরা প্রায়শই উদাসীন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি কি একটি বিশ্ববিমুখ আত্মগতবুদ্ধি জাব? তা কখনই নয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ববাদের এ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা, এ অর্থ কদর্থ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত রচনায় আত্মার সঙ্গে বিশ্বের মিলনের সেতু রচনা ক'রে গিয়েছেন, তাঁর সমস্ত উক্তির মূলে এই বিশ্বাস—'একা মানুষ ভয়ঙ্কর ভাবে নিরর্থক'। কুঁড়ির ভেতর অন্ধ ভাবে সুগন্ধের কান্নাকে তিনি কোন দিনই চরম ব'লে মেনে নেন নি, সেই বন্দীদশা থেকে বার হওয়াই তাঁর আপন 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রমণ। এই সেতুবন্ধ সার্থক ও সত্য হয়েছিল ব'লে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র কবি 'প্রভাত-সঙ্গীতে' নবজীবন লাভ করেছিলেন, নিশ্বাসের মত সহজ ভাবে বলতে পেরেছিলেন, "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও আধুনিক সাহিত্যের পৃথিবী এক নয়, এক নয় রবীন্দ্রনাথের আত্মা ও আধুনিক সাহিত্যের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মানুষ বিশ্বের জল-হাওয়া গাছপালার সঙ্গে নিখিল প্রকৃতির একজন অংশীদার, রবীন্দ্রনাথের মানুষ ইতিহাসের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। আধুনিক সাহিত্যের মানুষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক, প্রাকৃতিক নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মানুষকে বলা উচিত মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যধর্ম যা মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এক ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে তার মহত্ত্বের আশ্রয় ও মহিমার মুকুট হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে চেষ্টা হয়েছে গোষ্ঠীগত, ইতিহাসের শৃঙ্খলবদ্ধ জান্তব মানুষের আত্মপ্রকাশের। তার বিশ্ব ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব এক নয়। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু ইতিহাস তাঁর বিশ্বে অপ্রধান, আর ইতিহাসগত মানুষই আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। আমি এ কথা বলছি না যে, ঐতিহাসিক মানুষের আনন্দ-বেদনার প্রকাশ আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সৎ সিদ্ধান্তে এসে

পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু এর চেষ্টা ও তজ্জনিত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আধুনিক সাহিত্যের মূলধারা।

এই জান্তব মানুষের আর এক দিক আধুনিক সাহিত্য, তার প্রথম আত্মপ্রকাশের সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিল। আমি যৌনতার কথা বলছি। যৌনতার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য ব্যক্তি-জীবনের একটি নিশ্চিত স্বীকৃতি খুঁজেছিল। আমার কথাটা স্পষ্ট হবে যদি আমি প্রাচীন সাহিত্যের যে নিঃসঙ্কোচ স্বতঃজাত যৌনতা, তার সঙ্গে এই আধুনিক মানসিকতার তুলনা করি। আধুনিক যৌনতার ক্ষেত্রে একটি সজ্ঞান মনের সচেষ্ট সন্ধান আছে। প্রাচীনের ক্ষেত্রে আছে সহজ অনুভূতির সহজ প্রকাশ। কিন্তু যৌনতার মধ্যে এই সন্ধান কেন? তার কারণ মিলবে জাগতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। যুদ্ধ ও অনাহার মানুষের জীবনের তথা তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভেঙে দিয়েছিল, তার কর্মক্ষেত্রকে বিলুপ্ত করেছিল আর তার আত্মাকে করেছিল নিরবলম্ব। জীবনের উদ্দেশ্য যদি লুপ্ত হয়, তা হ'লে নীতি বা লোকব্যবহারের কি অর্থ থাকে? জীবনের পত্রপুষ্প বিকাশের ও বিস্তারের যদি কোন ক্ষেত্র না থাকে তবে শিকড়ের মধ্যেই আত্মসন্ধান চলতে থাকে। যে অবস্থায় জীবন ও তার সর্বসাধনাকে নিরর্থক পরিণতিহীন ব'লে মনে হয় সে অবস্থায় যৌনতাই আত্মপ্রতিষ্ঠার Self assertion-এর সহজতম পন্থা। তৎকালীন বিপুল আত্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে যখন ব্যক্তি-মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও তার জীবনের সমস্ত তাৎপর্য এক অসার্থক শোভাযাত্রার রূপ ধারণ করেছিল, তখন ব্যক্তি তার আশ্রয় খুঁজেছিল এই অন্ধ আদিম প্রবৃত্তির গহনে। জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাববিপর্যয়ের সাক্ষাৎ মিলবে। যেমন দেখা গিয়েছিল মেসিনার ভূমিকম্পের পর যখন ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে বিহ্বল নরনারী যৌনমিলনে মিলিত হয়েছিল, বিপর্যয়ের মধ্যে প্রাণের একটা নিশ্চিত ক্ষেত্র হিসেবে। Promiscuity-র আলোচনাতেও এই একই মানসিকতার পরিচয় মিলবে। প্রহসনের নায়ক যখন বুঝতে পারে না যে সে জীবিত কি মৃত, তখন সে নিজের গায়ে নিজে চিম্‌টি কাটে। যৌনতা সেই রকম আত্মার চিম্‌টি কাটা।

কিন্তু এ ভূমিতে ভিত গাঁথলেও এই ধুলোর ওপর এলিয়ে শুয়ে থাকা যায় না। Instinct আমাদের গহনে থাকে থাকুক, কিন্তু সে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে না, অন্তত জটিল আধুনিক জগতে। তাই আধুনিক সাহিত্য ধীরে ধীরে তার সন্ধানের দিগ্বলয় পরিবর্তন করেছে, এবং আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎযুগে যৌনতা এক বিহ্বল কালের আর্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

অথচ ব্যক্তির নিজের মধ্যে যদি সৌন্দর্য ও পূর্ণতার কোন আশ্রয় না থাকে, যদি তার জীবন একান্তই সমষ্টি-নির্ভর হয়, তা হ'লে জীবন-জিজ্ঞাসাকে কিছুদিনের জন্য এড়িয়ে যাওয়া হয় মাত্র, তার সমাধান হয় না। ব্যষ্টিরই হোক আর সমষ্টিরই হোক, জীবনের উদ্দেশ্য ও পূর্ণতা কিসে? কোন্ অনুভূতির মধ্যে আমাদের প্রাণ আপন সত্যকে সম্পূর্ণভাবে খুঁজে পায়?

আধুনিক সাহিত্যের পথ এই আত্মজিজ্ঞাসার পথ।

অসিতকুমার

অনিবার্য

ননীর চোর বদনামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সবাই, বিশেষ ক'রে মেয়েমহলে। একে মেয়েমানুষ, জলজ্যান্ত সধবা, তার ওপর বামুনের মেয়ে, পাঁচ-পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা।

ছোট গাঁয়ে ননীর বাড়ি—বাপের বাড়ি, শ্বশুর-বাড়ি সব। ননীর স্বামী হরেন ঘরজামাই থাকবার কথা স্বীকার ক'রেই নাকি বিয়ে করেছিল ননীকে। যেখানে জন্মেছে সেখানেই বড় হয়েছে ননী। ছোট ছোট দুইখানি মাটির চালাঘর, বেড়া দিয়ে ঘেরা। শশা, বরবটি, লাউমাচা প্রতি বছরই ভাঙে গড়ে অনেকটা অনিবার্যতার আইন ধ'রে, ঠিক যেমন ক'রে সূর্য ওঠে রোজ রান্নাঘরখানার পূর্ব দিকে হেলা কাঁঠাল গাছটার আড়ালে, একটু একটু ক'রে রোদ এসে পড়ে উঠানে, জলের কলসি একটা যেখানে বসানো আছে প্রায় তিরিশ বছর থেকে একভাবেই। গাঁয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র পোশাকী, আটপৌরে সব।

ওরই মধ্যে তার পৃথিবী, ওরই আকাশ বাতাস জল মাটির সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে তার কল্পনা।

একই জায়গা। সেইটকুকে কেন্দ্র ক'রে ঘোরাফেরা করেছে ননী; ছোট থেকে বড় হয়েছে, গাছকোমর বেঁধে খেলা করেছে, হরেনকে দেখে ঘোমটা টেনেছে, আবার মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে হরেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আঙুল মটকে গাল দিয়েছে ছড়া কেটে কেটে—হাড়হাভাতে, মুখপোড়া, শ্বশুর-বাড়ির ঢেঁকি, গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।

এসব গা সওয়া ননীর। এতে সে বাড়েও না, কমেও না।

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর রোদ মাথায় ক'রে মুখুজ্জে-বাড়ির খিড়কি-দোর ঠেলে ভেতরে এল ননী।

কি লা ছোট বউ, রান্না হয়ে গেল?

কে? দিদি! এস, ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা এলেই তাঁর ভাতটা চাপিয়ে দেব।

মুখখানা যে বড্ড শুকিয়ে গেছে ছোট বউ। এতটা বেলা হ'ল, কিছু খাস নি বুঝি?

ছোট বউয়ের হাসিটা দেখলে বড় মায়া হয় ননীর। শ্বশুর-শাশুড়ীর চাপে প'ড়ে পিষে যাচ্ছে বউটা। গরিবের মেয়ে, স্বামীরও রোজগার কম। বড় বউ বড়লোকের মেয়ে, স্বামীর কাছে কলকাতায় থাকে। মাথা ধরলেই মুখুজ্জে-গিন্নী ছুটে যান সেখানে। ছোট বউ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মুখটি বুজে, ভাল কথা বছরে একদিনও জোটে কি না সন্দেহ। মুখুজ্জে-গিন্নীকে বেশ জানে ননী।

ছোটখাট মানুষটি, অত্যন্ত চটপটে ননী। পাতলা ঠোঁট দুটো আর গোল গোল ফরসা ছোট ছোট দুখানা হাত বড্ড তাড়াতাড়ি চলে, এক রকম ভেল্কি বললেও হয়।

নে, হাত ধুয়ে ফেল্। এটুকু মুখে দে দিকি। কি করবি এখন? জল তুলবি ইঁদারা থেকে? তুই খা তো, আমি তুলে দিচ্ছি।

রূপোর মত ঝকঝকে ফুলকাঁসার বাটিতে তেল-জবজবে টাটকা মুড়ি, তার ওপর বড় বড় দুটো নারকেল-নাড়ু বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে ননী।

ছোট বউয়ের চোখে জল আসে। কলকাতায় গেছেন শাশুড়ী, যাবার সময় দিব্যি দিয়ে গেছেন, ননী যেন চৌকাঠ না মাড়ায়। চোর দুর্নাম থাকলেও ভালবাসতে জানে ননী। ননীর আদর পায় নি, এমন বউ ঝি খুব কম আছে গাঁয়ে। আচার্যদের নতুন বউকে ঘড়ার ভেতর লুকিয়ে খাবার নিয়ে গিয়ে কতদিন খাইয়েছে ননী, বড় পুকুরের ধারে। নিজে মুখেই গল্প করেছে বউটা।

খাওয়াদাওয়ার পর আসব ছোট বউ। একলাটি থাকিস। গোলোকধামটা নিয়ে আসব, কেমন?

আচ্ছা, ঠিক আসবে তো দিদি?

আসব বইকি।

দুলে বাগদী আর ঘর কতক বামুন কায়স্থ নিয়ে পাড়াটা। লোক যেন ক'মে আসছে দিন দিন। কত লোক ছিল আগে। সেবার ওলাউঠা হয়ে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! সাবিত্রী পিসিমা, রমাই সরকার, অধর বাগদী, আরও কত মারা গেল চার-পাঁচ দিনের ভেতর। ও-দিকটায় যেতে এখনও গা ছম ছম করে ননীর। রক্ষেকালীপুজোর ভোগের সন্দেশ আগে থাকতে চুরি ক'রে খেয়েছিল হরু—ভটচাজ্জি মশাইয়ের ছোট ছেলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গাঁ উজোড় হয়ে গেল।

ক্ষয়িষ্ণু পল্লীগ্রামের অবক্ষয়ের বেদনা। তারই অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতির ধারাবাহিকতাকে নিয়ে কত রকমের জমা খরচ করে ননী।

সাতকড়ে দুলের ভাঙা ঘরখানার দিকে চোখ পড়ল ননীর। হাড়কিপ্‌টে ছোটলোক সাতকড়ে। ভাল ক'রে পেট ভ'রে দুটো খেতে দেয় না বউটাকে। জোয়ান মদ্দ খাটিয়ে লোক সাতকড়ে। মাছ ধরে, জন খাটে, মাঠের কাজ করে আর লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমায়। দেওয়ালের গায়ে গর্ত ক'রে মাটির কলসি পুঁতে টাকা রাখে সেখানে। বউটা পাঁচটা টাকা চুরি ক'রে কি মারটাই না খেয়েছিল সেবার! গায়ের ব্যথায় উঠতে পারে নি কতদিন।

ঠিক দুকুর রোদে কম্‌নে গিয়েলে দিদিঠাকরুণ? মুখখানা একেবারে আঙা হয়ে গিয়েছে। বসবা?—এক বোঝা কাঠ কুড়িয়ে

এনে দাওয়ায় সাজিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলে সাতকড়ের বউ।

আঃ, মরণ! ঐ টেনা প'রে কোথায় গিছলি? মুখপোড়া সাতকড়ে কি একখানা কাপড় দিতেও পারে না? অমন পয়সার মুখে আগুন! অগ্নিবর্ষী আকাশ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে—রাস্তায়, ঘাটপথের ধুলোয়, ননীর মেজাজে সব কিছুতে।

দাওয়ায় উঠে উপ্ হয়ে বসল ননী, সন্তর্পণে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। মনটা কিন্তু তখনও ছুঁয়ে আছে সাতকড়ের বউয়ের অপরিচ্ছন্ন দেহটাকে, ছেঁড়া কাপড়ের অসচ্ছলতাকে, রুগ্ন গায়ের খোস-পাঁচড়ার, নয়তো কালসিটের দাগগুলোকে।

কই, রান্না করছিস নে? এর মধ্যেই খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল?

নাঃ। আন্না এখন করব না। মিনসে মাছ বেচতে গিয়েছে বেলেডাঙার হাটে। হাঁড়িতে পান্ত ভাত ছ্যাল। আত্তিরে গরম ভাত হবেখুনি।

সাতকড়ে আবার মাছ বেচতে ধরল বুঝি? কিছুই আর বাদ রাখল না দেখছি।

বেচবে না? জন খাটায় তো অস নেই। মাছ বেচায় অস কত? গায়ে গা ঠেইকে বসবে। কত হ্যাকরা, হাসি মস্করা!—চোখ টেনে ব'লে গেল সাতকড়ের বউ।

আলগা হয়ে পড়ল ননী।—কি বললি লা বউ? কার গায়ে পা ঠেকিয়ে বসবে?

বড্ড মুখরোচক খাতে চলে এসেছে আলোচনাটা।

কার আবার? যে জনার সঙ্গে ভাব, গায় পড়াপড়ি, তার।

আ মরণ! না বললে কি ক'রে বুঝব বল্।

সাতকড়ের বউয়ের হাসিসুদ্ধ মুখখানা ছলছল ক'রে উঠল। ব্যথার ওপর হাত বুলুতে গিয়ে যেন মুচড়ে ফেলেছে ব্যথার জায়গাটা।

কেডা আবার? ঐ ফুলি গো, আবার কেডা? কত ঢলানই না ঢলাল। আঁড় হয়ে তোমাদের মতন হাত শুধু করল, আঁস খাওয়া ছেড়ে দেল, একেবারে সতী সাবিত্তিরী। এখন আবার গলায় কাঁস-

হার হয়েছে, বাস-তেল না হ'লে মাথা হয় না। কত দেখলাম দিদিঠাকরুণ, আরও কত দেখব!

তামার মত জ্বলন্ত আকাশ হারিয়ে ফেলেছে তার রূপ, স্নিগ্ধতা, শ্যামলতার নামগন্ধ। সব কিছু পুড়ে যাচ্ছে নিঃশেষে, অপরিণামে,— কেন, ঠিক জানে না ননী। দুলে-বউ পুড়ছে, মুখুজ্জেদের ছোট বউ পুড়ছে, আরও কত কে পুড়ছে, কে তার খবর রাখে? দুলের মেয়ে ফুলি, ননী তাকে হতে দেখেছে। তারই মত ঝিউড়ি থেকে বউ হয়েছিল এই গাঁয়েই। বরের নাম ছিল কার্তিক। কার্তিক তো কার্তিকই বটে! ছোটলোক হ'লে কি হয়, কি চোখমুখের গড়ন আর কি গায়ের রঙ! দিন তিনেকের জ্বর-বিকারে মারা গেল। ননীর সেজ ছেলেটা হয় সেবার। ফুলির কি কান্না আর কি দাপাদাপি, ধন্য ধন্য করেছিল গাঁয়ের লোক। কত লোক নিকে করতে চাইল, টাকা নিয়ে সাধাসাধি করল। এক বেলা খেয়ে ঘরের কোণে কাঁথা প'রে ব'সে থাকত ফুলি, পরনে একখানা কাপড়ও ছিল না। তাও কি দু-দশ দিন পাঁচ-ছ বছর!

চোদ্দ-পনের বছরে বিধবা হয়েছিল ফুলি, কোলে একটি মেয়ে নিয়ে। মেয়ে তো নয়, একেবারে মাখনের ডেলা, দুলের মেয়ে হ'লেও চোখ ফেরাতে পারত না কেউ। না খেতে পেয়ে পুঁয়ে পেয়ে গেল মেয়েটা। অধর ডাক্তার শিশি কতক ওষুধ দিয়েই দামের তাগাদা করল। অধর ডাক্তারের দুটো পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদেছিল ফুলি, মেয়ে ভাল হ'লে গতরে খেটে তার দেনা শোধ করবে। ডাক্তার তো নয়, চামার। দুধলো গরুটার দড়ি ধ'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।— টাকা দিয়ে গরু নিয়ে যা। গরুর দুধ বেচে পেট চালাত ফুলি, মেয়েটার পেটেও এক-আধ ফোঁটা যেত। মাসখানেকের ভেতরই মেয়েটা গেল! সে ফুলিকে মনে করলে এখনও চোখে জল আসে ননীর, ছোট্ট মেয়েটার গেঙিয়ে গেঙিয়ে কান্না আজও ভুলতে পারে নি সে।

আর আজ? মাছ বেচতে গিয়ে নিজেকে বেচে ফেলেছে ফুলি। পাতলা ছিপছিপে ফুলি ফুলে উঠেছে মাংসে, চর্বির ঢল নেমেছে গায়ে। বোকা বোকা মুখখানা ভেঙে চুরে টোল খেয়ে গেছে কুৎসিত রসের

কদর্যতায়। গলার আওয়াজ মোটা হয়ে গেছে—সে ফুলি আর নেই। ছিঃ, ছিঃ! ছোটজাতের মুখে আগুন। মেয়েমানুষের স্বভাব নষ্ট হ'লে আর রইল কি? পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় ননী, মেয়ে পুরুষ সকলের সঙ্গেই মেশে, কথা কয়, কাউকে লজ্জা করে না, সমীহ নেই, তবুও কেউ মন্দ কথা বলুক দেখি তাকে? তেমন মায়ের মেয়েই নয় ননী।

ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারিস নে? কোথাকার ভিজে বেড়াল লো তুই?

তাই।—ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে চোখ দুটো মুছে নিল সাতকড়ের বউ। বললে, দ্যাখবা?

ঘরের ভেতর থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট্ট একটা মোড়ক নিয়ে এল ফুলে-বউ।

কি লো? কি ওটা?

আমার ছেরাদ্দ, আবার কি? সোহাগীর জন্যে দুল গইড়েছে গো। ঝাঁপির ভেতর দ্যাখলাম আজ সকালে।

ঝকঝকে একজোড়া সোনার দুল, নতুন গড়ানো। দুল জোড়াটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ননী। সোনা—মেয়েমানুষের সুখদুঃখের মাপকাঠি, স্বর্গ, অপবর্গ, যা কিছু। এরই ধাতব আকর্ষণের শত পাকে জড়িয়ে আছে ননী, জ্ঞান হবার পর থেকে। জন্মে এর প্রসাদ পায় নি ননী, বিয়ে ক'রেও একে কোনদিন খুঁজে পায় নি হাতের মধ্যে, এখনও তাই। মেয়ে-বেচা ঘরের মেয়ে ননী। হরেন তার স্বামী হ'লেও, বিয়ের দাম ফেলতে হয়েছিল হরেনকে নিজের সম্পত্তির অংশ বিক্রি ক'রে। সে দামে সোনার সংসার জুটলেও, সোনা জোটে নি ননীর গায়ে। তাই দেহের ষোল আনা পাওনাও সে বুঝে পেল না কোন দিন।

দুল না থাকলেও, দুল পরবার বিঁধ ছিল তার কানে। নিজের হাতে দুল দুটো প'রে ফেলল ননী।

কি মানানই না মেনিয়েছে দিদিঠাকরুণ, যেন লক্ষ্মী পিতিমে। বলে—যার রঙে মানায় সোনা, তার জোটে না সোনাদানা।

ছুলে-বউ যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

দূর। তোর যেমন কথা! এ তো ছাই জিনিস। তোরা তো দেখিস নি। এত বড় বড় কানবালা ছিল আমার। চেহারাও ছিল সেই রকম। বিশু আমার সেবার পেটে হয়েছে। তোর জামাইবাবু আর ঘরের কোণ ছেড়ে নড়তে চাইত না।

ননীর নেশা লেগেছে—বাস্তব আজ মিলিয়ে গেছে কোথায়, হারিয়ে গেছে তার সীমারেখা। জলজল করছে সোনা, বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য, দুজনেরই শক্তি-সামর্থ্যের অনধিগম্য।

আয়, তোর কানে পরিয়ে দিই। ছুলে-বউয়ের দিকে এগিয়ে গেল ননী।

থাক্ গো দিদিঠাকরুণ। আমার আবার গয়না! বলে, ভাত কাপড়ই প্যালাম না। আমাদের এমনিই ভাল।

আ মর্ মাগী। তুলে রাখ্, আমি নিয়ে কি করব?

ঐ ফেলে থোও ঐঠানটায়। তোলবা নে।—খেটে খাওয়া শরীরটা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে ছুলে-বউয়ের।

না, তুলে রাখ্। যেখানে ছিল সেখানে।—ঘরের ভেতর চোখ রেখে ব'সে রইল ননী।

আসুক একবার মুখপোড়া। আজ তারই একদিন, কি আমারই একদিন। আজ আঁধবও না, বাড়বও না। দেখি, কেডা পিণ্ডি দেয় গিলতে?

দুল জোড়া যেমন ছিল রেখে দাওয়ায় এসে শুয়ে পড়ল ছুলে-বউ।

রাতে অনেকবার ঘুম ভেঙে গেল ননীর। কান দুটায় যেন কি ঝুলছে, বেশ ভারী ভারী, সেই সঙ্গে মুখখানা বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছে। নাঃ, কোথায় কি, সেই তো ন্যাড়া ন্যাড়া কান, রাক্ষুসীর মত হাঁ ক'রে রয়েছে বিঁধ দুটো। পেছন ফিরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে হরেন। ফুটফুটে রঙ, নরম নরম গা। হ'লে কি হয়? কেবল ঘুম আর ঘুম! না আছে শখ, না আছে সাধ। কাটখোট্টা, চোয়াড় চোয়াড় সাতকড়ে, জোঁকের মত কালো কালো ঠোঁট, তবুও কত শখ তার? পুরুষ বেটাছেলে বটে! লম্পট হ'লেও দিতে জানে, ভালবাসতেও জানে।

দুলে-বউ দুঃখী বটে, কিন্তু বরাত ফিরতে কতক্ষণ? পুরুষমানুষের চোখের নেশা আর কদিন? তারপর? সেই দুলে-বউ। ঘরের বউ ফেলে কতদিন আর বাইরে বাইরে ঘুরবে? আর হরেন? কোন্ সাধটা মিটিয়েছে তার, যে পরে মেটাবে?

শুয়ে শুয়ে ফুলতে লাগল ননী। দুর্ভিক্ষ লেগেছে চারিদিকে। শরীরে মনে সব জায়গায়; দুলে-বউ তাকে সুন্দর বলেছে। কই, এত দিন তো বলে নি ও-কথা! শুধু একজোড়া দুল পরতেই তার রূপ খুলে গেল? তবুও তো হাতে নেই, গলায় নেই। ছোট্ট ঘুলঘুলির মত জানলা দিয়ে হাওয়া আসছিল, শেষরাতের পাতলা হাওয়া—ঝিরঝিরে, গা জুড়িয়ে যায়। হাত পা ছড়িয়ে ভাল ক'রে শুল ননী। সাতকড়ে হয়তো এতক্ষণ পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এল। ফুলি হয়তো দুল প'রেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, ভগবানের কি বিচার! যতদিন ভাল ছিল ফুলি, সোনার আঁচড়ও পড়ল না গায়ে। তেলচিটে ময়লা কাপড়, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, এই মাথাটা, সাতজন্মে এক কৌটা তেল জুটত না। আর যেই স্বভাব খোয়াল, সোনাদানায় গা ভ'রে যাচ্ছে। গলায় হয়েছে, কানে হয়েছে, তিন আঙুলে আংটি উঠেছে, শুধু হাতেরটা ফেলে দিয়েছিল ব'লে আর হাতে পরতে পারে না। আর পুরুষগুলোরই বা কি দশা? নিজের বউকে পেট ভ'রে ভাত দেয় না আর ফুলির জন্যে দুল গড়ানো হয়েছে। আজ যদি কার্তিক বেঁচে থাকত, খেঁকী কুকুরের মত ঘুরে বেড়াত ফুলি, গায়ে খড়ি উঠেছে, ছেলে হয়ে হয়ে ফুলে পড়েছে পেটের চামড়া। কোথায় পেত গা-ভরা গয়না, মাথার গন্ধ-তেল, বেশ কাচানো ধপধপে কাপড় জামা? ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে ননীর গা ঘেঁষে এল হরেন। চমকে উঠল ননী। কি সব আবোল-তাবোল ভাবছে সে না ঘুমিয়ে! নোংরা, ছোটলোক ওরা, ছুঁলে নাইতে হয়, ওদের ভাল মন্দেতে কি আসে যায় তাদের? শেয়াল-কুকুরের মত বাস করে তারা মানুষের মধ্যে। হরেনের দিকে পেছন ফিরে ঘুমবার চেষ্টা করল ননী।

গঙ্গাস্নান ক'রে পূজা ক'রে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চাইল ননী, বামুনের মেয়ের প্রাক্তন স্বরূপ, বামুনপাড়ার সঙ্গে নাড়ীর যোগ। কনে

ঠাকুরমার বড় কষ্ট, একলাটি থাকে বুড়ী, গঙ্গা থেকে জল আনতে বুকে খিল ধ'রে যায়। এবার থেকে তার জলটা রোজ এনে দেবে ননী। মুখুজ্জেদের ছোট বউটার কাছে আর যাওয়া হয় নি। ভাত মুখে দিয়ে ছেলেমেয়েদের ঘুমুতে ব'লে বেরিয়ে পড়ল ননী। ননীর বাড়ি আর মুখুজ্জে-বাড়ির মধ্যে হাইফেনের মত জুড়ে রয়েছে জেলেপাড়াটা—সাতকড়ে, হারু, ফুলির ঘরগুলো। সাতকড়ের ঘরখানায় বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। দুলে-বউ হয়তো কাঠ ভাঙতে গেছে, নয়তো ছাগল বাঁধতে গেছে বিলের ধারে। সাতকড়ে ফুলির গায়ে গা দিয়ে ব'সে মাছ বেচছে। দুল জোড়াটা কি দিয়ে দিয়েছে ফুলিকে? আচ্ছা, যদি না দিয়ে থাকে, দুল দুটো লুকিয়ে রাখলে কেমন হয়? তারপর একদিন দুলে-বউকে ডেকে তার কানেই পরিয়ে দেবে দুল দুটো। ফুলির খপ্পরে পড়ার চেয়ে সে অনেক ভাল। সর্বনাশী ফুলি মাথাটা খাচ্ছে গাঁয়ের।

ননী সব ভুলে গেল। শত সহস্র গঙ্গাস্নান, পূজা অর্চনার শুদ্ধি। নিষ্কলুষ দেহের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুলিয়ে উঠল আদিম রমণীর লোভাতুর মন। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি খুলে ফেলল অতি সন্তর্পণে। জালের কাঠি, ছেঁড়া একপাটি মোজা, মতিহার দোক্তার পাতা, তার ভেতর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বেগুনী টিস্যু পেপারে জড়ানো দুল জোড়াটা। না, ঠিক আছে। এই পরলে নাকি বড্ড ভাল মানায় তাকে। মাথাটা ঘুরে উঠল ননীর, বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পিটছে, হাত দুটো ঠকঠক ক'রে কাঁপছে থেকে থেকে।

ঝনাৎ ক'রে আছড়ে পড়ল শেকলসুদ্ধ দোরটা।

ও মা, আমার কি হবে? দিদিঠাকরুণ, তুমি?—হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল দুলে-বউ।

ননীও আছড়ে পড়তে চাইছিল, নয়তো ধাক্কা দিয়ে দুলে-বউকে সরিয়ে চোঁ-চা দৌড় দিতে। তবুও সামলে নিল। অনেক পোড় খাওয়া ননী—বঞ্চনা, লজ্জা, অপমানের অজস্র ক্ষতচিহ্নিত তার মন। বহুরূপীর মত সহজ হয়ে গেছে চোখমুখের রঙ বদলানো। বিত্তহীনতার অপরাধে অনেক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে তার। প্রথম

যৌবনের স্মৃতির সঙ্গে আজও একাত্মী হয়ে আছে সে সব অপমানের কথা। একলা পেয়ে হাত ধ'রে টেনেছিল রাজু চাটুজ্জের ছেলে শৈল, ননীর তখন বিয়ে. হয়ে গেছে, সমস্ত গা তার মুড়ে দিতে চেয়েছিল সোনায়। সোনার নেশায় সে দিন রঙ ধরে নি তার মনে। এক ধাক্কায় শৈলকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ননী, ঢাক পিটে গাল পেড়েছিল শৈলকে পাড়ায় পাড়ায়, ঘাটে পথে।

কে? বউ? আর বলিস কেন আমার মরণ! গুড়ের বাটিটা কুকুরে মুখে ক'রে নিয়ে গেছে কোথায়, কোনখানে খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই ভাবলাম, যদি তোদের ঘরে এনে ফেলে থাকে—

তাই ঝাঁপি উট্‌কে খুঁজতি এয়েছ ঘরের মধ্যে?—চাঁচাছোলা, কাটা কাটা কথা দুলে-বউয়ের, একটুও জড়তা নেই।

সর্ সর্। আমি কি তোর ঘরে চুরি করতে এয়েছি না কি? ঘরটা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, দুলটা আছে, না, ফুলির গব্বে গিয়েছে!

মেলা ফুটুনি ক'রো না বাম্‌নি। তোমার ছোঁচকা স্বভাব কেডা না জানে এ গাঁয়ের? স্থাখ্‌বা, হাটে হাঁড়ি ভাঙব?

কি হয়েছে রে বউ? চেঁচাচ্ছিস কেন?

ফুলি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

ও কে? ননীদিদি? ননীর চোখের আড়ালে স'রে গিয়ে দাঁড়াল ফুলি।

আবার কেডা? ঘাট থেকে জল এনে দেখি দুয়োরের ছেকল খোলা। ও মা! গা আমার একেবারে ডোল দিয়ে উঠেছে! দেখি, যা ভেবেলাম ঠিক। ঝাঁপি খুলে পুঁটলি বের করেছে! দুল জোড়াটা হাতের তেলোয় নিয়ে এই এমনি ক'রে ধ'রে, আর একটু হ'লেই পগার পার হোয়েল আর কি!

দুলে-বউয়ের সামনে হাতে হাতে ধরা প'ড়েও কোন রকমে সামলে দিল ননী। ফুলি তাকে একেবারে বেফাঁস ক'রে দিল। এ আত্মসমর্পণ থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই। অনেক পুরুষের বুদ্ধি ভাঙিয়ে খায় ফুলি।

চুপ কর বউ, ছিঃ ছিঃ। ভদ্দরলোকের মেয়ে। একটা ভুল কাজ

হয়তো ক'রে ফেলেছে, তা নিয়ে কি পাঁচ কান করতে আছে ? তুমি বাড়ি যাও ননীদিদি। বড্ড রোদ চড়ছে। এ গরমে মানুষ পাগল হয়ে যায়, মাথার ঠিক থাকে না। খবরদার বউ, এ কথা যেন কারুর কানে না ওঠে। অমন মানুষ হয় না। খেতে পায় না, পরতে পায় না। অমন ভুল মানুষ ক'রেই থাকে।

ফুলির মুখের দিকে আর চাইতে পারবে না ভেবেছিল ননী। আজও নয়, হয়তো সারা জীবনেও নয়।

দুল জোড়াটা তুমি নিয়ে যাও ননীদিদি। এ দুল আমার। বউ দুঃখী মানুষ, ওর জন্তেই গড়িয়ে দিয়েছিলাম সাতকড়িদাকে। ওকে আবার আমি গড়িয়ে দেব।

না, দরকার নেই।—ফুলির মুখের দিকে চেয়ে আর কোন কথা বলতে পারল না ননী। এ যেন সেই ছোটবেলাকার ফুলি, একটুও বদলায় নি কোনখানে, একেবারে হুবহু সেই। গাঁয়ের মেয়ে ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই তার।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

কারা ?

কারা শোধ নেবে এ অপঘাতের
ভাঙবে এ কারা বন্ধ্যা রাতের
কাদের কঠিন ক্রুদ্ধ হাতের
  আঘাতে খুলবে দ্বার ?
কাদের প্রাণের অগ্নি-আভায়
মৃত্যু জ্বলবে চিতাশয্যায়
কারা উদ্দাম প্রাণবন্যায়
  ভাসাবে অন্ধকার ?
বন্ধু, তোমার আমার হৃদয়ে টলমল এই আশা
কাঁপে চঞ্চল কাল-তরঙ্গে নিরুপায় ভালবাসা
বারে বারে সব বানচাল করে শকুনির কালপাশা
  নাই বুঝি পথ নাই ;—

কারা উদ্দাম প্রাণবন্যায় ভাসাবে অন্ধকার
দূর দিগন্তে চাই।

* * *

রক্তে আমার সমুদ্রস্বাদ, ধারত্রীকাম আমার মনে,
অরণ্যঘন মানসে শ্যামল আশা
তবুও আমার দু বাহু বদ্ধ রাত্রি নামিছে নয়ন-কোণে
ইতিহাসে পথ পায় নাকো ভালবাসা।
আহা মরণের কৃষ্ণশিলায়, ভেঙে ভেঙে যায়
জীবনের ঢেউগুলি
অন্ধকারের মৃত-অন্তরে, থরথর করে
আলোকের অঙ্গুলি
আহা জন্মের দুরাশা বৃহৎ, হারা হয় পথ
মরুপথে বার বার—
কোথাকার প্রাণ হয় অবসান, গ্রাস করে সব
বন্ধ্যা অন্ধকার।
দিগন্তে কাঁপে দুঃসহ ঝড়, ক্লান্ত প্রহর
এতদিনে বুঝি শেষ—
এতদিনে বুঝি জন্মসীমায় স্বীয় মহিমায়
ঘনায় জীবনাবেশ,
এতদিনে যেন মৃত ইতিহাস নিল নিশ্বাস
অন্তরে এল আশা
এতদিনে যেন কঠিন মাটিতে, দুঃসহ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে
প্রাণ দিল আর সাথে সাথে যেন
প্রাণ পেল ভালবাসা।
বন্ধু দেখেছি, কালো বঞ্চনা, কালো রক্তের দাগ
মুছে সেই অনুরাগ,
আর্তকণ্ঠে সহসা জানাই রক্তের দাগ মুছি—
আসে না প্রভাত আসে না সূর্য শুচি
শতাব্দীগুলো হয়ে যায় ধুলো,
সেই জর্জর পথে

যাব কি ভবিষ্যতে ?
এত জন্মের এত মৃত্যুর দুঃসহ অবশেষে
তুহিনপঙ্ক সংশয়ে গিয়ে দুরারোহ পথ ঘেঁষে
যে হবি ঢেলেছি দূর দুর্জয় দেবতার উদ্দেশে
তাকে টেনে নেয় মাটি—
ঊর্ধ্বে তাকাই সূর্য শিকারী চলে তিমিরান্তরে
নির্বাক্ পথ হাঁটি—
কারা শোধ নেবে এ অপঘাতের
ভাঙবে এ কারা বন্ধ্যারাতের
কাদের কঠিন ক্রুদ্ধ হাতের
আঘাতে খুলবে দ্বার ?
কাদের প্রাণের অগ্নি-আভায়
মৃত্যু জ্বলবে চিতাশয্যায়
কারা উদ্দাম প্রাণবন্যায়
ভাসাবে অন্ধকার ?

প্রসঙ্গ-কথা

জীবনযাপনের মান

ভারতবাসীদের জীবনযাপনের মান উন্নীত করিবার জন্য আমাদের নেতাগণ আগ্রহান্বিত। এই আগ্রহ প্রশংসনীয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার সমাধান করিতে গেলে আনুষঙ্গিক অনেক কথাই বিবেচনা করিয়া লইতে হয়।

জীবনযাপনের মান কতটুকু পর্যন্ত উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোন্ মানদণ্ডে তাহার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, তাহা পরিষ্কার করিয়া কেহই বলিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের নেতাদের সম্মুখে দুইটি আদর্শ রহিয়াছে,—একটি পাশ্চাত্য আদর্শ আর একটি ভারতবর্ষের আদর্শ। পাশ্চাত্য আদর্শে ন্যূনতম জীবনযাপনের মান বহু অর্থ, শিক্ষা

ও সৎ-দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ। ভারতবর্ষীয় আদর্শে ব্যয় অত বেশি নহে, কিন্তু চরিত্রবলের প্রয়োজন বেশি।

এই দুইটি আদর্শগত মান বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করার পূর্বে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চাই, বর্তমানে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাপনের মানের রূপ কি!

বিহারে একটি শহরে আমারই বাড়ির পিছনে তিন ঘর ডোম বাস করে। একটি মজা পুকুরের পাড়ে একটি বটগাছের ছায়ায় তাহাদের তিনখানি কুঁড়েঘর। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে ৪।৫ হাত, প্রস্থে ৩।৪ হাত মাত্র। উচ্চতা বেশি নাই, একটা মানুষ দাঁড়ানো অবস্থায় ঘরে ঢুকিতে পারে না। ঘর তিনটি অবশ্য নিকৃষ্ট জাতীয় খড়ের। ভিত্তি মাটি হইতে ৩।৪ আঙুল মাত্র উঁচু। ঘরের মধ্যে খাট-খাটিয়া নাই। দুই-একটা ছিন্ন তালপাতার চাটাই ও জীর্ণ কাঁথার মত কি একটা বস্তু। দুই-তিনখানা অর্ধছিন্ন নোংরা বস্ত্রখণ্ডও আছে। কয়েকটা মাটির হাঁড়ি বটগাছের ডালে শিকায় ঝুলানো থাকে।

এই ডোমদের প্রধান জীবিকা বাঁশের টুকরি তৈরি করিয়া বিক্রয় করা। কোন মানুষ মরিলে ইহারা আসিয়া বাঁশের দোলা বানাইয়া দেয়, তাহাতে নগদ কিছু পয়সা পায় আর মৃতের ত্যক্ত বিছানাপত্র ঘরে লইয়া আসে।

যাহা কিছু আয় করে, তাহার একটা মোটা অংশ ইহারা তাড়ি খাইয়া ব্যয় করে আর অবশিষ্ট পয়সা দিয়া নিকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য কেনে। পাড়ায় দূরে বা নিকটে কোন ভোজ হইলে ইহারা রাস্তায় কুকুরের মত বসিয়া থাকে, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কাড়িয়া কুড়াইয়া ঘরে আনিয়া খায়।

পাড়ার কুয়াতে ইহারা জল ভরিতে পায় না, বর্ণহিন্দুরা তাড়া করিয়া আসে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দয়াময়ী গৃহিণীদের কাছে মাগিয়া যাচিয়া পানীয় জল আনিয়া খায়। ইহারা কেহ কেহ কয়েকটা মুরগী পোষে। মুরগীগুলিকে আহার দিতে হয় না। চারিদিকে ঘুরিয়া যাহা পায় খায়। যখন ডিম দেয় তখন পাড়ার বাবুদের বাড়ি বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা ঘরে আনে। ইহাদের পরিধানে ছিন্ন নোংরা বস্ত্র।

আমার বিবেচনায় জীবনযাপনের মানবিচারে এই হইল ভারতবর্ষের সর্বনিম্নস্তরের মানুষ।

ইহার ঠিক উপরে নানা জাতের লোক আছে। তাহারা অস্পৃশ্য না হইলেও বাসস্থান তাহাদের প্রায় একই রকম। পুরা একখানা বস্ত্র সকলে পরিতে পায় না। বিছানা নাই বলিলেই হয়। আহার এক বেলা মকাইয়ের খই বা কড়াইভাজা, আলুয়া বা আর কোন নিকৃষ্ট মূল সিদ্ধ। সপ্তাহে ৩।৪ দিন এক বেলা ভাত জুটিলে সমারোহ পড়িয়া যায়।

মহাত্মাজী এই নিম্নশ্রেণীর দুর্গতি দেখিয়া নিজেও তাহাদেরই মত জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কুঁড়েঘরে খাটিয়ায় শুইতেন, হাঁটু অবধি পৌছায় এমন বস্ত্র পরিতেন আর অনুরূপ গামছা অঙ্গে ধারণ করিতেন। নিজের পরিধেয় বস্ত্র সাবান দিয়া কাচিয়া লইতেন। কিন্তু যাহাদের মধ্যে বাস করিতেন, তাহাদের খাট-খাটিয়া জুটিত না, আস্ত বস্ত্রও কম থাকিত। সাবানের পয়সা তাহারা কোথায় পাইবে? মহাত্মাজী ব্লেড দিয়া দাড়ি কামাইতেন, ছাগদুগ্ধ ফল ইত্যাদি সেবন করিতেন, সে সকল খাদ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবিতেই পারে না যে তাহাদের কোনদিন জুটিবে।

বিলাতী আবহাওয়ার দৃষ্টান্তে আমরা মধ্যবিত্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভাবিতেছি, ইউরোপীয়দের মত চালে আমাদের থাকিতেই হইবে, নহিলে সভ্য হইতে পারিব না।

দেখিতে দেখিতে বাড়িতে খাট টেবিল চেয়ার ঘর জুড়িয়া বসিল, অসংখ্য কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইল। ব্যয় বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও বাড়িল। মধ্যবিত্তদেরই এই চাল বাড়িতেছে এবং দেখা যাইতেছে যে, সমাজে তাহারা মান রাখিতে গিয়া বেইমান হইয়া পড়িতেছে। অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি করিতেছে। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ ইহাদের অনুকরণ করিয়া ভদ্রলোক সাজিতে চায়, কিন্তু অর্থাভাবে পারিয়া উঠে না।

এখন প্রশ্ন এই, দরিদ্র দেশবাসীর জীবনযাপনের মান কতটুকু বাড়াইলে চলিতে পারে?

প্রথম প্রয়োজন—বাসস্থান। মহাত্মাজী নোয়াখালিতে দরিদ্রের বাঁশখড়ের তৈরি কুটীর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, রাজার অট্টালিকা হইতেও এই সব গৃহ স্বাস্থ্যকর। বাঁশখড়ের ঘরই তাহারা নিজের পরিশ্রমে তৈরি করিয়া থাকে। এই কাঁচা ঘরের উন্নতির সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় আরও বড় হওয়া চাই। আলোবাতাস যথেষ্ট আসা চাই। ঘরে শোবার জন্য খাট বা খাটিয়া চাই। জিনিসপত্র রাখিবার জন্য অন্তত একটা বাক্স বা তোরঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তারপর খাদ্য। যাহাদের জমি আছে, তাহারা নিজেদের খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। যাহাদের সে সম্বল নাই, তাহারা খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া খায়। ধরিয়া লওয়া যাউক, একটি ভূমিশূন্য শ্রমিকের ঘরে পাঁচটি লোক আছে। ইহাদের কেবল মাত্র চাল বা অন্য খাদ্যশস্য ক্রয় করিতেই প্রত্যহ বারো আনা এক টাকা খরচ হয়। তারপর ভাত খাইবে কি দিয়া? একটু ডাল তরকারি তেল নুন কিনিতে আরও ।৶০-৷৹ ব্যয় হয়। দেখা গিয়াছে একটি শ্রমিক এই ব্যয়ভার বহন করিয়া পরিবার বস্ত্র ক্রয় করিয়া উঠিতে পারে না। সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো দূরের কথা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যও দিতে পারে না। মাথার তেল মাখিবার পয়সা নাই, আস্ত একখানা ধুতি শাড়ি কিনিবার পয়সা নাই। ছিন্ন বস্ত্র ময়লা ও নোংরা হইয়া গেলে পয়সা নাই যে, ধোপার বাড়ি দিবে বা সাবান কিনিয়া নিজেরা কাচিয়া লইবে। শীতে গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা তো স্বপ্নলোকের কথা। সুতরাং এই শ্রমিকদের আয় প্রত্যহ দুই টাকা হইলেও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। তারপর দেখা যায় যে, রোজ দুই টাকা আড়াই টাকা দিয়া কয়জন লোক ইহাদের কর্ম দিতে পারে! মধ্যবিত্তেরাই মানুষ খাটায়, তাহারা আর তো পারিয়া উঠিতেছে না। গৃহে ভৃত্য রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। খাওয়া মাহিনা দিয়া ভৃত্য রাখিতে মাসে ন্যূনকল্পে ৫০৲ দরকার। কয়জন লোকে এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারে? ফলে অনেক বাড়িতে চাকর রাখা হইতেছে না। যাহারা ভৃত্যের কাজ করিত, তাহারা অনেকেই বেকার হইয়া পড়িতেছে, অন্যথা কেহ কেহ ছুটকা-ছাটকা ব্যবসা করিয়া সদুপায়ে এবং অসদুপায়ে কিছু কিছু রোজগার করে। যা রোজগার

য়, তাহাতে তাহাদের জীবনযাপনের মান উন্নীত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। জাতিভেদের নিষ্ঠুর অর্থহীন প্রথা থাকার দরুন মধ্যবিত্ত লোকেরা ইচ্ছা থাকিলেও অস্পৃশ্যদের গৃহকর্মে নিযুক্ত করিতে পারে না। গৃহিণীরাই তাহাতে আপত্তি করেন। ফলে বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইলে দরিদ্র শ্রমিকগণ স্বল্পব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া হয়তো জীবনযাপনের মান উন্নীত করিতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবে কৃষকদের সম্মতি নাই, তাহারা বলে—অত পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া তাহার মূল্য যথেষ্ট না হইলে তাহারা কি দিয়া বস্ত্রাদি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে? কোথায় পাইবে অর্থ, যাহার দ্বারা তাহাদের বাসস্থানের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ক্রয় করিবে? পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে?

সুতরাং সমস্যার সমাধান করিতে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করানো সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতেও বিঘ্ন আছে। শিল্পপতিগণ বলেন যে যদি শ্রমিককে বেশি মজুরি দিতে হয়, তবে উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে না। লাভ না হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে আগ্রহ হয় না। অতএব সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনিয়া এই উৎপাদনবৃদ্ধি এবং মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করা ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হইবে না।

এখন যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা একটি আদর্শে নিজেদের জীবন যাপন করিতে থাকিলে তাহাদের নিম্নস্তরের লোকেরাও অনেক বিষয়ে তাহাদের অনুকরণে দীক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। সেই আদর্শ পাশ্চাত্য রীতিতে জীবনযাপন নহে; ভারতবর্ষের আদর্শই আমাদের ধরিয়া থাকিতে হইবে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাত্মাজী জীবন যাপন করিয়াছেন। বাংলা দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই আদর্শে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়াছেন। আরও দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথের সরল জীবন যাপন এবং বরিশালের অশ্বিনী

কুমার দত্ত মহাশয়ের। সেই আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্যে' লিখিয়াছেন :—

'ক'রো না ক'রো না লজ্জা, হে ভারতবাসী
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কী বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের 'পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

কিন্তু এই যথার্থ plain living and high thinking—সরল জীবন আর উচ্চ চিন্তা ভারতবর্ষের আদর্শ হইলেও আমরা পাশ্চাত্য আদর্শ দ্বারা এতদুর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের আদর্শে ফিরিয়া আসা বহু লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। জীবন যাপনের মান উন্নত করার কর্মে এই দুইটি আদর্শের সংঘাত এক অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। পাশ্চাত্য রীতিতে জীবনযাপনের ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীর মধ্যে স্থিতিলাভ করিয়াছে। এখন জাপানী গৃহস্থের মত আসবাবশূন্য কক্ষে মাদুর বিছাইয়া নিজে বসিয়া অতিথি বন্ধুদের বসাইয়া মানসিক সৎসাহসের পরিচয় দিতে অল্পসংখ্যক লোকই সক্ষম হইবেন। দুই নৌকায় পা দিয়া আমরা এমন সঙ্কটে পড়িয়াছি যে, কোন নৌকায়ই আমরা স্থির হইয়া থাকিতে পারিব না। হয়তো কালে এই দুই

আদর্শের সমন্বয় সাধিত হইবে, কিন্তু তখন ভারতবর্ষের আদর্শ অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ব্যাবেল

বাইবেলে কথিত আছে, প্রাচীন যুগের মানুষ পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং সহজ করিবার উদ্দেশ্যে ধৃষ্টতা করিয়াছিল বলিয়া ঈশ্বর সকলের ভাষার গণ্ডগোল বাধাইয়া দিলেন। ফলে কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতে না পারিয়া মানুষ কলহ-বিবাদে মত্ত হইল। এই ঘটনা নাকি বেবিলোনিয়াতে হইয়াছিল—হিব্রু নিষ্ঠাবান পুরোহিতগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন। যাহাই হউক, মানুষের ভাষা দেশে দেশে বিভিন্ন হইয়া আছে। অথচ পশুপক্ষীর ডাক সর্বত্রই কার্যত এক। সিংহ আফ্রিকাতে যে শব্দ তুলিয়া গর্জন করে অন্যত্রও সিংহের গর্জনে সেই ধ্বনি শুনা যায়। ইংলণ্ডের পাখী ইংরেজী ভাষায় গান করে না, পাঞ্জাবের পাখী তাহা বুঝিতে পারে। পাখীর গানের ভাষা যদি থাকে তবে তাহা সর্বত্রই এক।

মানুষের ভাষা পৃথিবীতে কেন নানা স্থানে নানা রকম হইল তাহার কারণ লইয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণা করিয়াছেন। এই কথাটি অসংকোচে বলা যায় যে, মানুষই তাহাদের ভাষার বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। কোনও বিশেষ অসদভিপ্রায়ে নহে, দূরে দূরে দুর্গম স্থানে বাস করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে ভাষার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। ইহাই হইল ভাষার স্বাভাবিক বিভেদ। এই বিভেদ অনেক ক্ষেত্রে কথিত ভাষায়ই লক্ষিত হয়। কলিকাতা শহর হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই কথার উচ্চারণের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতা শহরেও বিশেষ বিশেষ পাড়াতে কথার উচ্চারণ এবং শব্দনির্বাচন বিভিন্ন। 'করনু গেনু খেনু' উচ্চারণ আমরা লক্ষ্য করি। 'ল'কে 'ন' উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন —নুন নঙ্কা নেবু নক্ষ্মীপূজার নাড়ু। আবার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসীরা 'ন'কে 'ল' বলিয়া উচ্চারণ করেন, নবকৃষ্ণ নাগ তাঁহাদের মুখে শুনা যায় লবকৃষ্ণ লাগ। কোথাও বা 'অ'-এর পরিবর্তে 'র'

উচ্চারণ হয়, রাত্রিকে আত্রি, আশুবিশ্বাসকে রাশুবিশ্বাস বলা হয়। বাঙাল বলিয়া যাহাদের উপহাস করা হয় তাহাদের উচ্চারণ যে বিকৃত তাহা অস্বাভাবিক নহে। ইহা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লিখিত ভাষা এক। পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতি বাংলা সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে।

ঠিক অনুরূপ বিভেদ ইংলণ্ডেও আছে। 'H' অক্ষরটির প্রয়োগ লইয়া এই বিভেদ বিশেষ লক্ষণীয়। কেহ কেহ কোথাও কোথাও ass-কে hass, educatedকে heduccated বলে। আবার 'he' না বলিয়া 'ই' "Henry" না বলিয়া "enry" বলা হয়। এই বিভেদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই শ'এর Pygmalion বইখানিতে। ফুল বিক্রয় করিয়া খায় এমন একটি বালিকার কথিত ভাষা এইরূপ—

Ow eez ye-ooa san is e ? Wal fewd dan y'deooty bawmz a mather should eed now bettern to spawl a pore gels flahrzn then ran awy athaht pying.

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে এই বর্ণসমষ্টির এই রূপ হইবে—Oh he is your son is he ? Well, if you had done your duty by him as a mother should he would know better than to spoil a poor girl's flowers and then run away without paying.

Professor Higgins ছয় মাসের মধ্যে এই বালিকাকে বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে শিখাইয়া শেক্সপীয়র এবং মিল্টনের ভাষার অধিকারিণী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে এবং যাতায়াতের পথ সুগম হইলে নানা কর্মে এক স্থানের লোক অন্য স্থানের লোকের সংস্পর্শে আসিতে থাকিলে এই ভুল উচ্চারণ লোপ পাইয়া যায়। পূর্ববঙ্গবাসীরাও এখন বাংলার প্রচলিত কথিত ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। কথায় একটু টান থাকিলেও ভাষা একই হইয়া গিয়াছে। এই রকম কথার উচ্চারণের টান এবং শব্দ-প্রয়োগের বিভেদ স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও লক্ষিত হয়। Burns তাঁহার প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষায় যে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহা

ংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার দুই-কটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Oh wud some pours the giftie gie us,
To see oursef as ithers see us.
The rank is but the guinea stamp
The man's the gowd for a' that.

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহা আমার প্রধান বক্তব্যের ভূমিকা াত্র। যাঁহারা আসাম এবং উড়িষ্যায় যাতায়াত করেন না, তাঁহারাও ডিওতে সংবাদ শুনিবার সময় বুঝিতে পারিবেন, অসমীয়া উড়িয়া এবং াংলা ভাষা মূলত এক। উড়িয়াতে করিছন্তি, যাউছন্তি ইত্যাদি য়েকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দ একটু পৃথক হইলেও ভাষার শব্দ, শব্দবিন্যাস এবং ব্যাকরণ এক। অসমীয়াতে 'স' বর্ণের পরিবর্তে অনেক স্থলে হ' বর্ণ ব্যবহার হয়। এইরূপ ব্যবহার পূর্ববঙ্গেরও আছে। বুড়া গোঁসাইকে আসামীরা বুরাপোহাই বলেন, অথচ শব্দটি বুড়া গোস্বামীর অপভ্রংশমাত্র। এই তিনটি ভাষার গঠন, ব্যাকরণ, বাক্যযোজনা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে নিকটতম। সুতরাং এই তিনটি ভাষা লইয়া একটি বৃহত্তম বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিতে পারে। উভয় বাংলায় ৬ কোটী লোক, তৎসঙ্গে আসামের ১ কোটী ৯ লক্ষ এবং উড়িষ্যায় ৮৭ লক্ষ যুক্ত হইলে বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮ কোটী ১০ লক্ষ। ইহার সহিত যে যে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বিহারে রহিয়াছে তাহারও লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ হইবে। সুতরাং বাংলাভাষাব্যবহারকারী লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটী ১৬ লক্ষ হইবে। হিন্দী ভাষা যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে প্রচলিত। যুক্তপ্রদেশের লোকসংখ্যা ৫ কোটী ৫১ লক্ষ, বিহারের লোকসংখ্যা মানভূম ইত্যাদি অঞ্চল বাদ দিলে ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ হইবে। অতএব হিন্দীভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ৯ কোটী ৮ লক্ষ হইবে। ইহার মধ্য হইতে বিহারের ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাও লোকদের বাদ দিলে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা ৯ কোটির বেশি হইবে না। সুতরাং

বাংলা এবং হিন্দী ভাষাব্যবহারকারীদের লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমান। বাংলাভাষা সাহিত্যে সমৃদ্ধশালী, হিন্দীভাষায় উন্নত শ্রেণীর সাহিত্যের অভাব। তথাপি শাসনতন্ত্র অনুসারে হিন্দীই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ভারত-বিভাগের পর হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটি। ইহার মধ্যে কেবল ৯ কোটী লোকের মাত্র মাতৃভাষা হিন্দী। এই হিন্দী নামেই হিন্দী প্রকৃতপক্ষে যুক্তপ্রদেশের অনেক অংশে উর্দু ই প্রচলিত। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু মহাশয় বেতার বক্তৃতায় উর্দু ভাষাই ব্যবহার করেন। বিশুদ্ধ হিন্দী তিনি এখনও বলিতে পারেন না।

এক সময় বাংলা আসাম উড়িষ্যা এক প্রদেশের অন্তর্গত থাকিয়াও ভাষার ঐক্য সাধিত হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজ শাসকগণের কূটনীতিপ্রসূত অনৈক্যবিধানের গোপন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। উড়িষ্যার বর্ণমালার পরিবর্তে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তিত হইলে ভাষার মিলন সহজ হইতে পারে। তুরস্কে যদি রোমান বর্ণমালা চলিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে উড়িষ্যায় বাংলা বর্ণমালাও চলিতে পারিবে। অসমীয়ার বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে অভিন্ন। কেবল 'ব' 'র'-এতে যা প্রভেদ।

আসামে এবং উড়িষ্যায় বাঙালীবিদ্বেষ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের গোপন সমাদর বর্তমান আছে। এখন প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতা পরিহার করিলে এই তিন প্রদেশের সাহিত্যিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে বাংলা সাহিত্যের প্রসারতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভাষা এক হইয়া গেলে প্রাদেশিকতার বিষও ক্রমশ অন্তর্হিত হইবে।

নানা প্রদেশে হিন্দী শিক্ষা দিবার প্রচুর ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু হিন্দীর ব্যাকরণ, লিঙ্গ এবং বিভক্তির প্রয়োগ এত জটিল এবং খামখেয়ালী যে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার করিতে পারা যায় এমন হিন্দীজ্ঞান অর্জন করা কঠিন। সুতরাং অনিশ্চিতকালের জন্য ইংরেজী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত না রাখিলে ব্যবসায়ে, শিক্ষায়, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ে ভারতবাসীর বিশেষ

অসুবিধা হইবে। অকস্মাৎ ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলে ভারতবর্ষেও ব্যাবেলের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আছে। এই ব্যাবেলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ইংরেজী ভাষার চলন অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

ইংরেজী ভাষা যেমন বিদেশীয়দের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের একমাত্র বাহন, তেমনই ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে লোকেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের বাহন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তখন ও-দেশে ফরাসী, স্পেনীয় ভাষাভাষীর লোক কম ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের নেতাগণ রাগ বা অভিমান করিয়া ইংরেজী ভাষা বর্জন করিয়া ফরাসী ভাষা সেখানে চালু করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। আজ পৃথিবীর এ-পিঠে এবং ও-পিঠে ইংরেজীই আন্তর্জাতিক ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী না জানিলে আমরা ভারতবাসীরা বিশ্বের ভাবধারার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিব না।

দিল্লীতে প্রতিষ্ঠাবান নেতাগণ যদি এখন আইনের জোরে ইংরেজী বর্জন করিয়া কেবলমাত্র হিন্দীর প্রচলনই সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই ব্যাবেলরই পুনরভিনয় হইবে।*

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগ্‌লা-গারদে অবস্থানকালে রচিত)

পাখা

পাখীরে দিয়েছ পাখা, পাখী সে পাখায় ক'রে ভর
জীবনের স্বপ্ন দেখে, নীলাকাশে করে সে সফর।
শূন্য শুধু শূন্যমাত্র নয়
এ সত্য অন্তরে জেনে শূন্যতারে করে না সে ভয়।

* এই গোলযোগের সূত্রপাত এইবারই হইতে বসিয়াছিল, শ্রীরাজাগোপালাচার্যের কূটবুদ্ধিতে আপাতত তাহা নিবারিত হইল।—স. শ. চি.

মানুষেরে পাখীর মতন তুমি দাও নাই পাখা।
শুধু পৃথিবীর বক্ষে বন্দী হয়ে থাকা
পাখীর পাখার পানে চেয়ে ভাল লাগিল না তার;
পাখা-জোড়া আকাশে ওড়ার যন্ত্র হ'ল আবিষ্কার।
যন্ত্রের পাখায় ক'রে ভর
বিধাতারে জব্দ ক'রে শুরু হ'ল মানুষের আকাশে সফর
কিন্তু ক্রমে শিখিল মানুষ
ক্ষণমাত্রে শত শত মানুষের ফাঁসাইতে জীবন-ফানুস
ব্যোম হতে বোমা হেনে নিম্নপানে অসহায় পৃথিবীর 'পরে—
যন্ত্রের পাখায় ভর ক'রে।

টোকা

তুমি কোনদিন এসে টোকা দিবে আমার দুয়ারে—
এ কথা কখনো ভাবি নাই।
তাই যবে অসময়ে টক্-টক্ শুনেছিনু টোকা,
ভেবেছিনু হয়তো এ বাতাসের ধোঁকা,
হয়তো উদাসী হাওয়া
ক্ষ্যাপামী নেশায় পাওয়া
জানে নাকো কি যে তার চাই।
হায়, সে যে হাওয়া নয়, তুমি এলে অসময়
সে কথা তখন ভাবি নাই।
তখনো শিয়রে মোর প্রদীপ একেলা ছিল জেগে,
ঘুমের আভাস ছিল চোখে।
কবিতার গ্রন্থখানি যেন শ্রান্ত দেহে
আমার বক্ষের 'পরে সকরুণ স্নেহে
একান্ত আপন-ভোলা
প'ড়ে ছিল আধ-খোলা
প্রদীপের অন্তিম আলোকে।
সেই ক্ষণে টক্ টক্ টোকা দিলে আমার দুয়ারে

কানের ভিতর দিয়া পশিল তোমার টোকা
মরমে পেল না মোর ঠাঁই।
তুমি ফিরে চ'লে গেলে ব্যর্থমনোরথ, দিশাহারা,
না পেয়ে জবাব।
শুধু টোকা দিয়ে গেলে, হয়তো বা নহে কড়া-নাড়া
তোমার স্বভাব।
তুমি চ'লে গেছ পরে খবর পেয়েছি যার থেকে
সে কহিল, কিছুক্ষণ টোকা মেরে দেখে
ব্যর্থ হয়ে চ'লে গেল বক্ষে ল'য়ে মৌন হাহাকার,
ভাব দেখে মনে হ'ল এ পথে সে কোনদিন ফিরিবে না আর।
যদি কভু নাহি ফেরো, জানি নাকো তোমার ঠিকানা,
দেখা আর হবে নাকো। এই শুধু র'য়ে গেল জানা
কড়া নাড় নাই তুমি, যারে আমি ভেবেছিনু বাতাসের ধোঁকা
সে মোর দুয়ার-বক্ষে হয়তো তোমার শেষ টোকা।

৺রামপ্রসাদ

তুমি নেই, কিন্তু তোমার গান আছে, রামপ্রসাদ!
মাঝে মাঝে গ্রামোফোনে শুনি, কখনো বা রেডিওতে
রামপ্রসাদী গান।
তুমি নাকি ছিলে মহা ভক্ত, সাধক, ক্ষ্যাপা, আপন-ভোলা,
আত্মহারা হয়ে গান লিখতে আর গাইতে,
গাইতে আর লিখতে। সব গানই মা তারার,
ওরফে মা কালীর—মা বিনে কিছু নাকি জানতে না।
কিন্তু ভায়া রামপ্রসাদ,
অতই যদি ছিলে আপন-ভোলা, ন্যালাক্ষ্যাপা,
যখন চাকুরি করতে জমিদারী সেরেস্তায়,
তা হ'লে তোমার ভক্তিরসের গানগুলো কেন লেখা হ'ল
বেছে বেছে সেরেস্তার পাকা বাঁধানো হিসেবের খাতায়?
কেন লেখা হ'ল না এলোমেলো টুকরো কাগজে

যা হারিয়ে যেতে পারত সবার অলক্ষ্যে
অযতনে, অবহেলায় ?
এদিকে দেখছি দিব্যি টনটনে খেয়াল ছিল—
এ ব্যাপারে তো হিসেবের কিছু ভুল হয় নি।
আর, তহবিলের দিকে তো নজরটি ঠিক ছিল!
তাই গানের ছুতোয় বললে—আমায় দে মা তবিলদারি।
কিন্তু দিলে না। মা তবিলদারি দিলে না।
মা কি অত কাঁচা মেয়ে
যে চট ক'রে তবিলদারি দিয়ে দেবে ?
ঘোরাতে লাগল। কলুর বলদের মত ঘোরাতে লাগল।
ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে তুমি বললে—
মা, আমায় ঘোরাবি কত ?
ও মা তো যে-সে মা নয়,
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে চরকি ঘোরায়, তুমি তো ছেলেমানুষ।
ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, তবিলদারি দেবার নামটি নেই।
তুমি বিষম ক্ষেপে গিয়ে ভয় দেখিয়ে বললে—
এবার কালী তোমায় খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
ছুটোর একটা ক'রে যাব।

তোমার বিদ্যা-সুন্দর কাব্য পড়েছি, রামপ্রসাদ।
ভক্তিরসেই তোমার নাম বেশি।
কিন্তু তোমার বিদ্যা-সুন্দরের আদিরসের কাছে
ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর ছেলেমানুষ।
ভক্তিরসিক তুমি ভায়া আদিরসিক তো কম ছিলে না!
আর, যতই তুমি আপন-ভোলা হয়ে থাকো,
এ কথাটি তো তোমার ভারি খেয়াল ছিল :
সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।
তাই তোমার প্রত্যেকটি গানের লেজুড়ের দিকে

তোমার নিজের নামটি জুড়ে দিয়েছ,
সে বেলায় তো তোমার ভুল হয় নি !
হয়তো ইচ্ছা আর আশা ছিল তোমার,
মানুষ তোমায় চিরকাল মনে রাখবে।

কিন্তু তোমার সে গুড়ে বালি, রামপ্রসাদ।
মানুষ অনন্ত যুগ ধ'রে কোনো মানুষকে মনে রাখে না।
মানুষ ভুলে যাবে একদিন কালিদাস, সোক্রাতিস,
আরিস্টটল, শেক্‌স্‌পীয়ার, গ্যেটে,
এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও—
তখন তুমি আর তোমার রামপ্রসাদী গানও
তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির তলায়।

তবে হ্যাঁ, মনে রাখবে মহাকাল।
মানুষ সব কিছু ভোলে ;
মহাকাল কোনো কিছু ভোলে না, ভুলতে পারে না।
তার অনন্ত বুক থেকে কার সাধ্য হারিয়ে যায় ?
মহাকালের স্মৃতিতে চিরদিন আঁকা থাকবে
জুলিয়াস সীজার, মাইকেল অ্যান্‌জেলো, দান্তে, বিয়াত্রিচে,
আলেকজাণ্ডার, শেক্‌স্‌পীয়ার, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ,
চণ্ডীদাস, রজকিনী রামী, বটকেষ্টো পাল,
ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, গোষ্ঠ পাল, কানাইলাল···থেকে শুরু ক'রে
পকেটমার কাল্লু শেখ, রাধাশ্যাম মুদী,
চানাচুর-খ্যাত এন্‌ মুখার্জী···
আর সেই সঙ্গে তুমিও, রামপ্রসাদ।

মহাপুরুষ

ভাবিতেছিলাম একা ব'সে আমি করিতে করিতে জুতা-বুরুষ—
পৃথিবীর কোন ক্ষতি হইত কি কোনদিন কোন মহাপুরুষ

করিয়া জ্যোতি বিকীর্ণ
আঁধারে আলোক দেখাইতে যদি না হতেন অবতীর্ণ ?
কত যুগে আর কত দেশে হ'ল এদের আবির্ভাব ;
এরা তো হলেন নাম-জাদা, তাতে মোদের কি হ'ল লাভ ?

শিখায়ে গেলেন শ্রীযীশুখ্রীষ্ট অহিংসাবাদ খাঁটি
আরেকটি গাল ফিরাইয়া দিবে এক গালে খেলে চাঁটি।
ফলে হ'ল এই—চাঁটি খেয়ে যারা বাড়ায় আরেক গাল,
তাদের গালেই পড়ে শুধু চাঁটি, যেন বেওয়ারিস মাল।
পাতা গাল দেখে নিশপিশ করে চাঁটি-মারা হাতগুলো,
মারে আর ভাবে, মেরে কবে হায় ধুনে দেব যেন তুলো !
দুনিয়ায় দেখি খ্রীষ্টান ব'লে পরিচয় দেয় যারা
গাল পেতে চাঁটি খাওয়ার চাইতে ভালবাসে চাঁটি মারা।
চাঁটি খেয়ে চাঁটি হজম করাটা নয়কো তাদের স্বভাব,
এক চাঁটি খেলে বিশ চাঁটি মেরে দিতে চায় তারা জবাব।

নিতান্ত যারা গোবেচারা, ভীরু, নেহাত যাহারা খোজা,
তারা ভাবে, চাঁটি মারার চাইতে চাঁটি খাওয়া ঢের সোজা।
মোরা অহিংস সেপাই, মোদের কাঠামোয় তালপাতা।
গোলমালে ভাই যেতে নাহি চাই তাই শিখি গালপাতা।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৮

রসাল-তত্ত্ব

এইবার রসাল বা আম বা আম্র বা ম্যাঙ্গোর কথা কহিব। আমাদের "কালা নরেন" [আর্ট প্রেসের শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে] আমাদিগকে আম দিয়াছে, সুতরাং আমের কথা কহিতে হয়।

বলিতে পার—mango শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? ইংরেজ এ শব্দটা কোথা হইতে পাইল? ভারতবর্ষের কোন জাতি ত ম্যাঙ্গোর অনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করে না! জন বীম্‌স, র‍্যাভেনশা, ইউল প্রমুখ রসাল-রসাস্বাদবিমূঢ় বড় বড় সিবিলিয়ানের মধ্যে কেহই "ম্যাঙ্গো" এবং "ম্যাঙ্গোষ্টিন" এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে পারেন নাই। কে একজন বকেয়া সাহেব সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, ম্যাঙ্গো শব্দ ব্রহ্মদেশের কোন প্রাদেশিক ভাষার অন্তর্গত শব্দ। কেহ বলেন, শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায় এবং সিঙ্গাপুরে ম্যাঙ্গো শব্দের প্রচলন আছে। হইতে পারে, পরন্তু আমরা এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট নহি।

আম্রের আদি স্থান

পূর্বের এনাম, কাম্বোডিয়া হইতে পশ্চিম-পাঞ্জাব পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আম্রের উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দেশ করা আছে। ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জেই আম্রের প্রাচুর্য খুব অধিক। তবে র‍্যাভেন্‌শা সাহেব বলেন যে শ্রীহট্ট, মালদহ, ভাগলপুর, মিথিলা, পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এই কয় জেলার মাটিতে সর্বাপেক্ষা ভাল আম উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে মাদুরা প্রভৃতি জেলায় ভাল আম হইয়া থাকে। মাটিতে চুণ ও সোরা না থাকিলে ফল ভাল হয় না। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে ভাল আম জন্মায়।

আমের কলম

আমের কলম করিতে আমরা ইংরেজের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। পাটনার ডেভিস সাহেব সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে কলমের সাহায্যে বোম্বাই আমের উদ্ভব সাধন করেন। আমাদের বালককালে পাটনা ও ভাগলপুরে এত বোম্বাই আমের প্রাচুর্য ছিল না। তখনকার বোম্বাই আম আকারে খুব বড় হইত এবং একেবারেই বর্ণচোরা হইত,

অর্থাৎ পাকিলে লাল বা হলুদে রং ধরিত না। সে আমের রস ঠিক আলতাগোলা লাল হইত। এখন বোম্বাই আমের অধোগতি চলিতেছে, আম আকারে ছোট হইতেছে, স্বাদও পূর্ববৎ নাই। কলমের গাছ পঁচিশ বছরের অধিক টিকে না। পঁচিশ বৎসর অতীত হইলে কলমের বাগান কাটিয়া নূতন কলমের চাষ করিতে হয়। ডেভিসের উপদেশ অনেকে ভুলিয়াছে, সে বহি এখন পাওয়া যায় না, তাই তাহার সৃষ্টি বোম্বাই আম জাতি হারাইতেছে। মনে থাকে যেন, বোম্বাই আম বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায় না।

চশমা ও খাসি

আমাদের দেশে পূর্বে ডালে কলম করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। আঁটির গাছই হইত, সার ও মাটির গুণে এক একটা গাছের আম অতি সুস্বাদু হইত। তবে ছিল খাসি করা এবং চশমা লাগানো। একটা বড় সার-কুড়ে আমের আঁটি পুঁতিয়া রাখা হইত। সেই আঁটির গাছগুলা এক হাত পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে, একে একে তাহাদিগকে তুলিয়া মাঝের বড় শিকড়টাকে কাঁচি দিয়া অর্ধেক কাটিয়া দেওয়া হইত; সেই কাটা গাছগুলাকে পংক্তি অনুসারে পুঁতিয়া দেওয়া হইত। এক-একটি বড় গহ্বরে ইন্দুরের মাটি, পচা মাছ, গোবর এবং কঙ্করচূর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। সেই মাটিতে গাছগুলি রোপণ করা হইত। ইহাকে বলে খাসি করা। খাসির বাগানে দুই শত বর্ষ পর্যন্ত গাছে ফল ধরে। মিথিলা, ত্রিহুত এবং উত্তর-ভাগলপুরে খাসির বাগান অনেক ছিল, এখনও আছে। চশমা করাই আসল grafting, আম্রের নবীন কিশলয় অঙ্গে অন্য গাছের কিশলয় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। একটি ভাল চাকু ছুরির সাহায্যে ডাঁটাটি কিঞ্চিৎ চিরিয়া নূতন twig বা কিশলয় বসাইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। সেই কিশলয়মুখে যে নূতন ডাল বাহির হয়, তাহাই বজায় থাকে, অন্য ডাল কাটিয়া ফেলিতে হয়। ডেভিস সাহেব দুই গাছে দুইটা ডাল কলমের মত চাঁচিয়া, সেই দুইটাকে বাঁধিয়া কলম করিতেন। তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে ফল শীঘ্র হয়। তাই চশমা ও খাসির পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া অধুনা ডেভিস পদ্ধতি সর্বত্র অনুসৃত হইতেছে।...

আম্রের বিশিষ্টতা

আম্রফলের একটা অপূর্ব বিশিষ্টতা আছে, যাহা জগতের অন্য কোন ফলে নাই এবং ঘটানো যায় না। আতা, জাম, কাঁঠাল, পেপে, আনারস কলা প্রভৃতি স্বদেশী ও বিদেশী ফলের এক স্বাদ, এক রস বাঁধা থাকেই। আতা বা পেঁপের যত উন্নতি সাধনই কর না কেন, ভাল সার দাও, ভাল জল যোগাও, তাহার প্রভাবে বড় জোর ফলটা বৃহদায়তনের হইবে, বীচি ছোট হইবে এবং উহার মজ্জাগত স্বাদ তীব্রতর হইবে। পরন্তু আতা আতাই থাকে—পেঁপে, কলা, আঙ্গুর, পেয়ারা, প্যারা সকল ফলই তাহাদের মৌলিক প্রকৃতি বর্জন করে না। পরন্তু পাটসাটের ফলে, সার দেওয়ার প্রভাবে, চশমা এবং খাসি করার ব্যবস্থায় আমের প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া যায়। ঝেলো, এঁশো, টোকো আম অতি উপাদেয় ফলে পরিণত হয়। তাহার পর বেলতলী, ক্ষীরতলী, আনারসী, গোলাপখাস, তালফলী, খরমুজা প্রভৃতি নানাবিধ আমের নানাবিধ রস এবং আস্বাদ। এখন সে সকল আমের আদর নাই, বাবুমহলে তাহাদের প্রচলনও নাই। বেলতলীর গন্ধ ও আস্বাদ ঠিক বেলের মতন, আনারসী আম পক্কাবস্থায় ঘরে রাখিলে ঘরটা আনারসের গন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে যে সকল আম গোলাপখাস বলিয়া পরিচিত, তাহা ঠিক গোলাপখাস নহে। গোলাপখাস আমে ঠিক বস্‌রাই গোলাপের গন্ধ বাহির হয়। ভাগলপুরে জরদালু বলিয়া এক রকমের আম আছে, তাহার সৌগন্ধে ঘর ভরপুর হইয়া থাকে। এই হেতু আমকে অমৃতফল বলা হয়; উহাতে সকল রকমের অমৃত-রস ফুটানো চলে, উহার আকারও নানাবিধ হইয়া থাকে। ঠিক চালতার মতন, পেঁপের আকারের, এমন কি, কামরাঙা ঢঙের আম আমরা দেখিয়াছি। ভাগলপুরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাগানে সত্যই একটা গাছে কামরাঙার আকারের আম ফলিত। আমের এই প্রকৃতি অবলম্বনে মিথিলায় ও অযোধ্যায়, মুর্শিদাবাদে ও মালদহে অনেক রকমের সংস্কৃত ও ফার্সী পদ্য বা সায়ের প্রচলিত ছিল। র‍্যাভেন্‌শা সাহেব তাহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

আম্রভোজন-পদ্ধতি

সত্য বলিতে কি, তোমরা আম খাইতে জান না, বাঁদরে খাওয়া খাইয়া থাক, অর্থাৎ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ হিসাবে আম খাইতে নাই। আম পাড়িবার পদ্ধতিও এখন তেমন প্রচলিত নাই। আগে আম পাড়ার তত্ত্বটা বলিব। আম ঠেঙ্গাইয়া বা ডাল নাড়া দিয়া পাড়িতে নাই। যে আম সজোরে মাটিতে পড়িবে, সেই আমেই জাম্‌ড়ো ধরিবে। তাই জালির সাহায্যে এক একটি করিয়া আম পাড়িতে হয়। একটা বড় বাঁশের আঁকশির মুখে জাল দিয়া থলির মতন করিতে হয়। একটু রং-ধরা আম আঁকশি দিয়া টানিলেই ঐ জালের থলির মধ্যে পড়ে, মাটিতে পড়ে না। এই ভাবে এক একটি করিয়া আম পাড়িয়া, আমের পাতার বা সোঁদালের পাতার অথবা কার্পাস তুলার মোটা আস্তরণের উপরে জাগাইয়া রাখিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা জাগান না দিলে আম ভোজনের যোগ্য হয় না। যে সকল আম ভোজনের যোগ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া ঠাণ্ডা জলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই আমের—বাঁশের চেঁচাড়ির বা তালের বাল্‌দোর বা হস্তিদন্তের অথবা কাচের ছুরির সাহায্যে খোসা ছাড়াইতে হয়। লৌহনির্মিত কোন অস্ত্রের দ্বারা, বঁটি বা ছুরির দ্বারা আম ছাড়াইতে নাই। আমের খোসায় টারপিনের মত একটা স্নেহজ পদার্থ আছে, আমের রসে ম্যালিক এসিড আছে, লৌহ অস্ত্রে আমের খোসা ছাড়াইলে এই দুইটা এক হইয়া যায়, আম খাইতে বিস্বাদ হয়। পূর্বে মুর্শিদাবাদের ও মালদহের সকল ভদ্রলোকের বাটীতে আমের ছুরি স্বতন্ত্র থাকিত। অতি সুন্দর তালের বাল্‌দোর ছুরি আমরা দেখিয়াছি। খোসা ছাড়ানতেও একটু চাতুরী আছে। বাম করপুটে আম রাখিয়া, তাহাতে হিসাবমত ছুরি বসাইয়া, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খোসা ছাড়াইতে হইবে, আমের গায়ে সবুজ খোসার লেশ মাত্র থাকিবে না। আধুনিক বাবুদের মধ্যে তদ্বির করিয়া আম খাইতে ও খাওয়াইতে পারিতেন মুর্শিদাবাদের পুরাতন উকীল বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর। বৈকুণ্ঠনাথবাবু সেকালের হিসাবের

একজন বড় বাবু ও সৌখীন ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে তাঁহার মনোমত করিয়া দরিদ্র কাঙ্গালীদের আম খাওয়াইবার সমাচার পাইলে আমরা সর্বাপেক্ষা সুখী হইব। আমের আদর করিবার মানুষ যে ক্রমে বাঙ্গালায় বিরল হইল।

দান ও বিতরণ

আম একা খাইতে নাই। ইষ্টদেবতাকে দিয়া, ব্রাহ্মণ সজ্জন, পল্লীর প্রতিবেশী সকলকে এবং কাঙ্গাল ফকীর দলকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া তবে নিজে পরিবারবর্গ সহ আম খাইতে হয়। ইহাই সেকালের ব্যবস্থা ছিল, হিন্দু, মুসলমান, সকল বাঙ্গালী গৃহস্থই এই ব্যবস্থানুসারে আম খাইতেন এবং খাওয়াইতেন। এই পদ্ধতি অনুসারে সেকালে কাজ হইত, তাহার একটু পরিচয় দিব,—

(১) ৺কানাইলাল শীলের উইলে ব্যবস্থা করা ছিল যে, প্রতি বৎসরে আমের সময়ে দেব, দ্বিজ, কাঙ্গালীদিগকে পাঁচ শত টাকা মূল্যের আম খাওয়াইতে হইবে।

(২) ৺মোহিনীমোহন রায়, ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল আম বিতরণের ও ভোজনের জন্য পাঁচ শত টাকা প্রতি বর্ষে ব্যয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

(৩) মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের এমনই ব্যবস্থা ছিল এবং বোধ হয়, উইলেও সে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত বার্ষিক প্রাপ্য আমের ঝুড়ি পাই না।

(৪) পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ী মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুরের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থপ্রমুখ সকল ভদ্রজাতীয় গৃহস্থদিগের আম্র ভোজনের জন্য তিনটী আমবাগান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন কি, ভাগলপুরে থাকিতেও আমরা মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত আম খাইয়াছি। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এ বাজে খরচ উঠাইয়া দিয়াছেন।

(৫) বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিস্তীর্ণ ভাবে আম্র বিতরণ করিতেন। মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ চন্দের আমল হইতে আমরা ভাগলপুরে বসিয়া বর্ধমানের আম খাইতাম। বর্তমান

মহারাজাধিরাজও আমরা কলিকাতায় আসিলে কয়েক বৎসর আমাদিগকে আম খাওয়াইয়াছিলেন। শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়া বর্তমান মহারাজ বিগড়াইয়াছেন, আম্রবিতরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

(৬) দিনাজপুরের বুড়া মহারাজা ৺গিরিজানাথ সেকালের হিসাবমত আম্র বিতরণ করিতেন। বর্তমান মহারাজার নিকট হইতে এখনও আম পাই নাই; বোধ হয়, পুরানা চাল বন্ধ হইল।

কত আর নাম করিব, সেকালের বাঙ্গালার বড়লোক মাত্রেই আম খাওয়াইয়া তবে খাইতেন। বলিব কি দুঃখের কথা, ৺গণেশচন্দ্র চন্দ্র এবং তস্য পুত্র ৺রাজচন্দ্র চন্দ্র রীতিমত আম্র ভোজ করাইতেন, ঝুড়ি ঝুড়ি আম গৃহে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাজচন্দ্রের পুত্র [শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র] কু-সঙ্গে পড়িয়া সে ব্যবস্থা বন্ধ করিয়াছে। বাপপিতামহের ধারা বজায় রাখিতে পারে না। ইহা কি কম লজ্জার কথা!

আমের কথা লিখিতে হইলে একখানা বড় পুস্তক রচনা করা চলে। তাহার ইঙ্গিত শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় করিয়া দিয়াছেন। একটা কথা জোর করিয়া বলিব—চশমা, কলম, খাসি, এ সকলই ভারতবর্ষের নিজস্ব; ভারতবর্ষ হইতেই মোগল, পাঠান, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, হিস্পানী, ইংরেজ, সবাই কলম করা শিক্ষা করিয়াছে। ডেভিস সাহেব ডালে কলম করিতে শিখাইয়াছিলেন বটে, তাহাও তাঁহার আবিষ্কৃত নহে। পুরাতন মালীর দল ডেভিসের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহিত না; কারণ, উহার সাহায্যে আম শীঘ্র পাওয়া যায় বটে, পরন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কলমের গাছ নষ্ট হয়, ফল ভাল ধরে না। "ফিঙ্গে চশমায়" যে কলমের গাছ তৈয়ারি হয়, তাহা শতাধিক বর্ষকাল টিকে। মালদহের কাছারিবাড়ীর ভিতরে দুইটা ফিঙ্গে কলমের আমগাছ ছিল, বোধ হয় এখনও একটা আছে। এ দুইটাই শতাধিক বর্ষের অধিক পুরাতন। একটা ঝড়ে পড়িয়া যাওয়াতে তাহার কাঠই নিলামে দুই শত টাকায় বিকাইয়াছিল। গাছ পড়িলে পরে জানা গেল যে, উহা ফিঙ্গে কলমের গাছ ছিল। বাবুদিগের বোধার্থে ফিঙ্গে কলমকে dovetailing বলিতে পারি। একটা আঁটির চারা প্রথমে তৈয়ার করিতে হয়, তাহার পর তাহার মাথাটা কাটিয়া, নীচের গুড়ি খানিকটা

চিরিয়া দিতে হয়, সেই চেরার মধ্যে আর একটা ভাল গাছের মাথা কাটিয়া আনিয়া তাহার নিম্নদেশটা ফিঙ্গে (dovetail)-এর মতন করিয়া বসাইয়া দিতে হয়; পরে উহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া গোবরমাটি দিয়া জড়াইয়া রাখিতে হয়। কলম জুড়িয়া যাইলে গোড়ার মাটি ক্রমে উচ্চ করিয়া ফিঙ্গে কলমের মুখ বা জোড় পর্যন্ত তুলিয়া দিতে হয়। এ কলম বানাইতে পরিশ্রম অধিক, কিন্তু এক বার কলম ধরিয়া এক হইলে, নূতন বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয় এবং উহাতে পর্যাপ্ত ফল ধরে। ফিঙ্গে কলমের গাছকে দশ বৎসর কাল অতি যত্নে পালন করিতে হয়।

বগুড়ার একটি ভদ্রলোক পুরাতন রীতি অবলম্বনে আমের চাষ করিয়া থাকেন। তিনি নানাবিধ কলমের সাহায্যে অপূর্ব রকমের আমের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহার খবর দিতে পারেন।

আজকাল বাবুমহলে যে সকল আমের আদর অধিক, তাহার সব কয়টাই আধুনিক এবং আংশিক ইংরেজের আবিষ্কৃত। একটু পরিচয় দিব।

(১) **ফজলি**—মালদহের পূর্বেকার জেলার কালেক্টার র‍্যাভেন্‌শা সাহেব ফজলির আবিষ্কর্তা। ফজলি নামে এক মুসলমানী গৌড়ের জঙ্গলের পার্শ্বে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় এই আমের গাছ হইয়াছিল। বৃদ্ধা অতি যত্নে আমগাছটি রক্ষা করিত এবং ফকীর সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইলে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া আম খাইতে দিত। এই হেতু সেই বৃদ্ধাই ঐ আমের নাম ফকীরভোগ রাখিয়াছিল। র‍্যাভেন্‌শা সাহেব শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধার গৃহে যাইয়া অতিথি হন। তাঁহাকেও একটি আম খাইতে দেওয়া হয়, তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া উহার নাম ফজলি রাখেন। আমরা মূল গাছের আম খাইয়াছি, তাহার সহিত বাজারে প্রচলিত ফজলির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কলমের কলম, তস্য কলম করিয়া, ডেভিসের পদ্ধতিক্রমে ডালে ডালে কলম বানাইয়া ফজলির জাতিনাশ ঘটিয়াছে, degenerate হইয়াছে। মূল গাছটা বোধ হয় এখনও আছে, থাকিলে উহা শতাধিক বর্ষের পুরাতন বৃক্ষ হইবে।

(২) ল্যাংড়া—ইহার আদিস্থান হাজিপুরে। এক ল্যাংড়া ফকীর এই গাছতলায় বাস করিত। পাটনার বিভাগীয় কমিশনার কোবর্ন (Cockburn) সাহেব ল্যাংড়ার আবিষ্কর্তা। ল্যাংড়ার মূল গাছের গোড়ার আদর আমরা দেখিয়াছি। হাথুয়া, বেতিয়া, দ্বারভাঙ্গা, ডুমরাও প্রভৃতির মহারাজগণ মূল ল্যাংড়ার গাছের এক একটা ডাল জমা লইতেন। সে সান্ত্রী পাহারা, সে তদ্বির তদারক দেখে কে? এখন সে সকল কথা যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়। হাথুয়ার দেওয়ান বাবু ভুবনেশ্বর দত্তের কৃপায় আমরা মূল ল্যাংড়ার ফল খাইয়াছি। পূর্বে সোমবারী মেলার সময়ে আসল ল্যাংড়া পাটনায় আমদানি হইত; এক টাকায় ছয়টার অধিক পাওয়া যাইত না। সে ল্যাংড়া এখন আর বাজারে দেখিতে পাই না। এখনকার যে ল্যাংড়া কলিকাতার বাজারে প্রচলিত, তাহা কাশীর শ্যামা নামক পুরাতন আমের সহিত আসল ল্যাংড়ার কলমজাত জারজ ফল। কলিকাতায় যে ল্যাংড়া আইসে, তাহার অধিক অংশই কাশীর ও এলাহাবাদের জারজ শ্যামা। আসল ল্যাংড়া ওজনে প্রত্যেকটা এক পোয়া, তাহার ছালের রং ঘোর সবুজবর্ণ—bottle-green, খুব পাতলা ছাল এবং কাগজের মতন পাতলা আঁটি। কিন্তু কলিকাতার বাজারের ল্যাংড়া অনেকটা pea-green, মটরশুঁটির মতন ফিকে সবুজ, আকারে ছোট, আঁটিও মোটা। ল্যাংড়া ও ফজলিতে একেবারেই আঁশ থাকিবে না। হাজিপুরী ল্যাংড়া ক্রমে যেন লোপ পাইতেছে, degenerate হইতেছে। ল্যাংড়ার আঁটির ও খাসির বাগান দ্বারবঙ্গের মহারাজা বানাইয়াছেন।

(৩) কিষণভোগ—ইহার গোড়ায় নাম ছিল "দরভঙ্গীয়া," ইহা দ্বারবঙ্গ জেলার পূর্বাংশের আম। ইহার আদর বাড়াইয়া যান ভাগলপুরের বিভাগীয় কমিশনার বার্লো সাহেব। মিথিলার একজন ব্রাহ্মণ জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের বাগানের আম প্রথমে রপ্তানি হওয়াতে ভাগলপুরেই উহার নামকরণ হয় "কিষণভোগ"। এ আম বোঁড়ে—প্রায় গোলাকার, ভিতরটা বেশ লাল; কলিকাতায় আসল কিষণভোগ কমই আইসে। সতালু আম ও কিষণভোগের কলমজা

এক জারজ বোঁটারাঙা আমই কলিকাতার বাজারে কিষণভোগের আদর পায়।

(৪) **বোম্বাই আম**—ইহাকে গোড়ায় ভাগলপুর বিভাগে Davis breed বলিত। গোপালভোগ ও গঙ্গাসাগর বা কালুয়া, এই দুই আমের তৃতীয় সংস্পর্শের কলমের ফল বোম্বাই আম। গত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে উহার প্রচলন হয়। উহার যে কেন বোম্বাই নাম হইল, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। এ আম সম্পূর্ণ বর্ণচোরা, পাকিলেও ঘোর সবুজবর্ণ থাকে। একেবারে রং ধরে না। উহার ভিতরের শাঁস ঠিক আলতার বর্ণ, এ আমের মিষ্টতা অতি তীব্র। এক একটা আম আধ পোয়া, এক পোয়া পর্য্যন্ত ওজনে হইত। উহার ছাল মোটা, আঁটি মোটা, কিন্তু ছোট। পাটনার ও ভাগলপুরের সে পুরাতন ভুতো বোম্বাই আমের অতিমাত্রায় অধঃপতন হইয়াছে; এখন রং-ধরা আমও বোম্বাই নাম পাইয়া বাজারে বিকায়। ভাগলপুরের বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বোম্বাই আমের পাট করিতে জানিতেন, তাঁহার বাগানের আম অত্যুৎকৃষ্ট হইত; সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা। সে সব পুরাতন কলম এত দিনে বিগড়াইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া জরদালু, গোপালভোগ, নবাবভোগ, বেগমপ্যারী প্রভৃতি অসংখ্য অত্যুৎকৃষ্ট আমের প্রচলন পূর্বে ছিল। লক্ষ্ণৌয়ে প্যারাফুলি আমের আকারের এক অত্যুৎকৃষ্ট আম আছে, তাহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মূল্য অধিক, কুড়ি টাকায় এক শতের অধিক পাওয়া যায় না। ইংরেজী নামের আমও আছে—Alfonso, Hastings, Ryland প্রভৃতি নামধেয় আম পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বা উত্তর-ভারতের আমে একটা সুগন্ধ ও সুস্বাদ আছে, যাহা মান্দ্রাজী ও বোম্বেয়ে আমে নাই। নিজামের হায়দরাবাদের হাফিজপ্যারী আম ভাল বটে, পরন্তু বাঙ্গালার বা মালদহের আমের তুল্য সুগন্ধপূর্ণ ও সুস্বাদু নহে।...('নায়ক,' ৩, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতারঞ্জন

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন

"হের বিশ্বমূর্তি আমার মানবচক্ষু দেখতে না পায়"-
হয় যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র-সূর্য-মণ্ডিত
বাসুদেবের বিরাট দেহ আকাশ ভরে তার ছটায় ॥

সেই দেহে দ্বাদশাদিত্যে দেখেন পার্থ কৌতূহলে
মরুৎ উন-পঞ্চাশৎ প্রকাশে আশ্চর্যবৎ
দেখেন বসু-রুদ্রগণে অশ্বিনী-কুমার-যুগলে ॥

দিব্যমাল্য বসন ভূষণ দিব্যগন্ধ অনুলেপন
অসংখ্য চক্ষুতে চাহেন অনেক মুখে কথা কহেন
রণোদ্যত দিব্য আয়ুধ অনেক বাহু উদর চরণ ॥

নানাবর্ণ নানাকৃতি বিশ্বরূপে একস্থ
সমস্ত দেব ঋষি ধ্যানী সকল উরগ সকল প্রাণী
যক্ষ-অসুর স-চরাচর ব্রহ্মা রহেন ধ্যানস্থ ॥

সবিস্ময়ে হর্ষে ভয়ে অভিভূত ধনঞ্জয়
নুইয়ে মাথা যুক্ত করে রোমাঞ্চিত কলেবরে
স্তবন করেন, হে স্তবার্হ, নমস্তে আশ্চর্যময় ॥

জ্বলৎ অনল অর্কদ্যুতি ভো প্রচণ্ড বীর্যধর
নভঃস্পর্শী দীপ্ত দেহ দুর্নিরীক্ষ্য অপ্রমেয়
সূর্যচন্দ্র নেত্র তব নমস্ত্রিভুবনেশ্বর ॥

বিবৃতমুখ দংষ্ট্রাকরাল হে লোক-সংহর্তা কাল
প্রলয়াগ্নি তুল্য বদন প্রতিপক্ষে কর নিধন
হোক পলাতক রাক্ষসেরা চক্রবালের অন্তরাল ॥

ভীষণ দন্ত সন্ধি মাঝে তোমার বদন-গহ্বরে
হেরি ধার্তরাষ্ট্রগণ দুর্যোধন কর্ণ দ্রোণ
জয়দ্রথ ভীষ্ম আদির চূর্ণিত শির গ্রাস করে ॥

প্রণাম করি কিরীটধারিণ, নমশ্চক্রগদাধর
সম্মুখে পশ্চাতে হরি সকল দিকে প্রণাম করি
হও প্রসন্ন জগন্নিবাস হে ভুবনৈক-সুন্দর ॥

সংবর এই ভীষণ বপু দাও হে শান্তি জনার্দন
যুদ্ধের ফল জয় পরাজয় আকাশপটে লক্ষিত হয়
কিসের যুদ্ধ ? কিসের মৃত্যু ? বুঝতে নারি মহাত্মন্ ॥

কে তুমি এই উগ্ররূপী প্রজ্বলন্ত মূর্তিধর ?
না বুঝি প্রবৃত্তি তোমার দিশাহারা চিত্ত আমার
আমাকে নিমিত্ত মাত্র কেন কর হে ঈশ্বর ?

শান্ত কর এ উদ্‌ভ্রান্তে দেখাও মানুষ-রূপ তোমার
তুমিই সবার জানার যোগ্য প্রণাম লহ হে সর্বজ্ঞ
অনন্যা ভক্তিতে লভ্য লহ পুনঃ নমস্কার ॥

কর্মযোগীর যথার্থভাব হয় নি আমার হৃদ্‌গত
না বুঝি ঈশ্বরের তত্ত্ব মনোরথে লও সারথ্য
তুমি তো সেই পূর্ণব্রহ্ম কর জ্ঞানে জাগ্রত ॥

কভু কর্ম, কভু বা জ্ঞান দুটি পথই প্রদর্শিলে
কল্যাণকর কোন্‌টি মম কও মোরে পুরুষোত্তম
সন্দেহ দূর কর আমার কোন্ সাধনে সিদ্ধি মিলে ॥

স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ যদি কর্ম হতে
তবে কেন বল মোরে হিংসাত্মক কর্মঘোরে
নিযুক্ত করিছ কৃষ্ণ চলব বলো কোন্ পথে ॥

পুরাতনের ধ্বংসকর্তা নূতন প্রতিষ্ঠানের তরে
হে শাশ্বত ধর্মপালক গ্রাস করিছ সমগ্র লোক
বিষ্ণু তোমার তীব্র তেজে সারা জগৎ দগ্ধ করে ॥

ব্যথিত মোর অন্তরাত্মা চতুর্দিকে দুর্লক্ষণ
ঘুরছে মাথা গাত্র জ্বলে রইতে নারি রণস্থলে
হাত থেকে গাণ্ডীব খসিল, চাই না যুদ্ধ মধুসূদন ॥

চাই না কুলের হন্তা হতে বুঝতে নারি কিবা শ্রেয়
চাই না রুধিরাক্ত অর্থ রইতে চাহি অপ্রমত্ত
যুদ্ধ মানি ধর্ম জানি দূর কর মোর এ সন্দেহ ॥

শুকাল মুখ কাঁপিছে বুক অবসন্ন দেহ মন
স্বজন বধি পাপের ভাগী হওয়ার চেয়ে ভিক্ষা মাগি
খাওয়াই ভাল, চাই না আমি ত্রৈলোক্যের সিংহাসন ॥

চাই না বিজয় চাই না রাজ্য নহি সুখের অভিলাষী
আমি হত হই হইব, প্রতিযুদ্ধ না করিব
না দেখি মঙ্গল হে কৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজনে নাশি ॥

যাদের নিয়ে রাজত্ব ভোগ তারা হ'লে সব নিধন
কি ফল বলো বেঁচে থেকে জাগ্রতে দুঃস্বপ্ন দেখে
বিধবাদের বিলাপ-রোলে শিহরিয়া উঠবে মন ॥

অধিক কি, নিরস্ত্র মোরে আক্রমিলে জ্ঞাতিগণ
প্রতিবাদী নাহি হব মৃত্যুকেও বরি লব
কদাপি হব না আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ ॥

স্বজন নাশি সুখ না পাব কুলক্ষয় সে ভয়ঙ্কর
ধর্মনাশে কুলক্ষয় কুলনারী দুষ্টা হয়
লুপ্ত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি জন্মিবে বর্ণসঙ্কর ॥

লোভের বশে ভাবেন ওঁরা মিত্রদ্রোহে পাতক নাই
কুলধর্ম হইলে নাশ মনুষ্যদের নরক বাস
চাই নে হতে মহাপাপী মিত্রে নাহি মারতে চাই ॥

কর্ম করতে ব'লেও আবার বলছ স্থিতপ্রজ্ঞ হও—
এই হেঁয়ালি নাহি বুঝি বল মোরে সোজাসুজি
যুদ্ধ ও সমত্ব বুদ্ধি কোন্‌টি শ্রেয় স্পষ্ট কও ॥

ব্রহ্মা হতে শ্রেষ্ঠ তুমি আদি কর্তা হে দেবেশ
যদিও আহূত রণে নাই আসক্তি রাজ্যধনে
আমার পক্ষে শ্রেয় কিবা কহ তুমি হৃষীকেশ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি*

কর্ম না করিলে কেহই না লভে নৈষ্কর্ম জ্ঞান
কর্মত্যাগীর সিদ্ধি নাই—ত্রিগুণেরই বশে সবাই
বাধ্য হয়ে কর্ম করে, কর কর্ম অনুষ্ঠান ॥

কর্ম কর ঈশ্বরার্থে, হও সমত্ব বুদ্ধিমান
সুকৃত-দুষ্কৃতের ভোগী না হন কভু কর্মযোগী
স্বর্গ-সুখ বা নরক-ভয়ে করেন না কর্মানুষ্ঠান ॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখেও যিনি স্পৃহাহীন
ভয় অনুরাগ ক্রোধ তাঁহারে স্পর্শ না করিতে পারে—
বুদ্ধিটি নিশ্চলা হ'লে রয় না কেহই মায়াধীন ॥

কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ দেয় উভয়েই মোক্ষফল
ব্রহ্মার্পণ আদি দ্বারা 'তৎ' 'ত্বং' পদের দ্রষ্টা যাঁরা
নিমি জনক জানিতেন এই কর্মযোগের সুকৌশল ॥

যুদ্ধ আমার অভিপ্রেত দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন
দুঃশাসন শ্যেনদৃষ্টি চায় নাশিতে ভারতকৃষ্টি
হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যজি ধারণ কর শরাসন ॥

যুদ্ধ বিনা হৃত রাজ্য উদ্ধারের নাই উপায়
যুদ্ধ হিংসাত্মক কর্ম রক্ষা করে সমাজধর্ম
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহাই সহিও না এই অন্যায় ॥

---

* বিজ্ঞ সম কইছ কথা, কিন্তু জীবিত বা মৃত
কারো তরেই পণ্ডিতেরা করেন না শোক, কৌরবেরা
রাজ্য অপহর্তা হয়ে করেছে ঘোর দুষ্কৃত ॥

শাস্তি পাবার যোগ্য ওরা ভরত রাজার কুসন্তান
অন্যায়ের প্রতিরোধী প্রতিবাদী না হও যদি
অপরাধী হবে পার্থ, কার্য তোমার ক্ষত-ত্রাণ ॥

তোমায় দিয়ে করিয়ে নেব আমারি কাজ শোন পার্থ
আমার ইচ্ছা বলবতী তোমায় যদি দেয় শকতি
পারিবে গাণ্ডীব তুলিতে লোককল্যাণ আমার স্বার্থ ॥

বধের উপযুক্ত ওই পরস্বাপহারকগণ
পালন কর ক্ষাত্রধর্ম অভেদ্য তো তোমার বর্ম
দুষ্টজনে দণ্ড দিয়ে কর শান্তি সংস্থাপন ॥

অস্ত্র ত্যাগ যে অকীর্তিকর, ধর্মক্ষেত্র-মহিমায়
অন্তরে হোক স্বধর্মোদয় শত্রুদলে করহ জয়
কেন হেন অভিভূত শোক-মোহ-মমতায় ॥

কেন সংশয়ের দোলাতে চিত্ত তোমার হয় দোদুল
কাপুরুষের ন্যায় আচরণ, ক্লৈব্য তব নহে শোভন
তোমার বাণে হবেই হত ধর্মদ্রোহী কুরুকুল ॥

কর্ম তোমার সুনির্দিষ্ট প্রকৃতিই সে কর্ম-রতা
তুমি কর্তা মনে ক'রে অসম্মত হও সমরে
ইচ্ছা তোমার কিছুই নহে সত্য জেনো আমার কথা ॥

মনুষ্যত্ব নষ্ট হ'লেই দুষ্কৃত-ক্ষয়-অভিলাষে
কালরূপে হই অবতীর্ণ না রাখি শত্রুদের চিহ্ন;
তুমি কর্তা নও এ কাজে আমিই কর্তা এই বিনাশে ॥

উত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ, হও যশস্বী শত্রুজিৎ
ভোগ কর সমৃদ্ধ রাজ্য এই তব নির্দিষ্ট কার্য
তুমি তো নিমিত্ত মাত্র হও সখে মৎ কর্মকৃৎ ?

যুদ্ধ তুমি না করিলেও রইবে না ওই শত্রুচয়
দেখ পূর্বে আমার দ্বারা হত হয়েই আছে তারা
তুমি তাদের হন্তা নহ যুদ্ধ কর কিসের ভয় ?

'আমি কর্তা' এই ভাবনা করেন না তাই যোগীগণ
কর্মফলাসক্তিহারা হ'লেই নাশে জন্মধারা
হত্যা ক'রেও অহন্তারক আত্মজ্ঞানী হন যে জন ॥

আসন্ন সঙ্কট সম্মুখে শত্রুরা দণ্ডায়মান
বজ্রমুষ্টি শিথিল কেন আত্মা হত হন না জেনো
উত্তিষ্ঠ হে মহাবাহু অজেয় ঐ শিরস্ত্রাণ ॥

পূর্ণ হবে আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা উপেক্ষিয়
আছে যত অজ্ঞানী জন তারাই গণে পর বা আপন
দেহী সে অমূর্ত আত্মা দেহ তো নয় আত্মীয় ॥

বিবেকহারা আততায়ী বধে কারো হয় না পাপ
প্রজারঞ্জনার্থে রাজা কর্মদোষে পায় সে সাজা
যুদ্ধ কর সব্যসাচিন প্রদীপ্ত শৌর্য প্রতাপ ॥

অধর্মে দেশ নষ্ট করে রাষ্ট্রপতির কু-শাসন
সন্ধি সম্ভাবনা নাহি, হ'লেও তাহা ক্ষণস্থায়ী
তপোবনে লাগবে আগুন পুড়বে ধ্যানীর কুশাসন ॥

যুদ্ধ করাই ধর্ম হেথায় না করা ঘোর অধর্ম
বধ্য ওরা হ'লেও আপন স্বপ্নে পরিচয় আলাপন
আত্মরক্ষা মোক্ষসোপান কর পার্থ আমার কর্ম ॥

মানবধর্ম রক্ষা লাগি আমার সৃষ্ট বর্ণ চার
ব্রাহ্মণদের ত্যাগই যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দের প্রাণোৎসর্গ
বৈশ্য কৃষি-গোধন-রক্ষী শূদ্রে সেবার অধিকার ॥

বিনা রক্তপাতে দেশে শান্তি সংস্থাপনার্থে
ব্যর্থ হ'ল দৌত্য আমার রাজসভাতেই যথেচ্ছাগার
যুদ্ধ কর অস্ত্র ধর ধরার কলুষ নাশার্থে ॥

ভারত তব যশোভাতি বসুন্ধরা করে আলো
স্বধর্ম ভুলিছ কেন দিগ্‌বিজয়ী ভীরু হেন
দুর্নাম রটিবার আগেই মানী জনের মৃত্যু ভালো ॥

কিরাতবেশী পশুপতি করেন তোমায় বর প্রদান
ইন্দ্রিয়-যুদ্ধে যে জয়ী তারেই মালা পরান মহী
বিদ্ধ করুক বৈরী-ললাট পরন্তপের অগ্নি-বাণ ॥

দুষ্টজনে শাস্তি দিতে ধর ধনুঃশর ধর
কর সখে আমার কার্য ধর্মযুদ্ধ অনিবার্য
হারায়ো না এ সৌভাগ্য পরম এ দান গ্রহণ কর ॥

শ্রেষ্ঠ লোকে যাহা করেন অনুসরে সর্বজনা
কর্মযুক্ত হোক সকলে কর্মযজ্ঞে সিদ্ধি মেলে
কারেও কভু দিয়ো নাকো কর্মত্যাগের মন্ত্রণা ॥

মদ্গত চিত্ত হও যদি তরবে তুমি মোর কৃপায়
পেরিয়ে যাবে সুদুস্তর মৃত্যু-সংসার-সাগর
হও তুমি নিরঅহঙ্কার শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ॥

সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান মানি যোগস্থ হও
চিত্তের যে সাম্যভাব তার ফলে সুবুদ্ধি লাভ
কর্মে তোমার রয় অধিকার ফলের অধিকারী নও ॥

সমস্ত কামনার ত্যাগী সন্তুষ্ট আপনাতে
জানিও স্থিতধী সেই যোগীর কোন উদ্বেগই নেই,
নাই ক্রোধ ভয় নাই মমতা স্থির রন দুঃখ-সংঘাতে ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী যিনি তিনিই যোগী অন্যে নহে
সর্বসঙ্কল্প ত্যাগীরেই জানবে যোগারূঢ় ব'লেই
আসক্তি বর্জিতে হবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ॥

জিতেন্দ্রিয় যে জন নহে মনই তাহার শত্রু হয়
যে জনা প্রশান্তচিত্ত রাগদ্বেষাদিবিরহিত
বিচলিত নন কিছুতেই সাধন-পথে তাঁরই জয় ॥

* * *

না-পাওয়া মোর নাই কিছু তো, নাইক চাওয়া একটি রতি
প্রকৃতি রক্ষণের লাগি অ-তন্দ্রিত আছি জাগি
ফলে অনাসক্ত, তবু কর্মে মম নাই বিরতি ॥

তোমায় দিয়ে আমার কার্য করিয়ে নেব শোন পার্থ
আমার ইচ্ছা বলবতী তোমায় যদি দেয় শকতি
পারিবে গাণ্ডীব তুলিতে—লোকরক্ষা আমার স্বার্থ ॥

কুরুকুলের দুষ্টগ্রহ দুর্যোধন সে মনুষ্যময়
নয় যে রাজা ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রীরা নয় জ্ঞানগরিষ্ঠ
মনুষ্যত্ব হারিয়ে সেথা প্রজারা বিধ্বস্ত হয় ॥

ন্যায্য উত্তরাধিকারে কেন প্রবঞ্চিত হও
হোক সে বন্ধু হোক্ না সে ভাই দুর্জনে প্রশ্রয় দিতে নাই
হও অগ্রণী কর্মযোগিন্ পিতৃগণের প্রসাদ লও ॥

হাসেন মহারথ সকলে এ বৈরাগ্য উচিত নয়
অরাতির আতঙ্ক পার্থ হবেন উপহাসের পাত্র
ঐ শোন উদাত্ত ভেরী তুল্য মানো জয়-অজয় ॥

দয়াপরবশে যদি শত্রু নিধন না কর
তাদের বাণে হবে হত কিংবা মাথা করবে নত
ঘোষিবে কলঙ্কগাথা ধর হে গাণ্ডীব ধর ॥

ত্যজ মোহ ত্যজ ক্লৈব্য, সংগ্রামে পলায়মান
হয় কবে ক্ষত্রিয় জাতি নাশ শত্রু গুরু জ্ঞাতি
সে রাজা তো আত্মঘাতী না রাখে যে নারীর মান ॥

দুর্নীতিপরায়ণ রাজার প্রজারা হয় বিশৃঙ্খল
ঈশ্বরে বিশ্বাসী না রয়, 'জন্মে প্রাণী' চার্বাক কয়
'স্ত্রীপুরুষের মিলন-ফলে মৃত্যুতে শেষ হয় সকল' ॥

অহঙ্কারে বলে দর্পে কামে ক্রোধে জ্ঞান হারায়
গুণীরে ঘোষিয়া দোষী হানে তারা হিংসা-অসি
অবৈধ কুকর্ম করি জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥

নিষ্ফলা হয় তাদের আশা ব্যর্থ কর্ম যজ্ঞ যাগ
সৎ অসৎ বিবেকহারা পরম ভাবে অজ্ঞ তারা
রাক্ষসী প্রকৃতি তাদের মন্দ কর্মেই অনুরাগ ॥

দুষ্কর্মা ও মোহগ্রস্ত মায়ায় অপহৃত জ্ঞান
অসুরসুলভ বৃত্তি ধরে আমারে অবজ্ঞা করে
নিরুপাধি আমার স্বরূপ সত্তায় হয় সন্দিহান ॥

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিতে বৈধ যুদ্ধ করে যেই
হত হ'লে যায় সে স্বর্গ জেতা হ'লে পৃথ্বী ভোগ্য
ধ্বংস করে ধর্মগ্লানি বহু জনের হিতার্থেই ॥

পণ্ডিতেরা করেন না শোক জানেন আত্মরহস্য
নহেন তিনি অস্ত্রে ছেদ্য না হন তিনি জলে ক্লেদ্য
অগ্নিতে অদাহ্য তিনি মরুতে রন অশোষ্য ॥

দেহেরই হয় জন্ম-বিনাশ কর্মক্ষয়েই মৃত্যু হয়
আত্মা জেনো অবিকার্য মৃত্যু সে অপরিহার্য
নাই অনুশোচনার কারণ শোক করা তো উচিত নয় ॥

সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সে ঈশ্বর
এই কথাটি জানলে পরে বুঝবে জীবের দেহই মরে
ক্ষয়-ব্যয়-রহিত আত্মা সর্বকালে রন অমর ॥

জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান গম্য হয়েও আত্মা রহেন বাক্যাতীত
মোদের স্মৃতির যাদুঘরে 'নেতি নেতি' বিচার করে
তর্কবুদ্ধি পরাজিত আছেন তিনি অনির্ণীত ॥

দেহেরই হয় জন্ম-বিনাশ শুভাশুভ কর্মফলে
কেন দেহের শোকে মত্ত লক্ষ্য হউক অমৃতত্ব
স্বকর্ম অর্চনায় যুক্ত হও ও ধর্মক্ষেত্রতলে ॥

দেহেরই হয় জন্ম-বিনাশ কর্মক্ষয়েই মৃত্যু হয়
আত্মা জেনো অবিকার্য নাই মৃত্যু সে অপরিহার্য
নাই অনুশোচনার কারণ শোক করা তো উচিত নয় ॥

ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিরে আত্মা বলে না মানিয়ো
স্থূলের চেয়ে ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ তার চেয়ে মন
আরও শ্রেষ্ঠ মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এই জানিও ॥

হারায়ো না এ সৌভাগ্য ঘুচুক তোমার মনের ভার
যুক্তিপথে জ্ঞানের বাতি হউক তোমার কর্মসাথী
নির্দ্বন্দ্ব হ'লেই তব চিত্ত রবে নির্বিকার ॥

কর্ম ব্রহ্ম সমুৎপন্ন ত্যজ ফলে আসক্তি
স্বল্পমাত্র আচরিলে কর্মযোগেই মুক্তি মিলে
তরে মহৎ ভয় হইতে কর্মে আছে সে শক্তি ॥

শুভাশুভ কর্মভেদেই নূতন জন্মে নূতন সাজ
গুটিপোকাই প্রজাপতি-রূপে দেখা দেয় যেমতি
নাহং দেহো ন মে দেহঃ জপ গো এই মন্ত্ররাজ ॥

ন জন্মে মমত্ববুদ্ধি অতিথিদের পর-গেহে
ভাবেন পথের বাসা ছাড়ি যাবেন কবে আপন বাড়ি
অতিথিপ্রায় থাকেন জ্ঞানী নবদ্বারী এই দেহে ॥

জলের আবরণে ঘেরা বায়ুভরা বিম্বপ্রায়
ভাসে প্রাণী ভবার্ণবে জলেই মেশে ফাটে যবে
জলপুতুলের শোকেই কাতর, অশোচ্য সব যা হারায় ॥

কৌমারে যৌবনে জরায় মরণে কায় নূতন হয়
জীর্ণ সে চীর ছাড়ি নরে যেমন নূতন বসন পরে
মৃত্যু নবীন দেহগ্রহণ বিবেকী তায় কাতর নয় ॥

জীবন মৃত্যু সন্ধিক্ষণে ধরেন দেহী অন্য কায়
ছাড়ি জীর্ণ দেহাবরণ নূতন দেহ করেন ধারণ
আত্মা না হন হন্তা হত, কেন মুগ্ধ হও মায়ায় ॥

হবেই তব পূর্ণ বিকাশ ক্রমে ক্রমে জন্মান্তরে
তুচ্ছ মানি দুঃখ সুখে রও প্রসন্ন শান্তমুখে
অন্তরে বাহিরে শুচি যোগী দেখেন পরাবরে ॥

বায়ু যেমন পুষ্পগন্ধ বহন করে স্থানান্তরে
তেমনি দেহ ত্যাগের পরে ইন্দ্রিয় মন দেহান্তরে
কর্মবশে দেহস্বামী ঈশ্বর যান সঙ্গে করে ॥

জীবাত্মা সে নূতন দেহে প্রবিষ্ট হন বারংবার
ভোগবাসনা যখন মেটে বন্দী না রন দেহের ঘটে
পরমাত্মার অংশ তিনি প্রকৃতিই ত ঘটায় বিকার ॥

কারে তুমি বাস ভাল মরিলে তার জড় দেহ
তুলে দিয়ে চিতানলে ভাস খেদে আঁখিজলে
দেহটি কি ছিল প্রিয় ? না সেই দেহে ছিল কেহ ?

আসক্তি-দোষ জাগলে মনে জন্মিতে হয় পুনর্বার
হরিণ-স্নেহে ভরত রাজা সহেন পুনর্জন্ম-সাজা
পৃথিবীতে জীবের আসা নহে তো এই প্রথমবার ॥

এবার হেথায় আসার আগে কোথায় ছিলে পাও কি টের
বেঁচেছিলে স্মৃতিলোকে কে কাঁদে কার বিয়োগ-শোকে
এই জনমের কান্না হাসি যাবে তোমার সঙ্গে ফের ॥

তুমি ছিলে আমি ছিলাম তোমার কিছুই নাই স্মরণ
রাজন্যগণ ছিল সবাই কারো কিছু নাই মনে নাই
পরজন্মে থাকবে তারা পুনর্জন্মে পুনর্মরণ ॥

লভেন সাধক উর্ধ্বগতি বারে বারে দেহাশ্রয়ে
জন্মজন্মান্তরের যত সঞ্চিত সংস্কারবশত
পরমধামের যাত্রী মানুষ কেন কাতর দেহক্ষয়ে ?

তপস্যা হোম ভোজন বা দান আমায় হ'লে অর্পিত
তোমার যত বন্ধন-ভয় তৎক্ষণাৎ হইবে ক্ষয়
হে কৌন্তেয় রও সাধনায় মিলিবে আনন্দামৃত ॥

আত্মাকে কে জানিয়ে দেবে যাহাতে উৎপন্ন জ্ঞান
তিনি বোধি স্বয়ংজ্ঞাতা বহির্বস্তু জ্ঞানপ্রদাতা
তিনিই অখণ্ডিত সময় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ॥

গগন পবন সাগর তপন বিরাজে তাঁর ইচ্ছা-বীজে
কেমন তিনি সে কর্তারে মানুষ কভু জানতে নারে
আয়ুর সীমার মাঝে অসীম জন্মগ্রহণ করেন নিজে ॥

সর্বক্ষেত্রে প্রকাশিছেন পরমাত্মা রবির প্রায়
জীব ব্রহ্ম মূলে একই ভ্রান্তিতে পার্থক্য দেখি
মানুষরূপেই ভোগ্যগুলির ভোক্তা ব'লেই জানবে তাঁয় ॥*

---

* ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত বিজ্ঞান আনন্দময়
সর্বপ্রভেদ বর্জিত রন প্রত্যক্ষই দেন দরশন
চোখে 'তিমির রোগ' ধরিলে অনেক চন্দ্র দৃষ্ট হয় ।

বিশ্বরূপের সমষ্টিতে তিনি রূপে পরিপূর্ণ
সর্বত্র তাঁর প্রকাশন সৌন্দর্য মানস লোভন
বুঝবে তাঁরে মনটি যবে হবে বিষয়স্পৃহাশূন্য ॥

লীলাচ্ছলে নিত্য পুরুষ রূপ ধরিয়া হন প্রকট
অসীম হয়েও দেহের ঘটে সীমায় ঘেরা থাকেন বটে
আকাশ সে আকাশই থাকে ভাঙিলে মৃদ্‌বিকার ঘট ॥

সর্বভূতে বিভক্তবৎ অবিভক্ত মহেশ্বর
স্বয়ং জ্যোতিঃ স্রুক ও স্রুব তিনিই হবি হোতা ধ্রুব
সব আহুতি তাঁহার পদে বহন করেন বৈশ্বানর ॥

অসীম তাঁর কর্মশক্তি সসীম মন মাপতে নারে
ঘোরায় জীবে গোলোকধাঁধা বাহির হবার পথে বাঁধা
সৃষ্টি করে পদে পদে না পারে পৌঁছিতে দ্বারে ॥

প্রকৃতি তাঁর কর্মকর্ত্রী আদি কর্তা নির্বিকার
সর্বক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের নেত্রগোচর যোগ্য
দেহস্থিত এই জীবাত্মা অখণ্ডেরই খণ্ডাকার ॥

[ক্রমশ]

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মেরি চৈতন্যযোগে জীবদেহ চৈতন্যবান
থাকেন দেহের অন্তরালে কিন্তু ভোগের কাল ফুরালে
ছাড়িয়া যান জড়দেহ সর্পের নির্মোক সমান ।

একমাত্র আত্মা ছাড়া অপর সবি নিশ্চেতন
অরুণ রূপে উষার আকাশ সমজীবের হয় চিদাভাস
জবাফুলের সহবাসে স্ফটিক রঙিন হয় যেমন ।

চক্ষুকর্ণ জ্ঞাতা নহে মনোবুদ্ধি যন্ত্র মাত্র
তিনিই দেখেন রঙ ও আকার বস্তুর গুণ বোধ্য তাঁহার
শব্দ স্পন্দ তিনিই শোনেন অনুভবেন পাত্রাপাত্র ।

অভ্যাসের গুণেই ক্রমে দুঃখসহিষ্ণুদের আর
বোধ নাহি হয় দুঃখ ব'লে অনেক দুঃখ ভোগের ফলে
লভেন সাধক মুক্তিমোক্ষ পুনর্জন্ম হয় না তাঁর ।

গান্ধীবাদ

পাঠক। একটা কথা মশাই, আমাদের মাথায় ঢোকে না। আজকের যুগে গান্ধীভক্তেরা চরকা চালাবার চেষ্টা করছেন কেন? যন্ত্রের সুবিধা ত্যাগ ক'রে চরকা বা গরুর গাড়ির যুগে কি ফিরে যাওয়া উচিত হবে?

মানুষ যখন নিজের হাতের জোরে বা গাই-বলদের সাহায্য ছোটখাট কল চালিয়ে নিজের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি ক'রে নিত, আজ পৃথিবী তা থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে, মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন অবস্থায় পুরানো যুগে ফিরে যাওয়া দু-চারটা দেশের পক্ষে হয়তো আজও সম্ভব। কিন্তু সবাই ধনবৈষম্য দূর করতে গিয়ে যদি গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যায়, তা হ'লে সবাই গরিব হয়ে যাবে না কি? ধনবৈষম্য দূর করার জন্যে কি সকলকে গরিব হয়ে সমান হতে হবে?

লেখক। আপনার প্রশ্ন সঙ্গত এবং গান্ধীজীর পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু উত্তর আছে। আপনাকে দেবার চেষ্টা করব।

জীবজন্তুর শক্তির দ্বারা যখন কল চালানো হ'ত, মানুষ নিজের বাহুবলের দ্বারা যখন কাপড় বুনত, লোহার অস্ত্র নির্মাণ করত, তাতে সকলের অভাব মিটত না সত্য। আজ কয়লা বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মানুষের অভাব মেটানোর সামগ্রী অনেক বেশি পরিমাণে নির্মিত হয়; কিন্তু কলের ফলে সব শিল্পই বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে চলেছে, গ্রামে যারা থাকে তাদের মজুরিবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না, ধনবৈষম্যের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠক। এ কথা বর্তমান যুগের চিন্তাশীল অনেকেই স্বীকার ক'রে থাকেন। যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীভূত শিল্প থাকলে শত্রুর বোমার আঘাতে তার ধ্বংসের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ব'লে আজ শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ তো আপনিই হচ্ছে।

আর কয়লার বদলে বৈদ্যুতিক শক্তির উপরে নির্ভর করলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ তো সহজেই হবে। গ্রামের লোক শুধু মজুর না হয়ে

নিজের স্বাধীন কারিগরী বৃত্তিতে পুনরায় ফিরে যাবে; কিন্তু গান্ধীজীর চরকা-খদ্দরের উপর এত জোর কেন?

লেখক। গান্ধীজী চরকাকে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সর্বোত্তম নমুনা ব'লে ধরেছিলেন। বিকেন্দ্রীকরণেই তাঁর ঝোঁক ছিল। যদি বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ক'রে মানুষ অনায়াসে প্রয়োজনীয় বস্তু রচনা করে এবং সেই বিদ্যুতের কেন্দ্র যদি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে বা গ্রামপঞ্চায়তের অধিকারে থাকে, তাতে তিনি খুশিই হবেন—এই রকম কথা লিখে গিয়েছেন।

আসল কথা হ'ল, বিকেন্দ্রীকরণ। তার মধ্যে তিনি দুটি প্রধান গুণ দেখতেন। উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা আর্থিক সমৃদ্ধির সমবণ্টন সম্ভব। আর দ্বিতীয়ত, বস্ত্র বা অনুরূপ কোনও প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে প্রত্যেক মানুষ যদি দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হ'লে আজ বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে যে ব্যবধান জ'মে উঠছে তাও দূর হয়ে যাবে ব'লে তিনি মনে করতেন।

তা ছাড়া আর একটি কথা আছে। ধরুন, আজ ভারতের মত দেশে কবে সমগ্র দেশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্লাবিত হবে তার ঠিক নেই, সে অবস্থায় কি মানুষকে ধনতন্ত্রের দাসত্বে তত দিন ব'সে থাকতে হবে?

পাঠক। তা কেন? ধনতন্ত্রকে দ্রুত ভেঙে কলকারখানা বা জমি ও নদনদী সবই রাষ্ট্র বা সর্বসাধারণের অধিকারে আনতে হবে।

লেখক। নিরস্ত্র শ্রমিকশ্রেণী বা ভারতের মত নিপীড়িত দেশের পল্লীবাসী চাষীকুল যদি ধনতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগ করে, তা হ'লে তারা কি খেয়ে-প'রে বাঁচবে?

পাঠক। সেইজন্যই তো নিপীড়িতের পক্ষ নিয়ে, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা রচিত সেনা-বিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দ্রুত কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

লেখক। কিন্তু আজকের যুদ্ধাস্ত্র যে ভাবে উন্নত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কামান-বন্দুক নিয়ে কি জনসমূহ দাঁড়াতে পারবে? অহিংস অসহযোগ কি তাদের পক্ষে আরও বেশি সহজ ও সম্ভব নয়?

পাঠক। কিন্তু অহিংস অসহযোগই যদি তারা করে, তখন ধনতন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ জমির বা কলের মালিক তাদের তাড়িয়ে দিয়ে কি পরাস্ত করতে পারে না?

লেখক। পারে। কিন্তু সত্যাগ্রহের প্রস্তুতির সময়ে তারা যদি চরকা-খদ্দরের কাজ শেখে, অন্যান্য শিল্প আয়ত্ত করে, এবং সেই সব কাজকে পুরনো ভাবে না ক'রে, প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে কেন্দ্র ক'রে নিজেদের মধ্যে সমবায়মূলক ছোট ছোট সমাজ গ'ড়ে তোলে, তা হ'লে তাদের লড়ায়ে যুঝবার শক্তি কি বৃদ্ধি পাবে না?

পাঠক। ও-রকম সংগঠন সফল হ'লে লড়াইয়ের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, অসহযোগ আরও দীর্ঘদিন হয়তো চালানো সম্ভব। কিন্তু অতখানি সংগঠন পর্যন্ত ধনীকুল আপনাদের অগ্রসর হতে দেবে কি না তাতেই সন্দেহ আছে। আজ জগতের সর্বত্র ধনীশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থাকে যে ভাবে নিজেদের করায়ত্ত ক'রে রেখেছে, এবং রাষ্ট্রশক্তির সুকৌশল ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীকে যে ভাবে পদানত ক'রে রেখেছে, গঠনকর্মের ভিতর দিয়ে নূতন মুক্তির প্রচেষ্টাকে তারা ব্যর্থ ক'রে দেবে না কি? ১৯৪২ সালের বিপ্লবের সময়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের চাপে সর্বত্র খাদি বা বুনিয়াদী শিক্ষার কাজও কি বন্ধ হয়ে যায়-নি?

লেখক। ধনীদের বাধা দেবার শক্তি যে প্রচণ্ড—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গড়ার কাজে আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, রাষ্ট্রক্ষমতা যদি ধনীদের হাতে র'য়ে যায়, তা হ'লে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তারা গড়ার চেষ্টাকে পরাস্ত ক'রে দেবে, তাতেও সন্দেহ নেই। সেই জন্য গান্ধীজী মনে মনে নৈরাজ্যবাদী হয়েও রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করার জন্য বারংবার সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতরাষ্ট্র নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করবেন; আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে জনসমূহের মধ্যে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়ার জন্য গান্ধী-প্রদর্শিত গঠনকর্মের কাজে সর্বতোভাবে উৎসাহ এবং সহায়তা দান করবেন।

পাঠক। তাই যদি হয়, তবে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব-সাধনের পূর্বে গড়ার কাজ তো নিরর্থক। আগে ধনীশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তার পর তো গড়ার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। আপনি যে ভাঙার আগেই গড়তে চান!

লেখক। গান্ধীজী ঠিক ভাঙার আগেই গড়ার কথা বলতেন না, গড়তে গড়তে ভাঙার কথা বলতেন। আগে ভাঙা, পরে গড়া—এ নীতি তিনি সমর্থন করতেন না।

পাঠক। কেন?

লেখক। তার কারণ, শুধু ভাঙার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ভবিষ্যতে কি ধরনের সমাজ আমরা রচনা করতে চাই, আজ থেকেই তার সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা জনসাধারণকে তিনি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ভবিষ্যতে সমতামূলক সহযোগিতাপূর্ণ যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সেইরূপ জীবনের একটু নমুনা তিনি চরকা-খদ্দর অথবা বুনিয়াদী শিক্ষার মারফৎ এখন থেকে জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট ক'রে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয়ে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে তাঁর নেতৃত্বে হয়তো জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একদিন অধিকার ক'রে বসত; কিন্তু তার পর কি গড়তে হবে, এই নিয়ে স্পষ্ট ধারণা কারুর না থাকায় জনসমূহ যার-তার হাতে গড়ার কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিত। তাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশি। মানুষের ইতিহাসে বারংবার দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে জনসাধারণের শোষণ এক রূপ পরিহার ক'রে অন্য রূপ নিয়েছে, শোষণমুক্তি সুদূর স্বপ্নের মতই থেকে গেছে।

তাই গান্ধীজী ভবিষ্যৎ সমাজের চারা এখন থেকেই বোনবার চেষ্টা করতেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে আসবে, তখন সর্বত্র সেই চারা ব্যাপকভাবে রুইবার সময় হবে ব'লে তিনি মনে করতেন। তার অভাবে নতুন জীবনের নমুনা বীজাকারই হয়তো সমাজদেহের আনাচ-কানাচে থেকে যাবে, তার ব্যাপ্তি বা প্রসার সম্ভব হবে না।

পাঠক। আচ্ছা, তর্কের খাতিরেই যদি ধ'রে নিই যে জনসমূহ ভবিষ্যতের চারা এখন থেকে ছোট ছোট ক্ষেতে তৈরি ক'রে রাখতে পারে, এবং হয়তো বিপ্লবের পর নতুন জীবন গড়বার সময়ে এর দ্বারা সুবিধা হওয়া সম্ভব; তবু প্রশ্ন ওঠে, এইভাবে গড়া এবং ভাঙার কাজ একসঙ্গে মিশিয়ে দুই চেষ্টাই কি দুর্বল হয়ে পড়ে না? তার চেয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রথমে ভেঙে, পরে গড়ার চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

লেখক। আপনার যুক্তি মানলাম। কিন্তু আপনি যখন দ্রুত কার্যসিদ্ধির কথা ভাবেন, তখন হিংসার পথে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই তো ভাবছেন?

পাঠক। নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত না হ'লে গড়ার কাজ যে পূর্ণ করা সম্ভব হবে না, আপনি গান্ধীবাদী হয়েও তা স্বীকার করছেন। আমার মত হ'ল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হিংসা ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে হস্তান্তরিত হতে পারে না।

লেখক। আচ্ছা, হিংসার পথে বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লে একটি পার্টির প্রয়োজন অপরিহার্য ব'লে আপনি মনে করেন তো?

পাঠক। নিশ্চয়ই। সেই পার্টি শুধু ভাঙার সময়ে নয়, গড়ার সময়তেও জনসাধারণকে শিক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত করবে।

লেখক। গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থা এমন জিনিস যে, সেখানে পার্টির প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব কম। জনসমূহ যদি গোড়া থেকেই জানে, কি উদ্দেশ্যে তাদের বিপ্লব, এবং তারা যদি সত্যাগ্রহের কর্মকৌশলও আয়ত্ত ক'রে থাকে, তা হ'লে বিপ্লব বা শান্ত প্রতিরোধের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তিকে একেবারে অকেজো ক'রে দিতে পারে। হিংসার পথে পরিচালনা কেন্দ্রীভূত না হ'লে দ্রুত সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়; অহিংসার পথে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল, বিপ্লব-প্রচেষ্টাকেও যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভূত করা। কর্মারম্ভে প্রতি সত্যাগ্রহী লক্ষ্য এবং উপায় সম্বন্ধে স্থিরদৃষ্টি হয়ে নেবে; কিন্তু কার্যকলাপে প্রত্যেকে নিজের অবস্থা অনুসারে অগ্রসর হবে। বর্তমান যুদ্ধে প্যারাট্রুপ সৈনিক যেমন ভাবে চলে, সত্যাগ্রহীকে তেমনই নিজের নেতৃত্ব নিজের উপরেই রাখতে হয়। অন্তত সত্যাগ্রহ-পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল তাই।

পাঠক। সন্দেহ হয় মশাই। যে জনসাধারণ এতদিনের শোষণে জর্জর হয়ে আছে, যাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা সংঘবদ্ধ নয়, বিক্ষিপ্তভাবে থাকে, তারা কখনও শুধু অহিংসার একটি মন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিপ্লবকে সার্থক করতে পারে? হয়তো তারা খানিকটা গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে ধনীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, কোনও বুদ্ধিযুক্ত সুকৌশলী পার্টির সাহায্য ব্যতিরেকে কি সম্ভব হয়? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

লেখক। আপনার সন্দেহ যে সঙ্গত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিংসাত্মক বিপ্লবের পরে কোনও পার্টি নিজের হাত থেকে ক্ষমতার রাশ স্বেচ্ছায় অপরের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তার কোনও নজির দিতে পারেন?

পাঠক। তাতে কি হ'ল? আগে হয় নি ব'লে আজ সে রকম পার্টি হতে পারবে না—এ কথা আপনাকে কে বললে? আগে মানুষে আকাশে উড়তে পারত না, আজ বিজ্ঞানবলে তাও সম্ভব হয়েছে।

লেখক। ঠিক কথা। পূর্বকালে অহিংস বিপ্লব সম্ভব হয় নি ব'লে আজকেও তা সম্ভব হবে না, আপনিই বা তা ভাবছেন কেন?

পাঠক। ইতিহাসে অহিংসা কোথাও সফল হয়েছে দেখাতে পারেন?

লেখক। পারি। পূর্বে যেখানে হিংসার ব্যবহার অপরিহার্য ব'লে মনে করা হ'ত, সেখানে আজ মানুষ অহিংসার প্রয়োগ ক'রে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরাই ছেলেবেলা কত মার খেয়েছি। পাগলের চিকিৎসা বা অপরাধীর সংশোধনের জন্য প্রহার বা শাস্তি ভিন্ন অন্য পথ মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু আজ শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের এতদূর উন্নতি হয়েছে যে হিংসার ব্যবহার উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিক্ষার ব্যাপারে এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘ'টে গেছে।

এক কথায়, ব্যষ্টির পরিবর্তনসাধনে পূর্বে যেখানে হিংসার প্রয়োগ ছিল, সেখানে আজ মানুষ অহিংসাকে একমাত্র কার্যকরী পন্থা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সমষ্টির বেলায় মানুষ আজও সংরক্ষণশীল

হয়ে রয়েছে। বহুজনকে পরিবর্তন করবার চেষ্টায় মানুষ অহিংসার উপরে ভরসা পায় না, চিরাচরিত হিংসার প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করে।

পাঠক। আপনি কি বলতে চান, স্বার্থান্বেষী ধনীকুল অহিংসার প্রভাবে এমনই বদলে যাবে যে, দরিদ্রের জন্য তাদের প্রাণ কেঁদে উঠবে?

লেখক। না, তা নয়। অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন হ'লে তখন তারা দরিদ্র জনসাধারণের যুক্তি শুনবে এবং দরিদ্রগণ যে নূতন সমাজব্যবস্থা রচনা করতে চায়, সে বিষয়ে সাহায্য বা সহযোগিতাও হয়তো করতে পারে।

পাঠক। অসম্ভব কথা। হৃদয়ের পরিবর্তন ওদের হবে—আপনার এই ধারণা অলীক স্বপ্ন।

লেখক। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি। যখন আপনি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলেন, তখন কি আপনি ভাবেন না যে, ধনমদে মত্ত স্বার্থান্বেষী ধনীশ্রেণীকে প্রহারের দ্বারা আপনি পদানত করবেন, দর্পচূর্ণ করবেন?

পাঠক। হ্যাঁ, তা তো করিই। কিন্তু সেটা তো হৃদয়ের পরিবর্তন নয়।

লেখক। এক দিক থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন বই কি! যে হৃদয় দম্ভে, শক্তির অহঙ্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেখানে ভয় এসে উপস্থিত হ'ল। ভয়ের বশে ধনীকুল আপনার কথা শুনতে রাজী হ'ল, যুক্তিতে সায় দিয়ে গেল। অহিংসার পথে ভয়ের পরিবর্তে দরিদ্র সত্যাগ্রহীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব জাগাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র।

দরিদ্রেরা যদি বলে, আমরা শোষণমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগ করব, তোমার যত সাজা দেবার ক্ষমতা আছে দাও, আমাদের ভাঙতে পারবে না। আমরা গঠনকর্মের দ্বারা যতটুকু খাওয়াপরার ব্যবস্থা করেছি, তার আশ্রয়ে বরং গরিবের মত বেঁচে থাকব, তবু আমাদের দ্বারা তুমি আর নিজের শোষণব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না, তা হ'লে অবস্থা কি দাঁড়ায়?

পাঠক। কি আর দাঁড়াবে? ধনীরা গরিবদের অসম্ভব প্রহার দিতে আরম্ভ করবে। অনাহারের দ্বারা তাদের সায়েস্তা করার চেষ্টা করবে।

লেখক। যদি সত্যাগ্রহী অটল থাকে, নিজেরা মরে তবু বশ্যতা স্বীকার না করে, তা হ'লে ধনীকুল শেষ পর্যন্ত নিজেদের কলকারখানা ও জমিদারি চালাতে পরেবে না। উপরন্তু, দরিদ্রদের সাহসে তাদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা হয়তো জাগতেও পারে।

দরিদ্রদেরা হিংসা প্রয়োগ করলে ধনীকুল আত্মরক্ষার খাতিরে নিজেদের অস্ত্রপ্রযোগকে যে ভাবে স্থায্য বা সঙ্গত ব'লে মনে করত, অহিংসার বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগের বেলায় বেশিদিন সে সুবিধা ভোগ কবতে পারবে না; অন্তরে একটু লজ্জা পাবেই পাবে।

পাঠক। বলিহারি যাই! তারা গরিবদের নির্মূল না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে ব'লে আপনি মনে করছেন? তারা লজ্জা পাবার লোকই-নয। তাদের চোখের পর্দা নেই, যতদিন স্বার্থবুদ্ধি প্রবল থাকবে, ততদিন তাদের দৃষ্টিও বদলাবে না।

লেখক। বদলাবে, এই ভরসা নিয়েই সত্যাগ্রহী অগ্রসর হন।

পাঠক। আচ্ছা, সত্যিই আপনি মনে করেন সত্যাগ্রহের তাড়নায় ধনীদের মধ্যে কোনদিন শুভবুদ্ধির উদয় হবে?

লেখক। প্রত্যেক ধনীর হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এমন আশা সত্যই আমি যে করি, তা বলতে পারি না। কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতির ধনীরা শেষ পর্যন্ত একা প'ড়ে যাবে; অর্থাৎ কোণঠাসা হবে ব'লে আমি মনে করি। একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

পাঠক। বলুন।

লেখক। বাংলা দেশে ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল, আপনার মনে আছে তো? তার মধ্যে নোয়াখালিতেও দাঙ্গা হয়; সেই দাঙ্গায় মুসলমান জনতা প্রায় তিন শো লোককে খুন করে, কয়েক কোটি টাকার ঘরদোর পুড়িয়ে দেয় বা লুঠ করে, নারীদের উপরেও অনেক রকমের অত্যাচার করে এবং যে হিন্দুরা পালাতে পারে নি তাদের ধর্মান্তরিত করে।

সে সময়ে গুণ্ডাদেরই রাজত্ব চলেছিল। সাধারণ মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত ক'রে কিছু মতলববাজ বুদ্ধিমান মুসলমান এই সব অঘটন ঘটিয়েছিল।

গান্ধীজী সেখানে পৌঁছে সাধারণ মুসলমানকে সেবা এবং সৎশিক্ষা-দানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুকেও তিনি বলেছিলেন, ভয়ের বশে কেউ যেন ধর্মান্তরিত না হয়, নোয়াখালিতেই নিজের ধর্মানুষ্ঠান বজায় রেখে, সাহসের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন যে, যদি তারা এই সন্ধিক্ষণে নিজেদের জীবনকে বদলে ফেলতে পারে, ডাক্তার যদি সেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামের সর্বসাধারণকে সুস্থ হতে শেখান, ইঞ্জিনিয়ার তাদের সহজে অল্পব্যয়ে কি ভাবে আদর্শ গৃহ নির্মাণ করতে হয় সে কথা শেখান, তবে সেই সেবার বশে সাধারণ মুসলমান ক্রমশ মনে করবে, এই সব শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে থাকার ফলে আমাদের জীবনের উন্নতি ঘটছে। সেই রকম লোক যদি স্বীয় হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে চায়, মুসলমানেরা হয়তো আপত্তি করবে না। যদি কুশিক্ষার বশে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে আপত্তি ক'রে বসে, তখনও যদি হিন্দুরা অবিচল সাহসের সঙ্গে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না ক'রে শুধু নিজেদের মরণের দ্বারা ধর্মে অবিচল থাকে, তা হ'লে তার এক নূতন ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মুসলমানদের মধ্যেও সকলে অসৎ নয়, একটি সমাজে সকলে এক কালে সৎ বা অসৎ হতে পারে না। তবে সৎ সচরাচর দুর্বল হয় এবং অসৎ সহজে প্রবল আকার ধারণ করে। অধিকাংশ মানুষই সৎ ও অসতের সংমিশ্রণে তৈরি। সাময়িক উত্তেজনার বশে তাদের চিত্তেও সৎ স্তিমিত হয়ে যায়, অসৎ প্রাবল্য লাভ করে। এই অবস্থায় সত্যাগ্রহীদের অহিংস প্রতিরোধের ফলে সৎ আর স্তিমিত অবস্থায় প'ড়ে থাকতে পারে না। মুসলিম সমাজের মধ্যেও যারা সৎ আছে, তারা জাগ্রত হয়ে অসৎকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে।

দাঙ্গার সময়ে যে অশুভ শক্তি প্রাবল্য লাভ করেছিল, সাধারণ মুসলমানের অন্তরস্থ সৎ এবং অসতের মধ্যে অসৎকে লোভ বা ক্রোধের

উস্কানিতে প্রবল ক'রে যারা হিন্দুর অনিষ্টসাধন করেছিল, সত্যাগ্রহের ফলে সতের যখন শক্তিবৃদ্ধি হবে, তারা তখন সাধারণ মুসলমানের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ ক্রূর স্বার্থান্বেষী গুণ্ডাদের হৃদয় সদ্য সদ্য পরিবর্তিত না হ'লেও, যে বলের সুযোগ নিয়ে তারা ব্যাপকভাবে কার্যসিদ্ধি করে, সেটা আর সম্ভব হবে না; তারা কোণঠাসা হয়ে যাবে। মোটের উপর সত্যাগ্রহীদের বীর্যের প্রভাবে সতের ব্যাপ্তি এবং অসতের সঙ্কোচ সাধন হবে। ফলত সত্যাগ্রহী সফলকাম হবেন।

পাঠক। তর্কের দিক দিয়ে আপনার মতের যৌক্তিকতা স্বীকার হয়তো করতে পারি। কিন্তু কোথাও এ রকম ঘটেছে বলতে পারেন? নোয়াখালিতে গান্ধীজীর চারমাসব্যাপী চেষ্টায় কি আশানুরূপ ফল লাভ হয়েছিল?

লেখক। না, নোয়াখালিতে গান্ধীজীর আশানুরূপ ফললাভ হয় নি সে কথা সত্য। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ দিনের পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসহযোগ অথবা দ্বন্দ্ব চার মাসের চিকিৎসাতেই মাত্র দু-চারজন লোকের চেষ্টাতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এ কথা আশা করাই অন্যায়।

কিন্তু অহিংসার ফল যে হয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পাঠক। বলেন কি? ১৯৪২-এর আন্দোলনকে আপনি অহিংসার সাফল্য বলতে চান না কি?

লেখক। ১৯৪২-এ আমাদের মন ইংরেজের প্রতি প্রেমে পূর্ণ ছিল না—এ কথা সত্য, কিন্তু ইংরেজকে আমরা খুনও তো করি নি। গান্ধীজী সংগ্রামকে অহিংস রাখতে চান—এ কথা জেনে লোকে থানা দখল করেছে বটে, কিন্তু পুলিসের পরিত্যক্ত অস্ত্র ব্যবহার না ক'রে পুকুরে ফেলে দিয়েছে বা ভেঙে ফেলেছে। মোটের উপর, আচরণে তারা সংযত ছিল। দু-এক জায়গায় অসম্ভব অত্যাচারী রাজকর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত ক্রোধ বা প্রতিহিংসা বশত তাদের খুনও করেছে। কিন্তু ইংরেজকে জাতি হিসাবে বিপন্ন করে নি।

১৯২১, ১৯৩১-৩৩, ১৯৪১-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ব্যক্তিগত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়ে আমাদের নেতা গান্ধীজী বারংবার ইংরেজকে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন যে, আমরা স্বাধীনতাকে ভালবাসি ব'লেই আমরা মরণকে আহ্বান করছি। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা আমাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। ফলে ১৯৪৫ এর পর যখন আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হ'ল যে, ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে, তখন ইংলণ্ডের মধ্যে এক বৃহৎ দলকে পাওয়া গেল যারা ভারতের স্বাধীনতার দাবিকেও সমর্থন করেছিল। বিশ-পঁচিশ বছরের মোটামুটি অহিংস আচরণের ফলে ইংলণ্ডেও আমরা ভারতের দাবির সমর্থক একটা দল সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। হিংসার অস্ত্র ধারণ করলে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে ভারতের দাবির সমর্থক অতবড় দল পাওয়া যেত না।

পাঠক। ভারতের বহু লোক যে ব'লে থাকেন, আই. এন. এ.-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই ইংরেজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এটা কি আপনি স্বীকার করেন না?

লেখক। আই.এন.এ.র কোনও ফল হয় নি—আমি এমন কথা বলি না। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চালানোর পর যখন সন্ধি হ'ল, তখন ইংরেজ সৈনিকেরা রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বাড়ি ফেরবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে। ভারতের সেনাবিভাগেও আই.এন.এ.-র ইতিহাস শুনে বিদ্রোহের মনোভাব ধূমায়িত হচ্ছিল। ইংরেজ হয়তো ভাবলেন, এ অবস্থায় সাম্রাজ্যরক্ষা আর ভারতীয় সৈনিকের দ্বারা সম্ভব হবে না বা অত্যন্ত অনিশ্চিত হবে; ক্লান্ত ইংরেজ সৈনিকের মধ্যেও সাম্রাজ্য রক্ষার আগ্রহ বেশি থাকবে না। সর্বোপরি ১৯৪২ সালে দারুণ বিরোধিতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সর্ববিধ চেষ্টাকে পরাস্ত করে, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রুশিয়ার সমর্থন ব্যতিরেকে পরাজয় অতিসম্ভব জেনেও যখন কংগ্রেস আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তখন ১৯৪৫-এর রণক্লান্ত পৃথিবীতে সেই প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে

না—এই সব ভেবে-চিন্তেই হয়তো ইংরেজ মানে মানে বিদায় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করেছিলেন।

পাঠক। তা হ'লে ভারতের মুক্তি শুধু অহিংস অসহযোগের শক্তিতে ঘটে নি—এ কথা আপনিও স্বীকার করছেন।

লেখক। তাতে সন্দেহ কি! পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখন সে কেবল নিজের হিংসাস্ত্রের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছে, এমন তো শুনি নি। বহু ঘটনার সংমিশ্রণে রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবং সেই সকল ঘটনা পরম্পরার মধ্যে অহিংস সংগ্রামশক্তি ১৯২১ থেকে পঁচিশ বৎসর ধ'রে এক দিকে যেমন ভারতের জনগণকে শক্তিশালী করেছিল, অপর দিকে ইংরেজ জাতির হৃদয়ের মধ্যে সৎভাবের উন্মেষ এবং পরিপোষণ যে ভাবে করেছিল, তাও তো বড় কম কথা নয়। তার দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভ যে আরও সহজ হয়েছিল—এ কথা কি আপনি অস্বীকার করবেন?

পাঠক। তা হ'লে আপনি কি বলতে চান, মানুষের মধ্যে ভাল বুদ্ধিকে জাগ্রত ক'রেই আমরা সর্বদা বিপ্লবসাধনের চেষ্টা করব?

লেখক। আপনি যথার্থ বলেছেন। মঙ্গলের পথকে আশ্রয় ক'রেই বিপ্লবসাধন করা উচিত ব'লে আমরা মনে করি।

পাঠক। দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্যে মানুষের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে, তাকে কাজে লাগানোয় ক্ষতি কি? কাঁটা দিয়েই যদি তাড়াতাড়ি কাঁটা তোলা যায়, তা হ'লে অন্য চেষ্টায় দরকার কি? আমাদের কাঁটা তোলাই যদি লক্ষ্য হয়, তা হ'লে যাতে কাঁটা তাড়াতাড়ি তোলা যায় সেই তো ভাল পথ।

লেখক। আমরা তা মনে করি না। ধনীশ্রেণী লোভ, অহঙ্কার ও শক্তির মত্ততায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করেছে, তাকে ভাঙবার জন্য আপনারা অত্যাচারিত মানুষের অন্তরে ক্রোধ প্রতিহিংসা প্রভৃতির ভাবকে জাগিয়ে বাতাস দিয়ে সেই আগুনকে আরও বাড়িয়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ভস্মীভূত করতে চান। কিন্তু কার্যসিদ্ধির তাগিদে মানুষের অন্তরের রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলি যখন

পুষ্টিলাভ করে, ভবিষ্যতের সমাজগঠন সময়ে তারাই আবার নানা নতুন অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। সেই সম্ভাবনা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। সেই জন্য শুভ-আদর্শে পৌছনোর উদ্দেশ্যে আমরা শুভ উপায়ের সন্ধান ক'রে থাকি।

পাঠক। কিন্তু শুভ উপায়ের দ্বারা শুভ ফললাভের ইতিহাস রাজনীতিক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। তবু, আপনারা অন্য প্রমাণিত পথ পরিহার ক'রে চলবেন ?

লেখক। হিংসার যে পথকে আপনি আপাতত সার্থক ব'লে মনে করছেন, সূক্ষ্ম বিচারে তার মধ্যে আমরা এত গ্লানি দেখতে পাই যে, নূতন পরীক্ষা করতে আমরা পশ্চাৎপদ হই না।

গান্ধীজীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি সমষ্টির ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য জগতের বৃহত্তম পরীক্ষা করেছিলেন। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার বেলায় অহিংসার নূতন নূতন পথ বা প্রয়োগকৌশল হয়তো আবিষ্কার করতে হবে। তাতে সময় লাগবে, মানুষকে অনেক নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। কিন্তু অহিংসা শুভদায়ক ব'লে, মানুষের চিত্তের উন্নতিবিধান এবং শুভের উদয় এই পথে দ্রুত সম্ভব ব'লে সত্যাগ্রহকেই গান্ধীজী শ্রেষ্ঠতম পথ বলতেন।

পাঠক। যদি ধ'রেই নিই যে অহিংসায় সাফল্য লাভ হয়, তবু কি এ পথকে আপনারা অনাবশ্যক রকম দীর্ঘ ব'লে মনে করেন না ?

লেখক। আপাতত দীর্ঘ ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু পথের ফল নিশ্চিত লাভ হয় ব'লে অনিশ্চয়াক্রান্ত হিংসার পথ অপেক্ষা সত্যই অহিংসা দ্রুত সিদ্ধিদান করে। স্বরাজ লাভের পথে গড়ার কাজ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চলে ব'লে 'আগে ভাঙা পরে গড়ার' পথের চেয়ে 'গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙার' পথ ভাল। দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে হিংসা প্রিয়তর বা আপাতত স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'লেও শ্রেয় নয়। শ্রেয়কে আশ্রয় করলে মঙ্গললাভ নিশ্চয়ই ঘটবে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ

শ্রীনির্মলকুমার বসু

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগ্‌লা-গারদে অবস্থানকালে রচিত)

আদম ও ইভ

হে আদি জনক আদম এবং আদি জননী ইভ !
যদি না করতে আদি জনন সেই আদিম স্বর্গোদ্যানে,
তা হ'লে তোমাদের উদ্দেশে আমার এই গদ্য-কবিতা
লেখার প্রয়োজন হ'ত না। আর তাই হয় তো ভাল ছিল।
হে আদি মানব, হে আদি মানবী !
তোমাদের দুটি আদিম জীবনের মিলন-উৎস থেকে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে
ব'য়ে চলেছে অনন্ত জীবন-স্রোত।
পৃথিবী-জোড়া আজ আমরা—তোমার কোটি কোটি বংশধর—
হে আদম, তোমার বংশ ধারণ করছি
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে,
দুনিয়ার ইস্‌লামী বেহেস্ত পাকিস্তানে,
ডলার-তীর্থ আমেরিকায়, সাদালাঞ্ছিত কালো আফ্রিকায়,
সাম্যবাদের লীলাভূমি লেনিন-স্তালিনের রাশ্যায়,
শুঁফো হাসিমুখ অ্যাটলির দেশে,
আরো কত জানা আর না-জানা ছোট-বড় জায়গায়।
এই কোটি কোটি আমাদের অস্তিত্বের একেবারে আদি মূলে
তোমরা দুজন আদি দম্পতি—আদম আর ইভ।

জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খেয়ে যে ভুল করেছিলে,
সে ভুলের মাশুল আমরা দিয়ে চলেছি
দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।
তোমাদের দুজনের রক্ত বইছে আমাদের সবার ধমনীতে।
সুতরাং স্তালিন, ট্রুম্যান, অ্যাটলি, লিয়াকৎ আলি খান,
পণ্ডিত জবাহরলাল, মাও-ৎসে-তুং, চিয়াং-কাই-শেক,

হিরোহিতো, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ম্যাক আর্থার…
এরা সবাই রক্তুতো ভাই।
তবু আজ বিশ্ব জুড়ে এত রক্তারক্তি!
বিশ্বকবির ভাষায় "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী!"

আজ বনছে না স্তালিনে আর ট্রুম্যানে—
কোরিয়ার ব্যাপার নিয়ে।
কাশ্মীর নিয়ে চলেছে মনান্তর
জবাহরে আর লিয়াকতে।
অথচ এদের সবারই মূলে এক পূর্বপুরুষ, এক পূর্বরমণী—
তোমরা দুজন, হে আদম, হে ইভ!

যদি বেধে যায় তিন নম্বর বিশ্ব-লড়াই, হে আদিপিতা আদম,
তা হ'লে তোমারি বংশধর ধ্বংস করবে তোমারি বংশধরকে
বীভৎস বৈজ্ঞানিক বর্বরতায়।

বিদেহী বিদেহিনী হে আদম ইভ!
দেহ তোমাদের নেই, কিন্তু আত্মিকরূপে তোমরা কি
ঘুরে ঘুরে দেখতে পাচ্ছ দুনিয়ার হালচাল?
আফসোস বা অনুতাপ করছ কি এই ভেবে:

"হায়, কেন খেয়েছিলাম
স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফল?"
তা হ'লে শোন আদম, শোন ইভ,
বিধাতা যদি হঠাৎ কখনো ক্ষেপে গিয়ে
"দুত্তোর" ব'লে সময়ের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
তোমাদের দুজনকে ফের ফিরিয়ে নিয়ে যায়
তোমাদের দুজনের দেহে, আবার সেই স্বর্গোদ্যানে,
অর্থাৎ আবার যদি সুযোগ পাও

সব কিছু প্রথম থেকে শুরু করার,
তা হ'লে—দোহাই তোমাদের—
এবারে আর যেন ভুলেও খেয়ো না
বা চেখেও দেখো না
জ্ঞানবৃক্ষের সেই সর্বনেশে নিষিদ্ধ ফল।

পাঁঠা

ঝুলে আছে পাঁঠা মুণ্ডুবিহীন, ছাড়ানো গায়ের ছাল,
হুক থেকে সারে সারে
কসাই-দোকানে, বাজারের এক ধারে।
নীচে জ'মে আছে হেথায় হোথায়
বে-ধড় মুণ্ডু, কে জানে কোথায়
সবুজ ঘাসের স্বপন তাহারা শেষ দেখেছিল চোখে!
জানি না কাঁদিছে কত না ছাগল এই পাঁঠাদের শোকে!

ছাওয়া হবে কত তবলা ও বাঁয়া, মৃদঙ্গ পাখোয়াজ
এদেরি ছাড়ানো ছালের চর্মে—মনে মনে ভাবি আজ—
ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল,
শুনে শুনে হবে চক্ষু সজল,
সঙ্গত সাথে সঙ্গীত শুনে পড়বে কি কারো মনে
এরি তরে পাঁঠা আপন পরাণ দিয়েছিল কোন ক্ষণে?

পাঁঠা-মাংসাশী লোলুপ মানুষ ঝুড়ি আর ঝুলি হাতে
সারি সারি দেখি খাড়া—
আছে অনেকের অফিসে যাবার তাড়া।
এ ধারে দাঁড়ায়ে আমি তাড়াহীন কবি
দেখি আঁখি মেলে শ্রেষ্ঠ জীবের এই চরিত্র-ছবি।
এবং মনে মনে বলি, হে পাঁঠা!
আমার এ সম্বোধন কোনো বিশেষ পাঁঠাকে

ব্যক্তিগতভাবে নয়,
বিশ্বের পাঁঠা জাতিকে ডেকে বলছি, হে পাঁঠা !
তোমাদের কেটে টুক্‌রো টুকরো করে,
সেদ্ধ ক'রে নুন আর মশলা মিশিয়ে খেতে
মানুষকে কে দিয়েছে অধিকার ?
হে কৃষ্ণচর্ম কৃষ্ণের জীব !

তারপর বোষ্টমদের কথা ভাব।
তারা, হে পাঁঠা, তোমার মাংস খায় না।
(মানে, সাধারণত খায় না,
কিন্তু একবার খাওয়া ধরলে অবশ্য……)
কিন্তু তাদের শ্রীখোলে তোমারি চামড়ার ছাউনি।

তারপর জুতো……… !
তোমাদের কচি চামড়ার জুতো প'রে আরাম, পরিয়ে আরাম।
তোমরা এত চামড়া দাও ব'লেই তো
এ জুতো আমরা পরতে আর পরাতে পারি।
আর এও আমি ব'লে রাখছি হে পাঁঠা !
তোমাদের ঘেসো বুদ্ধি ভুলে যদি হয়ে ওঠ চালাক ;
যদি তোমাদের হাতে আসে শক্তি আর ধারালো হাতিয়ার,
তা হ'লে যে মানুষ আজ তোমায় কেটে খাচ্ছে,
তোমার চামড়ায় পরছে জুতো,
সঙ্গীত-চর্চা করছে তোমার চামড়ায় ছাওয়া
সঙ্গত-যন্ত্রের মাথায় চাঁটি মেরে—
তুমিও সেই মানুষ কেটে ডিনার খাবে,
পায়ে পরবে পরাবে তারি চামড়ার জুতো,
আর তারি চামড়ায় ছাওয়া তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ সঙ্গতে
গাইবে পাঁঠাই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল,
অথবা হয়তো রাগপ্রধান বা আধুনিক।

অ. কৃ. ব

৩২

প্রতুলকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সমরেশ। শহরের বাইরে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর প্রতুল কি রকম যেন হয়ে গেছে। রাতদিন নিঝুম হয়ে ব'সে থাকে আর ভাবে। বাইরের খোলা হাওয়ায় ওর মনের গুমট ভাবটা একটু যদি হালকা হয়ে ওঠে, এই জন্যে সে প্রতুলকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ বেড়িয়ে নানা রকমের আলাপ-আলোচনা ক'রে রাত প্রায় নটায় ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সমরেশ বাড়ি ফিরছিল। তিনুদের বাড়ির সামনে দেখলে, তপনের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনুদের বাড়িতে ঢুকল সমরেশ। বারান্দায় মজলিস চলছে। একটা শতরঞ্জির উপর ব'সে আছেন গুণেনবাবু; সাজগোজ করেছেন প্রচুর। পরেছেন কোঁচানো মিহি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতে নূতন তৈরি সোনার বোতাম। মুখে চুলে প্রসাধনের পালিশ। আশীর্বাদ যেন ওঁর ভাবী জামাতার নয়, ওঁরই। সামনে শতরঞ্জির উপর আশীর্বাদের নানা উপহার-দ্রব্য—ধুতি, চাদর, গরদের পাঞ্জাবি, রুমাল, তোয়ালে, সাবান, তেল, সেণ্ট, পাউডার ইত্যাদি। একটি ভেলভেটের কেসে এক সেট সোনার বোতাম। এক পাশে ব'সে আছেন সমরেশের মা। গুণেনবাবু এক-একটি ক'রে জিনিস মাকে দেখাচ্ছেন, আর একটা বড় নতুন চামড়ার স্যুটকেসে তুলছেন। সামনে মেঝের উপর দুটো মাটির হাঁড়ি বসানো রয়েছে। হাঁড়ি দুটোতে মিষ্টি আছে। জামাই-বাড়ির জন্যে কলকাতা থেকে কিনে এনেছেন গুণেনবাবু।

তিনুও সাজগোজ করেছে। পরেছে দুধের মত সাদা, সবুজ চ্যাটাই-পাড় গরদের শাড়ি, গরদের ব্লাউস, হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার। লতুও যথোচিত সাজগোজ করেছে। একপাশে ইজি-চেয়ারে ব'সে আছেন মহেশবাবু। উনিও সেজেছেন। পরেছেন ধোপদস্ত ধুতি, সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, বুক-পকেটে ঘড়ি ও বুকের উপর রূপোর চেন; পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো; হাতে লাঠি—মাথাটি রূপো দিয়ে বাঁধানো। সেজেছে হাঁদা। পরেছে ফুলপাড়

ঠাকুর ফিরে এল। মা বললেন সমরেশকে, তুই কি এখন বাড়ি যাবি ?

সমরেশ বললে, যাচ্ছি একটু পরে।

মা বললেন, ও ঠাকুর! আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে চল দেখি।

ঠাকুরের সঙ্গে মা চ'লে গেলেন।

লতু বললে, ভোঁদু মামা ভারি একগুঁয়ে কিন্তু। দাদু মিছে বলেন নি।

সমরেশ উঠে ব'সে বললে, ধমকাবার একটি লোক বাড়ল দেখছি।

লতু লজ্জিত মুখে বললে, ওমা! আমি আবার ধমকালাম কখন ?

সমরেশ বললে, একজনের ধমকে সায় দিলেই ধমকানো হ'ল!

লতু বলল, বাঃ রে!

কৃত্রিম ক্ষোভের স্বরে সমরেশ বললে, তোমার না হয় বিয়েই হচ্ছে! তা ব'লে মামাকে ধমক দেবে ?

লতু কাঁদ কাঁদ স্বরে তিলুকে বললে, হ্যাঁ মাসী, আমি ধমকালাম ?

সমরেশ বললে, দেখ লতু, তুমি ধমকেছ। এ কথা অস্বীকার ক'রো না। তোমার মাসীকে সাক্ষী মানছ কি ? ও এ অপরাধে কম অপরাধী নয়। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবার জন্যে প্রস্তুত। যদি একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে পার।

তিলু বললে, নেমন্তন্ন খাবার জন্যে সেজে গুজে ব'সে আছি আমরা। প্রায়শ্চিত্ত-টায়শ্চিত্ত কেউ করতে পারব না এখন।

আবার এলিয়ে শুয়ে প'ড়ে সমরেশ বললে, তা হ'লে আর কথা কি!

লতু বললে, খুব শক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হয় তো—

সমরেশ আবার সোজা হয়ে ব'সে বললে, মোটেই শক্ত না, অত্যন্ত সোজা।

তিলু বললে, চা খাবার চেষ্টা তো ? তুমি দেখছি কাকাবাবুকেও হার মানাবে শেষে। এই চিনির অবস্থা। অত চা খেলে তো সর্বনাশ!

সমরেশ বললে, আজ চার দিন পরে এক কাপ চা খেতে চেয়েছি, তাতেই সর্বনাশ!

তিলু বললে, না, না, এখন চা কেউ করতে পারবে না। সেজে গুজে ব'সে আছি দেখছ।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, তা তো দেখছি। লতুর বরের আজ আশীর্বাদ। হবু শ্বশুর-বাড়িতে নেমন্তন্নে চলেছে। ওর সাজাগোজার কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি মেয়ের মাসী হয়ে অত গরদ চড়িয়েছ কেন?

লতু রান্নাঘরের দিকে চলল। সমরেশ পুলকিত স্বরে বললে, চললে নাকি চা চড়াতে?

লতু বললে, যাব না? যা রেগে গেছেন আপনি!

তিলু বললে, জলটা চড়িয়ে দে। ঠাকুর এসে চা ক'রে দেবে এখন।

সমরেশ বললে, আমি তো বাড়িতে ঢুকে তোমার আর জামাইবাবুর সাজগোজের বাহার দেখে, আর কাকাবাবুকে আর মাকে ভবিষ্যুক্ত হয়ে ব'সে থাকতে দেখে ভাবলাম, তোমাদেরই আশীর্বাদ বোধ হয়।

তিলু বললে, তার বিশেষ দেরিও নেই।

সভয়ে সমরেশ ব'লে উঠল, তাই নাকি?

তিলু বললে, হ্যাঁ, তাই। আজ কাকাবাবু দুপুর থেকে আমাকে কত বোঝাচ্ছিলেন। জামাইবাবু নাকি আবার বিয়ে করবেন বলেছেন এবং আমাকেই পছন্দ করেছেন। কাকাবাবুর এতে খুব মত দেখলাম।

সমরেশ বললে, মেয়ে আর মেয়ের মাসী এক হাড়কাঠেই বলি হবে নাকি?

তিলু ভর্ৎসনার সুরে বললে, ছিঃ, ওসব কি কথা! আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে বল, কিন্তু লতুর সম্বন্ধে ওসব কথা বলা সাজে না তোমার। মা-মরা মেয়ে। আমাদের সবাইয়ের ওর কল্যাণ কামনা করা উচিত।

সমরেশ লজ্জিত হয়ে বললে, কল্যাণ কামনা করছি বইকি। শুধু লতুর নয়, তোমারও। লতু সুখী হোক, তুমিও সুখী হও। কিন্তু মেয়েদের বিয়েকে, বিশেষ ক'রে হিন্দু মেয়েদের বিয়েকে কি বলির সঙ্গে তুলনা করা যায় না? বিয়ের পরে কজন মেয়ের স্বাধীন সত্তা বেঁচে থাকে বল?

ঠাকুর ফিরে এল। মা বললেন সমরেশকে, তুই কি এখন বাড়ি যাবি?

সমরেশ বললে, যাচ্ছি একটু পরে।

মা বললেন, ও ঠাকুর! আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে চল দেখি।

ঠাকুরের সঙ্গে মা চ'লে গেলেন।

লতু বললে, ভোঁদু মামা ভারি একগুঁয়ে কিন্তু। দাদু মিছে বলেন নি।

সমরেশ উঠে ব'সে বললে, ধমকাবার একটি লোক বাড়ল দেখছি।

লতু লজ্জিত মুখে বললে, ওমা! আমি আবার ধমকালাম কখন?

সমরেশ বললে, একজনের ধমকে সায় দিলেই ধমকানো হ'ল!

লতু বলল, বাঃ রে!

কৃত্রিম ক্ষোভের স্বরে সমরেশ বললে, তোমার না হয় বিয়েই হচ্ছে! তা ব'লে মামাকে ধমক দেবে?

লতু কাঁদ কাঁদ স্বরে তিলুকে বললে, হ্যাঁ মাসী, আমি ধমকালাম?

সমরেশ বললে, দেখ লতু, তুমি ধমকেছ। এ কথা অস্বীকার ক'রো না। তোমার মাসীকে সাক্ষী মানছ কি? ও এ অপরাধে কম অপরাধী নয়। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবার জন্যে প্রস্তুত। যদি একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে পার।

তিলু বললে, নেমন্তন্ন খাবার জন্যে সেজে গুজে ব'সে আছি আমরা। প্রায়শ্চিত্ত-টায়শ্চিত্ত কেউ করতে পারব না এখন।

আবার এলিয়ে শুয়ে প'ড়ে সমরেশ বললে, তা হ'লে আর কথা কি!

লতু বললে, খুব শক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হয় তো—

সমরেশ আবার সোজা হয়ে ব'সে বললে, মোটেই শক্ত না, অত্যন্ত সোজা।

তিলু বললে, চা খাবার চেষ্টা তো? তুমি দেখছি কাকাবাবুকেও হার মানাবে শেষে। এই চিনির অবস্থা। অত চা খেলে তো সর্বনাশ!

সমরেশ বললে, আজ চার দিন পরে এক কাপ চা খেতে চেয়েছি, তাতেই সর্বনাশ!

তিলু বললে, না, না, এখন চা কেউ করতে পারবে না। সেজে গুজে ব'সে আছি দেখছ।

সমরেশ মুচকি হেসে বললে, তা তো দেখছি। লতুর বরের আজ আশীর্বাদ। হবু শ্বশুর-বাড়িতে নেমন্তন্নে চলেছে। ওর সাজাগোজার কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি মেয়ের মাসী হয়ে অত গরদ চড়িয়েছ কেন?

লতু রান্নাঘরের দিকে চলল। সমরেশ পুলকিত স্বরে বললে, চললে নাকি চা চড়াতে?

লতু বললে, যাব না? যা রেগে গেছেন আপনি!

তিলু বললে, জলটা চড়িয়ে দে। ঠাকুর এসে চা ক'রে দেবে এখন।

সমরেশ বললে, আমি তো বাড়িতে ঢুকে তোমার আর জামাইবাবুর সাজগোজের বাহার দেখে, আর কাকাবাবুকে আর মাকে ভক্তিযুক্ত হয়ে ব'সে থাকতে দেখে ভাবলাম, তোমাদেরই আশীর্বাদ বোধ হয়।

তিলু বললে, তার বিশেষ দেরিও নেই।

সভয়ে সমরেশ ব'লে উঠল, তাই নাকি?

তিলু বললে, হ্যাঁ, তাই। আজ কাকাবাবু দুপুর থেকে আমাকে কত বোঝাচ্ছিলেন। জামাইবাবু নাকি আবার বিয়ে করবেন বলেছেন এবং আমাকেই পছন্দ করেছেন। কাকাবাবুর এতে খুব মত দেখলাম।

সমরেশ বললে, মেয়ে আর মেয়ের মাসী এক হাড়কাঠেই বলি হবে নাকি?

তিলু ভর্ৎসনার সুরে বললে, ছিঃ, ওসব কি কথা! আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে বল, কিন্তু লতুর সম্বন্ধে ওসব কথা বলা সাজে না তোমার। মা-মরা মেয়ে। আমাদের সবাইয়ের ওর কল্যাণ কামনা করা উচিত।

সমরেশ লজ্জিত হয়ে বললে, কল্যাণ কামনা করছি বইকি। শুধু লতুর নয়, তোমারও। লতু সুখী হোক, তুমিও সুখী হও। কিন্তু মেয়েদের বিয়েকে, বিশেষ ক'রে হিন্দু মেয়েদের বিয়েকে কি বলির সঙ্গে তুলনা করা যায় না? বিয়ের পরে কজন মেয়ের স্বাধীন সত্তা বেঁচে থাকে বল?

তিলু বললে, কাকাবাবু মিছে কথা বলেন নি। তুমি হাঁদারামই বটে।

সমরেশ বললে, গালাগালি দিতে হয় তো মৌলিক ভাবে দাও। কাকাবাবুর নজির টেনো না।

ঠাকুর ফিরে এল। তিলু বললে, দাদাবাবুর জন্যে এক কাপ চা ক'রে দাও দেখি। খাবার-টাবার নেই কিন্তু বাড়িতে। নেমন্তন্ন আছে বাড়িশুদ্ধু লোকের।

একটু হেসে বললে, গেলেই হ'ত। দুটো ভাল-মন্দ খেয়ে আসতে।

সমরেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, পথের কুকুর ভেবেছ নাকি আমাকে? খাবারের গন্ধ পেলেই ছুটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিব বার ক'রে নাল ফেলতে থাকব?

তিলু অপ্রতিভ হয়ে বললে, তাই বলছি নাকি? আজকাল কথায় কথায় রেগে যাও যে!

সমরেশ চুপ ক'রে রইল। তিলু বললে, আমার কি দোষ? জামাইবাবু বেচারা কত চেষ্টা করছেন, দিনরাত কত তোষামোদী করছেন, কত লোভ দেখাচ্ছেন, কত উপহার দিচ্ছেন! এই তো সেদিন সেই ভাল শাড়িটা দিলেন; সেটা পরতে দেখে রাগে অভিমানে নাক-মুখ ফুলিয়ে কোলা ব্যাঙ ক'রে তুলেছিলে। এইবার আশীর্বাদ করতে যাবার জন্যে গরদের শাড়ি ব্লাউস কিনে এনেছেন আমার জন্যে কলকাতা থেকে। লতুর বিয়েতে নাকি হাল-ফ্যাশানের সোনার হার কিনে দেবেন মেয়ের মাসীকে। তুমি তো কোনদিন একটা রুমাল পর্যন্ত কিনে দাও নি আমাকে, সোনা-দানা দূরে থাক্।

সমরেশ বললে, নিজের হাতে কাটা সুতোর খদ্দরের শাড়ি পাঠিয়ে দিই নি জেল থেকে?

তিলু হেসে ফেলে বললে, দিয়েছিলে বটে। তাও তো সরকারের পয়সায়।

সমরেশ বললে, নিজের পয়সা না থাকলে কি করব? ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

তিলু মুচকি হেসে বললে, একেবারে হাপর চালাতে শুরু করলে যে!

সমরেশ চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে রইল।

তিলু বললে, মূর্ছা গেলে নাকি?

সমরেশ উঠে বসে বললে, না।

হঠাৎ মোটরের হর্ন বেজে উঠল। সমরেশ বললে, তোমাদের গাড়ি এল বোধ হয়। চা যদি না হয়েছে তো থাক্, আমি চলি।—ব'লে উঠে দাঁড়াতেই তিলু বললে, বেশ লোক তো! দেখলে লতু বেচারা চা করতে গেছে আর না খেয়ে চ'লে যাবে? আমার ওপর রাগ ক্ষোভ যা হবার হতে পারে; লতুর দোষ কি?

লতু চা নিয়ে এল। সমরেশকে দিয়ে বললে, কি, ক্ষমা করলেন তো?

সমরেশ ব'সে প'ড়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, একশো বার। আশীর্বাদও করছি, যে বাড়িতে যাবার সূচনা আজ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে সুখী হও, সার্থক হও।

লতু মুখ লাল ক'রে বললে, বাবা! এর মধ্যে বিদায়ের আশীর্বাদ শুরু ক'রে দিলেন যে!

তিলু বললে, লতু, মুখটায় ঘাম দিয়েছে। আর একবার সাবান দিয়ে ধুয়ে যা।

লতু চ'লে গেল। সমরেশ নীরবে চা খেতে লাগল। শৈলীর কথা ভাবছিল সে। আহা! বেচারী মেয়েটা!

তিলু বললে, কি ভাবছ? পেঁচার মত গম্ভীর হয়ে উঠলে যে?

সমরেশ বললে, তোমার জামাইবাবুর মত ফুর্তির ফোয়ারা কোথায় পাব?

তিলু বললে, তোমার আবার অভাব কি? প্রতুলের বোন—

বাধা দিয়ে সমরেশ বললে, ও কথা বাদ দাও।

তাড়াতাড়ি চা শেষ ক'রে উঠে বললে, আচ্ছা, চলি তা হ'লে। ব'লেই কতকটা এগিয়ে যেতেই তিলু ব'লে উঠল, ভোঁদু, শোন।

সমরেশ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললে, কি?

তিলু এগিয়ে গিয়ে বললে, রাগ করলে নাকি? কণ্ঠস্বরে অনুতাপের

আমেজ। সমরেশ হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, না, না, রাগ কিসের! ব'লে চ'লে গেল।

৩৩

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রে একটা গুরুতর ঘটনা ঘ'টে গেল।

সেদিন খুব সম্ভব পূর্ণিমা।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। রাধাদের বাড়ির উঠোনে একটা মাদুর পেতে ব'সে চাঁদের আলোতে পদ্মা ও রাধা বিঁড়ি বাঁধছিল। মাধবের বাড়ি ফিরতে প্রায়ই অনেক রাত হয়। ডাক্তার যদি কোনদিন দূরে কোন গ্রামে যান, সেদিন হয়তো বাড়িই ফিরতে পারে না। যতক্ষণ মাধব ফিরে না আসে পদ্মা রাধার কাছে থাকে। পদ্মার বাড়ি রাধার বাড়ির কাছেই। সন্ধ্যার পরেই মেয়েকে আর মাকে খাইয়ে দিয়ে নিজের খাওয়া সেরে রাধার বাড়িতে আসে। দুজনে ব'সে ব'সে বিড়ি বাঁধে। এতে তাদের মাসে মাসে কিছু আয় হয়।

দুজনে বিড়ি বাঁধছিল। মাঝে মাঝে নানা রকমের গল্প করছিল। নিষুতি রাত। পাড়াটা থমথম করছে। এ পাড়ার পুরুষদের তো রাত্রি দশটার পর কারও হুঁশ থাকে না। ভাটিখানা থেকে ফিরে কিছুক্ষণ মাতামাতি দাপাদাপি করে, তারপর যে যেখানে পারে লুটিয়ে পড়ে, আর পড়তে পড়তেই ঘুমে পাথর হয়ে যায়। কেরোসিন দুর্লভ। মেয়েরা লম্প জ্বালিয়ে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। অবশ্যি যে সব যুবতী মেয়ে নিশাচরী, তাদের কথা আলাদা। তারা জেগে থাকে। পাড়ার এক প্রান্তে যে খাবারের দোকানটা আছে, তার কাছে ঘুরে বেড়ায় শিকারের খোঁজে। হাসি-কাশি, ছলা-কলার শর হানতে থাকে নির্বিচারে; কাউকে ঘায়েল করতে পারলে তাকে টেনে এনে ঘরে ঢোকায়। তাদের হাসি ও কথাবার্তার শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায়। রাধা ও পদ্মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কথা বলে।

দুজনেরই জীবন বদলে গেছে। যে পথে চলা আরম্ভ করেছিল, সে পথ ছেড়ে নূতন পথে চলতে শুরু করেছে। তারাও যে মানুষ, মানুষের মত বাঁচবার তাদেরও যে অধিকার আছে, এটা তারা

জেনেছে ; অপরিচ্ছন্ন, অসংযত জীবন যাপনে এসেছে অশ্রদ্ধা। তাদের সমাজের অন্যান্য মেয়েদের এ পথে টেনে আনতে তারা চেষ্টা করেছে অনেক, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। পঙ্কের মধ্যেই জন্মেছে তারা, পঙ্কের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে এতদিন, পঙ্কিল পরিবেশের প্রতি জন্মেছে প্রসক্তি। পঙ্কের মধ্যে জন্মেও পঙ্কজিনী হয়ে ওঠবার সুযোগ সমাজ তাদের কোনদিন দেয় নি। তাদের জাতির মেয়ে-পুরুষ দেহ দিয়ে সর্বপ্রকারে সমাজের সেবা করেছে চিরদিন, পরিবর্তে পেয়েছে অবহেলা, অবিচার, অবজ্ঞা ও অত্যাচার। অসুবিধায় পড়লে সমাজের উঁচু জাতিরা তাদের সুবিধা দেবার কথা বলে, বিপদে পড়লে তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা বাঁচবার জন্মে উদারতায় উথলে ওঠে, যেমন আজকাল মুসলমানদের ভয়ে তারা তাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে উঠেছে রাতারাতি, কিন্তু অসুবিধা ও বিপদ স'রে যাবামাত্র সে কথা তাদের মনে থাকে না। মনে পড়িয়ে দিলে, কড়া চোখ দেখিয়ে বিদায় ক'রে দেয়। এই চিরদিন হয়ে এসেছে, হয়তো এই চলতে থাকবে চিরদিন ধ'রে। স্বাধীনতার সূর্য উঠবে দেশের আকাশে, তার আলো তাদের জীবনে পড়বে কি না, ভগবানই জানেন।

ঠিক এই ধরনের কথা তারা ভাবছিল না হয়তো। তবু প্রতুল ও ভক্তির কাছে তারা ভাবতে শিখেছে। এই ভাবনাটা তারা কারও মনে সঞ্চারিত করতে পারছে না। পাড়ার মেয়েদের কাছে কোন কথা বলতে গেলে ছি-ছি ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে তারা। বলে, হইছে লো পণ্ডিতনী! হইছে! পদী হ'ল সতী! ঢঙ দেখে আর বাঁচি নে! ডুবে ডুবে কে কোথায় জল খাচ্ছে জানতে বাকি নাই লো আমাদের। তারা যা ছিল, তা আর নেই—এ কথা তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের কোন কথায় কান দেয় না তারা। অবশ্য অন্য পাড়ার মেয়েরা তাদের কথা শোনে। তাদের মধ্যে অনেকে শুধরেছে।

দুজনে মুখ নামিয়ে কাজ করছিল। রাধা হঠাৎ পদ্মাকে কি বলতে গিয়ে মুখ তুলেই সভয়ে ব'লে উঠল, কে ?

সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে, বেড়ার আগড় খুলে কে একটা লোক ঘরে ঢুকছে। লম্বাচওড়া চেহারা, পরনে গাঢ়

সবুজ রঙের লুঙ্গি, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবি, মাথায় বড় বড়

ওমা! কি হবে গো?—ব'লে দুজনে উঠে দাঁড়াল। লোকটা এগিয়ে আসতে লাগল। পদ্মা রাধার হাত ধ'রে টান দিয়ে বললে আয়, ঘরে ঢুকে খিল দিইগে। তারা চ'লে যেতে উদ্যত হতেই লোকট কড়া গলায় হেঁকে উঠল, খবরদার! এক পা নড়বি তো, দুটোকেই খুন করব।

থমকে দাঁড়িয়ে পদ্মা ও রাধা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলোতে তারা চিন লোকটাকে। আবদুল্লা, রাধার পূর্ব প্রণয়ী। লোকটা মদ খেয়েছে চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। ঘর্মাক্ত মুখটা চাঁদের আলোতে চকচক করছে। সারা মুখে হিংস্র কামোন্মত্ত বীভৎসতা। দাঁতে দাঁ চেপে, দুই মদিরাবিহ্বল চোখের দৃষ্টি রাধার ওপরে বর্শার মত উদ্য ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আক্রমণোদ্যত বাঘের সামনে মৃগীর মত ভীতি ব্যাকুল চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল রাধা। পদ্মা মাধবের আসা আশায় বার বার ব্যাকুল চক্ষে পথের দিকে তাকাতে লাগল।

আবদুল্লা রাধাকে হাতের ইশারা ক'রে বললে, আয়।

রাধা পদ্মার হাতটা ঝাপটে ধ'রে ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, না।

লোকটা বেয়াড়া গলায় পদ্মাকে বললে, অ্যাই মাগী, তুই কি করছিস এখানে? চ'লে যা এখান থেকে।

পদ্মা কাঁপা গলায় বললে, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে বলছি না হ'লে চেঁচিয়ে লোক ডাকব।

বীভৎস হাসি হেসে লোকটা বললে, লোক ডাকবি? যা, ডে আন্‌গে তোর লোক।

হঠাৎ রেগে উঠে কুৎসিত গালি দিল পদ্মাকে। সঙ্গে সঙ্গে রাধা হাত ধ'রে টান দিতেই রাধা ছিটকে লোকটার গায়ে এসে প' 'ও মাগো!' ব'লে কেঁদে উঠল।

ঠিক এই সময়ে মাধব এসে ঢুকল। প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপর পদ্মাকে বললে, কি হয়েছে রে পদ্মা?

পদ্মা বললে, এসেছ! ওই দেখ, রাধাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আবদুল্লা সাহেব।

মাধব এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে আবদুল্লাকে সরিয়ে রাধাকে বললে, চ'লে যাও, ঘরে ঢুকে পড়গে দুজনে।

লোকটা টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সামলে দাঁড়াল। মাধব দু হাতে ঘুষি বাগিয়ে আক্রমণোদ্যত হ'ল। রাধা আর্তনাদ ক'রে ব'লে উঠল, না না, যেও না, মেরে ফেলবে তোমাকে। লোকটা ক্রুদ্ধ সাপের মত ফুঁসতে ফুঁসতে তীব্র দৃষ্টিতে মাধবের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কোমর থেকে ফস্‌ ক'রে একটা ছোরা বার ক'রে মাধবের উপর লাফিয়ে পড়ল। পদ্মা ও রাধা চীৎকার ক'রে উঠল, ওগো, কে আছ, বাঁচাও।

মাধব সতর্ক ছিল। লোকটা লাফাতেই স'রে দাঁড়াল এক পাশে। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়তেই, মাধব পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে। লোকটা গায়ের জোরে মাধবকে উল্টে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। মাধবও প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে চেপে ধ'রে ওর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ ধ'রে দুজনে ধস্তাধস্তি চলল।

প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন্য রাধা ও পদ্মা চীৎকার করতে লাগল। কারও সাড়া পর্যন্ত পাওয়া গেল না। দূরে ভদ্রলোকেরা দু-একজন চীৎকার শুনে শয্যা ত্যাগ ক'রে জানলায় এসে দাঁড়ালেন; পাড়ার পুরুষরা অঘোরে ঘুমচ্ছে, মেয়েগুলো নিজের নিজের উঠনে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ আবদুল্লা আর্তনাদ ক'রে উঠল। মাধব তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাতে তার রক্তাক্ত ছুরি। আবদুল্লা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে বার হয়ে গেল; এগিয়ে চলল মুসলমান-পাড়ার দিকে। যেতে যেতে বীভৎস কণ্ঠে চেঁচিয়ে বার বার বলতে লাগল, একদম জানসে মার দিয়া।

রক্তাক্ত ছুরিটার দিকে তাকিয়ে মাধব পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। রাধা কেঁদে উঠে বললে, এ কি করলে গো! কি হবে?

পদ্মা ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, এ কি করলে মাধব ?

মাধবের কোন সংজ্ঞা নেই। পদ্মা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, শুনছ ?

ধীরে ধীরে মাধবের সংজ্ঞা ফিরল। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে পদ্মার দিকে তাকিয়ে থেকে মাধব স্খলিত কণ্ঠে বললে, কি করি পদ্মা ?

পদ্মা বললে, রাধাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর বাড়ি পালিয়ে যাও।

মাধব বললে, এই ছুরিটা ?

পদ্মা বললে, দাও আমাকে। ছুরিটা নিয়ে ফেলে দিয়ে এল সে পুকুরে। ঘরে তালা লাগিয়ে, রাধাকে নিয়ে মাধব ডাক্তারবাবুর বাড়ি চ'লে গেল।

আধ ঘণ্টা পরেই কতকগুলো মুসলমান লাঠি সড়কি ছোরা ছুরি নিয়ে বাউরীপাড়ায় এসে পড়ল। রাধা ও মাধবকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজল ঘরে ঘরে। না পেয়ে পাড়ার পুরুষগুলোকে মারধোর করল, মেয়েদের উৎপীড়ন করল। শেষে মাধবের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে বাউরীপাড়ায় জম-জমাট জনতা। শহর ভেঙে লোক এল দেখতে, মুসলমানরা হিন্দুদের উপর কি অত্যাচার ক'রে গেছে! হিন্দু-মহাসভার পাণ্ডারা এল, পাড়ার লোকদের ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, পদ্মাকে ডাকিয়ে সব জিজ্ঞাসা করল, সকলকে সাহস দিলে, ভয় নেই তোদের; সারা হিন্দু সমাজ তোদের পেছনে। মুসলমানরা যদি আর কিছু করবার চেষ্টা করে, খবর দিস আমাদের, আমরা এসে তোদের রক্ষা করব।

দারোগাবাবু এলেন সদলবলে। রঙ্গমিনে গিয়ে সব দেখলেন, পাড়ার লোকদের ডাকিয়ে কে কি জানে জিজ্ঞাসা করলেন। পদ্মাকে ডেকে তার বক্তব্য শুনলেন। সব ডাইরিতে লিখে নিয়ে বিদায় হলেন।

মুসলিম-লীগের সেক্রেটারি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করলেন, মুসলমানের উপর হিন্দুদের এই অত্যাচারের প্রতিকার চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, সাম্প্রদায়িক নয়।

লীগ-সেক্রেটারি বললেন, হুজুর, তা নয়। এর পেছনে হিন্দুদের
ষড়যন্ত্র আছে। আপনি প্রতিকার না করলে, প্রধান মন্ত্রীর কাছে
প্রতিকার প্রার্থনা করব আমরা। তিনিও মুসলমান, এ কথাটা হুজুর
যেন স্মরণ রাখেন।

হিন্দু-মহাসভার সেক্রেটারি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে
বললেন, একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে একটা গোরা পাড়ার মেয়ে-
-মেয়ে সকলের ওপর মুসলমানরা যে অত্যাচার করেছে,
প্রতিকার চাই। সরকার যদি কোন প্রতিকার না করেন, হিন্দুরা
এর প্রতিকার করবে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁদের যথোচিত প্রতিকার হবে আশা দিলেন
কোন গোলযোগ সৃষ্টি না করতে অনুরোধ করলেন।

মুসলমানরা আবদুল্লা সাহেবের মৃতদেহ শোভাযাত্রা ক'রে
লীগের শ্লোগান দিতে দিতে গোরস্থানে নিয়ে গেল।

হিন্দু মহাসভার পাণ্ডারা সভা ডেকে বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুদের সতর্ক
হবার জন্য উপদেশ দিলে।

পুলিস সাহেব বাউরীপাড়ায় ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দিবারাত্র
পুলিস-পাহারা মোতায়েন করলেন।

মাধবকে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ধ'রে নিয়ে
পুলিস। রাধা হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগল মাটিতে লুটিয়ে
যে স্বপ্ন-সৌধ গড়েছিল এতদিন ধ'রে কল্পনার বালুভূমিতে,
মুহূর্তে ধ্বসে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

বাবু ও ডাক্তারগিন্নী রাধাকে নিজেদেরই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা
তাই সস্নেহে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন।

৩৪

কম্যুনিস্ট কর্মীদের সভা বসল, এ অবস্থায় কি কর্তব্য স্থির
। সকলেই উপস্থিত। প্রতুল শুক্তি এল। রোসেনারা এল।
নীরজা ও মৃণালিনী। নীরজা নিরুদ্দেশ। মৃণালিনী মেয়ের
বিয়ের ব্যাপারে দিবারাত্র গুণেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত।
হিমাংশু আলোচনা শুরু করল। দেশের বর্তমান হিন্দু-মুসলমান

বিরোধ, পাকিস্থান ও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কথা বললে। তাদের জন-সংগ্রাম ও জন-সংহতির ওপর এর ফলাফল আলোচনা করল। তারপর এই জেলাতে এই আন্দোলন কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে, ফলে শহরে ও গ্রামে তাদের কাজ কতদূর বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সেই কথা বললে। তারপর সেদিনকার হত্যাকাণ্ডের কথাটা আরম্ভ করল। বললে, হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বহুদিন ধ'রেই ধূমায়িত হচ্ছিল এখানে। এ ঘটনা তাতে ঘৃতসংযোগ করল। আমাদের দলের লোকেরা যে এতে জড়িত হয়ে পড়েছে, এ অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার রাধা ও পদ্মার চোখের সামনে এ ব্যাপার ঘটেছে। তারাই মুখ্য সাক্ষী। তাদের সাক্ষ্যের ওপরেই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারিত হবে। পুলিসের কাছে রাধা ও পদ্মা যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে মাধবের উত্তেজিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে। এ কথা বিবেচনা ক'রে আদালত মাধবের ওপর লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করবেন হয়তো। যা সত্য তা প্রতিষ্ঠিত হোক—এ সকলেরই কাম্য। কিন্তু এ ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছে। মুসলমানরা বলছেন, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আছে হিন্দুদের প্রতিশোধস্পৃহা। রাধার সঙ্গে আবদুল্লা সাহেবের অনেকদিন থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

একজন মুসলমান কর্মী বললে, এটা সত্যি কথা।

শুক্তি প্রতিবাদ করলে, মিথ্যে কথা। আগে যাই থাকুক, সম্প্রতি রাধা ওর স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন যাপন করছিল।

রোসেনারা বললে, তা তুমি জানলে কি ক'রে? রাধার কাছে তুমি তো সব সময় থাকতে না?

শুক্তি বললে, না থাকলেও ওর চরিত্রের যে কত পরিবর্তন হয়েছে, ওর কাজে ও কথায় তার পরিচয় পেতাম।

রোসেনারা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, কাজে ও কথায় মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাইরে ভালমানুষি ভেতরে শয়তানি, এর অভাব নেই সংসারে।

শুক্তি কি বলতে যাচ্ছিল, প্রতুল থামিয়ে দিল।

হিমাংশু বলতে লাগল, আবদুল্লা সাহেবের সঙ্গে রাধার এখনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, মাধবের মা পুলিসের কাছে বলেছে।

শুক্তি বললে, মিথ্যা বলেছে। আবদুল্লা সাহেবের বাড়িতে সে অনেক দিন থেকে ঝিয়ের কাজ করে। ওদের পরামর্শেই এ কথা বলেছে।

রোসেনারা বললে, শাশুড়ী হয়ে বউয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দিতে পারে ব'লে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না।

হিমাংশু বলতে লাগল, হিন্দুদের অনেকে নাকি এ কথা জানত। কিন্তু এ নিয়ে এতদিন কেউ মাথা ঘামায় নি। সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠতেই হিন্দুরা মাধবকে উত্তেজিত ক'রে আবদুল্লার ওপর প্রতিশোধ নিইয়েছে।

একজন হিন্দু সভ্য বললে, পদ্মা যা বলছে, তাতে ব্যাপারটার মধ্যে হিন্দুদের কোন হাত আছে ব'লে মনে হয় না। এটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার জন্যে মুসলমানরা হিন্দুদের এর মধ্যে টেনে এনেছে।

একজন মুসলমান কর্মী জবাব দিলে, সব ব্যাপার ভাল ক'রে না জেনে মুসলমানদের ঘাড়ে এই বদ মতলব চড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

হিমাংশু বললে, এখন কথা হচ্ছে, এই সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে আমাদের কোন পক্ষের সঙ্গেই যোগ থাকা উচিত নয়। আমরা কোন পক্ষকেই সাহায্য করব না। রাধার সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই। কেন না, ঘটনাটা তাকেই কেন্দ্র ক'রে ঘটেছে। কিন্তু পদ্মার এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া উচিত হয় নি এবং পুলিসের কাছে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত হয় নি। পদ্মা যদি আমাদের পরামর্শ নিত, তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এ রকম কাজ করতে নিষেধ করতাম।

প্রতুল বললে, পদ্মা কোন অন্যায় করেছে ব'লে আমার মনে হয় না। যা সত্য ব'লে সে জানে, তা সে নিশ্চয় বলবে, পুলিসের কাছেই হোক বা বিচারকের সামনেই হোক।

শশধর বললে, যে কাজের ফলে আমাদের পার্টি কোন সম্প্রদায়ের

বিরাগভাজন হয়ে উঠবে, তা আমাদের পার্টির কোন সভ্যের করা উচিত ব'লে আমি মনে করি না।

প্রতুল বললে, কিন্তু এটা তো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয় মোটেই। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। জোর ক'রে সাম্প্রদায়িক করা হচ্ছে। তা ছাড়া মাধব আমাদের পার্টির একজন সভ্য। যদি পদ্মা সত্য কথা বললে তার মঙ্গল হয়, তা হ'লে পদ্মার কোনমতে সত্য গোপন করা উচিত নয়।

রোসেনারা জবাব দিলে, পার্টির একজন সভ্যের মঙ্গলের আগে সমস্ত পার্টির মঙ্গল দেখা দরকার। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টিকে মুসলিম-লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। কাজেই মুসলিম-লীগের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে চলাই আমাদের উচিত।

হিন্দু মুসলমান অনেক সভ্যই রোসেনারাকে সমর্থন করলে।

প্রতুল বললে, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলা দেশে মুসলিম-লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টি পরস্পর সহযোগিতা করবেনই, নিজ নিজ দলের স্বার্থের উদ্দেশ্যে। স্থানীয় একটা ব্যাপারে যদি স্থানীয় দুই দলের মধ্যে মনান্তর ঘটে, সমগ্রভাবে দুই দলের সহযোগিতা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হবে না। তা ছাড়া আমার মনে হয়, স্থানীয় মুসলিম-লীগের কর্তৃপক্ষরা উত্তেজনাবশে এখন যাই করুন পরে যখন ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক দিয়ে ঘটনাটি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, তখন সবই বুঝতে পারবেন এবং আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের যাতে ন্যায্য বিচার হয় এবং অপরাধীর ওপরে যাতে ন্যায্য দণ্ডের বিধান হয়, সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা করবেন না।

শশধর বললে, মুসলিম-লীগ বা হিন্দু-মহাসভা কে কি করছেন বা করবেন তা আমাদের বিচার করবার দরকার নেই। যে ভাবেই হোক এই ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যোগ থাকা আমি বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি না। আমি আমাদের পার্টির অন্যান্য সভ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। তাঁদের সকলেরই এই মত। কাজেই আমি দুটি প্রস্তাব

করছি। প্রথম, পদ্মা যে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এই ব্যাপারে পুলিসের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্যে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করছি। দ্বিতীয়, আমাদের পার্টি এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময়ে পদ্মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ব'লে বা ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা জানে ব'লে স্বীকার করবে না। আপনারা হাত তুলে বা না-তুলে এ প্রস্তাবে আপনাদের সমর্থন আছে বা নেই, তা জ্ঞাপন করুন।

প্রতুল, শুক্তি ও জনকয়েক হিন্দু ছেলে ছাড়া সকলেই হাত তুলল।

রোসেনারা মুচকি হেসে বললে, আশা করি, আমাদের সকল সভ্য পার্টির নির্দেশ মানবেন। পদ্মাকেও কেউ সাক্ষ্য দিতে প্ররোচনা দেবেন না।

শুক্তি বললে, পদ্মা এ নির্দেশ না মানতেও পারে।

রোসেনারা ধারালো কণ্ঠে বললে, তা হ'লে তাকে পার্টি থেকে স'রে যেতে হবে।

শুক্তি বললে, যদি সে স'রে যেতে প্রস্তুত থাকে ?

একজন মুসলমান সভ্য ব'লে উঠল, তা হ'লে দুনিয়া থেকে স'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলবেন তাকে।

সভা ভঙ্গ হ'ল। প্রতুল ও শুক্তি চ'লে গেল একসঙ্গে। কিন্তু পার্টির মধ্যে বিদারণ-রেখাটি যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ রইল না।

[ক্রমশ]

শ্রীঅমলা দেবী

শ্বাসরুদ্ধ

আমায় নিশ্বাস নিতে দাও—

একবার বৃষ্টিঘন রাত্রির বাতাসে

মেঘের আহ্বান শোন, তার সাথে গাও, গান গাও।

সমুদ্র মাতাল গাঢ় অন্ধকার ভিড় ক'রে আসে ;—

একবার আকাশে তাকাও ॥

ঘরের জন্মকথা অবান্তর নয়—এটা ঠিক ধান ভানতে শিবের গীত নয়। কারণ, আজকে যেখানে সেখানে নানা প্রগতি-সম্প্রদায়ের ছেলেদের মুখে শুনি, আমরা নাকি দৈবাৎ—অ্যাকসিডেণ্টে এসেছি, এর পেছনে নাকি কোন আয়োজন বা প্রয়োজন-উদ্দেশ্য নেই। ফলে তারা মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা এবং 'সাধারণ' এই উভয়কে একই দৃষ্টিতে দেখতে চায়। পরিষ্কার ব'লে বেড়ায়, নীতিবাক্য ছেঁদো কথা, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, বা জননী জন্মভূমি কথাগুলি বা পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি কথাগুলি নিছক অন্ধ কুসংস্কার। ইংরেজীয়ানা শিখে আমরা ছেলেদের সনাতনী হিতকথা শেখানো বন্ধ করেছি, কিন্তু বদলে একটা কিছু দেবার চেষ্টা করি নি। অতএব আজকে, স্বার্থে ও প্রয়োজনে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিতে হচ্ছে যে, এ সবই আমাদের পিতারও পিতা যিনি, তাঁরও পিতা যিনি, সেই ওপরওয়ালার অমোঘ বিধান।

সংসার ও পরিবারের স্বরূপ—পূর্বে 'সংসারে তপস্যা' অংশে পরিবারের স্বরূপটা খানিক বুঝে নিয়েছি। সংসারের নানা ক্ষেত্র—পরিবার, সমাজ, বিপণি, রাষ্ট্র ইত্যাদি। এর মধ্যে পরিবার আদি ও আদর্শ। আমাদের দৃষ্টিকোণে, পঞ্চসাম্য সংসার—সমান স্বার্থ, সমান কাম্য, সমান মন্ত্র, সমান আকূতি, সমান সহযোগ। পরিবারে সব চাইতে বড় অভাব, স্নেহ মমতা ষোল আনা থাকা সত্ত্বেও কোন জলুশ নেই। ইমশন রোমাণ্টিক ছেলের জন্য কোন চটক, ঝাঁজ ও জাঁক নেই। বরঞ্চ আছে একটা নির্মম উদাসীনতার ছাপ। ঘরে এক দিকে যেমন সহজ ও অবাধ মুক্তি আছে, তেমনই প্রত্যেক পরিবারেই তার একটা বিশিষ্ট একঘেয়ে বাধা আছে, যা সময় সময় অত্যন্ত বিরক্তিকর গুমট হয়ে মানুষকে ঘরছাড়া করে। আজকের প্রগতির দিনে এই বাধা, সময়ে সময়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ফলে আবেগী ছেলে তার মার স্নেহাঞ্চল ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়। প্রজাপতির মত সুন্দর, শিরীষ কুসুমের মত সুকুমার, অথচ বাতাসের মত চঞ্চল ও বুদ্বুদের মত শূন্য যে আলেয়া, সেই আলেয়ার পেছনে ছুটে যায়। কিন্তু যখন বুঝতে পারে, মৃগের তৃষ্ণা—মৃগতৃষ্ণা মরীচিকাতে মেটে না, তখন এই হারানো ছেলের হুঁশ হয়, তখন সে কেঁদে ফেরে মায়ের অঞ্চলে। এই কথাটা ছেলে যদি

আগে থেকে বুঝে নেবার সুযোগ পায়, তবে সে মায়ের কোলে হাঁপিয়ে ওঠে না। সে বুঝতে পারে, সস্তা চটকে ও সোডার বোতলের ফস্‌ফসানিতে স্নেহরস বিলিয়ে দিলে ঘরের স্নেহের গভীরতায় টান পড়বে। ছেলেকে তার ঘরের কথা বুঝিয়ে দেওয়া বাপ-মার কর্তব্য। খাওয়ানো পরানোতেই বাপ-মার কর্তব্য শেষ হয় না, ছেলেকে সহযোগিতা শেখানো এবং উড়তে শেখানো, এই দুটো বাপ-মার চরম কর্তব্য। নতুবা হয়তো ছেলে পদে পদে হোঁচট খাবে। আলেয়ার পেছনে ছুটে ব্যর্থ হয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হবে। নিরক্ষর কবির মুখে গান শুনেছিলাম, 'শরীর বাইরে ঢাকা কাটার ভারে, অন্তর ভিতর ভরা রসের ধারে, খাজুর মাঝারে, আমি কলাগাছে বান্ধলাম কলস, কি রস এখন চাখি'। এই তার ছবি।

ঘুড়ির ঘর—পরিবারকে ঘুড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। নাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ি। নাটাই যেন তার মায়ের কোল, নিরাপদ। কিন্তু নাটাইয়ে আবদ্ধ থাকলে ঘুড়ির জয়ের পথ বন্ধ থাকে। উড়তে তাকে হবেই। কিন্তু যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, নাটাইয়ের সঙ্গে সে সুতো দিয়ে বাঁধা। জলে-ঝড়ে, বিপদে-আপদে, নাটাই গুটিয়ে ঘুড়িকে ঘরে আনলেই সে নিরাপদ। দৈবাৎ 'ভোঁকাট্টা' খেলতে যদি সুতো কাটে, তখন বাতাসে ভেসে কোথা থেকে কোথা গিয়ে কোন্ গাছে ধাক্কা খেয়ে, খোঁচা খেয়ে, ঘুড়ির অপমৃত্যু হবে, কে জানে! যদি ভাগ্যবশে অক্ষত অবস্থায় বাইরে কারও হাতে পড়ে এবং তার নাটাইয়ে স্থান পায়, তবে সে একটা নতুন ঘর পেল, বেঁচে গেল। কিন্তু এটা তো ভাগ্যের কথা, স্ফুর্তিখেলা—স্পেকুলেশন, এটা নির্ভরযোগ্যও নয়, এখানে করবারও কিছু নেই। ডার্বি টিকেট কিনে লক্ষ টাকা ধার করা চলে কি?

পরিবার আমার শৈশবের দোলা—আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে, দুঃখে-দৈন্যে পরম আশ্রয় এবং বার্ধক্যের পরম আশ্বাস ও বিশ্রাম। কিন্তু তা ব'লে চিরকাল ঘরে ব'সে থাকলে তো চলবে না। জয়ের পথে আমাকে যেতেই হবে, হয়তো তখন কারও কারও পরিবার ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে হবে। কিন্তু জয়ের পথে যতদূরই যাই

না কেন, ঘুড়ির সুতোর মত মায়ের আঁচলের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। তাতেই আমার চরম সার্থকতা,—আমার নিরাপত্তাও থাকে, আত্মপ্রকাশও হয়।

পরিবারের প্রভাব—পরিবারের শিক্ষা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি, সাধারণত একমাত্র পুঁজি। কারণ, শৈশবে মনের মধ্যে যা বুনব আর কৈশোরে যা চাষ দেব, তার ফসলই আমার ভবিষ্যৎ জীবনে একমাত্র পাথেয়। এই মহাসত্য আজকের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। ব্যর্থতার যে সব ভূমিকা আছে—বাতুলতা, ক্রিমিন্যালিটি, চরিত্র-দৌর্বল্য, ভীতি, অসন্তোষ, অসহযোগ, এদের সকলেরই বীজ ও চাষ এইখানে, এই শৈশবে ও কৈশোরে, এক কথায় এই পরিবারে। এইখানেই পরিবারের দায়িত্ব ও অধিকার, সুতরাং এইখানেই পরিবারের শ্রেষ্ঠত্ব। অপরাধ প্রকাশের বয়স নাকি ১৫ থেকে ২৮। অ্যামেরিকা বলে, 'কৈশোর ভয়াবহ বয়স'—Teen agers are dangerous। ইউরোপ বলে, 'বিশ্রী বিরুদ্ধ বয়স'—Awkward age। কারণ জয়ের পথে সব চাইতে শক্তিশালী মটিভ 'আত্মপ্রকাশ,' এবং শৈশবে এর বীজ বপন হয় ও কৈশোরে এর কথা ফোটে। কিশোর ভাবে—আমি ছোট নই; আবার বড়রা আমোল দেয় না, তুচ্ছ করে; কাজেই কিশোর তখন বিদ্রোহ করে এবং সুবিধেমত প্রগতি-দলে মিশে, তাদের সস্তা স্লোগান আওড়ায়, আর বাপ-মাকে করে 'ডোণ্ট কেয়ার'। ছেলে বিগড়য় এই বয়সে, একমতে একাদশ থেকে বাইশ। প্রাচ্য শাস্ত্রের বিধান—পুত্রমিত্রবৎ আচরেৎ। ওরা বলে, আত্মপ্রকাশে বাধা না দিয়ে, স্নেহে সহানুভূতিতে গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, বিগড়বে না। কিশোর তোমারও সহায় হবে, আর নিজেও জয়লাভ করবে।

ঘরের দায়িত্ব এখানে। সর্বদা শুনতে পাই, 'আমার যথাসাধ্য করলাম, এখন যার যার ভাগ্য'। হয়তো কি করতে হয় তাও জানি নে, আর কি করেছি তাও জানি নে। কেউ বা ছেলেকে মাথায় ক'রে নাই দিয়ে ভেবেছি, বাপ-মার কর্তব্য শেষ। আবার কেউ বা উঠতে বসতে চাবুক হাঁকড়ে ভেবেছি, খুব করলাম। পৃথিবীতে

এনে সন্তানকে মানুষ করার ভার বাপ-মার ওপর। মানুষ বা অমানুষ হবার প্রধান ক্ষেত্র তিনটি—পরিবার, পাঠশালা ও খেলার মাঠ। মন্ত্র পেয়েছি, কঠোর একনায়ক ডিক্‌টেটর না হয়ে, স্নেহপ্রবণ ও হিতকামী এবং হিতকর্মী ডাক্তার হবে। ডিক্‌টেটর নয়, ডাক্তার।

পরিবার-জীবনে সাধারণ টেকনিক—'সংসারে তপস্যা' অংশে সবশুদ্ধ সাতাশটি মন্ত্র পেয়েছি, তার দশ আনার ওপর পরিবার সম্বন্ধে। এদেরই বিস্তার-অভিক্ষেপনে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা। পরিবারে কোন কোন পথে অশান্তি ও ব্যর্থতা আসে, সেই রন্ধ্রগুলি আটকাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই বিশেষ টেকনিক ভাবাই আজকে আমাদের পালা।

সংসারে কিসে তাল কাটে—গানের আসরে তাল কাটে দু রকমে—গাইয়ে তালকানা হ'লে তাল কাটে, আর গানের আসরে সহযোগিতা না পেলে তাল কাটে। যারা গান-বাজনা করে, তা জানে। তালকানা হ'লে ওষুধ, তাল শিখিয়ে নেওয়া। কিন্তু যেখানে তাল কাটাবার জন্য চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র বা বুদ্ধির ভুল, সেখানে সমস্যা কঠিন। সংসারেও প্রায় তাই। এ-পক্ষ বা ও-পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাব। কোন পক্ষ থেকে সহযোগিতায় হাত বাড়ালেই সমস্যা মেটে। যদি পরস্পরের অবস্থা বুঝে সহযোগিতা করি, তবেই শান্তি পাব।

মন্ত্রের ইঙ্গিত 'পরের অবস্থা বুঝে নেবে'। আমরা ভূমিকার মূলসূত্রে পেয়েছি, 'আদান-প্রদানে সহযোগিতা কর, পরস্পরের স্বার্থে ও প্রয়োজনে রফা কর, সংশোধন কর বা ক্ষতিপূরণ কর—compromise, correction ও compensation'। এই তুই মন্ত্র প্রয়োগেই তালকাটা বন্ধ হবে। দোষ কারও নয়, দোষ বোঝবার ভুলের। কিন্তু একজন বুঝে এগিয়ে এলেই অপর পক্ষ এগিয়ে আসবে। শত হিতচেষ্টা সত্ত্বেও, শুধু বুদ্ধির দোষে কত ভুল করি, হিতকামী হ'লেও বুদ্ধিতে মাঠো ব'লে হিতকর্মী হতে পারি না।

বিশেষ টেকনিক—সংসারে আমাদের বুদ্ধির ত্রুটিতে, কথায় বা কাজে, তিন রকমের বিষ জমতে পারে, আমাদের অজ্ঞাতসারেও।

(১) পক্ষপাতিত্ব বিষ। কথায় বা কাজে, ছেলেতে ছেলেতে, বউয়ে বউয়ে, মেয়েতে মেয়েতে—কেউ যেন ভাবতে না পারে, অমুককে বেশি ভালবাসে। যাকে বেশি ভালবাসা দেখাবে, তার সর্বনাশ, কারণ তার বিরুদ্ধে অপরের মনে হিংসা জমবে, প্রচ্ছন্নই হোক, প্রকটই হোক।

(২) তুলনা ও সমালোচনা-বিষ। তুলনা বা সমালোচনাতে কাকেও হীন করলে তাকে হারাবে। যত ইচ্ছা তুলনা-সমালোচনা ক'রেও যদি মান ও মুখরক্ষা হয়, হীনতাবোধ না জন্মে, তবে তাল কাটবার বিদ্রোহ জাগবে না। হীনতাবোধে বিদ্রোহ জাগে। বিদ্রোহী তাল কাটবে, দলছাড়া হবে, যেখানে তার সস্তা অহমিকা প্রশ্রয় পাবে সেখানে গিয়ে জুটবে।

(৩) দয়া বা কৃপা-বিষ (pity)। খবরদার, খবরদার, দয়া করবে না, দয়া কেউ চায় না। খবরদার খবরদার, নিষ্ঠুর নির্মম হবে না, তা কেউ চায় না। বাঃ, তুমি দেখছি, এদিকেও গাইছ, ওদিকেও গাইছ। হাঁ, তাই। সহানুভূতি সবাই চায়, কিন্তু তা ব'লে মুরুব্বিয়ানা ও দয়া মিশিয়ে সহানুভূতি কেউ চায় না। অথচ মুরুব্বিয়ানার দুর্বলতা, একটু খোঁচা দিয়ে কথা বলবার লোভ নেই এমন মানুষ তো কম দেখলাম। ফলে যা হবার হয়, এই রন্ধ্র পথে আসে গ্লানি। মুরুব্বিয়ানা বা patronage ছাড়া অতীব কঠিন, আর এইটে হচ্ছে নেতৃত্বের সব চাইতে বড় দুর্বলতা। ভারতবর্ষকে যেদিন কোম্পানির হাত থেকে নেওয়া হয়, সেদিন যাতে মুরুব্বিয়ানার ভিতর দিয়ে নেপটিজ্‌ম ও পক্ষপাতিত্ব না আসতে পারে—এ জন্য নিয়ম হয়, বাছা বাছা কয়েকটা পদ ছাড়া, সবই সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে, নতুবা আশঙ্কা হ'ল মুরুব্বিয়ানার গ্লানিতে ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটে পর্যন্ত ক্ষয় দেখা দিতে পারে। আজকের সরকারেরও যেখানে গ্লানি, তারই অন্তরালে মুরুব্বিয়ানার মোহ। অনভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কিছুতেই নিজের অক্ষমতা মেনে নেবে না। ফলে, এই মুরুব্বিয়ানা বজায় রাখতে গিয়ে, ছোট বড় যে কোন সমস্যার মুখোমুখী হয়, তার কোন সমাধান করতে না পেরে, ফট

ক'রে একটা ডাইরেক্টরেট ক'রে দিয়ে আসল 'ইস্যু' এড়িয়ে যায়, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। নিজের অক্ষমতাও প্রকাশ হয়ে না পড়ে, অথচ মুরুব্বিয়ানাও বজায় থাকে।

শ্রদ্ধা ক'রে তাকে সহানুভূতি দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে, তাকে পাশে বসাও, উৎসাহ দাও, সে তোমার হাতের মুঠোতে। অশ্রদ্ধা ক'রে তাকে পায়ের তলায় রেখে মুরুব্বিয়ানা মাখানো সহানুভূতি দেখাও, তার অন্তরে বিষ জমবে। মা, মাসীমা, পিসীমা, শাশুড়ী 'আহা উহুঁ' ক'রে ভাল করতে গিয়ে, মন্দই করেন বেশির ভাগ। 'বড় বউয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি না, ছোটরা তো যে যার ঘরে, আর এই বেচারী খেটে খেটে সারা হ'ল।' সঙ্গে সঙ্গে বড় বউয়ের সর্বনাশ, সঙ্গে সঙ্গে সবার মনে ঈর্ষা ও হিংসা জমে। 'মেজ বউয়ের দুরবস্থা ভাবা যায় না, অর্থবলও নেই, বাপের দেওয়া সোনা-দানাও নেই, আমার এমন দুঃখ হয়, তবু দু বেলা জুটছে এই ভাল'—এই কৃপা ও হীনতা-বিষ ঢেলে মেজ বউকে বীতশ্রদ্ধ বিরূপই করবে। বরঞ্চ বল 'সাবাস্ বেটী, মা যেন আমার দশভুজা'। এই 'সাবাস' মন্ত্র সংসারে মৃতসঞ্জীবনী।

পাঁচ রকমের লোক নিয়ে পরিবারে তাল কাটে—সংসারে এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে সাবধানে, কৌশলে, তোমার সংসার-সাম্যের মধ্যে মিলিয়ে নিতে হবে, নতুবা তাল কাটবার আশঙ্কা। বেসুরা গাইবেই। এরা মূলত দুটো—অক্ষম ও অতৃপ্ত। এই দুটোর বিস্তারে আর তিনটে শাখা পাই—আগন্তুক, আবেগী ও আলেয়া (বা আলেয়া-আবিষ্ট)। তা হ'লে মোট সংখ্যা হ'ল পাঁচটি—অক্ষম, অতৃপ্ত, আগন্তুক, আবেগী ও আলেয়া। এই সমস্যা প্রত্যেক পরিবারে, কেউ বাদ যাবে না, অতএব এর সমাধান চাই প্রত্যেকের। এই আমাদের অ-আ।

১। অক্ষম। অক্ষম-অশক্ত-অসমর্থ-অভাবগ্রস্ত। শিশু, নাবালক, বৃদ্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি। ২। অতৃপ্ত। শিশু, নাবালক, বিধবা, অনূঢ়া, অবিবাহিত, বিপত্নীক, নিঃসন্তান ইত্যাদি। ৩। আগন্তুক। শিশু, বধূ, জামাতা, ভাগিনা, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, কর্মচারী ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীও বোঝাপাড়ার পূর্ব পর্যন্ত আগন্তুকের খাতে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী পৃথিবীতে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং সর্বনিকৃষ্ট দান, ক্ষেত্র ও

পাত্র হিসাবে। ৪। আবেগী। ইমশন-প্রধান, ইমশন-নাবালক। শিশু, নাবালক,—স্বার্থান্ধ, মেজাজী, সন্দিগ্ধ চিত্ত, সংস্কারী, অতি প্রগতিশীল, মাতাল, বাতুল, অনাচারী, ক্রিমিন্যাল ইত্যাদি। ৫। আলেয়া। আলেয়া-আবিষ্ট। শেষ দুই শ্রেণী প্রায় একই খাতের।

কাউকেও পেতে হ'লে দেখতে হবে (১) তার সত্যিকার অভাব মেটানো যায় কি না, (২) তারপর সে আর যা যা চায়, তা তাকে দিতে পারি কি না, যদি তার কোন চাওয়াই মেটাতে না পারি, তবে (৩) তার মধ্যে এমন কোন মোটিভ জাগাতে পারি কি না, যা আমি পুরণ করতে পারি। মোটের উপর তাকে খুশি করতে এমন কি দিতে পারি ?

এই তিন পথে তার সঙ্গে সহযোগিতা করলেই তাকে পাব, তাকে আমার আদর্শ-সাম্যের মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারব। পরের কন্যা বধূরূপে ঘরে এসেছে, তাকে নিজের কন্যার মতন ক'রে নিতে হবে। পরের ছেলে জামাতারূপে এসেছে, তাকে নিজের পুত্র ক'রে নিতে হবে। এই তো তোমার-আমার সমাধান-ভিত্তি, এরই মন্ত্র ও ব্যবস্থা আমাদের 'টেকনিক'।

তথাপি যদি এমন খাপছাড়া অস্বাভাবিক কেউ আসে, যাকে কিছুতে সামলানো যায় না, তখন পরিবারের শান্তির জন্য তাকে বর্জন করাই বিধি। অল্পের জন্য বহুর ক্ষতি করতে পারি না।

বৃদ্ধ-শিশু-নাবালক—বৃদ্ধ, শিশু ও নাবালক, এরা সংসারে সব চাইতে বড় সহায়, সম্পদ। বৃদ্ধের কাছে তার অভিজ্ঞতায় পাই, কোথায় খানা ডোবা আছে, এবং পথ চলতে সতর্ক হতে পারি। শিশুর কাছে পাই ভবিষ্যৎস্বপ্ন, সজীবতা এবং পথ চলবার প্রেরণা। শিশুকে মানুষ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে চলি। পাছে তার আদর্শ নষ্ট হয়, নিজের অনাচার-অভ্যাস শুধরে নিই। কিশোরের কাছে পাই উৎসাহের শক্তি।

আবার বৃদ্ধ, শিশু ও নাবালক, পথ চলতে সব চাইতে বড় বাধা। বৃদ্ধ গতানুগতিক পুরাতনকে আঁকড়ে ধ'রে আমাকেও টেনে রাখতে চায়, তার কথা শুনলে, যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে জয়ের পথে পা

বাড়ানো মুশকিল। শিশু অবুঝ, বেশি আবদার দিলে বিপথে যায়, আবার অতি শাসনে আত্মপ্রকাশের গতি বন্ধ হয়, জীবনে ও জয়ের পথে যাবে না। কিশোরের চোখের আলেয়ার মোহ ও চমক থেকে তাকে বাঁচানো কঠিন।

বৃদ্ধের কথায় সেকেলে কৌলিন্য মানতে গিয়ে, আজ কন্যা দারিদ্র্যে নিপীড়িত, অন্নের বদলে জল দিয়ে শুধু কুলই জ্বাল দেয়, আর অকূলে ভাসে। আবার বৃদ্ধের সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে, সমাজ উপেক্ষা ক'রে, হুড়মুড় ক'রে অজ্ঞাতকুলশীল প্রগতিশীল বর এনে, এখন লিগ্যাল সেপারেশন করিয়ে কন্যাকে চোখের জলে ভাসাই। অতি আদরে শিশুকে অমানুষ ক'রে আজ তাকে জেলে পাঠিয়েছি বা রাঁচি পাঠিয়েছি; চাবুকের শাসনে যাকে রেখেছিলাম, সে বড় হয়েও দাঁড়াতে পারে না, কাঁপে, নিজের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে।

এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করাই সংসারে বড় সমস্যা।

বৃদ্ধ—বহু সংসারেই, কথাটা স্পষ্ট স্বীকার না করলেও, বেশ বোঝা যায় যে, বৃদ্ধ যেন অনাবশ্যক, গলগ্রহ। বৃদ্ধ যদি শাঁসালো হয়, তবে সংসার তাকে ফেলতে পারে না, নতুবা বহু পরিবারে বৃদ্ধকে হেনস্থা করতেও ছাড়ে না। বৃদ্ধও তেমনই জবাব দেয়, রাতদিন খুঁতখুঁত করে, অসন্তোষের সীমা নেই, টেঁকের জোর থাকলে, বৃদ্ধ রাতদিন কুরুক্ষেত্রও করে। বৃদ্ধ শান্তি নষ্ট করে ব'লে পরিবারের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্পার্টানদের মত বৃদ্ধকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায় না, তীর্থে পাঠালে বা দেশের বাড়িতে পাঠালে দুদিন পরই এসে হাজির। অতএব বৃদ্ধকে শান্ত ক'রে সংসারের ছন্দ ও সুরে মিলিয়ে নেওয়াই একমাত্র পন্থা, নতুবা অশান্তি সইতেই হবে।

বার্ধক্যটা একবার বানান করতে হ'ল। একটু অবান্তর হ'লেও শব্দটা পুরোই বানান করি, দেহে ও মনে। বার্ধক্যে দেহ মন দুইই অপটু হয়। আমাদের 'মানুষে যা চায়' দর্শনের দৃষ্টিতে 'বার্ধক্য সপ্তদশী'তে সতেরটি বার্ধক্যের লক্ষণ। দেহের অপটুতা—(১) আর্টারি শক্ত হওয়া, (২) বীজাণুর আক্রমণ, (৩) মেরুদণ্ড-বক্রতা, (৪) দম কমা, (৫) স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস, (৬) নষ্ট পাচকযন্ত্র,

(৭) দৃষ্টিশক্তি কমা, (৮) হার্টের অ্যাট্রফী ও (৯) ইন্‌ডোক্রাইন গ্রন্থীর বৈলক্ষণ্য।—এই নবধা দেহদৌর্বল্য। দেহের ব্যবস্থা কবিরাজ করবে। আমাদের ব্যবস্থা আলাদা, তা ওষুধ-পথে নয়, স্বভাব-পথে, তার কথা, 'বার্ধক্যরোধ' কথায় ভাবব। এবার মনের দিকটা দেখে নিই।

মনের বৈলক্ষণ্য আটটি—(১০) নতুনের প্রেরণা কমা (ইনিসিয়েটিভ কমা), (১১) নার্ভাস হওয়া, (১২) স্মৃতিশক্তি কমা। এদের প্রত্যক্ষ পথে সারাবার তেমন জোরালো ব্যবস্থা আমাদের নেই। (১৩) মেজাজ খিটখিটে হওয়া, (১৪) প্রফুল্লতার হ্রাস। এদের সারাবারও কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নেই। দেখা যাক, আর তিনটে অপটুতা কি, তাদের পথে কিছু করা যায় কি না!

তুমি আমি ভাবি, বৃদ্ধ অশক্ত অক্ষম হয়ে সংসার থেকে অবসর নিয়েছে, অতএব সে অবসর নিয়েই থাক্, আমরাই কর্তৃত্ব করি, সংসারের ভাল-মন্দ সব করি। তাই তো সময় সময় মাকে বুঝাই, 'মা, তুমি আশী বছরের বৃদ্ধা, তুমি সংসারের কোন কথায় থেকো না, তুমি গোবিন্দচিন্তা কর, তুমি গীতাপাঠ কর।' মা কিন্তু শোনেন না, আমরা আশ্চর্য হই, এইখানেই গোল বাধে, এইখানেই আমাদের ভুল। মা কথা বলেন ইমশন ভাষাতে, আমরা কথা বলি লজিকে। একজন বলি গ্রীক আর একজন বলি হিব্রু, কেউ কারও কথা বুঝি নে। দেখি, গোল কোথায়! আমরা মনে করি, বৃদ্ধরা অবসর নেয়। কিন্তু আসলে বৃদ্ধরা কখনও কোন কালেই অবসর নেয় না। দায়িত্ব ছাড়ে, কিন্তু কোন কালে তাদের অধিকার ছাড়ে না; বিশেষভাবে, কর্তৃত্ব-অধিকার বা মুরুব্বিয়ানা। অতএব (১৫) বৃদ্ধ মুরুব্বিয়ানা চায়। (১৬) বৃদ্ধ অপরের প্রতি মনোযোগ দেবে না, কিন্তু অপরের মনোযোগ চায়, বৃদ্ধ কারণে অকারণে মনে করে—আমায় অগ্রাহ্য করলে। কেউ মানে না, কেউ গ্রাহ্য করে না, এই দুটোই তো বৃদ্ধের স্লোগান। মুরুব্বিয়ানা ও মনোযোগ। বৃদ্ধের আর একটা দৌর্বল্য (১৭) সে কখনও তার নেশা (পূর্ব অভ্যাস) ছাড়বে না। তাই নিয়ে খিটমিটির সৃষ্টি।

এইবার আমাদের পথ পরিষ্কার। (১) বৃদ্ধকে তার প্রয়োজন মত সব দাও, যেন কোন অভাব বোধ না করে। (২) তার মুরুব্বিয়ানা কায়েম রাখ। (৩) তাকে যে অগ্রাহ্য কর না—এটা বুঝতে দাও, দরকারে, অদরকারে। (৪) তার অভ্যাস বা নেশা নিয়ে নীতিবাগিশী করবে না—'টু লেট্ এবং বৃথা।'

তোমার আদর্শে, তোমার ইচ্ছামত চল, ক্ষতি নেই, কিন্তু বৃদ্ধের সম্পর্কে, অন্তত অভিনয় ক'রেও, তার অহমিকাকে স্বীকার কর। 'বাবা, নেমন্তন্ন করার লিস্ট'। বাস্, এই পর্যন্ত, তারপর তুমিই নাম বল, ওকালতি কর, বৃদ্ধ তোমার কথায় সায় দেবে। 'দাদু, তুমি আমাদের প্রেসিডেন্ট।' খুশি।

বৃদ্ধের নেশা যাই থাক্, এতদিনকার অভ্যাস। যথাবিধি ব্যবস্থা ক'রে তার পথে তাকে চলতে দাও। নস্যি দোক্তা দাও, আফিং, আপত্তি কি। জল, শিশিতে দাগ কেটে দাও, নিষিদ্ধ উত্তেজনা না থাকলে নিজেই সংযত হয়ে কমের মধ্যে থাকবে। বিকেলে একটু বেড়ানো অভ্যাস, ছাড়তে পারবে কেন, দু ঘণ্টা বেড়িয়ে এলে এই বৃদ্ধ-বয়সে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? আলট্রা পিউরিট্যান হয়ে জটিলতা বাড়াবে ছাড়া কমাবে না, জেনো।

বৃদ্ধ তার গোঁড়ামিতে তোমাকে আটকাতে চাইবে না, যদি তার নেশা, তার মুরুব্বিয়ানা কায়েম থাকে।

একটা বিপদ, বৃদ্ধের নাতি-নাতিনীদের নিয়ে। সাধারণত বৃদ্ধরা আদর করবার অধিকার পায়, কিন্তু বাপ-মার কাছ থেকে শাসন করবার অধিকার পায় না। ফলে, নাতি-নাতনী দাদা-দিদির অতি আদরে গোবর গণেশ হয়, বা অতি আবদারে অসহযোগী হয়ে তাদের মনের মধ্যে বাতুলতা ও অপরাধের বীজ জন্মে। এইটে সব চাইতে ভয়।

তরুণবৃদ্ধ। বিবেচক ও ইমশন-সাবালক বৃদ্ধরা, কালের সঙ্গে, তরুণের সঙ্গে পা ফেলে চলে, তারা বৃদ্ধ নয়, তারা তরুণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা আদর্শ তরুণ, তারা পার্থসারথী বাসুদেবের মত চিরকিশোর, শিশুর সখা, তরুণের সখা, আবার বৃদ্ধ হতে অতিবৃদ্ধ

পিতামহ ভীষ্মেরও উপদেষ্টা। এরা তরুণবৃদ্ধ। খোলামন আদর্শ মানুষ।

বিধবা—প্রথমত বিধবার আগমনে নিরানন্দে সংসারের তাল কাটে। তারপর বিধবা যখন শোকের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে, তখন তার তৃষ্ণা উদগ্র হ'য়ে সে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে ধাক্কা দেয়। ব্যর্থতার স্বভাবই সংসারের উপর প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা, সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ ছুটে গেলে, যাকে সামনে পায় তাকেই কামড়ায়। বউদের মধ্যে, বোনেদের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে, দেওর-ভাসুরে, বাপ মার মনে, যেখানে যখন পারে বিষ ঢালে, তাল কাটে, সংসার ভাঙে। অতৃপ্তি ও ব্যর্থতা, সফলকামের উপর ঝাল মেটাবেই; লজিক মানে না।

বিধবার অভাব ঊর্ধ্বসংখ্যায় চারটি, স্বামী, সন্তান, সংস্থান ও বৈভব, এবং কর্তৃত্ব। স্বামী; তোমার সমাজে পুনর্বিবাহ অচল। উপায় কি? সন্তান; পূর্বে দত্তক নেওয়া সহজ ও সচল ছিল, আজও ভাইয়ের, বোনের, ভাসুরের ছেলে মানুষ করার সুযোগ পেলে অনেকটা তৃপ্ত হয়। সংস্থান; যা কিছু নিজের ব'লে নাড়াচাড়া ক'রে খুশি হবে—একটা ঘর, ফার্নিচার, দু কাঠা জমি, গয়না, টাকা, কাগজ, যা কিছু হোক। কর্তৃত্ব; সব চাইতে বড় কর্তৃত্ব অধিকার, অনন্য কর্তৃত্ব চাই। সংসারের কর্ত্রী হয়ে অনেক বিধবা সংসারকে নন্দন-কানন করেছে। সংসারের ভার দেওয়া সম্ভব না হয়, যা কিছু একটা দাও, ঠাকুর-ঘরের ভার, ছেলেদের পড়ার ভার, হাট বাজার, অতিথি-শালা, যা হয় একটা কিছু।

এই ক'রে অর্ধেক তৃষ্ণা মিটল। বাকি অর্ধেক, স্বামী। এখানে আমাদের মন্ত্র—কমপেন্‌সেশন, ক্ষতিপূরণ। জয়ের দ্বাদশ মোটিভ। স্বামী-মোটিভের পর আর কি কি মোটিভ বিধবার মনে প্রবল দেখে নাও, তাদের খাদ্য দাও, ক্রমে মন তাতে ব্যাপ্ত থাকবে। যদি কোন মোটিভ প্রবল না থাকে, তবে তার মনে কোন না কোন মোটিভ জাগাও, তারপর তার পূরণ কর। ফল একই হবে। লেখা পড়া, সেবাব্রত, গীতবাদ্য, হাতের কাজ, সাহিত্য চর্চা যাতে সম্ভব মনকে চালনা করতে সাহায্য কর।

পঙ্গু হ্যাণ্ডিক্যাপ—শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, এরা অশক্ত ব'লে নাকি পর-পীড়ক—টাইরেণ্ট হয়। সত্যি। কালা বোবা তোতলাদের মেজাজ দেখতে পাই। ওষুধ কন্‌সেশনে, যে অঙ্গ বা যন্ত্র বিকল, সেটা ছেড়ে দিয়ে, অন্য অঙ্গ বা যন্ত্র যাতে চালনা হয়, সেই মোটিভ তার মনে জাগাও এবং তা পুরণের ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে যে সব পঙ্গু বেঁচেছে বা বড় হয়েছে, সবাই ঐ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায়। বোবা কালা অন্ধ হেলেন কেলার, অচল ডারউইন, খোঁড়া স্কট, কালা এডিশন সহস্র দৃষ্টান্ত, ইতিহাসে ও তোমার আমার আশেপাশে।

অনূঢ়া কন্যা—কাজ না দিয়ে তার মন ব্ল্যাঙ্ক রেখে তাকে শয়তানের কারখানা করবে না। তারপর বিধবার খাতে ফেলে, তার তুল্যমূল্য ব্যবস্থা।

বধূ জামাতা ; নির্বাচন—(১) পরিবারের ও (২) পরস্পরের। দুটো মেলে ভাল, না মেলে, একপক্ষ সহ্য ক'রে না নিলে, তাল কাটবে। আমরা আজ পরিবারের নির্বাচনের উপর ভিত করে কথা বলছি। পরস্পরের আবেষ্টনীতে খুব পার্থক্য না থাকে এটা সর্বপ্রথম বিচার্য, তারপর পরস্পরের শিক্ষা-কালচার খুব বেশি আলাদা না হয়। এই গেল পরিবারের ও পাত্র-পাত্রীর নিরিখের বা স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা। সমান আকৃতি।

পাত্র-পাত্রী ও তাদের পরস্পরের পরিবার, তোমার আদর্শে এদের ভাল-মন্দ দেখে নিতে হবে। কোন্‌টা বড় ? পাত্র-পাত্রী, না, পরিবার ? সাইকলজি বলে, আকর, পরিবার। ধর, পাত্রী, ভাল পাত্রী, মন্দ পাত্রী, ভাল চাই, বুঝলাম। পাত্রীর পরিবার, ভাল পরিবার, ভালই চাই। বেশ। কিন্তু ভাল পরিবারের মন্দ পাত্রী, বা মন্দ পরিবারের ভাল পাত্রী ? সাইকলজি বলে—ভাল পরিবারের মন্দ মেয়েই ভাল। আমাদের দেশের প্রবাদবাক্য কিন্তু উল্টো, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। আজকের বিজ্ঞানের কথাই গ্রাহ্য, কারণ এর পেছনে অনেক পরীক্ষা ও স্ট্যাটিস্‌টিক্স আছে, প্রবাদের পেছনটা রাতের অন্ধকারে ডুবে আছে। তা ছাড়া, রক্ত কথা কয়, কবে কখন মন্দ রক্ত কথা কইবে এবং কি ভাবে কইবে, বলা যায় না।

পিতামহ ভীষ্মেরও উপদেষ্টা। এরা তরুণবৃদ্ধ। খোলামন আদর্শ মানুষ।

বিধবা—প্রথমত বিধবার আগমনে নিরানন্দে সংসারের তাল কাটে। তারপর বিধবা যখন শোকের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে, তখন তার তৃষ্ণা উদগ্র.হ'য়ে সে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে ধাক্কা দেয়। ব্যর্থতার স্বভাবই সংসারের উপর প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা, সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ ছুটে গেলে, যাকে সামনে পায় তাকেই কামড়ায়। বউদের মধ্যে, বোনেদের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে, দেওর-ভাসুরে, বাপ মার মনে, যেখানে যখন পারে বিষ ঢালে, তাল কাটে, সংসার ভাঙে। অতৃপ্তি ও ব্যর্থতা, সফলকামের উপর ঝাল মেটাবেই; লজিক মানে না।

বিধবার অভাব উধ্বর্সংখ্যায় চারটি, স্বামী, সন্তান, সংস্থান ও বৈভব, এবং কর্তৃত্ব। স্বামী; তোমার সমাজে পুনর্বিবাহ অচল। উপায় কি? সন্তান; পূর্বে দত্তক নেওয়া সহজ ও সচল ছিল, আজও ভাইয়ের, বোনের, ভাসুরের ছেলে মানুষ করার সুযোগ পেলে অনেকটা তৃপ্ত হয়। সংস্থান; যা কিছু নিজের ব'লে নাড়াচাড়া ক'রে খুশি হবে—একটা ঘর, ফার্নিচার, দু কাঠা জমি, গয়না, টাকা, কাগজ, যা কিছু হোক। কতৃত্ব; সব চাইতে বড় কর্তৃত্ব অধিকার, অনন্য কর্তৃত্ব চাই। সংসারের কর্ত্রী হয়ে অনেক বিধবা সংসারকে নন্দন-কানন করেছে। সংসারের ভার দেওয়া সম্ভব না হয়, যা কিছু একটা দাও, ঠাকুর-ঘরের ভার, ছেলেদের পড়ার ভার, হাট বাজার, অতিথি-শালা, যা হয় একটা কিছু।

এই ক'রে অর্ধেক তৃষ্ণা মিটল। বাকি অর্ধেক, স্বামী। এখানে আমাদের মন্ত্র—কমপেন্‌সেশন, ক্ষতিপূরণ। জয়ের দ্বাদশ মোটিভ। স্বামী-মোটিভের পর আর কি কি মোটিভ বিধবার মনে প্রবল দেখে নাও, তাদের খাদ্য দাও, ক্রমে মন তাতে ব্যাপ্ত থাকবে। যদি কোন মোটিভ প্রবল না থাকে, তবে তার মনে কোন না কোন মোটিভ জাগাও, তারপর তার পূরণ কর। ফল একই হবে। লেখা পড়া, সেবাব্রত, গীতবাদ্য, হাতের কাজ, সাহিত্য চর্চা যাতে সম্ভব মনকে চালনা করতে সাহায্য কর।

পঙ্গু হ্যাণ্ডিক্যাপ—শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, এরা অশক্ত ব'লে নাকি পর-পীড়ক—টাইরেণ্ট হয়। সত্যি। কালা বোবা তোতলাদের মেজাজ দেখতে পাই। ওষুধ কন্‌সেশনে, যে অঙ্গ বা যন্ত্র বিকল, সেটা ছেড়ে দিয়ে, অন্য অঙ্গ বা যন্ত্র যাতে চালনা হয়, সেই মোটিভ তার মনে জাগাও এবং তা পুরণের ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে যে সব পঙ্গু বেঁচেছে বা বড় হয়েছে, সবাই ঐ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায়। বোবা কালা অন্ধ হেলেন কেলার, অচল ডারউইন, খোঁড়া স্কট, কালা এডিশন সহস্র দৃষ্টান্ত, ইতিহাসে ও তোমার আমার আশেপাশে।

অনূঢ়া কন্যা—কাজ না দিয়ে তার মন ব্ল্যাঙ্ক রেখে তাকে শয়তানের কারখানা করবে না। তারপর বিধবার খাতে ফেলে, তার তুল্যমূল্য ব্যবস্থা।

বধূ জামাতা ; নির্বাচন—(১) পরিবারের ও (২) পরস্পরের। দুটো মেলে ভাল, না মেলে, একপক্ষ সহ্য ক'রে না নিলে, তাল কাটবে। আমরা আজ পরিবারের নির্বাচনের উপর ভিত করে কথা বলছি। পরস্পরের আবেষ্টনীতে খুব পার্থক্য না থাকে এটা সর্বপ্রথম বিচার্য, তারপর পরস্পরের শিক্ষা-কালচার খুব বেশি আলাদা না হয়। এই গেল পরিবারের ও পাত্র-পাত্রীর নিরিখের বা স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা। সমান আকৃতি।

পাত্র-পাত্রী ও তাদের পরস্পরের পরিবার, তোমার আদর্শে এদের ভাল-মন্দ দেখে নিতে হবে। কোন্‌টা বড় ? পাত্র-পাত্রী, না, পরিবার ? সাইকলজি বলে, আকর, পরিবার। ধর, পাত্রী, ভাল পাত্রী, মন্দ পাত্রী, ভাল চাই, বুঝলাম। পাত্রীর পরিবার, ভাল পরিবার, ভালই চাই। বেশ। কিন্তু ভাল পরিবারের মন্দ পাত্রী, বা মন্দ পরিবারের ভাল পাত্রী ? সাইকলজি বলে—ভাল পরিবারের মন্দ মেয়েই ভাল। আমাদের দেশের প্রবাদবাক্য কিন্তু উল্টো, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। আজকের বিজ্ঞানের কথাই গ্রাহ্য, কারণ এর পেছনে অনেক পরীক্ষা ও স্ট্যাটিস্‌টিক্স আছে, প্রবাদের পেছনটা রাতের অন্ধকারে ডুবে আছে। তা ছাড়া, রক্ত কথা কয়, কবে কখন মন্দ রক্ত কথা কইবে এবং কি ভাবে কইবে, বলা যায় না।

'তপস্যা' অংশের টেকনিক দিয়ে আগন্তুককে আপন করবে, অবস্থা বুঝে নেবে, সহযোগিতা করবে, তিনটা বিষের একটা বিষও যাতে জমতে না পায়, এমনই হবে তোমার পরিবারের শিক্ষা ও কালচার।

পরিসর সঙ্কীর্ণ, দু-চারটে ছবি দিয়ে হারমনি বা ছন্দতান-সাম্যের মন্ত্রের ইঙ্গিত পেলাম, হয়তো হাতড়ে হাতড়ে এবার নিজেরাই টেকনিক সৃষ্টি করতে পারব। লজিক, উপদেশ, হিতকথা, সুভাষিত বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি না ব'লে প্র্যাকটিক্যাল গাইডের জন্য টেকনিকই সহায়। (১) তপস্যার সাধারণ নিয়ম টেকনিক, (২) বিশেষ টেকনিক দুটো, (৩) বিষের টেকনিক তিনটে, (৪) ঠিক ঠিক অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রে হাতড়ে হাতড়ে টেকনিক বের হবে ব'লেই আমরা আশা করি।

পার্থসারথি চিরকিশোর বাসুদেব সহায় শরণ।

শ্রীঅতুল সেন

আবোল-তাবোল

মেরে ফেলে দেড় লাখ মানুষে
  খোঁড়া নাম ঘোচাল কি তৈমুর ?
একটি পাখীর প্রাণ বাঁচিয়ে
  বুদ্ধ হলেন সিদ্ধার্থ
  শোন শোন নবগীতা, পার্থ,
খুশি হয়, নিও এটা যাচিয়ে
  কাবাব ভাল, না, ভাল খইচুর !

কতখন নভে রয় ফানুসে
কতকাল নেচে চলে কানু সে
  কংগ্রেসী রয় নিঃস্বার্থ,
    কতকাল, কতকাল বল না !
গান্ধীর নাম নিয়ে মিথ্যে
  ক'রো না, ক'রো না দাদা ছলনা
ঝগড়া কি মিটবে না কভুও
  "বোলবো" এবং ওই "কইমু"র ?
সুখে যদি থাকে প্লীহা-পিত্তে
একই মিঞার চার ললনা—
  আমরা লড়াই করি তবুও
  বল বল বল কি নিমিত্তে ?

[ক্রমশ

সিন্ধুকূলে

(গোপালপুর)

১

বালিয়াড়ি 'পরে বসেছি এসে—
পাহাড়েরা চলে সার বেঁধে বেঁধে আকাশ ঘেঁষে ;
ঘন ঝাউবন পায়ে পায়ে গিয়ে পাহাড়ে মেশে।
হেথা বালিয়াড়ি ঢালু হয়ে নামে সাগরজলে,
পূবদিগন্তে গড়ায় সাগর গগনতলে।
ব'সে আছি আমি বালির পাহাড়ে এ ধারে বন
ওধারে সাগর—গরজে নাগিনী সারাক্ষণ ;
সৈকত 'পরে ঘন ঘন হানে হাজার ফণা—
পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায়ে ফেনায়ে জহরকণা।
পাহাড়েরা চলে, মেঘে মেঘে পাতে হাতীর ফাঁদ ;
সাগর-দস্যু ঝাঁপায়ে ভাঙিছে বালির বাঁধ।
চেয়ে চেয়ে দেখি—আলোয় ছায়ায় কি মায়া-ডোরে
সাগর পাহাড় বন বালুতট বেঁধেছে মোরে !

২

মুলিয়ারা ব'য়ে নামায় সাগরে কাঠের নাও,
ঢেউ যুঝে যুঝে পার হয়ে ঢেউ চ'লে উধাও ;
দাঁড় নেই, নেই—বৈঠায় বাও, হাজার নাও।
শত শত নাও—নাও সে কি ! শুধু কাঠের ভেলা,
দুর দুর্জয় মত্ত সাগরে করে সে হেলা।
উধ্বর্বাহুতে অঞ্জলি বাঁধি সাগরে নমি
নাও ঠেলি ঠেলি, লাফ দিয়া ওঠে ছাড়িয়া জমি ;
আছাড়ি পিছাড়ি ঢেউ ভেদি ছোটে হাজার নাও ;
নাই কোনো ডর, অকূল সাগরে চলু উধাও—
বৈঠা বাও।
এই দেখা যায়, লাফ দিয়ে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি
এই আর নাই ! ডুবল কি হায় নৌকা দুটি ?
না না, ওই ওই ! কৈ ? কৈ ? কৈ ? ওই তো, যাক !
পার হয়ে যাক দুর্দম ঢেউ হাজার লাখ।

দোলে নাও দোলে, সাগর-দোলায় নাগর-দোল ;
নাও তটে ঢেউ হানে মৃদঙ্গ—মত্ত রোল,
বাজে মাদল।
দূরে দেখ চেয়ে—বিন্দু বিন্দু কলমী-পানা ;
ফিরে এসে দেখো—জালে এক ঝাঁক হাঙর-ছানা।
আরো লাখো মাছ নাম-না-জানা!

৩

বেলা প'ড়ে আসে, মেঘের মেলা—
আকাশে আকাশে শুরু হয়ে গেল রঙের খেলা।
পূরবে সাগরে নীল গাঢ়নীল স্তরে স্তরে,
বেগুনী, সবুজ উথলিয়া নাচে ঊর্মি 'পরে
মিশে যায় শেষে দিগন্তরে
আলস ভরে।
পশ্চিমে হেরো মেঘে মেঘে ছায় সোনালী জাল ;
সূর্য নামিছে পাহাড়ের আড়ে—ফানুস লাল।
ওই যায় যায়, গেল গেল ডুবে পাহাড়তলে,
রেখায় রেখায় আকাশের গায় চূড়াটি জ্বলে।
বনে বনে ধীরে আঁধার ঘনায়, যায় না জানা ;
পাহাড় মেলেছে আকাশের গায় মেঘের ডানা।
সহসা কখন লাগিল আগুন মেঘের গায়,
রাঙিয়া উঠিল সাগর গগন সেই আভায়।
মনে হয় যেন আগুনের-ডানা-ঈগলপাখী
রজনীর পানে চলিয়াছে উড়ে আকাশ ঢাকি,
রক্ত আঁখি।
সোনালী রূপালী কমলে ধূমলে অঘোর ঝরা ;
দুলিছে সিন্ধু দোলে গিরি বন বসুন্ধরা।
গগনের পারে নাচে উর্বশী-রঙের চেলী
খনে খনে ওই খসায়ে ফেলিছে গগনে মেলি ;
রক্তাম্বর খসিল, খসিল জরদা, জরি,
ঝরকে ঝরকে পড়িছে শলমা চুমকি ঝরি—

সোনালী, কমলা, গোলাপী, বেগুনী, মরিচা শাড়ি—
দুকূল ঘুচায়ে দিল উর্বশী অকূলে পাড়ি।

৪

সাগরে সন্ধ্যা নামিল কুলায়ে ফিরিল পাখী,
কূলে ব'সে আমি—নিথর আঁধারে ডুবায়ে আঁখি।
নীরবে ঘনায়ে আসে সুগভীর আঁধার মায়া,
গগনে তারকা-জোনাকী—সাগরে পড়েছে ছায়া।
সহসা এ কি এ! হেরিনু লক্ষ ঊর্মিশিরে,
নাচিছে আলোর পারিজাত-মালা সাগর ঘিরে।
চেয়ে চেয়ে আর ফেরে নাকো আঁখি অবাক মানি,
ফুলসজ্জার উৎসব সাজে সিন্ধুরাণী।
যতদূর চাই ফ্লোরেসেণ্ট-আলো গড়ায়ে চলে,
অতিনিসর্গ-জীবন্ত কোটি জ্যোতির দলে।
জলতরঙ্গ দুন্দুভি বাজে গভীর নাদে,
লক্ষ কিরণ দুলিছে পড়িছে তাহারি ছাঁদে।
রক্তে আমার লেগেছে আগুন—জানে কি কেউ?
লেগেছে আঁধার চিত্তসাগরে আলোর ঢেউ।

৫

তখনো কাটে নি আকাশের ঘুমঘোর
ধূসর আলোকে ছোট গ্রামখানি ঘিরে
ডান হাতে টাকু বাম হাতে তারি ডোর
বুড়া দুলিয়ারা গুটি গুটি আসে তীরে;
যেথায় সিন্ধু মিশেছে নিথর লেকে
বালুচর গেছে চঞ্চুর মত বেঁকে
ঢেউগুলি এসে ভেঙে পড়ে থেকে থেকে;
সেই মোহানায় চলিয়াছি ধীরে ধীরে
ডুবায়ে ডুবায়ে পা দুটি সিন্ধুনীরে।
সমুখে বারিধি পূরব আকাশে মেশে
নীল ঢেউ-শাড়ি, ফেনা-ফুলকাটা পাড়

হোথা ঝাউবন লেকের কিনারা ঘেঁষে
মাঝে বালুচর সুবিপুল বিস্তার—
লেকে সিন্ধুতে চরে বনে কোলাকুলি,
দূরে উঁকি দেয় ছোট ছোট গিরিগুলি,
সীমা-স্তম্ভ প্রসারিয়া অঙ্গুলি
হানে সংকেত আকাশে—সিন্ধুপার,
যেথায় নীরবে সপ্ত রঙের তুলি
লিখিয়া মুছিয়া ফেলিছে বারম্বার।
বড় ভালবাসি এই মোহানার চর ;
ব'সে ব'সে হেথা পূর্ব গগনে চেয়ে ;
দেখি ধীরে ধীরে রাঙি উঠে অম্বর,
পড়েছে সাগরে তারি লাল আভা ছেয়ে ;
শুধু চেয়ে আছি—রক্তকমল কুঁড়ি
কখন উঠিবে সুনীল সায়র ফুঁড়ি
নীলাকাশ পানে স্বর্ণ-মৃণাল বেয়ে!
সহসা কখন দিগন্ত-সীমানায়
ভেদিয়া সিন্ধু রক্তবিন্দু লিখা—
সিঁদুরের টিপ সুনীল ললাটে ভায়
স্বর্ণ ঝালরে হানিছে অগ্নি-শিখা—
সাগরে গগনে একাকার হয়ে লোটে
অমৃত-ভাণ্ড সিন্ধু মথিয়া ওঠে
মোর আঁখি 'পরে জাগে মায়া-মরীচিক
সুবর্ণ থাল উঠিল সিন্ধু বেয়ে,
ঝলকে ঝলকে আলোকের ধারা বয়,
ভুবন গগন জাগিল আলোকে নেয়ে,
মধুর সিন্ধু গিরি বন মধুময়।
চিত্ত আমার ভরিল মধুর রসে,
মধু-সমীরণ অন্তরে মোর পশে,
নিখিল ভুবন মধুময় মধুময়।

শ্রীজীবনময় রায়

অশ্রু

সবচেয়ে দুঃখ হয় কি জানেন বীরুদা, যখন সংসারের অবস্থা একটু ফিরল, সুদিনের মুখ দেখলাম, সে আর সবুর করল না, চ'লে গেল। শেষদিকে প্রায়ই বলত, আমি ভারি অপয়া। আমি না মরলে তোমাদের ভাগ্য ফিরবে না, দুঃখ ঘুচবে না। আমার দুঃখ সে ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে।

বলতে বলতে শ্রীপতির চোখে জল এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কোঁচার খুঁটে জল মুছে ফেলে শ্রীপতি অপ্রতিভ হয়ে রইল।

স্ত্রীর মৃত্যুর তিন মাস পরে কথায় কথায় পুরুষের চোখ এমন সজল হওয়া শোভা পায় না। বীরেশ্বর সেন অবশ্য বহুদিনের পুরনো বন্ধু, বয়সেও বছর দশেকের বড়। নির্মলার অসুখের সময় সাধ্যমত যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তারপর এই তিন মাস ধ'রে সময় পেলেই একবার ক'রে আসেন। শ্রীপতিকে সান্ত্বনা দেন, তাকে অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইদানীং তাঁরও যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি পারতপক্ষে ওসব কথা তুলতেই চান না, বরং শ্রীপতিকেও যেন একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চান। আজ একটা দরকারী কাজে শ্রীপতির কাছে এসেছিলেন, তুলব না তুলব না ক'রেও স্ত্রীর কথা সে তুলে ফেলল।

বীরেশ্বর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোমাকে কতদিন বলেছি ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই ভাই ছিরু। যে গেছে সে তো গেছেই, যারা আছে এবার তাদের দিকে তাকাও—ছেলেপুলে-গুলিকে মানুষ ক'রে তোল। বুকের মধ্যে আগুন তো জ্বলবেই, চিরকাল জ্বলবে। কিন্তু তাই ব'লে চোখের জলে কর্তব্যের পথ যেন ঝাপসা না হয়।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন বীরেশ্বর।—ইস, আটটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। আমি এবার উঠি ভাই ছিরু। অনেক এরিয়ার জ'মে রয়েছে। একটু সকাল সকাল বেরুতে হবে অফিসে।

বীরেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি নির্মলার প্রসঙ্গকে ভয় করছেন। শ্রীপতি একবার স্ত্রীর কথা তুললে আর সহজে থামতে চাইবে না। বার বার পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করবে।

সদর দরজা পর্যন্ত বীরেশ্বরকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে শ্রীপতি চুপ ক'রে ব'সে রইল। নিজের আচরণের জন্যে নিজেই লজ্জিত হ'ল একটু। সত্যি, অন্যের চোখে নিজেকে এমন অনুকম্পার পাত্র ক'রে তুলে লাভ কি, নিজের দুঃখ নিজের মধ্যেই কেন লুকিয়ে রাখে না শ্রীপতি? বার বার সেই দুঃখের কাহিনী বর্ণনা ক'রে কেন বন্ধুদের বিরক্তিভাজন হয়?

বন্ধুরা ক্রমেই যেন দূরে স'রে যাচ্ছে। ব্যবধান বেড়ে চলেছে। সব সময় শ্রীপতিকে সতর্ক থাকতে হয়, পাছে তাদের কাছে স্ত্রীর কথা সে তুলে ফেলে। মানুষের ধৈর্যের সহানুভূতিজ্ঞাপনের তো একটা সীমা আছে!

নির্মলা বেঁচে থাকতে কিন্তু কখনও এমন হয় নি। বন্ধুবান্ধবেরা দিনের পর দিন তাদের স্ত্রীর গল্প শুনিয়েছে, দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি কথা বর্ণনা করেছে; কিন্তু শ্রীপতি কোনদিন মুখ খোলে নি। স্ত্রী ব'লে যে ঘরে কেউ আছে তা তার হাবে-ভাবে কেউ টের পেত না। তিনটি ছেলেমেয়ের বাপ হওয়ার পর অফিসের সহকর্মীরা জেনেছিল— শ্রীপতি বিবাহিত। তার আগে নির্মলার কোন অস্তিত্বই ছিল না তাদের কাছে। শ্রীপতির নিজের কাছেই কি খুব ছিল? কিন্তু ম'রে গিয়ে নির্মলা তার শোধ নিচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি যে ও চ'লে যাবে কে ভেবেছিল! মাত্র সাতাশ বছর বয়সে সংসারের কতটুকু সাধ-আহ্লাদই বা মেটে! নির্মলার মোটেই মেটে নি। তেরো বছরের বিবাহিত জীবন দারিদ্র্য আর রোগ-ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই তার কেটেছে। না পেরেছে শ্রীপতি তাকে দু-একখানা গয়না গড়িয়ে দিতে, না দিয়েছে তেমন দামী একখানা শাড়ি। শুধু কি তাই, অভাব-অনটনের সংসারে বেশির ভাগ দিন ঝগড়া-ঝাঁটিতেই কেটেছে। এখন সে কথা ভাবলে দুঃখ হয়—আগে যদি জানত নির্মলা এত অল্পদিনের জন্যে সংসারে থাকতে এসেছে, তা হ'লে সেই কটা দিন ওকে সুখে রাখতে চেষ্টা করত শ্রীপতি। শাড়ি গয়না ধনদৌলত দিয়ে নয়, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে, একটু বেশি আদর-সোহাগ জানিয়ে। নির্মলা তা-ই চাইত,

তাতেই খুশি হ'ত। আর চাইত লোকজনকে খাওয়াতে। শ্রীপতির মত অসামাজিক ছিল না নির্মলা। ওর ইচ্ছা ছিল, স্বামীর বন্ধুবান্ধব প্রায়ই বাড়িতে আসে যায়, তাদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, আদর আপ্যায়ন করে। কিন্তু তা ঠিক হয়ে উঠত না। সংসারের বাজেটে ফি মাসেই ঘাটতি পড়ত। নির্মলা যখন রোগশয্যায় তখন দু-ছুটি সুসংবাদ এল। চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছে শ্রীপতি। আর তার ছোট ভাই নৃপতিরও একটা ইন্‌সিওরেন্স অফিসে চাকরি জুটেছে। সব মিলিয়ে সোয়া শো টাকার মত পাবে। এক সঙ্গে দেড় শো টাকা আয় বেড়ে যাওয়া সোজা কথা নয়।

শুনে নির্মলা ভারি খুশি হয়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আগামী দু-তিন মাসের জমাখরচ ঠিক করেছিল মুখে মুখে। খানকয়েক চেয়ার, ছেলেদের পড়বার একটা টেবিল, টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখবার জন্মে একটা আলমারি—এসব না কিনলে আর চলে না। সেই সঙ্গে একান্তে শ্রীপতিকে ডেকে আরও একটি সাধের কথা জানিয়েছিল নির্মলা, আসছে একুশে আষাঢ় কি করবে বল? এবার কিন্তু একখানা বই-টই দিয়ে আর সারতে পারবে না। ঠাকুরপোর চাকরি হ'ল, তোমার মাইনে বাড়ল—

একুশে আষাঢ় শ্রীপতিদের বিবাহ-বার্ষিকী।

শ্রীপতি বলেছিল, দামি একখানা শাড়ি চাই তো? আচ্ছা, দেব। তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

নির্মলা মাথা নেড়েছিল।—উঁহু, শাড়ি দেবে ঠাকুরপো। তোমার কাছে অন্য জিনিস চাই।

কি, গয়না?

না গো না, গয়না নয়। তোমাদের ধারণা, মেয়েরা শাড়ি-গয়না ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে পারে না। গয়না-টয়না চাই নে। ওই দিন তোমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব। ঠিক যেমন হীরেন আর বিনীতারা করেছিল তেমনই। সেই সঙ্গে একটু গান-বাজনার আয়োজন করা যাবে। কি চমৎকার হবে, না?

শ্রীপতি স্বীকার করেছিল, পরিকল্পনাটি সত্যিই ভাল। কিন্তু

এবারকার একুশে আষাঢ় নির্মলা আর দেখে যেতে পারল না। আজ সেই বিবাহ-তিথি। শ্রীপতিকে আজকের দিনটি একাই উদ্‌যাপন করতে হবে।

বারান্দার এক কোণে রান্নার জায়গা। শ্রীপতির মা যোগমায়া সেখান থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের সাদা থান ছেড়ে মৃত পুত্রবধূর একখানা পুরনো ছেঁড়া শাড়ি গায়ে জড়িয়ে তিনি হেঁসেলে ঢুকেছেন। নির্মলাও তাই করত। শাড়ির ছেঁড়া জায়গাটা দিয়ে কখনও তার এলো খোঁপা বেরিয়ে থাকত, কখনও বা দেখা যেত ঘামে-ভেজা আধময়লা ব্লাউজের ছাপা ফুলের গুচ্ছ। ছেঁড়া শাড়িতেও ভারি সুন্দর মানাত নির্মলাকে। কিন্তু মা কেন ওই পুরনো রঙিন শাড়িখানা পরতে গেলেন? বড়ই বিসদৃশ লাগছে দেখতে!

যোগমায়া ছেলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, এবার ওঠ্ ছিরু, আর অমন ক'রে ব'সে থাকিস নে। আপিসের সময় হ'ল না তোর, ন'টা যে বেজে গেছে! শেষে নাকে মুখে গুঁজবি।

শ্রীপতি বললে, যাই মা।

যোগমায়া বললেন, আর মুখ ভার ক'রে থাকিস নে ছিরু। আর সেই এক ভাবনা দিনরাত ভাবিস নে। পুরুষমানুষ না তুই। তোর কি এসব সাজে?

শ্রীপতি বললে, হুঁ। মনে মনে একটু হাসল শ্রীপতি, তা ঠিক। স্ত্রীর জন্য পুরুষের শোক করা চলে না। এই উপদেশ উঠতে বসতে মা দিচ্ছেন, বন্ধুরা দিচ্ছে। স্ত্রীর জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবে, তাও সকলের চোখে বিসদৃশ লাগে। অথচ অশ্রু ছাড়া তাকে আর কিই বা দিতে পারে শ্রীপতি! অজ্ঞাত অখ্যাত একটি কেরানীর স্ত্রীর জন্যে কোন জনহিতকর তহবিল খোলা হবে না। কোন মর্মরস্তম্ভ খাড়া হবে না। শুধু অশ্রু, শুধু চোখের জলের তর্পণ। কিন্তু তাতে নাকি পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয়। হয় তো হোক।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রীপতি উঠে দাঁড়াল।

নৃপতি দু দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছে কোন

এক বন্ধুর বিয়েতে। শ্রীপতিকে নিজেই আজ বাজার সারতে হয়েছে। এবার অফিসের উদ্যোগ-আয়োজনও শুরু করতে হয়।

তেল মাখবার আগে স্ত্রীর টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল শ্রীপতি। মুখে এক দিনের দাড়ি জমেছে। খুঁজে খুঁজে কামাবার সরঞ্জামগুলি এক জায়গায় জড়ো করলে। এগুলি এগিয়ে দেওয়ার ভার ছিল নির্মলার ওপর। হাতের কাজ ফেলে রেখে এগুলি তাকে গুছিয়ে দিতে হ'ত। নির্মলা বলত, আর পারি নে। সব জিনিস একেবারে হাতের ওপর তুলে দিতে হবে! সংসারে কি দশটা ঝি আছে, না, চাকর আছে? নিজের শেভ করার জিনিস নিজে যদি একটু খুঁজে-টুজে না নিতে পার, অমন দাড়ি না কামালেই হয়।

শ্রীপতি ক্ষুরটা নামিয়ে রেখে সাবান-মাখা মুখ গম্ভীর ক'রে বলত, বেশ, নাই কামালাম দাড়ি।

নির্মলা হাসি চেপে বলত, হ্যাঁ, সেই ভাল, ওই এক মুখ দাড়ি নিয়ে যাও আপিসে, সাহেব যদি তেড়ে না আসে—

শ্রীপতি তেমনই গম্ভীর মুখে জবাব দিত, দিনের বেলা না হয় অফিসের সাহেবের তাড়া খেলাম। কিন্তু দাড়ি না কামালে রাত্রে ঘরের মেমসাহেবের দশাটা কি হবে শুনি! আসল গরজটা যে কিসের জন্যে তা সবাই জানে।

নির্মলা আরক্ত মুখে বলত, আঃ, চুপ কর। ও-পাশে মা রয়েছেন, ছেলেরা রয়েছে। কোন যদি আক্কেল-বুদ্ধি থাকে তোমার!

নির্মলার জন্যে সত্যি শ্রীপতির মুখে দাড়ি জমতে পারত না। রোজ শেভ ক'রে ফেলতে হ'ত।

শ্রীপতি বলত, আর তুমিই কিনা খোঁটা দাও আমার দাড়ি ভয়ানক কড়া, ঘরে এমন কড়া মেজাজের বউ যার থাকে তার দাড়ি কি কড়া না হয়ে যায়?

নির্মলা বলত, আহা-হা, এখন যত দোষ বুঝি আমার? চোদ্দ বছর বয়স থেকে ক্ষুর ধ'রে ধ'রে দাড়িকে শক্ত ক'রে ফেলেছ, এখন খোঁটা দেওয়া হচ্ছে আমাকে! বেশ তো, আমি ম'রে গেলে বড় চাপদাড়ি রেখো।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দিন দশেক বড় দাড়িই রেখেছিল শ্রীপতি চক্রবর্তী। তারপর সভ্যতার নিয়মে ফের নিখুঁত ক'রে কামিয়ে ফেলতে হয়েছে, রোজই কামাতে হচ্ছে। কিন্তু এখন যেন শুধু কড়া দাড়ি কামাবার যন্ত্রণাটুকুই আছে, আনন্দ আর নেই।

ঘরটা একেবারে খালি, নির্মলার দেড় বছরের কোলের মেয়েটিকে পাশের ঘরের ভাড়াটেদের বউ নিয়ে গেছে। নইলে রান্নার সময় যোগমায়াকে বড় বিরক্ত করে। বুড়ো মানুষ সব দিক সামলাতে পারেন না, অল্পেই মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু নির্মলা যখন রাঁধত, মিণ্টু প্রায়ই ওর পিঠের সঙ্গে লেগে থাকত। রাঁধতে রাঁধতে ছেলেদেরও পড়ার খবরদারি করত নির্মলা। ঘরের মধ্যে মাদুর পেতে শঙ্কু আর রঙ্কু বই নিয়ে বসত, তাদের গলা না শুনলেই নির্মলা ধমক দিত, জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়্, ও কি পড়া হচ্ছে শুনি?

কিন্তু শুধু ধমক ছাড়াও শঙ্কু-রঙ্কুর ভাগ্যে আরও কিছু জুটত। কোনদিন বা দুটি ডালের বড়া, কোনদিন বা কুমড়ো-ফুল ভাজা রাঁধতে রাঁধতে উঠে এসে ছেলেদের দিয়ে যেত নির্মলা, দেখ্ তো কেমন হয়েছে খেতে!

নির্মলা চ'লে যাওয়ার পর থেকে শঙ্কু রঙ্কু বড় একটা ঘরের মধ্যে থাকতে চায় না। বাইরে বাইরেই কাটায়, এই সকালবেলায় পড়াশুনো ছেড়ে গলিতে খেলতে শুরু করেছে ওরা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রীপতি ওদের ডাকল, এই শঙ্কু রঙ্কু, এদিকে এস।

বাপের ডাক শুনে রঙ্কু সভয়ে ঠাকুরমার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিলে। শঙ্কুও সেখান থেকে আসতে চাইছিল না। শ্রীপতি আশ্বাস দিয়ে বললে আয়, এদিকে আয়, বকব না, কাউকেই বকব না।

শঙ্কু এসে কাছে দাঁড়াল, বছর নয়েক বয়স হয়েছে ছেলের, কিন্তু স্বাস্থ্য মোটেই ভাল না, রোগা টিনটিনে। মুখের আদলটা নির্মলারই মত, তেমনই জোড়া ভ্রূ, টিকলো নাক, পাতলা সুন্দর দুটি ঠোঁট, রঙটা নির্মলার চেয়ে একটু ফরসাই হবে। মাথার চুলগুলি উস্কখুস্কো, গায়েও ময়লা পড়েছে। কেই বা দেখে, কেই বা যত্ন নেয়!

ছেলেকে আরও কাছে ডেকে নিল শ্রীপতি।—সকালে একটু পড়েছিলে তো?

পড়েছি বাবা, অনেকক্ষণ পড়েছি।

বেশ, পড়াশুনো হয়ে গেলেও সকালবেলাটি ঘরেই থেকো। সকালে গলিতে যাওয়া ভাল নয়।—একটু থেমে শ্রীপতি গলা নামিয়ে বললে, আচ্ছা, ঘরে আজকাল আর তোরা থাকিস নে কেন বল তো? থাকতে মন লাগে না, খালি খালি লাগে, না? মার কথা খুব মনে পড়ে, না?

বাপের আদরে অনভ্যস্ত শঙ্কু বড়ই বিব্রত বোধ করছিল। এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললে, না, মনে পড়ে না। কারও কথাই মনে পড়ে না। আমি যাই বাবা।

কিন্তু শ্রীপতি ছাড়ল না, জোর ক'রে ছেলের হাত চেপে ধ'রে বললে, অকৃতজ্ঞ, এই তিন মাসের মধ্যে মাকে একেবারে ভুলে গেছিস? একটুও মনে পড়ে না তার কথা?

যোগমায়া ছুটে এলেন।—হ্যাঁ রে ছিরু, তুই হ'লি কি বল্ দেখি, কি হ'লি তুই, একেবারে পাগল হয়ে গেলি? নিজে পাগল হবি, হ। কিন্তু বাড়ি শুদ্ধু সবাইকে পাগল করতে চাস কেন? কচি কচি ছেলে, ওদের আমি কত কষ্টে আগলে রাখি, ভুলিয়ে রাখি, আর তুই কিনা— ছি ছি ছি! শ্রীপতির হাত থেকে শঙ্কুকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন যোগমায়া। রান্নাঘরের ভিতর গিয়েও বকবক করতে লাগলেন।

আশ্চর্য, কত সহজে শঙ্কু ব'লে ফেললে—মনে পড়ে না, কাউকে ওর মনে পড়ে না! ওরে, পড়বে। এখন না পড়লেও একদিন মনে পড়বে। তখন বুঝবি, কি হারিয়েছিস, কাকে হারিয়েছিস! ছেলের সেই ভবিষ্যতের কষ্টের কথা ভেবে শ্রীপতির চোখ ছলছল ক'রে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলে শ্রীপতি। যোগমায়া ফের ঘরে ঢুকেছেন।—নে, এবার ওঠ্। উঠে নেয়ে নে।

শ্রীপতি আর দেরি করল না। অফিসের উদ্যোগপর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করল।

খাওয়ার সময় পাতের কাছে পাখা হাতে বসলেন এসে যোগমায়া।—দেখ্ তো কেমন হয়েছে! মনে আছে, ছেলেবেলায় এই

ডুমুরের তরকারি খেতে কত ভালবাসতিস তুই! হ্যাঁরে, আজ কেমন হয়েছে রান্না? খেতে খেতে শ্রীপতি একবার মুখ তুলল, তারপর নীরস সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, ভালই হয়েছে।

ছেলের জবাবের ভঙ্গি দেখে যোগমায়ার বুকের মধ্যে আচমকা একটি ঘা লাগল, বন্ধ হ'ল তাঁর হাতের পাখা।

ম'রে গিয়ে সর্বনাশী যেন তাঁর ছেলেকে আরও সরিয়ে নিয়ে গেছে, পর ক'রে দিয়েছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগমায়া বললেন, উত্তরপাড়ার যামিনী ভটচাযের মেয়েটির কথা আজও বলছিলেন পরেশবাবু, তাদের নাকি খুবই ইচ্ছে।

শ্রীপতি প্রায় আর্তনাদের সুরে বললে, মা!

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, কি হ'ল রে? মাছের কাঁটা-টাঁটা বিঁধল না কি?

কাঁটাই বিঁধেছে। কিন্তু মাছের কাঁটা নয়।

শ্রীপতি বললে, ওসব কথা আজ আর তুলো না মা।

কেন, আজ কি?

আজ যে কি, তা মার মনে রাখার কথা নয়। কিন্তু শ্রীপতি সে কথা ভুলবে কি ক'রে?

তবু ভুলতে চেষ্টা করল। সারাদিন অফিসের কাজে নিজেকে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করল শ্রীপতি। সহকর্মী যতীশ দত্ত বললে, কি হে চক্রবর্তী, খুব যে মনোযোগ দেখছি! মাসখানেকের মধ্যে আরও একটি প্রমোশন বাগাতে চাও নাকি?

কিন্তু অফিস ছুটির পরে যে ফাঁকা সেই ফাঁকা। সেই শূন্য সংসার। পুঁটলিতে বৈকালী বাজার বেঁধে সবাই ঘরমুখো ছুটছে। কেউ বাসে ট্রামে। কেউবা ট্রেন ধরবে। কারুরই দেরি সয় না, কিন্তু শ্রীপতির আজ তাড়া নেই। তার সব সইবে—সব সইতে হবে।

কোথায় যাবে, কোথায় যাওয়া যায়, ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণটায় দাঁড়িয়ে শ্রীপতি একটু ভাবতে চেষ্টা করল। টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ কালীঘাট, দক্ষিণগামী ট্রামগুলো একটির পর একটি

চ'লে যাচ্ছে। শ্রীপতি কোনটায় উঠল না। কি হবে এত সকাল সকাল আজ বাড়ি ফিরে? কি আছে বাড়িতে? কে আছে? কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে যাওয়া যায়! কিন্তু কারও বাড়িতে গিয়েই কি শান্তি মিলবে? সকলের কাছেই সাবধানে থাকতে হবে শ্রীপতিকে, পাছে নির্মলার কথা তুলে ফেলে তাদের বিরক্ত করে। অথচ আজ তার কথা না তুলে কি পারবে শ্রীপতি; কোন ক্রমেই কি তার কথা ভুলতে পারবে? বন্ধুদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। তারা সবাই ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বিপত্নীক শোকাতুর শ্রীপতিকে তারা করুণা করবে, অনুকম্পা করবে, কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করবে না। কোন বন্ধুপরিবারের সঙ্গেই সেই আগের মত যোগসূত্রটি আর নেই। যার কাছেই যায়, ঠিক যেন কাছে যেতে পারে না—ব্যবধান থেকেই যায়। ঠিক যেন নদীর এপার ওপার দুজনে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে পারাপারের নৌকো নেই, নেই কোন সেতু। সেই সেতু কি ছিল নির্মলা? সংসারের সঙ্গে শ্রীপতির একমাত্র যোগসূত্র?

আরে, শ্রীপতি না?

নারীকণ্ঠে অবাক হয়ে শ্রীপতি ঘাড় ফেরাল। স্কটিশের মল্লিকা বোস--চার বছর একসঙ্গে পড়েছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে দুজনে ছিল যুগ্ম সম্পাদক, সেই উপলক্ষে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অবশ্য সহপাঠীরা যতখানি মনে করত ততখানি নয়। তারপর কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোড় ভাঙল। মল্লিকার লক্ষ্য যতখানি উঁচুতে ছিল, হাত ততদূরে গিয়ে পৌঁছল না। ফলে, অনেকবার ঘা খেল মল্লিকা, অনেককে ঘা দিল। বিয়ে-টিয়ে আর করল না, চাকরি-বাকরি নিয়েই রইল। গোড়ার দিকের প্রায় সব খবরই শ্রীপতি জানত। খবর নেওয়ার একটু আধটু আগ্রহও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় তা আর থাকে নি। মাঝে মাঝে অফিস অঞ্চলে দু-একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু কথা হয় নি। মল্লিকা নিজেই এড়িয়ে গেছে, শ্রীপতিও আর এগোয় নি। কিন্তু মল্লিকা আজ নিজেই এগিয়ে এসেছে।

শ্রীপতি বললে, হ্যাঁ, আমিই। তারপর তোমার খবর কি? কি করছ আজকাল?

মল্লিকা বললে, কি আবার? তুমি যা করছ তাই, চাকরি। খানিকক্ষণ ধ'রে তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। ভিড়ের ভয়ে ট্রামে উঠতে পারছ না, একটার পর একটা ট্রাম ছেড়ে দিচ্ছ, একবার এগুচ্ছ একবার পেছুচ্ছ।

শ্রীপতি একটু হাসল, বললে, তা বটে। ভিড়কে তুমি ভয় কর না?

মল্লিকা বললে, আগে করতুম না, আজকাল করি। বড় ক্লান্তি লাগে। এই দেখ, চারদিকে আবার ভিড় জমছে।

শ্রীপতি বললে, এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না, চল, এগোই।

মল্লিকা তার লিপস্টিক-মাখা ঠোঁট টিপে একটু হাসল, বললে, কোন্ দিকে এগুব, তোমার সঙ্গে এগিয়ে লাভ কি, তুমি তো ফের পিছুতে শুরু করবে?

শ্রীপতি বললে, পিছুবই যে তার কি মানে আছে? চল, একটু চা খাওয়া যাক।

মল্লিকা বললে, চল।

খানিকটা এগিয়ে ম্যাঙ্গো লেনের রেস্টুরেন্টের একটা ছোট কেবিনে গিয়ে বসল দুজনে। দরজার নীল পর্দায় পৃথিবী আড়াল পড়েছে। ঢেকে গেছে যত অতীত আর ভবিষ্যৎ। বর্তমানের এই ক্ষণটুকুই একমাত্র মাহেন্দ্রক্ষণ, পিছনের কথা যেন ইচ্ছা ক'রেই শ্রীপতি তুলল না। এই চপল-চটুল মেয়েটির কাছে সেই দুঃখের কথা ব'লে লাভ কি? আশ্চর্য, তবু কথার অভাব হ'ল না।

মল্লিকা হেসে বললে, তোমার আজ হ'ল কি? চায়ের কাপে আর কোন রস পড়ল না কি?

শ্রীপতি একটু ঠাট্টার সুরে বললে, পড়েছে। সঙ্গসুধা-রস।

কিন্তু সুরটা ঠাট্টাকে ছাপিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাখানেক বাদে বেরুল দুজনে। ট্রাম-বাসের ভিড়টা তখন অনেকটা কমেছে।

মল্লিকা বললে, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

শ্রীপতি বললে, কালীঘাট। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, না বলাই ভাল ছিল। ও যদি ভিন্নপথ ধরে? কিন্তু মল্লিকা তাকে আশ্বস্ত করল।—চল, আমি ওদিকেই যাব ভবানীপুর অবধি, খানিকটা পথ বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

ট্রামের একটি লেডীস সীটে পাশাপাশি বসল দুজনে। যতবার ওর গায়ে গা লাগল ততবার রোমাঞ্চিত হ'ল শ্রীপতি। এই যেন প্রথম নারীস্পর্শ পাচ্ছে। অপূর্ব আগ্নেয় অনুভূতি!

পদ্মপুকুরের মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে মল্লিকা বললে, বেশ।কিন্তু কাটল সময়টা! আশ্চর্য, পৃথিবীতে অভাবিত আনন্দ এখনও জোটে! পুরানো মদের মতই পুরানো বন্ধুত্ব। কি বল? এস না একদিন আমাদের ওখানে।

শ্রীপতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কবে?

মল্লিকা একটু চিন্তা ক'রে বললে, কাল। না, কাল একটু আটকা থাকব। পরশু সন্ধ্যা সাতটায়। মনে থাকবে?

শ্রীপতি ঘাড় নেড়ে বললে, থাকবে।

মনোহরপুকুরে এসে শ্রীপতির চমক ভাঙল। নিজের স্টপেজ তো ছাড়িয়ে এসেছে। ট্রাম থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ফের ধরল হাজরা রোড। ডাইনে হরিশ চ্যাটার্জির ঘিঞ্জি গলি। কিন্তু অদ্ভুত ভাল লাগছে। অদ্ভুত, চমৎকার কথা বলেছে মল্লিকা—পুরনো মদের মতই পুরনো বন্ধুত্ব! কিন্তু নেশাটা চিরনতুন।

কড়া নাড়তেই শঙ্কর এসে দোর খুলে দিয়ে বললে, বাবা কে এসেছে জান?

কে?

দেখই না এসে।

ছেলের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল শ্রীপতি।

মেঝের মাদুরের উপর সাদা পাঞ্জাবি গায়ে যে লোকটি ব'সে ছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীপতির দিকে এগিয়ে এল, বললে, এস ভাই, এমন সর্বনাশ হয়ে গেল আর আমাকে খবরটা পর্যন্ত দিলে না?

নির্মলার পিসতুতো ভাই নিরুপম চাটুজ্জে, সি. পি. গভর্মেণ্টের ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে। সেখানেই থাকে ফ্যামিলি নিয়ে।

শ্রীপতি একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি খবর পাও নি?

নিরুপম বললে, না তো। জানই তো মামাবাড়ির সঙ্গে আমার

আর কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র নিমিই চিঠিপত্র লিখত, তাও ন'মাসে ছ'মাসে। প্রায় মাস চার-পাঁচ আগে একবার লিখেছিল—একুশে আষাঢ় ওর বিয়ের তিথি। সেই উপলক্ষে সবাইকে নিয়ে আমার আসা চাই। সবাইকে নিয়ে আসতে পারি নি। তোমার বউদি সবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে। কলকাতায় একটু কাজও ছিল। খবর না দিয়ে এলাম। ভাবলাম, তোমাদের একটা সার্‌প্রাইজ দেব। কিন্তু তোমরা যে আমার জন্যে এমন চরম সার্‌প্রাইজের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ, তা কি জানি?

নিরুপম ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভাবাবেগ রোধ করল।

ছেলেবেলা থেকে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছে। আপন ভাই বোন কেউ নেই নিরুপমের। নির্মলা ছিল সহোদরার মত।

মেঝের উপর কাগজে মোড়া একটি জিনিসের দিকে চোখ পড়ল শ্রীপতির, জিজ্ঞেস করলে, ওটা কি?

কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলল নিরুপম, মাঝারি আকারের শ্বেতপাথরের ভারি সুন্দর একটি বাক্স। ডালায় লতা আর ফুলের চমৎকার কারুকার্য!

নিরুপম বললে, নিমি নিজেই ফরমায়েস করেছিল। জানই তো শৌখিন জিনিসপত্র চিরকালই খুব ভালবাসত।

এবারও ঠোঁট চেপে ধরল নিরুপম। কিন্তু চোখের জল আর চাপতে পারল না। শ্রীপতি তাকিয়ে দেখলে, মেঝের আর এক ধারে পাতা বিছানায় রঞ্জু আর মিণ্টু ঘুমুচ্ছে। কোলের মধ্যে মুখ গোঁজা শঙ্কুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছছেন যোগমায়া।

কিন্তু আশ্চর্য, শ্রীপতির চোখ এখনও শুকনো। মনে মনে একটু স্বস্তিই বোধ করল শ্রীপতি। অন্যের চোখের সামনে নিজের সজল চোখকে সে আর তুলে ধরতে চায় না। তার জন্যে আছে সারা রাত্রি।

খানিক বাদে নিরুপম বিদায় নিল। অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও থাকল না, বললে, না ভাই। কোন্ মুখে আর থাকব?

বাক্সটাও রেখে গেল নিরুপম, বললে, ওটা নিয়ে গিয়ে আর কি করব? রাখতে হয় রাখো, ফেলে দিতে হয় দাও।

ফেলে দিল না শ্রীপতি। সযত্নে তুলে নিয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া কোন রকমে সেরে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল দোরে। টেবিলের ওপর খুলে রাখল বাক্সটা। দেয়ালে টাঙানো নির্মলার ছোট একখানি ফোটো, স্মিতমুখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীপতি আশা করতে লাগল, প্রতীক্ষা করতে লাগল, ছেঁড়া হারের মুক্তার মত একটি একটি ক'রে অশ্রুবিন্দু এবার সুন্দর গয়নার বাক্সটির মধ্যে ঝরতে শুরু করবে। কারও চোখকে আর লজ্জা নেই, ধরা পড়বার ভয় নেই কারও কাছে। আজ বিবাহ-বার্ষিকীর রাতে প্রিয়ার গলায় চিরবিরহীর অশ্রুর মালা দুলিয়ে দেবে শ্রীপতি।

কিন্তু আশ্চর্য, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটল। এক ফোঁটা জল দেখা দিল না চোখে। সমুদ্র শুকিয়ে কি মরুভূমি হ'ল?

পরশু, পরশু সন্ধ্যা সাতটায়। মনে থাকবে?

কে যেন ফিসফিস করছে কানের কাছে।

শ্রীপতি মাথা নাড়ল। না, অন্তত আজকের রাত্রির জন্য সে কথা কিছুতেই মনে রাখতে চায় না শ্রীপতি, কিছুতেই মনে আনতে চায় না।

কিন্তু সেই স্পর্শ? জীবন্ত নারীর অদ্ভুত সেই আগ্নেয় স্পর্শ। তা যে সমস্ত সত্তায় জ্বলছে।

তাও নীরবে। শুধু এক ফোঁটা জল। তাতে সব আগুন নিবে যাবে।

কিন্তু কোথায় সেই অমৃতবিন্দু?

টিকটিক ক'রে শব্দ হচ্ছে ঘড়ির। একটু একটু ক'রে কাঁটা ঘুরছে।

কাগজে আঁকা নির্মলার চোখ শ্রীপতির শুকনো পাথরে তৈরি চোখ দুটির দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে।

আলো নিবিয়ে দিল শ্রীপতি। ঘরের গুমট গরম তবু যায় না। অন্ধকারে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে দরজার খিল খুলে দিলে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

আবিষ্কার

ব্যাকুল প্রতীক্ষা-ভরা বহুদিনকার
বহু ব্যথা, বহু দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশার
তিমির রজনী-প্রান্তে এসে
এতদিনে ধরা দিলে শেষে।
প্রাণের নিভৃতে জমা পুঞ্জিত সংশয়
সহসা টুটিয়া গেল, আজি মোর হৃদয়ের জয়।
যেমন আষাঢ় মাসে
আকাশের এক চোখে জল ঝরে, অন্য চোখ হাসে,
একটি প্রশ্নের পর সহজে তেমনি
মেলি মোর মুখপানে ছলছল সজল চাহনি
হাসি-হাসি মুখে,
ঈষৎ কম্পিত স্বরে অনুরাগ-সুখে
কহিলে আগ্রহ-ভরা অভিমান ভরে—
'তবু ভাল, জানার সময় হ'ল এতদিন পরে ?'

আমার মনের যত শঙ্কা-দোলা চঞ্চল কামনা
ধরিল মোহিনী মূর্তি, মুখে কোনো কথা যোগাল না।
কে যেন অদৃশ্য হস্তে দিয়ে গেল জ্বালি
অনাস্থার অন্ধকারে বিশ্বাসের রঙিন দীপালি।
হৃদয়ের মরু-সাহারায়
মঞ্জরিল তৃণগুল্ম সবুজের খেয়ালী খেলায়।
ক্ষোভ এল লোভ নিয়ে, বক্ষোমাঝে জাগিল বিস্ময়—
তবে যা ভেবেছি মনে বুঝি মিথ্যা নয়।
মনে হ'ল, আমি যেন সঙ্গীহীন একা কলম্বাস
অকূল-সাগর-যাত্রী, চারিদিকে মহা জলোচ্ছ্বাস,
চলেছি তাহার খোঁজে আভাসে জেনেছি প্রাণে যারে
বিশ্বাসের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করি রাত্রি অন্ধকারে।
তারপর কোনো এক সুপ্রভাতে হেরিনু শিহরি
নতুন দ্বীপের বুকে কখন ভিড়েছে মোর তরী।

তাই ভাবি মনে,
প্রেমের আগ্নেয়গিরি এতদিন অতি সযতনে
কেমনে গোপন ক'রে রেখেছিলে সকল সময় !
বহ্নিদাহ বুকে ল'য়ে তিলে তিলে হ'য়ে গেছ ক্ষয়,
তবু সে কাহিনী
জানিতে দাও নি কারে হে অভিমানিনী।
দ্বন্দ্ব-দোলা প্রশ্ন নিয়ে কেটে গেছে নিদ্রাহীন নিশা,
কখনো বিশ্বাস কভু অবিশ্বাসে মিশা
উতলা ভাবনা নিয়ে কতবার ছুটে গেছি কাছে ;
কারো চক্ষে ধরা পড় পাছে,
দূরে দূরে থেকে তাই সঙ্গসুখে করেছ বঞ্চিত,
চিত্ত মোর র'য়ে গেছে তেমনি তৃষিত।
তবু সে সতর্ক চলা, চারিদিকে চেয়ে কথা বলা,
আঁখি-তারা কভু স্থির, কখনো উতলা,
অকারণে হেসে-ওঠা, নিস্পৃহ জিজ্ঞাসা,
গম্ভীর কথার মাঝে অর্থহীন ভাষা,
এরই ফাঁকে ফাঁকে তুমি দিয়ে গেছ ধরা
ব্যর্থ করি—আপনারে ঘেরি তব জাগ্রত প্রহরা।

এখন ও-কথা থাক্, আর কথা নয়,
কাহিনী সৃষ্টির তরে এসেছে সময়।
অতীতের যত দ্বন্দ্ব এখন আনন্দে হোক লীন,
কি চেয়েছি, কি পাই নি আজ নহে হিসাবের দিন।
নব জীবনের পথে জয়যাত্রা শুরু হোক তবে,
কে কি বলে তাহা শুনে বল কার কি বা লাভ হবে ?
বিচার না ক'রে যারে কর নি গ্রহণ
মাঝপথে লোকলাজে তাহারে দিয়ো না বিসর্জন।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

বিসদৃশ

নার্সিং হোমের ১২ নম্বর কেবিন লোকে লোকারণ্য। তিন মেয়ের পরে এক ছেলে, ফলে শ্বশুর-বাড়ি, বাপের বাড়ি, মামার বাড়ি, মামাশ্বশুর-বাড়ি, এবং সম্পর্কিত ও নিঃসম্পর্ক বন্ধুবান্ধব সবাই দেখিতে আসিয়াছে। কেহ আসিয়াছে দেখিয়া খুশি হইবার জন্ত, কেহ আসিয়াছে তাহাদের আগমন দেখাইয়া নবজাতকের মাতা ও পিতাকে খুশি করিবার জন্ত।

দেখিবার মত অবশ্য বিশেষ কিছু নহে। সদ্যোজাত শিশু যেমন হইয়া থাকে সচরাচর, তেমনই। মাথায় চুল নাই, মুখে দাঁত নাই, সমস্ত মুখে চোখে দেহে সৌন্দর্যের চিহ্নও নাই। থাকার কথাও নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন, নবজাত শিশু সাধারণত বাঁদরের মত দেখিতে হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম নাই।

দেখিবার মত যাহা আছে তাহা প্রসূতির আনন্দদীপ্ত মুখ। ছিপ্‌ছিপে একহারা সুন্দরী মেয়েটি, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর কোলে পুত্রসন্তান পাইয়াছে, তাহাও পর পর তিনটি মেয়ের পরে। ছেলে সুন্দর অথবা কুৎসিত তাহা চিন্তা করিবার অবসর তাহার নাই, প্রয়োজনও নাই।

এদিকে কিন্তু ছেলে কাহার মত হইয়াছে সে সম্বন্ধে গবেষণা ও জল্পনার অন্ত নাই। বাপ বেচারীকে ঘিরিয়া একদল বলিতেছে, অবিকল বাপের নাক মুখ চোখ চিবুক, এমন কি, চাহনিটুকু পর্যন্ত পাইয়াছে। আর একদল বলিতেছে, বাজে কথা, ছেলের মুখ ঠিক মায়ের মত, মাথায় চুল গজাইলেই সাদৃশ্য অক্লেশে পরিলক্ষিত হইবে; আপাতত টাক বলিয়া বাপের মত দেখাইতেছে। প্রথম দল ছেলের বাড়ির, দ্বিতীয় দল ছেলের মামার বাড়ির লোক।

ইহা ছাড়াও আর একদল আছে, তাহাদের কাহারও মতে ছেলের মুখ তাহার মাসির মত, কাহারও মতে পিসির মত, অথবা ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদামশায় অথবা দিদিমার মত। যে সত্যটা সবাই জানে অথচ প্রকাশ করিতেছে না তাহা এই যে, ছেলের মুখ এবং অবয়ব অনেকটা বানর-শিশুর মত। নূতনত্ব কিছুই নাই, কারণ পৃথিবীর যাবতীয় সাদা, কালো, পীত এবং পাঁশুটে বর্ণের শিশু তাহাদের পূর্বপুরুষের মত দেখিতে, যে

পূর্বপুরুষ সহসা কি এক খেয়ালে গাছ হইতে নামিয়া অনভ্যস্ত দুই পায়ে ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ডারুইন সাহেব জগৎজোড়া নাম কিনিয়াছিলেন।

যে যাহাই বলুক, মা একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে অতলস্পর্শ স্নেহ লইয়া শিশুর মুখের দিকে। যেন এত রূপ পৃথিবীতে আর কাহারও হয় নাই, হইবেও না।

নার্স ঘরে ঢুকিয়া লোক দেখিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিল, বড্ড ভিড় করছেন আপনারা, অত লোক একসঙ্গে থাকবেন না। উপস্থিত জনসমুদ্র একটু সরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু বাহির হইবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। নার্স কাছে গিয়া মায়ের পাশ হইতে শিশুটিকে তুলিয়া লইল। মুখে নার্সজনোচিত স্থির হাসি।

ক্ষণপরেই কিন্তু স্থির হাসি বিচলিত হইয়া ত্রস্ততায় পরিণত হইল। ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে শিশুর দিকে তাকাইয়া নার্স দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিল, পিছন পিছন প্রবেশ করিলেন ডাক্তার বোস। প্রশ্ন করিলেন, কে চার্জে ছিল?

নার্স মুখ নীচু করিয়া বলিল, সুহাসিনী।

পরুষকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, এক্ষুনি ঠিক ক'রে দাও। আর সুহাসিনীকে আমার আপিসে পাঠিয়ে দাও। অত্যন্ত কেয়ারলেস্। এমনই ক'রে মেটারনিটির কাজ করা চলে না। ফের এ রকম হ'লে স্যাক্ করব।

ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ নার্সও ছেলে কোলে লইয়া গেল। বিমূঢ়া প্রসূতি ভীতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, শিশুর অনুপস্থিতিতে তাহার রূপের আলোচনাও ব্যাহত হইল।

নার্স ফিরিল একটু পরে। শিশুকে মায়ের কাছে শোয়াইয়া দিয়া কহিল, উঃ, মা মেরি রক্ষা করেছেন!

সকলে কলকণ্ঠে বলিল, কি হয়েছিল?

নার্স বলিল, ছেলে বদল হয়ে গিয়েছিল ২১ নম্বরের সঙ্গে। ভাগ্যিস আমি দেখেছিলাম সময়মত!

ছেলে বদল হওয়া যথাসময়ে ধরা না পড়িলে কি হইত—এই কথা

ভাবিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। শুধু প্রসূতি ক্ষণেকের জন্য চোখে মুখে ভয়-বিস্ময় ফুটাইয়া পর-মুহূর্তেই নূতন শিশুকে অসীম স্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইল, যেমন করিয়া কিছুক্ষণ আগে অপর একটি শিশুকে লইয়াছিল।

শিশু কাহার মত দেখিতে এ আলোচনা আর কেহ তুলিল না।

কিন্তু তুলিলেও কোনও ক্ষতি হইত না। প্রথম ও দ্বিতীয় শিশুটির মধ্যে রূপগত বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তেমনই টাকমাথা, তেমনি মর্কটজনোচিত মুখভাব, পৃথিবীর যাবতীয় শিশুর যেমন হইয়া থাকে।

শ্রীআর্যকুমার সেন

নাগরিক কাব্য

হাওড়ার ব্রিজে সকাল হয়েছে চকচক করে পোলের ফ্রেম,
গঙ্গার জল লাল হয়ে ছিল ঘোলা ক'রে দিল স্টীমার লঞ্চ।
ট্রেন এসে গেছে অনেকগুলোই যাত্রীরা ছোটে উর্ধ্ব শ্বাসে
মানুষে ও মালে বারুদের মত বাসে ট্রামে হ'ল ঠাসা ও গাদা।
তারপর তারা ঢোকে তাড়াতাড়ি হাওড়া পোলের বিরাট হাঁ-তে
গমগম আর গরগর আর ঘড়ঘড় করে কোন্ সে দানা
লক্ষ মানব ছুটিয়া চলেছে দিনের প্রথমে তাহারই টানে
লালা ঝ'রে পড়ে নয়াদানবের লকলক করে লোলুপ জিব,
হাওড়ার ব্রিজে সকাল হয়েছে চকচক করে স্টিলের ফ্রেম।

বড়বাজারেতে দুপুর হয়েছে, ডালহৌসিতেও হয়েছে তাই,
ডাব আর গলা এক সাথে কাটে লক্ষ জীবন একের হাতে।
ভুঁড়ির ঘামের নোনা-নোনা জল ঝরিয়া পড়িছে মাটির 'পরে
মিশিয়া গিয়াছে বুঝিতে পার না অনেক চোখের নোস্তা জল,
রাইটার্স বাড়ি, সেক্রিটরেট লাল টকটকে দাঁড়িয়ে আছে,
ঠকঠক ক'রে ঠোকাঠুকি খেয়ে মর ঘুরে ঘুরে মাথাটি খুঁড়ে,
কোন্ পকেটেতে প'ড়ে হবে মাত্ নগরের এই ক্যারাম-বোর্ডে!

পিচ-ঢালা পথ চকচক করে হাওড়া পোলের ফ্রেমের মত,
বড়বাজারেতে দুপুর হয়েছে, ডালহৌসিতেও হয়েছে তাই।

চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যা নেমেছে লাল নীল সাপ-নিয়ন আলো,
বেগুনে আলোয় ক্লাউন গাউন ব্লাউজ বডিজ যৌনলীলা,
মায়ের চিতার আগুনে ধরায় সিগারেট যেন পেত্নী-প্রিয়া,
গান্ধীর ছবি ম্লান হ'ল হেথা জলজল করে চিত্রনটী।
নয়াদানবের পাঁজরে পাঁজরে ছুটিয়া চলেছে নানান কার।
আলো জ্বলে আলো নিভে যায় বুঝি ধকধক করে কাহার নাড়ি!
মনুমেণ্টের ওই কোণটায় কোন্ সে বৃদ্ধা কাঁদিছে ব'সে,
চোখের জলেতে ভেজা গালে তার গ্যাসের আলোক উজলি ওঠে।
চকচক করে বুড়ীর কপোল হাওড়া পোলের ফ্রেমের মত,
চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যা নেমেছে লাল নীল সাপ-নিয়ন আলো।

নগরের বুকে রাত্রি নামিল জলজল করে লক্ষ আঁখি,
নয়াদানবের কামনার মত জ্বলিয়া উঠিল লক্ষ বাতি।
গণিকার মাতা কন্যারে তার সাজিয়ে পাঠায় পথের ধারে
পাতিহাঁস যেন ডিম পেড়ে পেড়ে অমলেট ক'রে খাচ্ছে ভেজে,
বাঁশিতে ফুঁ দেয় কেউটে সাপেতে মাথায় তাহার নাচিছে ব্যাঙ।
রাত্রি নিঝুম জলজল করে নয়াদানবের লক্ষ আঁখি
আকাশের বুকে লক্ষ তারারা আঁখির ভাষার প্রতিধ্বনি।
মাতা ভাগীরথী পচা ডোবা হয়ে প'ড়ে আছে ঠিক ছাতার মত,
গভীর রাত্রি নগর-দানব সগর্বে খোঁজে শিকার তার
পুরু ঠোঁট দুটো জিব দিয়ে চাটে, নাক দিয়ে পড়ে গরম শ্বাস।
মানুষের ছেলে দেয়ালায় কাঁদে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে,
মরা জ্যোৎস্নার ম্লান আলো পড়ে, জ্যোৎস্না তো নয় চাঁদের বমি।
রাত্রি নিঝুম ধরণী ঘুমায়, দৈত্যপুরীটা জাগিয়া ওঠে,
হাওড়া পোলের স্টিলের ফ্রেমটা চকচকচক করে না আর,
লৌহ-ফ্রেমের সিল্যুট ছায়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী সম।

হাওড়ার ব্রিজে ভোর হয় হয়, ফরসা হয়েছে আকাশ নীল
জ্বলজ্বল করে ছুটি হীরে তারা ছলছল করা করুণ আঁখি।
নগরের এই কদর্যতা ও মিথ্যা মন্দ শঠের মাঝে,
তবু মোরা খুঁজি সত্য ও শিব সুন্দরে ভাই ক্ষণে ক্ষণে।
নার্সারি হোমে যদিও আমরা টবের বেড়েতে বন্দীচারা,
এই ধরণীর উদার বক্ষে বনস্পতির ভূমিকা মোরা,
উত্তর আর পূর্ব মেঘের নূতন বারতা আমরা কব,
মনের শাখায় গাহিছে কোকিল আশার ময়ূর পেখম মেলে।
ময়াদানবের ফসিলের বুকে ফুটিয়া উঠিবে মানব-ফুল
বিলাবে গন্ধ, ফলাইবে ফল—নার্সারি হোমে আজকে যারা।
রাত শেষ হবে, ভোর হয় হয় রাঙা হয়ে ওঠে নভের নীল,
হাওড়া ব্রীজের স্টিলের ফ্রেমটা রাঙাইয়া দেয় নতুন আলো,
রেঙে-ওঠা ফ্রেম—ফ্রেম সে তো নয়, সিন্দুরে রাঙা সতীর সিঁথি,
কলকল ক'রে বহিছে গঙ্গা আমার মায়ের করুণা হয়ে
জ্বলজ্বল করে ছুটি হীরে তারা ছলছল করা উজল আঁখি
হাওড়ার ব্রিজে ভোর হয় হয়, রাঙা হয়ে ওঠে স্টিলের ফ্রেম।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আবোল-তাবোল

কত কথা অতীত ও আধুনিক
কর্কশ কাক আর কুহু পিক
ভিড় ক'রে জাগে মোর চিত্তে।
শুকিয়ে বক্ষ কভু সাহারা
কভু ছলছল টইটুম্বুর।
ইতিহাস লিখিয়াছে যাহারা
ভেবে কি দেখেছে তারা সব দিক
খাড়া রেখে যুক্তির পাহারা
ঠিক ঠিক রেখে ডায়ালেকটিক।

আজ যা করেছে রুশ ভালুকে
শুধিয়ে দেখ না সেখ কালুকে
ঠিক তাই ঘটেছিল মক্কায়
যাযাবরদের সেই তালুকে;
হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া জনতা
উড়িয়ে পপ্তা ব্যোম ছক্কায়—
বড়ে টিপে মাত্ করে কিস্তি
মাত্র আড়াই লাখ ভিস্তি
এনেছিল মহামারী সমতা
ধুয়ে ফেলে সব মায়া-মমতা
এক ক'রে পদ্মে ও শালুকে।

[ক্রমশ]

ব্যা-ব্যা-ব্যা—

সকাল ছয়টা।

শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এ পর্যন্ত থামে নাই। থামিবার কোন লক্ষণ নাই। দেবীচরণ উঠিয়া নীরবে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বার কয়েক চক্ষু রগড়াইয়া লইল। কোন ফল হইল না। সম্মুখে গাঢ় ঘোলা জলের জমাট আড়াল ভেদ করিয়া পিছনের দিকটা যেন তার সমস্ত বিভীষিকা সহ মুখব্যাদান করিয়া উদ্যত হইয়া আছে।

মুহূর্ত বিলম্ব করা চলে না আর। গত রাত্রিতে পাড়ার বারোয়ারী কালীপূজার পাঁঠাবলি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিবার ফলে উঠিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘ একটা হাই তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেবীচরণ আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, মা—মা—দয়াময়ী! পরক্ষণে একটা গামছা টানিয়া লইয়া প্রায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এক বাটি চিড়া খাইয়া পনরো মিনিটের মধ্যে ভাঙা ছাতাটা লইয়া আর একবার দেবীচরণ ডাকিয়া উঠিল, মা—মা—দয়াময়ী!

বলিয়া শরীরটাকে যেন একটা ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিল জলের মধ্যে। একটানা কান্নার সুরের সঙ্গে মনের সুরটা এবার মিশিয়া যাওয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে চলিতে লাগিল দেবীচরণ।

এক ঘণ্টা ছাত্র পড়াইয়া আবার যখন দেবীচরণ রাস্তায় নামিল, বৃষ্টি তখন কমিয়া গিয়াছে।

লৌহ-ব্যবসায়ী শম্ভু দাসের কাছে কৈফিয়ৎ চলে না, দেবীচরণ জানে। তবু বলিল, বৃষ্টির জন্য দেরি হয়ে গেল।

বৃষ্টি! শম্ভু দাস ফাঁকি ধরিতে ওস্তাদ।—বৃষ্টি তো এক ঘণ্টা হ'ল থেমে গেছে মশায়! আপনার বৃষ্টি বুঝি চলছেই? তা চলুক, কিন্তু আমার কাজও চলা চাই।

দেবীচরণ আর জবাব না দিয়া কাজে হাত দিল। খাতা এবং চিঠি লেখার কাজ তাহার দশটার মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। কিন্তু শম্ভু দাস ছুটি দিল না।

একটু পোস্ট-আপিসে যান তো।

দেবীচরণ মৃদুস্বরে বলিল, দশটায় ওদের ওখানে না গেলে আবার—

সে আমি জানি নে।—শম্ভু ধমক দিয়া উঠিল।—যেমন দেরিতে এসেছেন তেমনই দেরিতে যাবেন।

কাজেই শম্ভু দাসের দোকান হইতে প্রায় এগারোটায় বাহির হইল দেবীচরণ। নয়নলালের দোকানে ঢুকিতেই সে দাঁত খিঁচাইয়া অভ্যর্থনা করিল, এই আপনার ঘুম ভাঙল নাকি মশায়? জানেন আমি এখন খেতে যাব, এখন এলেন ফাঁকি মারতে!

দেবীচরণ যখন বাড়ি ফিরিল, তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আড়াইটার মধ্যেই আবার বাহির হইতে হইবে। জামা ছাড়িয়া প্রথমেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, মা—মা—দয়াময়ী!

কোন রকমে নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া দিয়া আড়াইটার সময় আবার বাহির হইয়া পড়িল দেবীচরণ।

ফিরিল রাত্রি দশটায়।

সওদাগরী হিসাবের খাতা ছিল কয়েকখানা বগলে। খাতাগুলি নামাইয়া রাখিয়া জামা খুলিয়া শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া দেবীচরণ বসিয়া পড়িল। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ যেন গোঙাইয়া উঠিল, মা—মা—দয়াময়ী!

ঠিক এমনই আর্তনাদের অস্পষ্ট স্মৃতি চকিতে একটা ধাক্কা দিল দেবীচরণকে। কোথায়, কবে যেন শুনিয়াছে। ম্যা—ম্যা—ম্যা!

মনে পড়িয়া গেল। গত রাত্রিতে বলির সময়। ব্যা—ব্যা—ব্যা।

শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া উঠিয়া পড়িল দেবীচরণ। অদৃশ্য শত্রুকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল যেন। না, না, ব্যা-ব্যা সে করিবে না আর। না। যুদ্ধ—যুদ্ধ করিবে সে। বিনা যুদ্ধে এক চুলও ছাড়িয়া দিবে না।

কাহার যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দুই গালে ঘুষি মারিতে লাগিল দেবীচরণ। শম্ভু দাস, নয়নলাল ইত্যাদি সকলেই একে একে মার খাইতে খাইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। নিজের জীবনটাও—

কর্কশ স্বরে স্ত্রীকে হুকুম দিল দেবীচরণ, খেতে দাও।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া গত কয়েক দিনের দৈনিক সংবাদ-পত্রের উপর অভ্যাসবশে প্রত্যহ একবার চোখ বুলাইতেছি। মোটা মোটা হরফে ছাপা হইলেও কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি-চেষ্টার সমারোহ এবং পারস্যের তৈলখনির কার্যবিরতি ঘোষণা মনকে ততটা আবিষ্ট করিতেছে না, যতটা করিতেছে মহাভারতের আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভীষ্মপর্বে কংগ্রেস-সারথি নেহরু-নারায়ণের ম্যানিফেস্টো-গীতা। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সীমান্তে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশের পারস্পরিক অনুযোগ-অভিযোগও উক্ত ভগবদ্‌ভাষণের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে না। এই নবগীতা যদি কংগ্রেসীরা অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে তাঁহাদের কার্য ও শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোনও ভয় নাই। ইহাতে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি যোগের অপূর্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা আছে এবং কর্মীদের পক্ষে গান্ধীগতচিত্তে ফলস্পৃহাশূন্য হইয়া কাজ করিবার আহ্বান আছে। অনুন্নত সম্প্রদায় ও উদ্বাস্তুদের শিক্ষা, জীবনমানবৃদ্ধি ও পুনর্বাসন, সমগ্র দেশের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংবর্ধন ও সংরক্ষণ, যৌথকৃষি ব্যবস্থা ও কুটিরশিল্প প্রবর্তন, মূল্যবৃদ্ধি-রোধকল্পে নিয়ন্ত্রিত বণ্টন, রেল-ব্যবস্থার উন্নয়ন, মহামারী নিবারণ এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছু সম্বন্ধে সুব্যবস্থার নির্দেশ আছে। কিন্তু এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইবে, তাহার কোন ভরসা আছে কি? যে মহাত্মা গান্ধীর জয়োচ্চারণ করিয়া এই ম্যানিফেস্টো প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার সারা জীবনের আদর্শ ও উপদেশ, ব্যক্তিগত সাধনা ও শেষ পর্যন্ত আত্মত্যাগ যে দেশকে তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাসের অধিক তাঁহার আদর্শে সঞ্জীবিত রাখিতে পারিল না—তাঁহার একান্ত ভক্ত শিষ্যেরাই যেখানে লোভ ও লাভের বশবর্তী হইয়া আত্মাভিমান মোহ ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া

গেলেন, সেখানে এই দোহাই-পাড়া নির্দেশে কোনও কাজ হইবে কি? হাজার হাজার বৎসর আসল গীতার পাঠ লইয়াও যে দেশ আত্মস্থ হয় নাই,—হয় নাই নিশ্চয়ই, কারণ, হইলে ভারতের এই লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ঘটিত না,—নির্বাচন-যুদ্ধের মুখে এই ফাঁকা আওয়াজে তাহারা বিচলিত হইবে কি? পুরা চার বৎসর হইতে চলিল ভারতের শাসনভার নেহরু-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোম্পানির হাতে আসিয়াছে, ইহার মধ্যেই সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার অবধি নাই। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই ইংরেজ-শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্তরিক কামনা করিতেছে। শিক্ষিত লোকেরা গদির সুখ কল্পনা করিয়া পরস্পর ছেঁড়া-ছিঁড়ি করিতেছেন, পার্টির উপর পার্টি গড়িয়া নির্বাচন-যুদ্ধ-প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছেন। যে অদৃশ্য মুনাফালোভী কালোবাজারী সম্প্রদায়ের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া শাসক এবং জনসাধারণ উভয় সম্প্রদায়ই আত্মদোষক্ষালন করিতেছেন তাহারা আজিও অদৃশ্যই থাকিয়া যাইতেছে, প্রকাশ্য দিবালোকে তাহাদের একজনেরও বিচার হয় নাই। কিন্তু রেলের পকেটমারের মত তাহারা যে আমাদের আশেপাশেই আছে, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশের লোকের মন ধীরে ধীরে যে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রমাণ জেলায় মহকুমায় অনুষ্ঠিত ছোটখাট নির্বাচন-যুদ্ধফলেই মিলিতেছে। অথচ আমরা জানি, দেশের চিত্তের প্রধান অংশ এখনও কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেসের পরাজয়ে তাহারা লজ্জিত হয়, কংগ্রেসের অন্যায় দেখিলে কংগ্রেসকে নিজের মনে করিয়া অনেকের মাথা হেঁট হয়। এই বিপুল নীরব সমর্থন ও সহানুভূতির সুবিধা কংগ্রেসীরা গ্রহণ করেন নাই; ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। তাঁহারা শাসন-সংসদ ও সেক্রেটারিয়েটের আড়ালে নিরুদ্বেগে আত্মগোপন করিয়াছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও জনতার সম্মুখীন হন নাই। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাধনায় দেশের সঙ্গে যে প্রাণের সম্পর্ক ইঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মাত্র চার বৎসরের পদগৌরবে-গর্বিত উপেক্ষায় তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। একমাত্র সেই কারণেই কংগ্রেসের এই দুরবস্থা,

নহিলে নূতন করিয়া ম্যানিফেস্টো জারি করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

* * *

কিন্তু যাহা ঘটিলে এই নূতন ইস্তাহারও লোকে নূতন বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারিত, তাহা হইতেছে কর্তৃপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন। তাহার কোন চিহ্নই কোনও দিক দিয়া দেখা যাইতেছে না। শীতল ম্যানিফেস্টোর পিছনেও গদিয়ান জওহরলালের মনের উত্তাপ প্রকাশ পাইতেছে। নহিলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ব্যাপারে তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, পরে পূর্ব-ভারতবর্ষের মানভূম-অঞ্চলের উপর অবিচার এই বলিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন না যে, প্রত্যন্ত দেশের বহুভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ইস্তাহার খাটিবে না। যিনি কাশ্মীর-সমস্যায় সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়া আছেন, তিনিই মানভূম-আন্দোলনে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি হইতে পারে!

* * *

সুতরাং বিবাহে প্রীতি-উপহারের যে মূল্য, এই নির্বাচন-ম্যানিফেস্টোকে তাহার অধিক মূল্য কেহ দিতে না চাহিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে কি? গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক গঠন-পরিকল্পনাই আমরা দেখিলাম, কিন্তু সকল 'পরি'কল্পনাই যে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তির 'উপরি'পাওনায় পর্যবসিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও তো আমরা এই আধনিমীলিত চোখেই দেখিতে পাইতেছি। কংগ্রেসকে আবার মেঘমুক্ত সূর্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমান করিয়া তুলিতে হইলে, জনসাধারণের প্রীতি ও প্রেমের প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, চারি হাজার সুনির্বাচিত শব্দে গ্রথিত ইস্তাহার জারি করিলেই চলিবে না; কর্মীদের হাজারে হাজারে গদি হইতে নামিয়া জনতার মধ্যে মিলিতে হইবে; তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার

ভাগ লইতে হইবে। গান্ধীজী যাওয়া ইস্তক সেই কার্য ইঁহারা করেন নাই, শুধু পঙ্গপালের মত উড়িয়া উড়িয়াই বেড়াইয়াছেন। এখনও সময় আছে, কাজের ক্ষেত্রে আবার ইঁহারা নামিয়া আসুন, খালি পায়ে খালি গায়ে গদিতে বসিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন না করিয়া আবার দেশের মাটির মানুষ হইয়া দাঁড়ান। তবেই কংগ্রেস জয়যুক্ত হইবে।

—

ইটনের খেলার মাঠে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত—এ কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়াছি। কলিকাতার গড়ের মাঠের ব্যাপার দেখিয়া আজ আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, গড়ের মাঠে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধের ভিত্তি স্থাপিত। এগারো জনের খেলা লইয়া এগারো লক্ষ লোকের এই আত্মহারা বিহ্বলতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের কি নিদারুণ দৈন্যদশা প্রকট করিতেছে, তাহা ভাবিলে লজ্জিত হইতে হয়। ট্রামে-বাসে স্কুলে-কলেজে কলে-কারখানায় ঘরে-বাইরে এই চরিত্রহীনতারই প্রকাশ আমরা দেখিতেছি। ইংরেজ রাজত্বে এবং অন্যান্য সঙ্কটকালে যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়াছি, আজ তাহাই বোমা ও বন্দুকের গুলিরূপে আমাদের নিজেদের উপরেই বর্ষিত হইতেছে—কাহারও কাছে নালিশ জানাইবার উপায় নাই। এই অবস্থার প্রতিকার আমাদের খেলার মাঠেই হইতে পারে, যদি জাতির নেতা ও শিক্ষকেরা সহৃদয়তার সঙ্গে এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। পুলিস এবং ঘোড়সওয়ার দিয়া তাড়া করিলেই এ ব্যাধি সারিবে না; বিদ্যালয় এবং খেলার মাঠের স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটাইতে পারিলেই এ ব্যাধির উপশম হইবে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, কর্তৃপক্ষ যদি এই সঙ্গে খেলার মাঠের দিকেও একটু নজর দেন তাহা হইলে আমাদের এই গড়ের মাঠই একদিন বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্যের ভিত্তি হইতে পারিবে।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দীর্ঘকাল পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। ১৯০৭ সনে শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক নেপালে বাংলা সাহিত্যের এই মহামূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হয়, ১৯১৬ সনের জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩২৩) পুস্তকখানি সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া বাহির হয়। আজ ঠিক ৩৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। এই পুস্তকে আদিমতম বাংলায় লেখা সাড়ে ছেচল্লিশটি গানের পদ আছে—বাংলা ভাষার ইহার পূর্ববর্তী রূপ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরে এই পদগুলির ভাষাতত্ত্ব ও তত্ত্বব্যাখ্যা লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক নূতন তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখাইয়াছেন যে, পদগুলির ভাষা বাংলা ছাড়া কিছু হইতে পারে না এবং ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষা যখন সৃষ্ট হয় নাই, তখন এগুলি রচিত হইয়াছে।

আজ হাজার বৎসর পরে বাংলা ভাষার বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে আমরা আশঙ্কা করিতেছি, উর্দু ও হিন্দীর চাপে এই মহতী ভাষা বিনষ্ট হইবে। আমাদের বক্তব্যবিষয়বস্তুর গুরুত্ব যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন এই আশঙ্কা যে অমূলক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই হাজার বৎসরের পুরানো গানগুলির প্রসঙ্গ তুলিতেছি। শুধু কথার ফুলঝুরি বানাইতে থাকিলে কোনও ভাষার চাপ না আসিলেও বাংলা ভাষা বাঁচিবে না, আর আদিমতম যুগের মত আজও যদি মধুসূদনবঙ্কিমরবীন্দ্রনাথ-কাহ্নুপাদলুইপাদের দল এই ভাষাকে স্ব-স্ব সাধনার দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া চলিতে থাকেন তাহা হইলে ইহার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে কোনদিন পারিবে না।

বাঙালী সিদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল উত্তর-

সাধকদের অবগতির জন্য সেই সদ্য-নির্মিত বাংলা ভাষায় গানের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনা সত্য ও বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য ছিল বলিয়া অচিরকালমধ্যে তাহা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, ভাবের ঐশ্বর্য ছিল বলিয়াই ভাষার পঙ্গুতা তাহাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া বিনষ্ট করিতে পারে নাই। আজ আমরা অবাক হইয়া দেখিতেছি যে, সেকালেই সেই ছোট ছোট বাংলা পদগুলির সুবৃহৎ সংস্কৃত টীকা রচিত হইয়াছে এবং তাহা তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া উত্তরাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে. সন্ধান করিলে চীনা ও জাপানী ভাষায়ও হয়তো পদগুলির অনুবাদ মিলিতে পারে।

এ যুগেও আমরা কি দেখিতেছি? বাংলা ভাষার গৌরব বাংলা ভাষাটুকুর জন্যই নহে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বক্তব্য শুনিবার জন্য। আমরা কিছুই বলিব না, আর লোকে হাঁ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে---এইরূপ মেয়েমানুষী আবদার করিলে চলিবে কেন? আদিমতম যুগ হইতে যে অপরিসীম গৌরব বাংলার সাহিত্য পাইয়া আসিয়াছে তাহা বাঙালীর চিন্তাধারার জন্য, সেই চিন্তাধারা যদি শুকাইয়া যায় তাহা হইলে চেঁচাইয়া গগন বিদীর্ণ করিলেও কেহ বাঙালীর কথা শুনিবে না, সেই ধারা যদি বজায় থাকে তাহা হইলে দুর্বোধ্য সন্ধ্যাভাষাতে বলিলেও ভিন্নভাষাভাষী ব্যক্তিরা তাহা শুনিবে এবং শুনিবার জন্য আগ্রহশীল থাকিবে।

"চালাকির দ্বারা কোনও মহৎকার্য হয় না"—স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি যে অন্তত আমাদের দেশে ভুল—'দেশ' সপ্তাহে সপ্তাহে নিঃসংশয়ে তাহা প্রমাণ করিতেছেন। "রূপময় ভারত" নামক যে ধারাবাহিক প্রবন্ধে চমৎকার ছবি সহযোগে ভারতের নানা আদিম জাতির বিবরণ প্রচারিত হইতেছে, তাহা একরূপ মহৎ কার্যই বলিতে হইবে। লেখক যে স্বয়ং সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া এই সকল আদিম জাতির মধ্যে বসবাস করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, এতখানি দাবি

আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে করি না। তিনি ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের রচনা হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিতেছেন, আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমাদের দাবি এইটুকু যে, অনুগ্রহপূর্বক তিনি উৎসস্থলগুলির উল্লেখ করিবেন। চালাকি করিয়া নিজের নাম জাহির করিবেন না। তিনি কিন্তু বেমালুম গোমুখীর সন্ধান গোপন করিয়া প্রতিদিন মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া চলিতেছেন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, সুতরাং তাঁহার এই চালাকি ভাঙিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। অন্তত একটি উৎসের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র-রচিত ও ১৯৪৯ সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'আসামে অরণ্যচারী' পুস্তকের ৯৬ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠায় গারো জাতির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই বৎসরের ১লা আষাঢ়ের 'দেশ' পত্রিকায় "রূপময় ভারত"-বিভাগে "আসামের আদিবাসী গারো জাতি" প্রবন্ধে যায় ভাষা স্থানে স্থানে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। নলিনীবাবুর ঋণ স্বীকার করিলে প্রবন্ধের মূল্য যে আরও বৃদ্ধি পাইত, এই বোধ লেখকের জাগুক—ইহাই কামনা করি।

—

আষাঢ় মাস বলিতে আকাশ-ঢাকা কালো মেঘ এবং অবিশ্রান্ত ধারা—ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। পথঘাট ও চারিপাশের নির্জনতার সহিত ভেকের কলস্বর মিশিয়া মনটা কেমন যেন উদাস-উদাস হইয়া পড়ে। একটি ঘন-বর্ষার দিন আসিলেই মনে হয়, বহুদিন ধরিয়া যাহাকে আশা করিতেছি অথচ যাহার নাগাল পাইতেছি না, তাহাকে যেন সহসা ধরিয়া ফেলিলাম। বরষাই যে এই যুগে আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু শুধু কবিত্ব নয়, আষাঢ় মাস বলিতে মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে মেঘদূত, ল্যাংড়া আম, ফুটবল লীগ এবং গাঙ্গেয় ইলিশ। আজিকার অন্নবস্ত্রসন্ধিৎসু বাঙালী মেঘদূতকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে, ল্যাংড়া আম ও ফুটবল লীগ কদাচ চোখে দেখিয়া থাকে, ইলিশমাছ অধিকাংশ দিনই দেখিতে পায় না। বাঙালীর আশার

আষাঢ় এমনভাবে তিরস্করণী অবলম্বন করিল কেন? এ আষাঢ়কে আমরা বুঝিতে পারি, দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই অথচ ধরিতে পারি না; কেন এমন হইল? যাহা হউক, এবারের আষাঢ় চলিয়া গেল, জল-কাদা ও ঘোলাটে 'পরিস্থিতি'র মাঝখানে আমরা পড়িয়া রহিলাম, ইহাই সত্য কথা।

এই আষাঢ়ের অর্থাৎ বর্ষার প্রশস্তি বেতারে-আসরে প্রতি বৎসর গাহিয়া চলিয়াছেন শান্তিনিকেতনের দল। ইলিশমাছ ও ফুটবল লীগের আওতা হইতে এক শত মাইল দূরে বসিয়া ইঁহারা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে যেভাবে বর্ষার ভজনা করেন তাহাতে আমাদের বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত হইবারই কথা। কিন্তু মোটের উপর আমরা খুশিই হইয়া উঠি—'বর্ষামঙ্গল' নিতান্ত মঙ্গলকর না হইলেও সাময়িক পরিতৃপ্তিবিধায়ক বটে। মাঝে মাঝে নূতন কণ্ঠের সাড়া পাই বলিয়া আরও ভাল লাগে। ইলিশের পেটি তেলের রকমফের হয় বলিয়াই কখনও পুরানো হইয়া যায় না।

কিন্তু আসলে আমাদের বক্তব্য ইলিশমাছ অথবা লীগ খেলা লইয়া নহে, আম লইয়া। আম নাই, কিন্তু আমের স্মৃতি আছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই স্মৃতিকথা পুনর্মুদ্রণ করিয়া বাঙালী আম্ররসিক সমাজের যদি একটু তৃপ্তিবিধান করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিলাম।

সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। না, পাড়ার কুকুর নয়, রেডিও। 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ? এ কি, বিঘোষকের ঘোষণায় বিশ্বাস স্থাপনা করা দুষ্কর হইল যে! কিন্তু অচিরেই আমার সংশয়ের নিরসন করিয়া 'পেলে' শুরু হইয়া গেল, উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিলাম।

সেদিন নিজের জানিয়াও যে রেডিওটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং যদিও তাহারই জন্য গৃহিণী হইতে শুরু করিয়া বাড়ির বিড়ালটি পর্যন্ত সকলেরই নিন্দাভাজন হইয়াছি, তবুও আমি নিজেকে কিছুতেই দোষী বলিয়া মানিতে পারি না। না, কিছুতেই না।

কি করিব বলুন, 'কপালকুণ্ডলা'র রসস্বরূপকে যে আমি অস্বীকার করিতে পারি না, এবং তাহার বিকৃতি যে শুধু আমাদের রসপিপাসা নয়, আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উৎসমূলে আঘাত করে তাহাও যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

রেডিওর রথীমহারথীদের কথা বাদ দিলে যে কোন সাহিত্য-জিজ্ঞাসু জানেন যে, 'কপালকুণ্ডলা' একটি রোম্যান্স, এবং রোম্যান্সের রস অপরিচয়ের আভায় উদ্ভাসিত সুদুর্লভ সৌন্দর্যের রস। 'কপালকুণ্ডলা'র সমস্ত পটভূমিকায় সেই অপরিচয়ের আভা বিস্তার করিয়াছে। কপালকুণ্ডলা তো শুধু একটি মানবীমাত্র নয়, সে সুদূর সমুদ্রমেখলা পৃথিবী, বনরাজিনীলা দিগন্ত ও স্বর্ণদেহবালুবেলার একটি অনশ্বর অংশ। তাহার বিচিত্র গম্ভীর জীবনকে সেই পারিপার্শ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, পাওয়া যায় না। সমস্ত মানবিক সম্বন্ধের পরপারে যে অনন্ত অস্থির সমুদ্র ও অতল গম্ভীর অরণ্যের প্রচ্ছন্নলীলা চলিতেছে, কপালকুণ্ডলা মানবী হইয়াও সেই লীলায় চঞ্চল। ইহাই 'কপালকুণ্ডলা'র রস, ইহাতেই তাহার ট্র্যাজেডি। অ্যাক্‌শন-প্রধান নাটকে, বিশেষত রেডিও-নাটকে, যেখানে দৃশ্যপটের কোন স্থান নাই, সেখানে এই জাতীয় রোম্যান্সরস সঞ্চার করা দুঃসাধ্য। 'কপালকুণ্ডলা'র পারিপার্শ্বিককে জানিবার কোন সুযোগই শ্রোতার নাই, ফলে কোন বাতাবরণ সৃষ্টি হইতে পারে না। যে নির্জনতা ও মুক্ত প্রকৃতি 'কপালকুণ্ডলা'র প্রাণ, রেডিওর শব্দভেদী বাণ তাহাদের হত্যা করিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। সর্বোপরি ভাষা। 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় আমাদের আত্মায় অজানা মাধুর্যের শিহরণ জাগায়। এক বিস্মৃত শতাব্দীর অজানা নায়ক-নায়িকার অন্তর্বেদনা এ তো হোমশব্দসঙ্কুল ঈষৎ অপরিচিত ভাষার মাধ্যমেই অনুভব করা সম্ভব। সুতরাং কপালকুণ্ডলা যখন কোলকাতিয়া চালে, সেকাঞ্চলের স্মার্টগার্লের ন্যায়, 'এস আমার আঁচল ধর' বলিয়া উঠে, তখন রেডিও ভাঙিয়া ফেলা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

চিত্ত হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা বিতাড়ন মানসে একটি সিগারেট ধরাইয়া বসিয়া ছিলাম, এমন সময়, না গোপালদা নয়, জনৈক অধ্যাপক-বন্ধু প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশে উত্তরবঙ্গে (ভা.ই.) গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর কি খবর? ছুটি কেমন—

প্রশ্ন শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ছুটি নয়, বিছুটি। তাঁহার কাছ হইতে সেই অঞ্চলের যে মর্মন্তুদ অবস্থার কথা শুনিলাম, তাহা নিছক 'আঞ্চলিক অবস্থা' ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার কোন উপায় নাই। কারণ আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মফস্বল অঞ্চলেই ওই একই অবস্থার তাণ্ডব চলিয়াছে। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই। মহকুমা শহরের শত-করা আশিজন যুবক এবং ভদ্র যুবক মোদকের নেশায় মাতিয়া বেড়ায়। আগে অনুশীলন এবং যুগান্তর দল এতদুভয়ের মারামারি ছাড়া অন্তত ভদ্র যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের কোন কারণ ছিল না, এখন মেয়েদের স্নানের ঘাট উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের হাতাহাতি বোমাবুঁষিতে পরিণত হয়। সাধারণের বৃত্তি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জমি সকলেরই অল্পবিস্তর পাকিস্তানে পড়িয়াছে এবং ওকালতি-নির্ভর মধ্যবিত্ত সাধারণও কঠিন ঘা খাইয়াছেন; কারণ অনেকগুলি থানা বেহাত হইয়া যাওয়ায় মামলার সংখ্যা এদিকের আদালতে তত আসে না। বস্তুত স্মাগলিংই এখন সবচেয়ে লাভজনক উপজীবিকা। ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অবস্থার অনিবার্য ফলস্বরূপ আসিয়াছে, নারীর অপমান ও শিশুর অনাদর। চিনি কাপড় ইত্যাদি যোগাড় করিয়া স্বভাব-ষণ্ডেলগণ অনাত্মীয় পরিবারের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে এবং সেই সুযোগের কুৎসিত অপব্যবহার করিতেছে। উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যৎহীন বর্তমানও এই পদস্খলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছে। অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার আসিয়া এক-একটি স্বল্পপরিসর বাড়িতে ভিড় করিয়াছে, এবং শালীনতা ও ব্যবধানের অভাবে নরনারীর জীবন হইতে সমস্ত সামাজিক সম্ভ্রমবোধ ও ভদ্রতা দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে। এ ছাড়াও আছে শিশুরা। তাহাদের আহার নাই, যত্ন নাই, শিক্ষা নাই, কিন্তু

এই অবস্থায় তাহাদের দুর্বল দেহে সংসারের দুর্বহ ভার চাপিয়াছে। মোট কথা বাংলা দেশের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনখানেই আশার আলো দেখা যাইতেছে না। বাঙালীর সমাজ-জীবনই বিধ্বস্ত হইতে চলিল, সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা না তোলাই ভাল।

আমাদেরই কোন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশার্থ পাইয়াছি। মামলা—পণ্ডিচারী বনাম বোড়াই-চণ্ডীতলা। ইহাতে বাঙালী পাঠকসাধারণের আগ্রহ বিশেষ না থাকিবারই কথা। তথাপি বাংলা দেশের একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে অপপ্রচার নিবারণ প্রত্যেক বাঙালীরই কর্তব্য বলিয়া পত্রটি মুদ্রিত করিলাম। বলা বাহুল্য, পত্রলেখক জ্ঞানাঞ্জন দত্ত বনামে পত্রটি পাঠাইয়াছেন।—

"শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষার পর তাঁহার জীবনের নানা দিক অবলম্বন করিয়া নানা জনে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন। সাময়িক পত্র খুলিলে প্রায়ই এইরূপ প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গত ১৩৫৭ সালের ৮ই মাঘের 'নবসঙ্ঘ' পত্রে "ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন প্রবর্তক-সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে উক্ত প্রবন্ধটির অধিকাংশ ১৩৫৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবাসী' তাহার "বিবিধ প্রসঙ্গে" উদ্ধৃত করিয়াছে। ইহাতে মতিলালের দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে—প্রবন্ধটির প্রচারাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নবসঙ্ঘকেও 'প্রবাসী' বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। একই সঙ্গে এইরূপ "ডুড ও টামুক" কয়জনার ভাগ্যে জুটিয়া থাকে? ইহাকেই বলে ব্যবসায়-বুদ্ধি!

"শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে মতিলাল বলিতেছেন—'তাঁর আত্মা হিন্দু হইলেও স্বভাবের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব। ইউরোপের শিক্ষায় লালিত পালিত হওয়ার ফলে তিনি সংস্কারবশে ইউরোপীয়ানদের প্রতি একটু স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। এই স্বভাব-দৌর্বল্যের রন্ধ্র পথেই ভারতের শাশ্বত অবিনাশী যে আত্মা, তাহা

ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।' ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক শ্রীঅরবিন্দ যে ইউরোপীয়ানদের প্রতি কিরূপ 'স্নেহদৃষ্টি' রাখিয়া চলিতেন, তাহার উজ্জ্বল বিবরণ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিত আছে। সর্বসাধারণে সে কথা জানে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মতিলালের এ কি হইল? এরূপ মতিভ্রম হইল কেন? শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পূর্বে তো তিনি বহুবার ইহার বিপরীত কথাই বলিয়া আসিয়াছেন! আজ অকস্মাৎ কোন্ স্বার্থবুদ্ধি তাঁহার এ মতিচ্ছন্ন ঘটাইল? এই বেফাঁস কথা বলিবার সময় সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture, Secret of the Veda, The Life Divine প্রভৃতির ছায়াচিত্র মতিলালের চোখের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল, তাই কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ডিগবাজি খাইতে খাইতে বলিয়া বসিলেন—'তিনি জন্মিয়াছিলেন ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রেরণায়। এইখানে তিনি সিদ্ধ।' লোকে ভাবিবে, শেষবয়সে মতিলাল পাগল হইয়া গেলেন নাকি? কিন্তু সেয়ানা পাগল! 'ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রেরণায় সিদ্ধ' বলিয়াও তিনি নিজ মস্তিষ্কে লাঙল চালাইতে নিরস্ত হন নাই; 'সিদ্ধ'-র পরেও আবার 'কিন্তু' জুড়িয়াছেন। মতিলাল বলিতেছেন, 'ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রেরণায়' তিনি 'সিদ্ধ কিন্তু আকিশোর বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবও তাঁহার জীবনে যথেষ্ট শিকড় গাড়িয়াছিল। ইহার সহিত আমরণ সংগ্রাম আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। ইহা যাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে না, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভ্রান্ত এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বরূপাবধারণে অসমর্থ, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিব।' 'আকিশোর বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরিবেশ'-এর সঙ্গে 'আমরণ সংগ্রাম' বলিয়া তিনি আ-আগা ও আ-গোড়া দুই দিকেই গোল বাধাইয়াছেন। 'আকিশোর' বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে এই 'আমরণ' সংগ্রাম তাঁহার লক্ষ্যে পড়িল কিরূপে ও কোথায়? হাঁ, এ বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার মতিলালের আছে এবং তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। সে কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র তিনিই। ১৯১০ সনে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে চন্দননগর গিয়া কিছুদিন মতিলালের আতিথ্য গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেই সময় যদি তিনি বিরুদ্ধ প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া সংগ্রাম করিয়া থাকেন, তাহা মতিলালের লক্ষ্যে পড়িবার কথা। সুতরাং এই কয়টি দিনের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কথা তিনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দের স্বরূপাবধারণে যাহারা অসমর্থ, তাহারা যে এতদিনে মতিলালের স্বরূপ অবধারণে সমর্থ হইল, ইহাই তাহাদের পরম লাভ। শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবের পর মতিলাল মুখোশ ও মুখ দুই খুলিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন।

"ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে মতিলাল যাহা বুঝেন, তাহার সম্যক পরিচয় প্রবন্ধটিতে তিনি দিয়াছেন ;—শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি মানা—মোটামুটি বলিতে গেলে ইহাই দাঁড়ায় যে, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র যে-সব বিধি দিয়াছে সেগুলি মানিয়া চলা, ভারতীয় মুনি-ঋষিরা যে সব বাণী দিয়াছেন সেগুলি সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করা। এগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির এক-একটি অঙ্গ। মতিলাল বহু জায়গায় বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দীক্ষাগুরু। গুরুর 'স্বভাবদৌর্বল্য' প্রভৃতির যাচাই করিয়া গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টায় ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র মতে তিনি গুরুদ্রোহী হইয়াছেন, সে কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র গুরুদ্রোহীদের সম্বন্ধে যে-সব শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা মতিলালের পক্ষে আদৌ শ্রুতিমধুর হইবে না। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বলেন—

"যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়া সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয় ॥"
"অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পরুষং প্রবদন্তি যে।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষপি ॥"
"যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম ॥"

—অগস্ত্য সংহিতা

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥"

—তন্ত্র

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥
উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতাম্নায়োপভুঞ্জতে॥"

—হরিভক্তিবিলাসধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্ত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ॥
একাক্ষরং প্রদাতারং যো গুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চণ্ডালেষ্বপি জায়তে॥"

—অত্রি সংহিতা

"'অর্থাৎ নিরন্তর পাপকর্মা যে সকল মূর্খ শ্রীগুরুর প্রতি দ্রোহ আচরণ করে, তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য থাকিলে তাহাও নিশ্চয়ই পাতকরূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত গুরুদেবকে ভৎসনাপূর্বক পরুষ-বাক্য বলে সে শত জন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তম! যে সমস্ত পাপিষ্ঠ নরাধম শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করে না, তাহাদের নরকযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। শ্রীহরি কুপিত হইলে শ্রীগুরু উদ্ধারকর্তা হন, কিন্তু শ্রীগুরু কুপিত হইলে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি শ্রীগুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ভগবান হরি তৎকর্তৃক অগ্রেই পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। তাহার হিতাহিত-জ্ঞানাধারই কলুষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গুরুদেব যদি শিষ্যকে একটি মাত্রও অক্ষর প্রদান করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে শিষ্য ঋণমুক্ত হইতে পারে। একাক্ষর-প্রদাতা গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মান না করে, সে শতবার কুক্কুর-জন্ম প্রাপ্ত হয় ও শেষে চণ্ডাল জাতিতে জন্মগ্রহণ করে।'

"মতিলাল এই প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে ওকালতি করিতে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের শ্রীমায়ের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। শ্রীমায়ের প্রতি এই বিরুদ্ধমনোভাবের পরিচয় তিনি পূর্বেও দিয়াছেন তাঁহার 'জীবনসঙ্গিনী' পুস্তকে। শ্রীঅরবিন্দ কেন তাঁহার সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লইয়া গিয়া আশ্রম-পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইউরোপীয় মহিলা মাদাম রিশারের উপর সে ভার ন্যস্ত করিলেন, এই কৈফিয়ৎ তিনি তলব করিয়াছেন মহাসমাধিগত শ্রীগুরুর কাছে! ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। শ্রীঅরবিন্দ কেন তাঁহার সহধর্মিণীকে সাধন-পথের সঙ্গিনী করেন নাই, সে প্রশ্নের উত্তর একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই দিতে পারিতেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতির জন্য অনেকেরই মনে মতিলালের প্রশ্ন জাগিয়াছে, অনেকে তাঁহাদের অশ্রুর সঙ্গে নিজেদের অশ্রু মিশাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের স্বামীদের চিত্ত গলে নাই বা টলে নাই। ইহা সাধারণ ব্যক্তিদের বুঝিবার কথা নহে, সুতরাং মতিলালেরও বুঝিবার নয়।

"কিন্তু আমাদের মনে একটু খটকা লাগিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণীর প্রতি সাধারণের মনে সহানুভূতি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক হইলেও মতিলালের পক্ষে সেটা কতখানি অকৃত্রিম, ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহার মধ্যে কোন ছলনা নাই তো? যিনি নিজ সহধর্মিণীকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিতে পারেন, তিনি যে কোনও নারীর দুঃখে সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিবেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার স্বরচিত 'জীবনসঙ্গিনী'তে এই প্রহারের বিবরণ পাইতেছি ১৯২১ সন পর্যন্ত,—তখনও মতিলাল সঙ্ঘগুরু এবং তাঁহার স্ত্রী সঙ্ঘমাতা। অবশ্য তিনি প্রাচ্য প্রথায় স্ত্রীকে ঠ্যাঙাইয়া পরে পাশ্চাত্য প্রথায় স্ত্রীর বন্দনা-গান গাহিয়াছেন! এই-খানে নির্ভেজাল ভারতীয় সংস্কৃতির সাধক মতিলালের মধ্যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছে। মতিলাল বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির বুলি মুখে আওড়াইলেও তাঁহার কর্মধারায় কিন্তু সে সংস্কৃতি পাশ্চাত্য-প্রভাবে কলুষিত। তিনি প্রাচ্যমতে ধর্মসঙ্ঘ

পরিচালনা করেন আবার পাশ্চাত্য মতে দুইখানি কাগজে তাহার প্রোপাগাণ্ডা করেন, প্রাচ্য মতে শিষ্যশিষ্যাদের অধ্যাত্মজীবন গড়িবার জন্ত যেমন তাঁহার প্রবর্তক সঙ্ঘ, সেই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পাশ্চাত্য বেনিয়া বুদ্ধি লইয়া তেমনি তাঁহার প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক ফার্নিশার্স, প্রবর্তক জুট্ মিল্স্ প্রভৃতি। মতিলালের চিন্তিত হইবার কারণ নাই। দৃষ্টি একটু প্রসারিত করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগ। জগৎ এই পথেই চলিয়াছে। মতিলাল ইহা অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে রাখিবেন, জগৎটা তাঁহার বোড়াই চণ্ডীতলা নয়।

"ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলিতে বলিতে মতিলাল 'আচারো পরম ধর্মে'র কথা পড়িয়াছেন। এ কথা বলিবার কালেও তাঁহার মস্তিষ্কে দুষ্ট-সরস্বতী লীলা করিতেছেন। 'আচারো পরম ধর্মে'র বক্তৃতার শেষে তিনি বলিতেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাপুরুষের কফিন শয়ন চরম লক্ষণরূপে আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত করিবে।' সাধু-মহাপুরুষদের দেহ সমাধিস্থ করার প্রথা আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতে আজিও প্রচলিত আছে। বৈদিক যুগেও সে দেহ সুরক্ষিত থাকিত শবাধারে। এ সংবাদ মতিলালের জানা উচিত ছিল। কারণ তাঁহারই নামে প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় "বেদ-রহস্য" ছাপা হইতেছে।"

সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য প্রতিশ্রুত পুস্তকপরিচয় এবারে দেওয়া হইল না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৭

গান্ধী-বাণী

(ইংরেজী হইতে)

বর্তমানে যে ইস্পাতি যুগ চলছে
প্রস্তর-যুগ হতে সেটা কিসে বড় ?
পিশাচেরা আজও মানবাত্মাকে ছলছে,
সভ্যতা শুধু শয়তানি করে জড়ো।
সেদিন মানুষে মানুষ মারত ল'ড়ে
হার-জিত হ'ত শুধুই গায়ের জোরে,
আজ সে একক উঠিয়া মেঘের আড়ে
বোমার আঘাতে শত সহস্রে মারে।
সে দিন সে পায়ে হেঁটে
যেত বড় জোর প্রহরে কয়েক ক্রোশ,
পতঙ্গ সম অঙ্গে দু পাখা এঁটে
পলে পলে আজ চলে সে যোজন,
তবু নাই সন্তোষ!
সেদিন সে খোলা মাঠে
খেটে খেত আর গাইত মাঠের গান,
ইঁদুরের মত আজ দলে দলে
রুটির গন্ধে ছুটে চলে কলে,
কাতারে কাতারে খনির পাথারে
করে পরমায়ু দান।
ইস্পাতি যুগে এ যন্ত্র-সভ্যতা
মানবের বুকে জাগায়ে তুলিছে
নিতি নব দানবতা।
রে মন ধৈর্য ধর্,
কালের ফলকে কি লেখা রয়েছে পড়্—
ধরণীর ভার এ সভ্যতার উঠেছে নাভিশ্বাস
আপনার হাতে আপনি সে হবে নাশ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আঞ্চলিকতা

ছয়

ব্রিটিশ শাসনের গোড়া হইতেই কলিকাতা মহানগরী ভারতের রাজধানী ছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ রহিত করার পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানীও দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাঙালীর প্রভাব হ্রাস করিবার অভিসন্ধিতে বাংলা হইতে রাজধানী অপসারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। কলিকাতা ভারতের রাজধানীর গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র বলিয়া আজও পরিগণিত ও সম্মানিত।

বঙ্গের বাহির হইতে কোন অবাঙালী কলিকাতায় আসিলে এই মহানগরীর সার্বজনীন ভাব প্রথমেই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। বাঙালীর মন যদি প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন থাকিত, তবে এই মহানগরীর সার্বজনীন রূপদান কখনও সম্ভব হইত না। কলিকাতায় ও তৎপার্শ্বস্থ বৃহত্তর কলিকাতায় শিল্পবাণিজ্য-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, সিন্ধী প্রভৃতি অবাঙালী সম্প্রদায়ের যে আধিপত্য আজ পর্যন্ত রহিয়াছে, তাহার কারণ শুধু বাঙালীর শিল্পবাণিজ্য-বিমুখতা নহে। বৈধ প্রতিযোগিতা হইতে বাঙালী কাহাকেও প্রাদেশিকতার আওয়াজ তুলিয়া অপসারিত করা অন্যায় মনে করে। আজিকার বাঙালীকে শিল্পবাণিজ্য সম্পর্কে উদাসীন বলা চলে না। বাংলায় অবাঙালীর পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালীর স্থান নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালী যে অবাঙালী খেদাইবার আন্দোলন আরম্ভ করে নাই, ইহার মূলে রহিয়াছে বাঙালী-মানসের উদারতা ও সার্বজনীনতা এবং জাতীয়তার আদর্শের প্রতি বাঙালীর অবিচলিত নিষ্ঠা।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ভারত-গৌরব স্বর্গীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (উপাধি) ও চাকরির মোহ হইতে বাঙালীর মনকে মুক্ত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের অভিমুখী করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়া তিনি এই সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং

জাতিকে সারগর্ভ উপদেশ-বাণী শুনাইয়াছেন। বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্য বিমুখতা দূর হইলে যে সকল অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগিবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাঁহারা আচার্যদেবের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার মধ্যে আবিষ্কার করিলেন অবাঙালী-বিদ্বেষ ও প্রাদেশিকতা। ব্যক্তিগত স্বার্থহানির আশঙ্কা হইতেই এই মহানুভব উদারচরিত লোকহিতৈষী জাতীয়তাবাদী জ্ঞানতপস্বীর সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ আচার্যদেব সর্বভারতীয় জাতীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদ করিতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের ফলে ভাবীকালে একের গুণ অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সমর্থনে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি-রূপে আচার্যদেব "বাঙালীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেছি—

"প্রবাসী বাঙালীর সমক্ষে আর একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত। ভিন্ন প্রদেশের বিরাট জনসমুদ্রে—তাঁহারা মুষ্টিমেয় মাত্র। ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিতে চান। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই প্রকারে তাঁহারা ঐ সব প্রদেশের লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদিতে পরস্পর সহানুভূতির কোনই স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"লম্বার্ডরা যখন ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। লণ্ডন সহরের লম্বার্ড স্ট্রীট এখনও তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে। আল্ভার অত্যাচারের ফলে ফ্লেমিশেরা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছিল।

ইহারাই পশম-ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করে। হিউগেনটস্‌রাও ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য-গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্মান্ধতার বশবর্ত্তী হইয়া "এডিক্ট অব ন্যান্টিস্" প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় ৪০ হাজার 'হিউগেনট্' অধিবাসী নিকটবর্ত্তী প্রোটেষ্টাণ্ট দেশসমূহে গিয়া আশ্রয় নেয়। ঐ সব দেশে তাহারা তাহাদের বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মকুশলতার অবদান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডিন্যাল নিউম্যান এই দুই কৃতী ভ্রাতা উক্ত বংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাঁহাদের মাতা হিউগেনট্-বংশীয়।

"যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলণ্ডের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। ইংলণ্ড তাহার এই উদার-নীতির জন্য যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড বহু ইহুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিশ্রণের ফলে ইংরাজ জাতির বহু উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিজরেলি (লর্ড বিকনস্‌ফিল্ড), জর্জ জোয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেগু, স্যামুয়েল হারবার্ট, রুফাস আইজ্যাকস্ (লর্ড রেডিং) এবং ধনকুবের রথচাইল্ডের বংশধর কেহ কেহ ইংরাজজাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং রাজনীতিক-রূপে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যই সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা না থাকার জন্য, ইঁহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ফলে ইংরাজ জাতিভুক্তই হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে বাংলা দেশে, ঐশ্বর্য্যশালী অ-বাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালী জাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্নান করে এবং কালী-মন্দিরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সহিত তাহাদের ব্যবধান বিস্তর। উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য 'চীনা-প্রাচীর' বর্ত্তমান।

"আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিবাহের

প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয় জাতির গুণই বর্ত্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক লাভ ক'রত। গোয়েঙ্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে, তাঁহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ স্যার হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে, মানব জাতির সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কুপ্রথা আর নাই। তাঁহার এই কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বিবাহের কথা দূরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাই।

"আমার আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টি কথা ব'লয়া আমি আপনাদের দৃষ্টি জাতিভেদ ও প্রাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই মাত্র। অনেকে হয়ত বলিবেন, যদি এই প্রকারে আমরা একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাই, তাহা হইলে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ত চলিয়া গেল! এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। আমরা যদি প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া চলিতে থাকি, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব? এরূপ হইলে, নিখিল ভারতীয় জাতি কোন দিনই গঠিত হইবে না। আমরা যখন বিদেশে যাই—সুদূর প্রাচ্য বা প্রতীচ্যে যেখানেই হউক—তখন আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা হিন্দুস্থানী বা ভারতবাসী। বিদেশবাসীরা ভাবিতেও পারে না যে, হিন্দু বা মুসলমান, বাঙালী বা বিহারী, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির অস্তিত্ব আছে!

"এই সমস্যা একমাত্র প্রবাসী বা মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে। ইহা নিখিল ভারতীয় সমস্যা।..."

সাত

প্রবাসী বাঙালীরা যে ভিন্ন প্রদেশে বাস করিয়াও "ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিতে চান," ইহা

আচার্যদেব সমর্থন করেন নাই। কেননা তাঁহার মতে "এই প্রকারে তাঁহারা ঐ সব প্রদেশের লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়েন।" এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের ফলে প্রবাসী বাঙালী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে "সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদিতে" যে পারস্পরিক মিলন ঘটিতে পারিতেছে না, তৎপ্রতিও তিনি প্রবাসী বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙালীর এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মনোভাবের নিদান সম্বন্ধে আচার্যদেব সম্ভবত ইচ্ছা করিয়াই নীরব রহিয়াছেন। কারণ প্রবাসী বাঙালীদের নিমন্ত্রণে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া তাঁহাদেরই সম্পর্কে অপ্রিয় সত্য খোলাখুলি বলিতে সংকোচ বোধ করা স্বাভাবিক।

ব্রিটিশশাসন-কালে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশে ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া ইংরেজী-শিক্ষায় বাংলা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং সরকারী চাকরি, ব্যারিস্টারি, ওকালতি, ডাক্তারি, অধ্যাপনা ইত্যাদি কার্যে বাঙালীরা ছিল অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ; এবং বাংলার বাহিরে যাইয়াও ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী বেশ দু-পয়সা রোজগার করিবার সুযোগ-সুবিধা পায়। প্রবাসে অর্থোপার্জনের সহিত বাঙালীর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এবং মান-মর্যাদা সহজলভ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্লাঘাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব এক শ্রেণীর বাঙালীকে পাইয়া বসে। ফলে প্রবাসী বাঙালী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া গেল। পরবর্তী কালে সেতুবন্ধ নির্মাণ করিয়া পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের জন্য কোন রামচন্দ্রের আবির্ভাব আর হইল না।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরাও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার-বোধ জাগে। স্থানীয় ইংরেজী-শিক্ষিতের দল প্রবাসী বাঙালীকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। স্থানচ্যুতির পরও বাঙালীর পূর্বোক্ত মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বাঙালী একবারও ভাবিল না। প্রবাসে ভিন্নপ্রদেশে দুই-তিন

পুরুষ ধরিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াও এক শ্রেণীর বাঙালী সেই প্রদেশের লোকের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার মান লইয়া প্রতিকূল সমালোচনা করে। শিক্ষার আলোক পাইয়া ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ লইয়া স্থানীয় অধিবাসীরা ইহা বরদাস্ত করিবে কেন? সুতরাং পূর্বের স্বখাত ব্যবধান তো থাকিয়াই যায়, অধিকন্তু পারস্পরিক সম্বন্ধে তিক্ততার সঞ্চার হয়। ইহার আর একটি কুফল এই দাঁড়ায় যে, শিক্ষা-বিস্তারে ও অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালীর যে প্রশংসনীয় দান, তাহা স্থানীয় অধিবাসীরা আর স্বীকার করিতে চাহে না, কিংবা তাহাদের মন হইতে উহার স্মৃতি মুছিয়া যায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বাংলা দেশের ভিতরে বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গী যতটা উদার, বাংলার বাহিরে ততটা নহে। স্ব-প্রদেশে বাঙালী প্রায় ক্ষেত্রেই নিজকে প্রাদেশিকতার নাগালের বাহিরে রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু প্রবাসী বাঙালী সম্পর্কে এ কথা পুরোপুরি খাটিতে পারে না। তবে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সকলেই যে পূর্বোক্ত শ্লাঘাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত, তাহা নহে।

আট

এইবারে বাংলা দেশে বাঙালীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের সম্মানিত পদে অবাঙালীও নির্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান স্পীকার একজন মারোয়াড়ী। কলিকাতা মহানগরীর শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, মহম্মদ আলি পার্ক, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল, মতিলাল নেহরু রোড, গোখেল রোড, তিলক রোড ইত্যাদি বাঙালীর জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠার নিদর্শন।

বাংলার সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় বীর ও বীরাঙ্গনা এবং সর্বভারতীয় বরেণ্য দেশনায়কদের প্রতি তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ, রাণা প্রতাপ, শিবাজী,

রণজিৎ সিং, রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসির রাণী, পদ্মিনী, সংযুক্তা প্রভৃতি বাঙালী লেখকের কাছ হইতে বীরপূজার অঞ্জলি পাইয়াছেন। বাংলার বাহিরের নিখিল-ভারতীয় স্মরণীয় নেতা দাদাভাই নৌরজী, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লজপৎ রায়, খান আবদুল গফুর খান প্রভৃতিকে স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী সাহিত্যিকেরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। বাংলার লেখক ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ, মীরাবাই, শিবাজী-গুরু রামদাস, তুলসীদাস, শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভক্ত-মহাজনের উদ্দেশ্যে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লেখক কর্তৃক রচিত গান্ধীজী-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে, গান্ধী-সাহিত্যে বাঙালীর দান আর সকলের উপরে। একমাত্র বাংলা সাহিত্য হইতেই ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে, বাঙালী-মানস প্রাদেশিকতার তমিস্রা হইতে নির্মুক্ত এবং সার্বদেশিক ও সার্বজাতিক মহাভাবে প্রোজ্জ্বল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, বাংলার সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অনেক নিম্নে অন্যান্য সকলের আসন। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর কথাই ধরা যাউক। বাংলার বীর বিজয়-সিংহ, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি সম্পর্কে কোন হিন্দী সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি? বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব, রামপ্রসাদ, রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষের প্রতি কয়জন হিন্দী-লেখক ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন? নিখিল ভারতের লোকপূজ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি সম্পর্কে হিন্দী কিংবা অন্য ভারতীয় ভাষায় কয়খানা পুস্তক রচিত হইয়াছে? ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ-চতুষ্টয় বাংলার প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম-সত্যেন-কানাই অন্য প্রদেশের লেখকের কাছ হইতে বীরপূজার অঞ্জলি পাইয়াছেন কিনা জানি না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সম্বন্ধে কয়জন হিন্দী বা অন্য ভারতীয় ভাষার লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর শুনিলে জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার না হইয়া পারে না।

নয়

যে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতি-বৎসল বাঙালী সর্বভারতীয় জাতীয়তা গঠনের পরিপন্থী জানিয়া উরগ-ক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় একদা বর্জন করিয়াছিল, আজ তাহাই বাংলার সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে মারাত্মক ব্যাধির জীবাণুর মত প্রবেশ করিতেছে। ভারত-বিভাগের সঙ্গে বাংলা দেশও বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে উদ্বাস্তু-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা নরনারী শরণার্থী হইয়া পশ্চিমবাংলায় আসিতেছে। অখণ্ড বাংলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গরাজ্য গঠিত এবং ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ঘন-বসতি। সুতরাং বন্যার অবিরাম জলস্রোতের ন্যায় উদ্বাস্ত পূর্ববঙ্গবাসীর আগমনে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। বেকার-সমস্যা তো আছে পূর্ব হইতেই। তদুপরি ভারত-বিভাগের ফলে খণ্ডিত বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে হঠাৎ মন্দা পড়িয়াছে। লোক-সংখ্যার এরূপ বৃদ্ধিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িতে পারে; এবং জীবিকা উপার্জনের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিবে। এই সকল আশঙ্কা আজ স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনে জাগিয়াছে।

এদিকে যে সকল হতভাগ্য নরনারী আশ্রয়প্রার্থী, তাহারা শুধু বাস্তুহারা হইয়াই চলিয়া আসে নাই, সর্বহারা হইয়া একবস্ত্রে চলিয়া আসিয়াছে। বহু পরিবারের রোজগারী পুরুষ দাঙ্গায় প্রাণ হারাইয়াছে, নারী ধর্ষিতা হইয়াছে কিংবা মুসলমান গুণ্ডা কর্তৃক অপহৃতা হইয়া আজ পর্যন্ত নিরুদ্দিষ্টা আছে। শোক-তাপ, ব্যাধি-গ্লানি, দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তা এবং সর্বোপরি পৈশাচিক লাঞ্ছনার স্মৃতির জালা ইহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি হারাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারা শরণার্থী—এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে একটি তৃতীয় পক্ষের। ইহারা প্রকৃত বাস্তুহারা না হইয়াও উদ্বাস্তুর ভেক ধরিয়া দলে ভিড়িয়াছে এবং দরদী সাজিয়া বাস্তুহারাদের দুর্ভাগ্যের মূলধনে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে। কেহ কেহ এই তৃতীয় পক্ষের নাম রাখিয়াছেন 'বাস্তুঘুঘু'। এই বাস্তুঘুঘুর দলই নাকি অনেক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের বিপথে চালিত করিতেছে এবং ইহাদের আশ্রয় করিয়া নানা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে।

উদ্বাস্তু-সমস্যা লইয়া কিছু কাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গরাজ্যে একটা আঞ্চলিকতার মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে। অদূরদর্শী সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের প্রশ্রয়ে ও উৎসাহে ইহা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। এই অশুভ মনোভাবকে অঙ্কুরে বিনাশ না করিলে ইহা গজাইয়া উঠিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিবে এবং কঠোর সাধনায় সৃজিত বাংলার জাতীয়তার মহান ঐতিহ্যকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই ক্রম-বর্ধমান মনোভাবের উৎপত্তির নিদান আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার জন্য কোন্ পক্ষের দায়িত্ব কতটা, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টাও এই প্রবন্ধে করিব না। বাঙালীর চরম দুর্দিনে আজ বাঙালী মাত্রকেই এ কথা সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এইরূপ মনোভাবের পোষণ, প্রশ্রয় ও উৎসাহ দান বাঙালী জাতির সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করিবে। বাঙালী হিন্দু আজ এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখামুখি দাঁড়াইয়া। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের স্থানাভাবের দরুন যে সকল বাস্তুহারা বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে, এমন কি সুদূর সুভাষ-দ্বীপপুঞ্জে (আন্দামানে) পর্যন্ত প্রেরিত হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পরবর্তী দুই পুরুষের মধ্যে এই সকল দেশান্তরিত উদ্বাস্তু বাঙালীর বংশধরগণ হয়তো বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যাইয়া একটা দোআঁশলা জাতিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। আর বাঙালীর ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে এমনও হইতে পারে যে, ইহারা বৈবাহিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীগণের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে মিলিত হইয়াও বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে সান্নিকের

অগ্নির ন্যায় জাগাইয়া জীয়াইয়া রাখিতে পারে; এবং বঙ্গের বাহিরে বৃহত্তর নববঙ্গ গঠনের গৌরব অর্জন করিতে পারে।

স্বদেশী-যুগের পূর্বে আঞ্চলিকতার এই মনোভাব বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। সে আজ অর্ধশতাব্দীরও পূর্বের কথা। তারপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন উভয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিলাতী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণের আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন বাংলার জাতীয় ও সামাজিক জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যা-প্রবাহে আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতার আবর্জনা তলাইয়া যায়। নবজাগৃতির উষা-সমাগমে বাঙালী-মানস ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হয় এবং জাতীয়তার অরুণালোকে উদভাসিত হইয়া উঠে। সেদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত রাখীবন্ধন সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন—যেন সত্য হয়, "বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা"। কবির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল—

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

ঋষিকবির সে প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করিয়াছিলেন। কার্জনী পরিকল্পনায় বিভক্ত বাংলা আবার সংযুক্ত হয়, বাঙালীর পণ সত্য হয়, বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন এক হয়।

স্বদেশী-যুগে পরাধীন অবস্থায়ও বাঙালীর লক্ষ্য ছিল জাতীয় সংহতি, রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধীন ভারতে আজ দুর্যোগের মুখে পড়িয়াও বাঙালী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না, দৃষ্টিভঙ্গীকে সংকুচিত করিয়া সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তাহা হইলে বাঙালীর সুস্থ সবল জাতীয়-জীবনের অপমৃত্যু ঘটিবে। বাংলার স্বাদেশিকতার ঋষি ভারতবাসীকে দিয়াছিলেন জাতীয়তার দীক্ষা-মন্ত্র "বন্দে মাতরম্"। সে মহামন্ত্রের উদ্গাতা বাঙালী। বাঙালীই আর সকলের আগে সংকল্প গ্রহণ করে—মন্ত্রের

সাধন কিংবা শরীর পতন। বাঙালীর সে সংকল্প পূর্ণ হইয়াছে। স্বদেশী-যুগের প্রথম আগস্ট মাসের পর ছত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গেলে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সেই সংকল্প-বাণী গান্ধীজীর কণ্ঠে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইল, করেংগে ইয়ে মরেংগে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

শ্রীলেখা

হে প্রিয়ে, তোমারে নয়ন ভরিয়া
হেরেছি মাধবী-রাতে,
ছুটি কানে ছিল পান্নার দুল
সিঁথিপাটি সিঁথিপাতে
আঁখিতটে আঁকা ভাবের কাজল—
শরমে জড়িত দিঠি ঢলঢল!
বিকশিত করি সুর-শতদল
ব্যথিত বীণার সাথে;
তবু দূরে ছিলে ধরা দিয়ে যেন
নূতন বঁধুর হাতে।

বুঝিতে না পারি রমণীর মন
কি মাধুরী দিয়ে গড়া,
মরমের কোষে কোথায় গরল
কোথায় অমৃত ভরা!
এক রূপে আমি দেখেছি তোমায়
কেহ পেল সোনা, কেহ ধুলা হায়!
তবু ভ'রে আছ আলো-সুষমায়
চাঁদের কলস-ঝরা;
জীবনের পারে মরণ-আঁধারে
হয়তো দেবে না ধরা!

তোমার বিরহ হৃদয়ের পাতে
একটি আঁচড় টানি ;
লিখে গেল তাতে সোনার আখরে
অমৃত-মন্ত্র-বাণী ।
ফুটি ফুটি করি ফুটিল কি কথা,
কি হতে কি হ'ল ! কে দিল বারতা,
শুধু বুকে বাজে বুক-ভরা ব্যথা,—
মাতাল করেছ জানি ;
ভরিয়া দিয়াছ সুরের সুরায়
প্রেমের পেয়ালাখানি ।

যে লেখা লিখিলে বিজলী ঝলকে—
মুছিলে ক্ষতি কি তায়,
যুগ যুগ ধরি তোমারি কাহিনী
গেঁথে যাব কবিতায় ।
তোমারি ছন্দে নন্দিত করি
ভুবনের হিয়া দিয়ে যাব ভরি,
তোমার স্মৃতির জ্যোতি-কণা দিয়ে
রচি নব তারকায় ;
বিদায়ের আগে রেখে দিয়ে যাব
আকাশের নীলিমায় ।

শ্রীশান্তি পাল

এ গলিতে বাস মোর

ছেঁড়া স্বপ্নের জীর্ণ নিশান উড়িয়ে,
হে মোর কাব্য, ঘন দুর্যোগে কোথায় চলেছ খুঁড়িয়ে ?
প্রপিতামহের সিন্দুক হতে রঙ-চটা সাজ কুড়িয়ে
দেউলে-দিনের লজ্জাকে ঢেকে আভিজাত্যের ছলনা,
দরবার-বেশে কোথায় চলেছ বল না !

তুমি কি ভেবেছ শাহানশা মহাকাল
বিস্মরণের সমুদ্রে ফেলে জাল
তোমাকে তুলবে পুষ্পকরথে
মরজীবনের ঘোলাজল হতে ;
চোখের নিমেষে দরবারে এসে মিলবে অমৃত-পেয়ালা ?
কুম্ভকর্ণ নিদ্রার ঘোরে এ কি বিচিত্র দেয়ালা !
এ গলিতে বাস তবু রোমান্সে
তাই বুঝি নেশা ঘন হয়ে আসে,
রোগা-জীবনের কান্নাকে ঢেকে ঝুমঝুমি বাজে ছন্দে,
ফোটে মন্দার পারিজাত বুঝি আবর্জনার গন্ধে ?
খোল চোখ, দেখ জীবনের হাটে সবাই এনেছে বেসাতি,
হয় ঠকো, নয় ঠকাও ; গহন জনতারণ্যে কে সাথী ?
বরফ-জমানো আলতা-মাখানো
বাসি পচা মাছ ভারে ভারে আনো,
তারা-মুদারায় হেঁকে যাও সেই অচল-চলন মন্ত্র,
শিখে নাও নব জীবনব্রতের অমোঘ সাধন-তন্ত্র ।
ফুল চাই ? দেখ কোণের দোকানে পারুল-রজনীগন্ধা
জল-সিঞ্চনে পরমায়ু পেয়ে বেঁচে থাকে তিন সন্ধ্যা—
বিবাহ-মড়ক-মহতী সভার
মরশুমে সব হয়ে যাবে পার ;
কিছু খাবে তার ধর্মের ষাঁড়, কিছুবা সেকেণ্ডহ্যাণ্ডে
ছাপোষার শখ মিটাতে বিকোবে সস্তা দরের স্ট্যাণ্ডে ।
এক মুর্গিকে যত দরগায় জবাই করতে পারবে,
জেনে রেখো, তত অনুপাত মত ধর্ম-অর্থ বাড়বে ;
পুরানো নীতির ফাঁকা গর্জন মিথ্যে ;
জীবন-সাধনা কর নির্ভীক চিত্তে,
নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, কায়মনে কর কর্ম ;
অলস মনের চাহিদা মিটাতে মুখে বেঁচে থাক্ ধর্ম ।

কাল নয়, আজ সত্ত সত্ত
পান ক'রে নাও জীবন-মন্ত্র
অমৃতের লোভে মিছে চল মায়া-স্বর্গের পানে খুঁড়িয়ে,
পাগলের মত জীর্ণ নিশান উড়িয়ে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নাম

কথা দিয়ে, কথা দিয়ে, শূন্যতাকে করেছি আপন
সত্যের 'নিস্তব্ধ সত্ত্ব', ঢেকে দিতে চেয়েছি প্রলাপে;
আজও তো পাই নি পথ, অন্ধকারে দিশাহারা মন,
তবু স্বপ্ন-আশালোকে গড়ে রূপ দুজ্ঞেয় জীবন,
অর্থ নেই? নাই থাক্—কী বা লাভ মুখর বিলাপে?
আমার জিজ্ঞাসাগুলি হিমচক্ষু তারায় তারায়
দীপ্তিহীন দাহ নিয়ে, জেগে থাকে নিস্পন্দ আকাশে;
অসীম-আয়তলোকে ধীরে ধীরে চেতনা হারায়,
কী অন্ধ অবাক বোধে সমস্ত হৃদয় ভ'রে আসে।
আজও যা জানি না তারে বারে বারে সঁপিয়াছি প্রাণ,
আবর্ত-আকুললোকে খুঁজিয়াছি পরম নির্বাণ,
হিমগাঢ় অন্ধকারে খুঁজিতেছি দীপ্ত বাতিঘর।
কত খুঁজিলাম—
অতীত, ভবিষ্য আর নারী, শিশু, সময়, ঈশ্বর
শুধু এক নাম॥
খুঁজেছি পরম পাওয়া, খুঁজিয়াছি সর্বাত্ম সমাধি
সম্পূর্ণ প্রণাম,
ইতিহাস অন্ধকারে জিজ্ঞাসার নাই অন্ত আদি!
শূন্যে ওঠে নানা রূপ—
অন্তরেতে, শুধু এক নাম॥

অসিতকুমার

স্বীকৃতি

তোমারে বেসেছি ভাল জীবনের নিশ্চিত সম্ভব
আমার গতির ছন্দে ঝঙ্কারিছে প্রত্যয়ের সুর,
তোমারে করেছি রাণী নিঃশেষিয়া প্রাণের বৈভব,
অতৃপ্ত বাসনা তারে জেগে ওঠে আসক্তি অঙ্কুর,
তোমারে পড়িল মনে বসন্তের পৌর্ণমাসী রাতে
স্মরণের অবসরে অনির্দেশ্য স্বপ্নজাল বোনা।
আমার কামনা কাঁদে রিক্ততার ক্ষুব্ধ বেদনাতে
প্রলুব্ধ হৃদয়ে জাগে বিরহের অসহ বেদনা।
লভিয়াছি আমি তব যৌবনের বাঞ্ছিত জবাব—
তুমি তো একাকী নহ হে অনন্যা, আমি তব মিতা,
কত ঋণ জমা হ'ল আজো তার করি নি হিসাব।
আমার মনের নীড়ে আসিবে না, ওগো অকুণ্ঠিতা,
আমার হৃদয় নাচে তোমা ঘিরে বিপুল স্পন্দনে—
জীবনের ইতিহাসে পাথরের সাজানো কঙ্কাল,
পৃথিবী ফুরাল মোর ; জেগে আছি তব আকর্ষণে
আমার প্রথম প্রেম পেল তব মনের নাগাল—
নৈকট্যের মিতালিতে আজো লুব্ধ আমার অন্তর
দূরত্ব চাহি না সখি ; করিয়াছি আত্মসমর্পণ,
লোলুপ কামনা মোর একা শুধু গণিছে প্রহর—
আশা ও আশ্বাস মাঝে খুঁজি মোর প্রশ্ন চিরন্তন
জীবনের রিক্তকুঞ্জে জাগে আত্মা লুব্ধ প্রতীক্ষায়।
নীলের উৎসব নাই আজ মোর মনের আকাশে—
না-বলা মনের বাণী কেঁদে মরে শূন্য ব্যর্থতায়।
জ্বলন্ত স্বাক্ষর তুমি রেখে গেছ মোর ইতিহাসে,
মনের আহ্নিকগতি সৌরচক্র করে প্রদক্ষিণ—
অনেক আকাঙ্ক্ষা মোর জেগে আছে তোমাকেই ঘিরে,
তুমি মোর তিলোত্তমা, তিলে তিলে গড়া প্রতিদিন
নবারুণ উদ্ভাসিবে জানি পুনঃ তমসার তীরে।

দোঁহের অন্তর মাঝে গ'ড়ে-ওঠা দূর ব্যবধান—
বিলুপ্তিতে সমাপ্তির প্রচঞ্চল আমি রাত্রি-দিবা,
স্মরণ-ফুলের গুচ্ছ বাতায়নে কভু কম্প্রমান,
অন্তর প্রদীপালোকে তুমি মোর দীপ্ত শান্ত বিভা।

শ্রীসলিল মিত্র

কল্যাণ-সঙ্ঘ

২২

মিনু রায় শোবার ঘরে আয়না-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। পরনে মিহি জরি-পাড় শাড়ি (বাড়িতে শাড়িই পরেন)। আঁচলটি লুটোচ্ছে মেঝেতে। গা খালি। পিঠের উপর লুটোচ্ছে একরাশ কালো চুল। আয়নার কাছে মুখ এনে, সিঁথির দুপাশে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছেন। এইখানটায় দু-এক গাছি ক'রে চুল পাকতে শুরু করেছে। রোজই চোখে পড়ে। চিমটে দিয়ে তুলে ফেলেন। আজও তুলেছেন দুগাছি। কুচকুচে কালো চুল রূপার তারের মত সাদা হয়ে উঠেছে। মনের ভিতরটা কেমন করতে থাকে দেখে। যৌবন বিদায় নেবার নোটিশ-জারি শুরু ক'রে দিয়েছে নাকি এর মধ্যে? চিরুনিটা থামিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। গলার কাছে থাক পড়তে শুরু করেছে; চিবুকটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে; গালে কপালে খোদাই শুরু হতে দেরি নেই; চোখের নীচেটা হয়ে উঠছে ঢিলে; বাহুর মাংসপেশীতে আসছে শিথিলতা, দেহের পালিশ খসখসে হয়ে উঠেছে। এর পরে, মাথার চুল সব পেকে যাবে; মেদের পাহাড় জ'মে উঠবে সর্বাঙ্গে; গিঁটে গিঁটে ধরবে বাত; দাঁত নড়নড় করবে; চোখে ছানি পড়বে;—মিনু রায়ের যৌবন-সূর্য অস্তমিত হবে।

হাঁফ ধ'রে আসে মিনু রায়ের। তার পরের কথা ভাবতে ভয় করে। জীবনটা এমনই ক'রে কেটে যাবে নাকি? এখানে-ওখানে ঠুকরে ঠুকরে? পাবে না কোনদিন পরিপূর্ণ পরিপক্ব প্রেম—তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব, যাতে থাকবে না কারও লুব্ধ দৃষ্টির কাঁটা, সমাজের রক্তচক্ষুর

দৃষ্টিসীমার বাইরে, সংসারের সম্পর্ক কাটিয়ে, নিবিড় নির্জনতায় যা ে আমৃত্যু আস্বাদন করবে।

ঝি এসে খবর দিলে, একজন বাবু দেখা করতে এসেছেন।

মুখ ফিরিয়ে বললেন মিনু রায়, কে?

চিনি নে তো! নতুন লোক।

কেমন দেখতে?

লম্বা, ফরসা—

বসাওগে বসবার ঘরে। ঠাকুরকে বল, চা করতে, খাবারও বলগে আমি আসছি এখনই।

গুণেন ঠাকুরপো বোধ হয়! চুলগুলো তাড়াতাড়ি খোঁপাে জড়িয়ে নিলেন। শাড়িটা বদলে পরলেন থান, ধবধবে ফরস মলমলের; পরলেন সাদা আদ্দির ব্লাউজ। পাউডার-পাফের স্প দিলেন মুখে গলায় বুকে বাহুতে। চোখে পরলেন সোনার চশমা শান্তি-নিকেতনের কাজ করা স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লে ঘর থেকে।

বসবার ঘরে ঈজি-চেয়ারে ব'সে গুণেনবাবু চুরুট টানছিলেন পাশে একটা টুলের ওপর অ্যাস-ট্রে দিয়ে গিয়েছিল ঝি, তাতে ছা ঝাড়ছিলেন।

মিনু রায় ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন; কায়দা ক'রে স্বর তুলে বললে নমস্কার! গুণেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। মুখে কি বললেন না। হাসি-হাসি মুখে চোখ ছুটির বিশেষ ভঙ্গী ক'রে তাকি রইলেন মিনু রায়ের মু'খর দিকে।

মিনু রায় মুখে ফুটিয়ে তুললেন বিস্ময়ের বিহ্বলতা, চোখ দু কুঁচকে ছোট ক'রে তুললেন, দীর্ঘ অতীতের কুয়াশার ভিতর দি অতিথিকে দেখে চেনবার চেষ্টা করছেন যেন।

গুণেনবাবু হেসে বললেন, চিনতে পারছেন না? আমি গুণেন।

অপরিচয়ের কুয়াশা এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। মুখের মসৃণতা ে ফিরে। চোখে জেগে উঠল পুরাতন বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার আনে দীপ্তি। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, তুমি! গুণেন ঠাকুরপে

এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। মুখের ’পরে চোখ রেখে বললেন, দেখি ভাল ক’রে। কতদিন দেখি নি বল তো? যেন এক যুগ! দেখি, কতখানি বদলেছ?

গুণেনবাবু বললেন, এক দিনেই সবটা দেখা ভাল নয়। এই-খানেই থাকছি তো। দিনের পর দিন দেখবেন। বসুন। ব’লেই ব’সে পড়লেন।

মিহু রায়ও বসলেন; বললেন, মোটা হয়ে গেছ আগের চেয়ে। তবে রঙটা আরও ফরসা হয়েছে। আমাকে কি রকম দেখছ বল।

বলতে ইচ্ছে হ’ল গুণেনের, ছিলেন লতা, হয়ে উঠছেন মহীরুহ। চেপে গিয়ে বললেন, আপনি বেশি বদলান নি তো! একটুখানি বোধ হয় মোটা হয়েছেন। তাতে বরং চেহারা খুলেছে আপনার। নেহাত পাতলা ছিলেন তো! তখনকার দিনের মডার্ন গার্ল! পাখির মত আহার ছিল আপনার। আপনার শাশুড়ী রাগ করতেন। মনে নেই? মুখ টিপে হেসে মিহু রায় বললেন, মনে আছি বইকি।

গুণেনের চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা। কণ্ঠস্বরে বিষাদের আমেজ এনে বললেন, এখানে বড় একলা। ভাল লাগে না। ব’সে থাকি একা একা; আগের দিনের স্মৃতি রোমন্থন করি। স্বাভাবিক সুরে বললেন, মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ বুঝি? কত দিনের ছুটি?

গুণেনবাবু বললেন, ছুটি তো অনেক দিনই ছিল। আর মাস পাঁচেক বাকি। আর কাজে ফেরবার ইচ্ছা নেই।—অনেক দূর। একেবারে একা। ভাবছি, এখানে বাড়ি ক’রে জ’মে বসব। ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু একটা করলেই হবে।

মিহু রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থাক এখন?

পেশোয়ার।

খুব নির্জন, না?

হ্যাঁ, মেশবার লোক নেই। কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের কোলে আমাদের আস্তানা। দূরে দূরে গ্রাম। একেবারে অখাদ নির্জনতা।

মুচকি হেসে বললেন মিনু রায়, বিয়ে কর নি কেন? পত্নীর ওপরে এত প্রগাঢ় প্রেম?

শুণেনবাবু হেসে বললেন, না না, ও সব কিছুই নয়। মেয়েটা কি ভাববে?

মেয়ের তো বর জুটিয়েছ। এবার নিজের জন্যে একটি কনে ঠিক কর।

চোখ টিপে শুণেনবাবু বললেন, দেখা যাক। এখনও কিছু ঠিক করি নি।

মুচকি হেসে মিনু রায় বললেন, মিস মুখার্জি তো তোমার শালা? ওকেই তাগ্ ক'রে আছ বুঝি?

শুণেনবাবু শুধু হাসলেন।

গম্ভীর হয়ে উঠে মিনু রায় বললেন, কিন্তু ওই যে ভদ্রলোক, কি নাম ওঁর, সমরেশ—ওঁর সঙ্গে নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ওঁর?

শুণেনবাবু প্রতিবাদ করলেন, পাগল নাকি! ভাই-বোনের মত দুজনে। এক রকম এক বাড়িতেই মানুষ!

কথার মোড়টা ফিরিয়ে দেবার জন্যে মিনু রায় বললেন, আমার মেয়েকে দেখ নি, না? ঝিকে ডেকে বললেন, নেলিকে ডেকে দাও তো। বলতে লাগলেন, ওই আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন। ওর বিয়ে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। একটি ছেলে ঠিক করেছি। সরকারী চাকরে। বাড়ির অবস্থাও ভাল। না হ'লেও, যা দেব তাতে চাকরি না করলেও চ'লে যাবে। এখানকার বাড়ি আর যা যা সম্পত্তি সব লিখে দেব। মেয়ের নামে দশ হাজার টাকা আগেই জমা আছে। তা ছাড়া আমি আরও দশ হাজার দেব। ছেলেটি বড় ভাল যেমন দেখতে শুনতে, তেমনই স্বভাব। আমার ভারি পছন্দ হয়েছে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিক। যত শিগগির পারি সেরে ফেলতে চাই

শুণেনবাবু বললেন, তারপর?

একটু হেসে মিনু রায় বললেন, তার পর, সংসার ত্যাগ। কো[illegible] তীর্থে-টীর্থে গিয়ে থাকব। আর কি? বয়স হয়েছে, বিধবা মানুষ ধর্ম-টর্ম না করলে কি আর চলে?

নেলী এল। চোখে গভীর ঔৎসুক্য। মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। মিনু রায় মেয়েকে বললেন, প্রণাম কর। তোমার কাকাবাবু।

নেলি প্রণাম করতেই গুণেনবাবু সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, চমৎকার দেখতে হয়েছে তো! ঠিক আপনার মত।

মিনু রায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই নাকি?

মেয়েকে বললেন, স্নান কর নি এখনও? যাও, সেরে নাওগে সকাল সকাল। ভারি রোদের তেজ আজ।

নেলী চ'লে গেল।

মিনু রায় ঠাট্টার সুরে বললেন, ঠাকুরপো তো খুব পাতলার পক্ষপাতী। কিন্তু মিস মুখার্জি তো দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নেহাত কম নন।

গুণেনবাবু বললেন, ওকে ওতেই বেশ মানায় কিন্তু, নয়?

দুই ভুরু তুলে মিনু রায় বললেন, বল কি! খুব পছন্দ হয়েছে ওঁকে?

না না, পছন্দ-অপছন্দের কথা নয়। এমনই নির্লিপ্ত দর্শকের মতই বলছি।

মিনু রায় মাথা নেড়ে বললেন, কথার সুরে মনে হচ্ছে না তো! যাই হোক, বিয়ে হয় তো নেমন্তন্ন পাব নিশ্চয়।

কথাটাকে বদলে দেবার জন্য গুণেনবাবু বললেন, সমরেশ তো আসে আপনার কাছে, নয়?

বিস্ময়ের সুরে মিনু রায় বললেন, কই, না তো। ওঃ! সে দিন আমাদের গাড়িতে ওঁকে দেখেছিলে বুঝি? এমনই রাস্তায় তুলে নিয়েছিলাম ওঁকে। রোসেনারার সঙ্গে আলাপ আছে, ওরই কথায়। আমার সঙ্গে আলাপ-টালাপ নেই, করবার ইচ্ছেও নেই। ও সব খদ্দরধারীদের ভাল লাগে না আমার। খদ্দরের মতই পুরু ক্যাটকেটে মন ওঁদের। আর সব সময়ে একটি মহামানবীয় ভাব। যেন দেশের জন্যে জেল খেটে কৃতার্থ ক'রে দিয়েছেন সবাইকে।

গুণেনবাবু হেসে বললেন, না না, তা নয়। ওরা হ'ল সিচুয়

জাত। ওপরে একটা খসখসে খোসা। কিন্তু খোসাটা খসাতে পারলেই পাবেন নরম মিষ্টি শাঁস। মিনু রায় অগ্রাহ্যের সুরে বললেন, খোসা খসাবার ধৈর্য নেই আমার। কন্তু থাক্‌গে ও-কথা—

ঝি চা-খাবার নিয়ে এল। গুণেনবাবু ব'লে উঠলেন, ওরে বাবা! এখন আবার ও সব কেন? খাবারটা নিয়ে যাক। চাটা বরং খাচ্ছি।

মিনু রায় বললেন, কি আবার খাবার? খাও। কত দিন পরে এলে। তখন কত খাওয়াতাম কত রকম তৈরি ক'রে। মনে নেই, সেই গঙ্গার ধারে চড়িভাত? গঙ্গাতে সাঁতার দেওয়া? একবার দুজনে একেবারে মাঝনদীতে গিয়ে উঠলাম, শ্বশুর মশায় হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন; শাশুড়ীর তো মূর্ছার উপক্রম! আর ওঁর সভয় আর্তনাদ! দিন-দুপুরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ছোকরা ভাগল বুঝি! আমাদের কোন খেয়াল নেই। মাঝগঙ্গায় প্রতাপ শৈবলিনীর মত দুজনে ভেসে চলেছি—

গুণেনবাবু হাসতে লাগলেন।

মিনু রায় বললেন, আজ সন্ধ্যের পর এস। রাত্রে খেয়ো এখানে। যে ছেলেটিকে জামাই করব, তাকে দেখে যাবে। সন্ধ্যের পর দুজনে বেড়িয়ে আসব একটু।

গুণেনবাবু বললেন, আপনার ওই গাড়িতে চ'ড়ে? তার চেয়ে বিশ জোড়া ঢাক পিটোতে পিটোতে গেলে প্রচার কম হবে।

লজ্জার মুখে মিনু রায় বললেন, ওই গাড়িতে কখনও চড় নি নাকি! সেই গাড়িখানা—

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে গুণেনবাবু বললেন, তাই নাকি! এখন ওই দাঁড়িয়েছে?

বিষণ্ণ মুখে অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললেন মিনু রায়, আমার মতই বদলেছে ও। ওকে, আমাকেও, আর কারও ভাল লাগবার কথা নয়। শেষের দিকটায় গলা ধ'রে এল তাঁর।

গুণেনবাবু বললেন, বউদিদির অভিমানটি ঠিক আগের মতই আছে। ব'লে হেসে মিনু রায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে।

চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন মিনু রায়, কি? আসবে? মোটরে যাব না, ভয় নেই। হেঁটেই যাব দুজনে।

২৩

সেদিন বিকেলে সারা পশ্চিম আকাশটা মেঘে কালো হয়ে উঠল। তারপর ছুটে এল কালবৈশাখীর ঝড়। উড়িয়ে নিয়ে এল যত ধুলো, শুকনো পাতা, ঘাস-খড়ের কুটো। বড় বড় গাছগুলো দৈত্যের মত শত বাহু আস্ফালন ক'রে শুরু করলে সংগ্রাম; যারা শীর্ণ দুর্বল ছোট, তারা মাথা নুইয়ে নতি স্বীকার করতে লাগল বারংবার; আকাশ ও পৃথিবী হয়ে উঠল ধূলি-পিঙ্গল; বিদ্যুতের বঙ্কিম বিদারণ-রেখা ঝিলিক মারতে লাগল সারা আকাশ জুড়ে; নামল মোটা ধারায় বৃষ্টি; রৌদ্রোতপ্ত পৃথিবী সর্বাঙ্গ মেলে দিয়ে সাগ্রহে শোষণ করতে লাগল স্নিগ্ধ ধারাবর্ষণ।

সন্ধ্যের পরও ঝিমঝিম ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল মাঝে মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের চাপা গর্জন। সমরেশ বেরুতে পারল না। বারান্দায় ব'সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বই পড়তে লাগল।

মায়ের একাদশী আজ। রান্না হয় নি সকালে। রাত্রেও হবে না। নফরের মা নিজের ভাত ফুটিয়ে নিয়েছে দু বেলার জন্যে। দুপুরে তিনুদের বাড়িতে খেয়েছে সে। রাত্রে ফল-মূল খাবার আসবে মায়ের জন্যে ওদের বাড়ি থেকে। এ ব্যবস্থাটি তিনুর, শুধু আজকের জন্যেই নয়, বরাবর।

দুপুরে গুণেনবাবুর পাশে ব'সে ছিল সমরেশ। সামনে ব'সে ছিল তিনু। পাখা করছিল। এক সময়ে গুণেনবাবু ব'লে উঠলেন, আজ মিনু বউদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আগের মতই আদর-যত্ন করলেন। রাত্রের নেমন্তন্ন পর্যন্ত বাগিয়ে এলাম।

তিনু বললে, আপনার সঙ্গে আগে খুব খাতির ছিল বুঝি? গুণেনবাবু তিনুর মুখের দিকে তাকালেন। তিনুর মুখে গাম্ভীর্য। মনে মনে হাসছে বুঝি! আপ্যায়নের সম্বন্ধে ফলাও ক'রে বিবরণ

দেবার লোভ সংবরণ করলেন। সমরেশকে বললেন, তোর ওপর ওপিনিয়ন তো ভাল না।

তিলু ঝটিতি গুণেনবাবুর দিকে তাকাল। সমরেশ মুখ গুঁজে খেয়ে চলেছিল। তারও দিকে তাকাল তিলু। সমরেশ মুখ তুলে বললে, নাই বা হ'ল।

গুণেনবাবু বললেন, বললে, লোকটার পরনের খদ্দর যেমন মোটা ক্যাটকেটে, মনটাও তেমনই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিলু মুখ টিপে হেসে বললে, সত্যি! গুণেনবাবু হেসে বললেন, কটু কটু ক'রে কিছু বলেছিলি বুঝি? কিংবা ঝেড়েছিস কড়া বক্তৃতা? তোরা স্বদেশী লোক তো! বেরসিকের চূড়ামণি।

তিলু চেয়ে রইল সমরেশের দিকে। সমরেশের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। গুণেনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সমরেশ বললে, আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলি নি ওঁর সঙ্গে। মনে মনে যদি বলেছি আর উনি শুনতে পেয়েছেন তো অন্য কথা।

গুণেনবাবু বললেন, রোসেনারা মেয়েটি কে রে? শুনলাম, ওর সঙ্গে খুব আলাপ তোর?

যাঁর কাছে শুনেছেন, তিনি সত্যি কথা বলেন নি।

তিলু বললে, এসেছে মাত্র কদিন; এর মধ্যে কত কর্ম ক'রে বেড়াচ্ছে। এর সঙ্গে ঝগড়া ওর সঙ্গে ভাব! কাজ-কর্ম না থাকলে পুরুষ মানুষের যা কাজ আর কি!

সমরেশ বললে, মেয়েদেরও।

ধারাল সুরে তিলু জবাব দিলে, মেয়েরা এত ছ্যাবলা নয়। মুখ নেড়ো না বেশি! একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, জামাইবাবু দু দিন আসতে না আসতেই নেমন্তন্ন বাগিয়েছেন। তারপর আরও কি বাগাবেন কে জানে? তবে একটা কথা, মেয়ের বিয়ের কথাটা যেন মনে থাকে। ওটা সেরে যা, ইচ্ছে হয় করবেন।

গুণেনবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললেন, আরে না না। অনেক দিনের আলাপ। একবার দেখা ক'রে এলাম। নিমন্ত্রণ করলে খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসব। তারপর আর কে যাচ্ছে?

তিলু বললে, যেতে কে মানা করছে? মানা করবার কি অধিকার আমার?

বল কি? মানা করবার অধিকার সবচেয়ে তোমার। দিদির জিনিস, উত্তরাধিকারসূত্রে তোমারই একছত্র মালিকানা। মুখ ভারী ক'রে বললে তিলু, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। কাকাবাবু বলছিলেন, ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আর দেরি করা ভাল হচ্ছে না। রাঘববাবুর বাড়ি গিয়ে দিনস্থির ক'রে আসবেন। তাড়াতাড়ি যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, তার চেষ্টা করতে হবে।

বেশ তো। কালই যাওয়া যাবে। ভোঁদাকে সুদ্ধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।—ব'লে খাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন।

চ'লে আসবার আগে তিলু বললে সমরেশকে, ও-বেলাও খেয়ে যাবে। আর শোন। কাছে এসে বললে, ওসব সত্যি নাকি?

সমরেশ প্রশ্ন করলে, কি?

ওই যে ঝগড়া, ভাব—

আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তোমার জামাইবাবুটিকে সামলাও গিয়ে। ওর জালে গিয়ে আটকে পড়েন তো ফাঁকিতে প'ড়ে যাবে।

রাগের সুরে বললে তিলু, যেখানে ইচ্ছে আটকে পড়ুনগে উনি। আমার তাতে কি? আমার কথার জবাব দাও তুমি।

বলেছি তো, একেবারে বাজে কথা। তাতেও বিশ্বাস না হয় তো কি করব?—ব'লে সমরেশ চ'লে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই তিলু বললে, পালাবার জন্যে যেন ছটফট করছে! কোথায় যাবে? চোখের ইঙ্গিত ক'রে বললে, বান্ধবীর কাছে বুঝি?

সমরেশ বললে, বান্ধবী-টান্ধবী নেই আমার। বাড়ি যাব।

এত রোদে নাই বা গেলে।

না গিয়ে কি করতে হবে শুনি? রৌদ্রের বদলে রুদ্র ধমক শুনতে হবে তো?

হেসে ফেলে বললে তিলু, ওকে ধমকই দিচ্ছে সবাই। আর কিছু

করে না? এই মাত্র হাতের রান্না খেয়ে এলে। হজম হয় নি এখনও। নেমকহারাম!

কণ্ঠস্বরে আবার সেই কল্যাণকামিনী বান্ধবীর সুর।

তিলু বললে, রোদে এখন যেতে হবে না। এইখানে একটু গড়িয়ে নাও।

সমরেশ সভয়ে বললে, কোথায়? কাকাবাবুর কাছে?

তিলু হেসে ফেলে বললে, আমার বিছানায়। ঘেন্না করে তো চাদর-ওয়াড় বদলে দিচ্ছি।

সমরেশ বললে, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। লোভ হচ্ছে। কিন্তু জামাইবাবু দেখলে চ'টে যাবেন। আর তাঁকে ঠাণ্ডা করতে হিমসিম খেতে হবে তোমাকে। থাক্‌গে, কাজ নেই। আচ্ছা—চলি ব'লে তিলুকে আর অনুরোধ করবার অবসর না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সারাদিন এই কথাটি সমরেশের মনে গুঞ্জিত হয়েছে, 'তিলু আজ তাকে তার বিছানা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল।' এ বিষয়ে তিলু চিরদিন বড় খুঁতখুতে। নিজের বিছানায় কাউকে বসতে পর্যন্ত দেয় না। কারও বিছানায় নিজে বসেও না। কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে ওর শুচি-বাতিক ভীষণ। কাউকে নিজের কাপড় পরতে দেয় না, কারও কাপড় নিজে পরে না। বিশেষ ক'রে তার অশুচিতা সম্বন্ধে তিলুর অসংশয়িত বিশ্বাস। তার যা-তা খাওয়া, যার তার সঙ্গে খাওয়া, যেখানে সেখানে যাওয়া—এ সম্বন্ধে কটু মন্তব্য তার মুখে লেগেই আছে। সেই তাকে যদি সে তার বিছানায় শোবার জন্য আমন্ত্রণ করতে পারে, তা হ'লে এটাকে তিলুর মনোরাজ্যে একটা চমকপ্রদ পরিবর্তনের সূচনা বলতে হবে।

বই পড়তে পড়তে এই সব কথাই ভাবছিল সমরেশ। তিলুকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে। ধীর শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। চিত্ত-বৃত্তির একটি সামঞ্জস্য আছে ওর চরিত্রের মধ্যে। কোন বিশেষ বিষয়ে কোন ঝোঁক নেই, কোন বিশেষ বৃত্তির প্রাবল্য নেই। তা ছাড়া, নিয়ম-নিষ্ঠ, কর্তব্য-নিষ্ঠ। এই জন্যে সকলে তাকে পছন্দ করে, তার প্রশংসা করে। শুধু তার সঙ্গে তার আচরণ একটু বিচিত্র।

ছেলেবেলা থেকে তার কাছে কাছে থাকত, একটুতে অভিমান কলহ অনুযোগ অভিযোগ করত। বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রাণ খুলে মনের কথা বলবার উপায় ছিল না, আড়ালে-আবডালে একটা সিগারেট টানবার উপায় ছিল না; গোপনে কোথাও আড্ডা জমাবার উপায় ছিল না। তিলু সব সময়ে লেজুড়ের মত জুড়ে থাকত তার সঙ্গে। ঠাট্টা করত বন্ধুরা, কানই দিত না ও। ও বড় হয়ে উঠলে, অনেকটা স্বাধীনতা পাওয়া গেল, এবং ওকে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একদিন। তারপর, যখনই তাকে কাছে পেয়েছে, সে অভিমান করেছে, রাগ করেছে, কটু ও কঠোর সমালোচনা করেছে। অথচ দেশের কাজে সে যোগ দিয়েছে ব'লে তিলু বিদেশী জিনিস ও বিলাসিতা বর্জন করেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরই ওর বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল। ও বললে, বি. এ. পাস না ক'রে বিয়ে করবে না। তারপর ওর বাবা মারা গেলেন। বি. এ.ও পাস করল ও। তখন, বিয়ের কথা হ'লেই মহেশ-বাবুর দোহাই পাড়তে লাগল। এমনই ক'রে এতদিন আইবুড়ো ব'সে আছে ও। কি যে ওর মনের ভাব, ক্ষীণতম ইঙ্গিতে কোন দিন প্রকাশ করে নি। সে নিজেও তার মনের ভাব কোন দিন ওর কাছে বলতে পারে নি, বলতে সাহস করে নি। জেল থেকে ফিরে এসে যখন সে দেখলে, তিলু ধর্মে মন দিয়েছে, স্বামীজীর শিষ্যা হয়েছে, সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছে, তখন একবার মনে হয়েছিল, তিলু বোধ হয় তাকে ছেঁটে ফেলবে তার জীবন থেকে। কিন্তু তা যে ভুল, সেটা বুঝতে দেরি হয় নি। তা ছাড়া, তিলুর একটা বিশেষ পরিবর্তন সে এবার এখানে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে যে অত্যন্ত উদাসীন, এ বিষয়ে তার মনে এতদিন একটি নিরেট নিশ্চিন্ততা ছিল। তাতে যেন চিড় ধরেছে। চিড় ধরিয়েছে লতু; কলকাতায় তরুণীদের সঙ্গে তার মেলা-মেশা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে। এখানে আসার পর, প্রতুলদের বাড়িতে তার ঘন ঘন যাওয়ার জন্যে সেই চিড়টা চওড়া হয়ে উঠেছে। প্রতুলদের দলের সম্বন্ধে তিলুর বিরাগ অত্যন্ত উগ্র। ওদের মতবাদের জন্যে ততটা নয়। যতটা

ওদের দলে মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার জন্তে। ঈর্ষা—সে পাছে ওদের দলের কোন মেয়ের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে—এই ভয়ে ও যেন চঞ্চল হয়ে রয়েছে রাত দিন। ওর কথাবার্তায় সন্দেহ ও ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করছে। তিলুকে আরও চঞ্চল ক'রে তুলেছেন গুণেনবাবু, যখন-তখন ওর সন্দেহ ও ঈর্ষার আগুনে ইন্ধন সংযোগ ক'রে এবং ওকে দখল করবার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে। যে মনের কথাটি তিলু এতদিন অন্তরের গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে প্রকাশ করবার জন্তে ও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ধরা দিয়ে ও যেন নিজেকে হারাবার ও তাকে হারাবার ভয় থেকে চিরদিনের জন্ত নিঃশঙ্ক হতে চাইছে।

ঝিমঝিম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদ নির্বাসিত হয়েছে মেঘের অন্তরালে। পৃথিবীতে জ'মে উঠছে আঁধার গাঢ় হয়ে। রাস্তার ধারে ভেকদের কলরব শুরু হয়ে গেছে। লণ্ঠনটাকে ঘিরে চলেছে বিচিত্র-পক্ষ পতঙ্গদের মজলিস। বাদলা-হাওয়ার মত দমকা হাওয়া বইছে মাঝে মাঝে, একটু শীত শীত করছে যেন।

হঠাৎ মুখ তুলে সমরেশ দেখলে, তিলু আসছে ভিজতে ভিজতে। ডান হাতে একটি পেতলের গামলা থালা ঢাকা। বাঁ হাতে একটি সাজি। পিছু পিছু হাঁদা আসছে, হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল সমরেশ। বললে, বেপরোয়া ভিজতে আরম্ভ করেছ যে, অসুখ করবে না?

বারান্দায় পা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে তিলু, বল কি? এত চিন্তা আমার জন্তে? শুনেও সুখ। মুচকি হেসে বললে, অসুখ করলে তো ভাল। সেবা পাব তোমার। সেবা ক'রেই এসেছি চিরদিন, পাই নি কখনও।—ব'লে ভিতরে চ'লে গেল।

ওকে দেখেই মা ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ মা, ভিজতে ভিজতে এলে? কাপড়টা ছেড়ে ফেল, মাথাটা মোছ। কি দরকার ছিল এত তাড়াতাড়ি করবার? বৃষ্টিটা ধরলেই আসতে। হ'তই বা একটু দেরি। তিলু বললে, না, ভিজি নি বেশি।

কই, দেখি মাথাটা তোমার?—মা বললেন।

তিলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

মা কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, এই বলছ ভেজো নি! ওগুলো নামিয়ে আগে কাপড় ছাড়গে, মাথাটা বেশ ক'রে মুছে ফেলগে। তারপর ওগুলোর ব্যবস্থা হবে।

তিলু রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে সব একটা জায়গায় গুছিয়ে রাখল। মাও ভিতরে গিয়ে বললেন, যাও মা, যাও। ভিজে মাথায়, ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।

তিলু হেসে বললে, এই লোহার শরীরে অসুখ দেখেছেন কখনও?

মা বললেন, না, তা দেখব কেন! কতবার যে ভুগেছ, আমাকে ভুগিয়েছ, মনে আছে বুঝি তোমার!

সমরেশ দরজায় এসে দাঁড়াল। মুরুব্বিয়ানার স্বরে বললে, সত্যি। রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, কি কি খাবার এনেছ, দেখি? এগিয়ে গিয়ে জিনিসগুলো দেখে বললে, সাজি-ভর্তি আম লিচু শসা দেখতে পাচ্ছি। আর ওটাতে? খোল না তিলু একবার, দেখি।

মা ধমকে বললেন, লোভী ছেলের অমনই খাই খাই শুরু হয়ে গেল। মেয়েটা যে ভিজে গেছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই। যা দেখি, একটা কাপড় এনে দে।

সমরেশ বললে, ও হ'ল সাধু সন্ত মানুষ। আমার কাপড় কি পরবে?

মা বললেন, একটা ধোয়া কাপড় বার ক'রে দে না। খুব পরবে। হ্যাঁ মা, পরবে না?

তিলু সমরেশকে বললে, তোমার একটা ধুতি দেবে চল।

শোবার ঘরে এসে সমরেশ তার সুটকেস থেকে একটা ধোয়া ধুতি বার করতে যেতেই তিলু বললে, তোমার একখানা কাচা কাপড় দাও না।

সমরেশ বললে, সেগুলো ময়লা। একখানা ধোয়া দিই বার ক'রে।

ধুতি বার ক'রে নিয়ে এসে বললে, খদ্দরের কিন্তু। পরতে পারবে কি?

তিলু ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল, দেবে তো দাও, না দেবে তো চ'লে যাচ্ছি।

মা হাঁক দিয়ে বললেন, দিলি রে?

তিলু ব'লে উঠল, দিতে চাচ্ছে না কাকীমা, বলছে—

মা ব'লে উঠলেন, এতটুকু দয়া মায়া নেই রে। এত ক'রে মরে ও আমাদের জন্মে। একখানা ধুতি বার ক'রে দিতে মন উঠছে না তোর?

ধুতিটা তাড়াতাড়ি দিয়ে বললে সমরেশ, দিয়েছি মা। এমনই মিথ্যে ক'রে বলছে।

মা ওর কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, এমন লোহার মত শক্ত মন করিস নে, বাছা। মায়া মমতা শেখ্।

সমরেশ বললে তিলুকে, মাকে শুরু করিয়ে দিলে তো! এবার থামানো দায় হবে।

তিলু দুষ্টু হাসি হেসে বললে, বাজে কথা বলছিলে যে!

সমরেশ নিরীহের মত মুখ ক'রে বললে, ব্লাউজ তো নেই। একটা ফতুয়া বার ক'রে দোব কি?

ফাজলামি হচ্ছে! ব'লে দেব কাকীমাকে?—চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল তিলু।

ধুতিখানা নিয়ে মায়ের শোবার ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে এল তিলু।

সমরেশ বললে, তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্ছে! বিধবার মত।

তিলু হেঁকে বললে, শুনছেন কাকীমা! আমাকে বিধবা বলছে।

আঁতকে উঠলেন মা—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলিস বাছা! কথার একটু আটকান নেই তোর?

সমরেশ বললে, বিয়েই হ'ল না ওর, এর মধ্যে বিধবা হওয়ার ভয়?

মা বললেন, নাই বা হ'ল। হবে তো। ও-কথা কখনও বলতে নেই মেয়েদের।

রান্নাঘরের মেঝেতে তিলু আসন পাতল, জল গড়িয়ে আনল; মাকে বসিয়ে খেতে দিল, লুচি মিষ্টি। তারপর, বঁটি পেতে ফল কুটতে বসল সামনে ব'সে।

সমরেশ বললে, মায়ের সঙ্গে আমার খাবারটিও যদি আনতে তিলু, তো ভাল করতে।

তিলু বললে, ক্ষিদে পেয়েছে তো চ'লে যাও না। লতু আছে, ঠাকুর আছে, খেতে দেবে।

বাড়ি ফেরবার সময়ে বৃষ্টি অনেকটা ধ'রে এল। সমরেশ ও তিলু দুজনে চলল পাশাপাশি। তিলু বললে, মিছিমিছি এতক্ষণ ব'সে রইলে; খাওয়া-দাওয়া সেরে এলেই পারতে!

সমরেশ বললে, বাঃ রে! তুমি খাও নি। আমি গিয়ে খেয়ে আসব?

মুখে হাসি ফুটে উঠল তিলুর। তৃপ্তির হাসি। অন্ধকারে দেখা গেল না। বললে, আমার সঙ্গে তোমার কি?

সমরেশ বললে, তা ছাড়া, তুমি নেই, বামুন-ঠাকুরের কাছে চেয়ে খেতে লজ্জা করত না আমার?

লতু তো আছে।

লতু ছেলেমানুষ। ওর কাছে কি চেয়ে খাওয়া যায়?

তিলু বললে, কেবল আমার কাছেই চেয়ে খেতে তোমার লজ্জা করে না, নয়?

সমরেশ বললে, সে কথাটা সত্যি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিলু বললে, আজকাল যে কার মুখ দেখে উঠছি রোজ রোজ, কান ভ'রে ভাল ভাল কথা শুনতে পাচ্ছি।

সমরেশ বললে, জামাইবাবুর বোধ হয়।

থমকে দাঁড়াল তিলু। রাগের সুরে তিলু বললে, দেখ ভোঁদু, তুমি আজকাল অত্যন্ত বাজে কথা বলতে শুরু করেছ। শুনলে রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্ব'লে যায় আমার। ও-রকম যদি আর বল, তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না আর।—ব'লে চলতে শুরু করল।

সমরেশ তার সঙ্গ রাখতে রাখতে বললে, খেতে দেবে তো? না, ফিরিয়ে দেবে রাগ ক'রে?

তিলু জবাব দিল না।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

বর্ষফল

এই শতাব্দীর প্রথম আধখানা তো ফুস্ করিয়া কাটিয়া গেল। বাকি আধখানার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? অতদিনের কথা বলিতে পারিব না। কিন্তু হঠাৎ এই বর্ষের—অর্থাৎ ১৯৫১ সালের—ফলাফল জানিতে পারিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। ইহা জ্যোতিষের বিচার নহে, সুতরাং জ্যোতিষী মহাশয়েরা দোষ ধরিবেন না। গত ৩১শে ডিসেম্বর কিছু আফিং চড়াইয়াছিলাম, এমন সময় আকাশ হইতে দৈববাণী শুনিলাম। বুঝিলাম, কমলাকান্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। সুতরাং এই দৈববাণী-মারফৎ লব্ধ বর্ষফলের দোষগুণ সত্যমিথ্যা সব কিছুই কমলাকান্তের। অবশ্য এই কমলাকান্ত সেই ওরিজিন্যাল কমলাকান্ত, যে নসীবাবুর আশ্রয়ে থাকিত; বর্তমান কালের ১নং বর্মণ স্ট্রীট নিবাসী দোসরা কমলাকান্ত নয়। ভূমিকা ছাড়িয়া এবার কমলাকান্তের দৈববাণীগুলি সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

সাধারণ রাষ্ট্রফল

সাধারণ রাষ্ট্রফলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল: আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধিয়াছে, অতএব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইবে না। প্রত্যেক পক্ষই মানবিক স্বাধীনতার জন্য আণবিক বোমার হুমকি দেখাইবেন ও নির্বিচারে মানুষ মারিবেন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা বিচিত্র হইবে। তাহার বিভিন্ন স্থানের দশা এইরূপ হইবে:—

(১) তনুস্থান। তনুস্থান গড়ে মাঝামাঝি হইবে। অর্থাৎ কেহ কেহ খুব ভাল থাকিবেন, কেহ কেহ খুব খারাপ থাকিবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা টাইফয়েড নিমোনিয়া বসন্ত ইত্যাদির প্রসার হইবে, কারণ এসব নিরোধের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা হইবে না।

(২) ধনস্থান। এই বছরে ধনস্থান আরও কঠিনতর হইবে। সাধারণ লোকের পক্ষে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হইবে। যাঁহারা ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি করিতে পারিবেন, তাঁহারা অসাধারণ বলিয়া

পরিগণিত হইবেন। গ্রন্থিছেদক ইত্যাদিরাও এইরূপ অসাধারণ হইবার চেষ্টা করিবেন বা হইতে পারিবেন।

(৩) মানস্থান। এ বছরে মানস্থান ভারতবর্ষের শুভ। সে কিছু করিতে পারিবে না বলিয়া আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে তাহার ঘন ঘন ডাক পড়িবে।

(৪) বন্ধুস্থান। এ বছরে যাঁহাদিগকে আমরা সাধারণত বন্ধু মনে করি না, তাঁহারা আমাদের বন্ধু সাজিবেন। যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা। আর, যাঁহাদিগকে আমরা বন্ধু হিসাবে পাইতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা আপাতত আমাদের বন্ধু সাজিলেও শেষ পর্যন্ত তাহা কত দুর থাকিবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। যেমন, চীন বা পাকিস্তান।

(৫) অতিথিস্থান। "অন্নংশ্চ ন বহু ভবেদ্ অতিথীংশ্চ লভেমহি" —অর্থাৎ আমাদের অন্ন বহু হইবে না, কিন্তু আমরা বহু অতিথি লাভ করিব। (প্রাচীন গ্রন্থে পাঠ আছে "অন্নংশ্চ নো"—কিন্তু বর্তমানে দেখা যাইবে, উহা ভুল পাঠ। 'নো'-এর বদলে 'ন' হইবে।)

সাধারণ নির্বাচন

সাধারণ নির্বাচন সম্ভবত হইবে না। যদি হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ফলগুলি দেখা যাইবে :—

(১) যে ছোকরা কলেজে বি.এ. পড়িতেছে, সে রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ও ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও ভোটাধিকার পাইবে না, কারণ তাহার বয়স ২০ বৎসর। আর আমাদের পাড়ার বুড়ী নেংলির মা কিছু না বুঝিয়াও ভোটাধিকার পাইবে, কারণ তাহার বয়স বাহাত্তর। অবশ্য তাহাকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়াও হইবে না, কারণ বাস্তবিক ভোট সে দিবে না, তাহার নামটা থাকিলেই হইল।

(২) এই ধরনের ভোটাধিকার ও ছোট ছোট নির্বাচন-কেন্দ্র হওয়ার ফলে দুই ধরনের লোক নির্বাচিত হইয়া আসিবে। এক, স্থানীয় কোনও প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি—জমিদার বা মহাজন বা ব্যাবসাদার বা ঐ ধরনের কেহ। অপর, একেবারে উগ্রমূর্তি সর্বহারার দল, যাঁহারা

সব কিছু করিয়া দিব বলিয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত কিছুই করিতে পারিবেন না।

(৩) ইহার মাঝামাঝি কিছুই থাকিবে না। এ পর্যন্ত যে সব স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল দেশের আন্দোলন ও অগ্রগতির পুরোভাগে ছিলেন, তাঁহারা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হইয়া লোপাট হইবেন।

রাষ্ট্রের স্বরূপ

রাষ্ট্রের স্বরূপ বিচিত্রতর হইবে। কোনও প্রদেশ অপর কোনও প্রদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখিবে না। প্রত্যেক প্রদেশই কেন্দ্রকে অস্বীকার করিতে চাহিবে। ফলে কেন্দ্রও এই সব প্রদেশের ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া সব জিনিস নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিবে। এক-এক প্রদেশে এক-এক রকম 'তন্ত্র' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিবে।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার যেটুকু থাকিবে, সেটুকুর অভূতপূর্ব চেহারা হইবে। বাংলার কলই বলিতেছি :—

(১) নির্বাচনের পরে আইন-পরিষদে বহু পার্টি থাকিবে। যথা— কংগ্রেস, নাম-কাটা কংগ্রেস, ল্যাজ-কাটা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, ভূতপূর্ব-লীগ-মুসলমান, জাতীয়তাবাদী মুসলমান, কংগ্রেসী মুসলমান, বাস্তুহারা-বাঙাল পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ পার্টি, টেকমল-নটগিভচাঁদ গ্রুপ, তপশীলী এলাকা, তপশীলী সম্প্রদায়, পৌণ্ড্র বিরোধী-নমঃশূদ্র গ্রুপ, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়, ধান্যচাষী সম্মেলন, আদিবাসী।

(২) এই সব পার্টি মধ্যে মধ্যে ডাহিনে বামে যাতায়াত করিবে। তাহার ফলে গভর্মেণ্ট মাঝে মাঝে বদল হইবে—জনসাধারণ রকমারি স্বাদ পাইবে।

(৩) সকলেই মন্ত্রী হইতে চাহিবে।

(৪) মন্ত্রী হইতে গেলে শুধু নিজে নির্বাচিত হইলে চলিবে না, অন্তত দশ জন লোক সঙ্গে থাকা চাই। (বাংলায় মোট আসন ২৩৭, তাহার মধ্যে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গভর্মেণ্ট গড়িবে, তাহার মোটামুটি

১৫০ লোক থাকা চাই। তাহার মধ্যে পনের জন মন্ত্রী হইলে ১৫০ ÷ ১৫ = ১০, এইরূপ হিসাব।) মন্ত্রী হইলে এই দশ জন লোককে খাওয়াইয়া পরাইয়া সুখে রাখিতে হইবে। ইঁহাদের কে কত সুখে রাখিতে পারেন, এই লইয়া বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিবে। যিনি এই প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবেন, তাঁহার সমর্থকেরা অন্য মন্ত্রীর দলে যাইবেন।

(৫) সাধারণ লোকে দাবি করিবে যে, মন্ত্রীদের নিম্নলিখিতগুলি অবশ্যকর্তব্য হইবে :—(ক) যেখানে সাধারণ নিয়মে যে জিনিস হয় না সেখানে নিয়ম ভাঙিয়া সেই সব জিনিস করানো। (খ) চাকরি ইত্যাদি দেওয়া। মোটের উপর তাঁহারা ঔচ্চন্তরিক তদ্বিরকার বলিয়া গণ্য হইবেন। ইহার উপর তাঁহারা যদি অন্য কাজ করিতে পারেন তো ভালই, না পারিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অবশ্যকর্তব্যগুলি পালন করিতেই হইবে। যাঁহারা জনসাধারণের এই সব দাবি পূরণ করিতে পারিবেন না তাঁহারা মন্ত্রী হইতে পারিবেন না, হইলেও থাকিতে পারিবেন না।

(৬) মন্ত্রীসভা বিচিত্র ও বহুবর্ণ শতরঞ্জের মত, অথবা দাবার ছকের মত, অথবা 'জিগ-স পাজ্‌ল-এর মত হইবে। তাহার এক টুকরা ছট্‌কাইয়া গেলে সমস্ত জিনিসটাই বেসামাল হইয়া যাইবে। এইরূপ ছটকানো প্রায়ই ঘটিবে।

(৭) কর্মচারীরা মন্ত্রীদের কথা শুনিবে না। তাহাদের নিজেদের মধ্যেও কেহ কাহারও কথা শুনিবে না। তাহারই মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা থাকিবে, তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারি, পুলিস কমিশনার, ও ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস—ইঁহাদের হাতেই থাকিবে, বাকি সকলেরই সমান অবস্থা হইবে এবং সকলেই ভুশণ্ডীর মাঠের মত নৃত্য করিতে থাকিবে।

লোকচরিত্র

এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি ফলের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) কাহাকেও বিশ্বাস করা চারিত্রিক দুর্বলতা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) নিঃস্বার্থ পরোপকার চারিত্রিক দোষ এবং নিঃস্বার্থ পরাপকার চারিত্রিক গুণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) চোরা-কারবার, হঠাৎ-বড়লোক-হওয়া, কাজ-না-করা ইত্যাদি চারিত্রিক সৌকর্যের পরিচায়ক হইবে। নূতন বড়লোক হওয়া গুণ ও পুরানো বড়লোক থাকা দোষ গণ্য হইবে।

(৪) দেশের কর্তৃপক্ষকে সকলেই গালি দিবে যে, তাঁহারা কিছু করিতেছেন না,—অথচ নিজেদের যেটুকু কাজ তাহা কেহই করিবে না।

ধর্ম

(১) এ পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত ধর্মই (কেবল কতকগুলি ধর্ম ছাড়া *) লোপ পাইবে, কারণ তাহা স্বাধীনতার পূর্বের, অতএব বাতিল।

(২) এই বর্ষে যে ধর্ম বহুলপ্রসার লাভ করিবে, তাহার বীজমন্ত্র হইল :—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

তাহা না হইলে নঁওগা পাকিস্তানে পড়িবার পর এই প্রোহিবিশন-এর যুগে মুর্শিদাবাদে আবার নূতন করিয়া গাঁজার চাষ আরম্ভ হয়! কিন্তু সরকারী কথা ছাড়িয়াই দিলাম, আমার কথাই বলি। যদি ধর্মের বীজমন্ত্র ঐরূপই না হইবে, তাহা হইলে আমি সব জানিয়া শুনিয়াও আফিং খাইয়াই চলিয়াছি, ছাড়িতে পারিতেছি না কেন?

"আফিংখোর"

* সেকুলার রাষ্ট্রে কোন ধর্মের গায়েই হাত দেওয়া চলে না, কেবল হিন্দুধর্ম ছাড়া।

গীতাভাষ্য*

হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক যে গীতা, সে সম্বন্ধে সকল সংশয়ের নিরসন হয়েছে কয়েক বছর আগেকার এক ঘটনায়। ইংরেজের আমল, ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলা দেশে একজন হিন্দু মহারাজা একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের একজন সভ্য মনোনীত হয়েছেন। শপথ গ্রহণ করা হচ্ছে। সাহেব সভ্য দুজন শপথের বাণী পাঠ ক'রে একে একে বাইবেল চুম্বন করলেন। মহারাজা পশ্চাৎপদ থাকবেন কেন, তিনিও পকেট থেকে একখানা বই বার ক'রে তাকে চুম্বন করলেন। সে বইটি হ'ল গীতা। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, হিন্দুর সবার বড় ধর্মপুস্তক—গীতা। আমি মহারাজচুম্বিত পবিত্র গীতার একটি ভাষ্য লিখতে প্রবৃত্ত হলুম।

কিন্তু গীতার তো বহু ভাষ্য রয়েছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রণীত ভাষ্য ও টীকা আছে। আনন্দগিরি-টীকা-সংবলিত শাঙ্করভাষ্য শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত টীকা রয়েছে। কৃষ্ণানন্দ স্বামী বাংলা ভাষায় বিশদভাবে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আর অন্য ভাষ্যের দরকার কি? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৯৩ সালে এর উত্তর দিয়ে গেছেন। তিনি গীতার এক ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করেন, আর তার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেন,—

"পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পূর্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাদের মনে সে সকল সংশয়

* এই ভাষ্য-লেখক "বেপরোয়া" একজন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। আমরা তাঁহার নিকট যৌবনে বিজ্ঞানের পাঠ লইয়াছিলাম। তিনি বিজ্ঞান ও "ন্যায়ে"র যুক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'গীতা'কে যে ভাবে কোতল করিয়াছেন, অনুভবে বুঝিতে পারিতেছি, তাহার উপরেও যুক্তি আছে; বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা বাহত সত্য হইলেও ভিতরে মিথ্যা। কিন্তু সে মিথ্যা প্রমাণ করিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। অথচ গুরুর ভাষ্য বাতিল করিবার মত জোরও নাই। এই কারণে এই ভাষ্য আমরা মুদ্রিত করিতেছি এই ভরসায় যে, কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি এই ভাষ্যের অসারতা প্রকাশ্যে প্রমাণ করিবেন।—স. শ. চি.

উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই টীকায় যতদূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।"

এর পর ৬৪ বছর চ'লে গেল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারা এগিয়ে চলেছে। বর্তমান কালের যুবকদের মনে নতুন নতুন প্রশ্ন জাগছে। অতএব গীতার নবতম ভাষ্যের প্রয়োজন আছে।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, রাজভবনে ব'সে আছেন, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্তে বিশেষ ব্যগ্র। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দিয়েছেন, হস্তিনাপুরে থেকেও সঞ্জয় দিব্যচক্ষে কুরুক্ষেত্রের ঘটনা সকল দেখতে পাবেন, সেখানকার কথা শুনতে পাবেন। সঞ্জয় তাই দিব্য-চক্ষে যুদ্ধ দেখছেন, কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন শুনছেন।

দিব্যচক্ষু দিব্যকর্ণের কথাটা অনৈসর্গিক, টেলিভিশন-যন্ত্র ব্যতিরেকে এটা সম্ভব ব'লে বর্তমান কালের যুবক বিশ্বাস করে না। যদি বল, তখন টেলিভিশন ছিল, তবে একালের যুবক ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে প্রশ্ন তোলে, তা গেল কোথায়? কিন্তু এখনকার যুবক এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় যে, কাব্যকে সে বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে যাচাই করবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুসৈন্য পাণ্ডবসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন, এমন সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।

শ্রীকৃষ্ণ তাই করলেন। এই অবস্থায় অষ্টাদশ অধ্যায় ব্যাপী দুজনের কথাবার্তা চলল, আর দু পক্ষের সৈন্য হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতেও কবিত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি।

সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি, উভয় সেনাদলের মধ্যে রথ রেখে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন, এসব কাব্য হ'লেও মূল ঘটনাটা কাব্য নয়, ঐতিহাসিক সত্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ সব নাকি প্রমাণিত হয়ে গেছে, সন তারিখ অবধি ঠিক হয়েছে। সে আলোচনাও আজ করব না।

আচ্ছা, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র জায়গাটা কত বড়? মহাভারতে

স্ত্রীপর্বে দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ১৬৬ কোটি লোক মারা গিয়েছে। হিসেবটা দিয়েছেন যুধিষ্ঠির, আর তিনি মিছে কথা বলবার লোক নন। ১৬৬ কোটি লোক যদি মারা গিয়ে থাকে তবে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কত যুযুৎসবঃ সমবেতা হয়েছিল? কুরুক্ষেত্র মাঠে গায়ে গায়ে দাঁড়ালে কত লোক ধরে? তখন ভারতের লোকসংখ্যা ছিল কত? যাক, এ সব প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করব না।

কোন্ পক্ষে প্রধান কে কে এসেছেন সঞ্জয় প্রথমে তার একটা ফিরিস্তি দিলেন, কে কি রকম শাঁখ বাজালেন তারও হিসেব পেলুম। এইবার অর্জুন যে উক্তি করলেন তা সত্যিই অপূর্ব! রাজ্য যাদের নিয়ে, তাদের মেরে রাজ্যে কি ফল! আমি যুদ্ধ করব না। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ। এ রকম অমৃতময় বাণী পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু ঠিক এর পরেই অর্জুন যে কথাগুলি বললেন, তা তেমনই জঘন্য। পুরুষরা মারা গেলে তাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হবে। তাদের গর্ভে নীচলোকের ঔরসে সন্তান জন্মাতে থাকবে, বংশ নীচ সন্ততিতে পূর্ণ হবে, কুলধর্ম উৎসন্ন যাবে, পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ পাবে। অর্জুনের এ উক্তি থেকে দুটো কথা আমরা জানলুম। স্বামী মারা গেলেই স্ত্রী পরপুরুষ ভজনা করে, আর সে পরপুরুষ স্বজাতি থেকে আসবে না, সে নীচজাতীয় হবে। এই যদি দ্বাপরের সামাজিক অবস্থা হয়, তবে বেঁচে থাকুক আমাদের কলি। বঙ্কিমচন্দ্রও বলতে বাধ্য হয়েছেন, কথাটা অতি মোটা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ছেলেদের জন্যে যে সরল গীতা লিখেছেন, দেখলুম তিনি ওই জায়গাটা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। ভালই করেছেন। আচ্ছা, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ তো ক্ষেত্রজ পুত্র, অন্য কর্তৃক উৎপাদিত! যদি তাঁদের দেওয়া পিণ্ডে তাঁদের পিতৃগণের সদ্গতি হতে পারে, তবে বর্ণসংকর কর্তৃক দেওয়া পিণ্ড ব্যর্থ হবে কেন? অর্জুনের এতে ভয় পাবার কি ছিল? স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি স্বজাতির পুরুষের অনুগামিনী হয়, অর্জুনের বোধ হয় তাতে আপত্তি নেই। বলিহারি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা!

তবে অর্জুনের এই আবোল-তাবোল বকুনির আসল কারণটা

লোকে ধরতে পারে নি। অর্জুনকে তখন ধরেছিল ম্যালেরিয়ায়, ম্যালেরিয়ার ঘোরে যা-তা ব'কে যাচ্ছিল। আচ্ছা, উপসর্গগুলি মিলিয়ে নিন।—

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥

একেবারে খাঁটি ম্যালেরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ অতটা বুঝতে পারেন নি।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্ব ব'লে কিছু নেই, কাব্য হিসাবেও এর স্থান খুব নিচে। এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসা যাক। ধর্মতত্ত্ব আরম্ভ হ'ল এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাই এখান থেকেই তাঁর ভাষ্য আরম্ভ করেছেন।

অর্জুন গোড়ায় যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। দু পক্ষ থেকেই যুদ্ধের আয়োজন হ'ল। সেনারা সম্মুখীন, যুদ্ধ আরম্ভ হবে। এমন সময় অর্জুন স্বজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর হয়ে পড়লেন, বললেন, আমি যুদ্ধ করব না, সামান্য পৃথিবীর রাজত্ব কেন, ত্রিভুবনের আধিপত্য পেলেও এই সব আত্মীয়দের হত্যা করতে পারব না। এই ব'লে ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে শোকাকুল চিত্তে রথের উপর ব'সে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে অর্জুনকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, আর সেখানে ধর্মতত্ত্ব আরম্ভ হ'ল।

গোড়ায় একটা অদ্ভুত কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করবার নানা রকম যুক্তি দিলেন, সব শুনে অর্জুন যুদ্ধে লেগে গেলেন, তুমুল যুদ্ধ হ'ল, ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্মূল হ'ল। এই সব প'ড়ে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে, তিনি তাঁর অহিংসনীতি ওই গীতা থেকেই পেয়েছেন। মহাত্মাজী বলছেন, মহাভারতকার ভৌতিক যুদ্ধের সার্থকতা সিদ্ধ করেন নি, তার নিরর্থকতাই সিদ্ধ করেছেন, বিজেতাকে কাঁদিয়েছেন, অনুতাপ করিয়েছেন, দুঃখ ছাড়া আর কিছু বাকি রাখেন নি। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মাজী যাঁকে বলছেন মূর্তিমন্ত শুদ্ধ, পূর্ণজ্ঞান, তিনি যেটা করা উচিত নয়, যা অধর্ম, অর্জুনকে দিয়ে তা করাবার জন্যে দীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়েছেন।

একই মূলের এই রকম বিপরীত অর্থ দেখলে আমাদের হতভম্ব হয়ে যেতে হয়।

এখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিটা বিশ্লেষণ করব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

যাদের জন্যে শোক করবার দরকার নেই, তুমি নিরর্থক তাদের জন্যে শোক ক'রে অবিবেকীর মতো কাজ করছ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্ধক্য এই তিন অবস্থা হয়, তেমনই দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, ধীর পুরুষ তাতে বিমুগ্ধ হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রকম দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে অভিনব দেহ ধারণ করে।

মানুষের দেহ আছে, মন আছে, একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার সম্বন্ধ ওই দেহ ও মনের ভিতর দিয়ে। মানুষ ম'রে গেলে তার দেহ ও মন থাকে না। এ কথাগুলি সর্ববাদি-সম্মত। সৌদামিনী তার স্বামী নরহরির প্রতি অনুরাগিণী—যৌবনেও অনুরাগিণী, বার্ধক্যেও অনুরাগিণী। স্বামী তাকে সোহাগ যত্ন করে, ভাল কাপড় কিনে দেয়, ভাল খাওয়ায়, অসুখ বিসুখে দেখে। সেই স্বামী একদিন মারা গেল, সৌদামিনী পথে দাঁড়াল। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বাছা সৌদামিনী, কেঁদো না, তোমার স্বামীর দেহ গেছে, যাক; কিন্তু সে ম'রে নতুন দেহ নিয়েছে। বস্, শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির পর আর সৌদামিনীর দুঃখ কিসের! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই নবানি দেহীকে দেখিয়ে দিতেন, তবে সৌদামিনী না হয় আঁতুড় ঘরে গিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ-করা সেই শিশুর কাছে খোরপোষের দাবি করত, তাকে প্রেম নিবেদন

করত। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমরা একটা বিধান চাই, নরহরি এক জায়গায় না এক জায়গায় যখন একটা দেহ নিয়ে আছে, তখন সৌদামিনী আলতা পরতে পারে কি না, ইলিশমাছ-ভাজা খেতে পারে কি না।

শ্রীকৃষ্ণের এই নবানি দেহী কথাটা যদি বাজে না হ'ত, আর আত্মীয়স্বজন যদি এই নবানি দেহীকে চিনতে পারত, তবে রাজশেখর বসুর ভুশণ্ডীর মাঠে শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী আর নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী যেমন দাপাদাপি করেছিল, সমস্ত পৃথিবীতে সেই রকম চলত। কিন্তু সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের উপমাগুলো আর তাঁর যুক্তি একেবারে অসার। কৌমার যৌবন জরা চোখের উপর দেখছি, তার সমপর্যায়ে ফেলা হ'ল নবানি দেহী, আজও যার কোন প্রমাণ হয় নি। ছেঁড়া কাপড় যখন পরিত্যাগ করি, তখন সামনে একখানা নতুন কাপড় জাজ্বল্যমান থাকে। এর সঙ্গেও নবানি দেহীর তুলনা হ'ল! বলি, নবানি দেহী রবি ঠাকুরকে যে আজ ক খ চিনতে হচ্ছে। আর শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত যুক্তি নির্ভর করল এই begging the question-এর উপরে।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার বা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নয়। তিনি নিত্য, সর্বত্রব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি।

হায়, হায়, নাথুরামের কৌন্সুলি যদি এই কথাগুলি বলত, তবে হাকিম আত্মাচরণ নিশ্চয়ই নাথুরামকে ছেড়ে দিতেন। গান্ধীজী তো মরেন নি, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি আর রাজঘাটে নৈনং দহতি পাবক।

অর্জুনকে বোকা পেয়ে তো শ্রীকৃষ্ণ লম্বা লম্বা বাত ঝাড়লেন, কিন্তু তাঁর নিজের বেলায় কি রকমটা ঘটল দেখা যাক। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন (এখানে কাশীরাম দাস থেকে উদ্ধৃত করছি)—

একজন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥

শোকেতে আকুল রাম না আইসে ঘরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারী॥

এ কি কথা! বলি ওহে যাদব, শোকে প্রাণ ধরতে পারছ না কেন?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বলবেন, আহা, শ্রীকৃষ্ণ হলেন পূর্ণব্রহ্ম, পৃথিবীতে লীলাখেলা করতে এসেছেন। এঁর কথা ও কাজের মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকতে পারে! ঠিক কথা।

যা হোক, আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচার করব না। সত্যি তো, শ্রীকৃষ্ণ ব'লে কেউ ছিলেন না, তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বেদব্যাস। কিন্তু বেদব্যাসের এ লেখাটা খুব উচ্চাঙ্গের হয় নি। মহাভারতের আগে তো ঋষিরা বেদের জ্ঞানকাণ্ড লিখে গিয়েছেন। সে লেখা পড়লে মনে হয়, আমরা যেন "আর এক জগতে এক উন্নততর মহত্তর অতিবলিষ্ঠ ও তেজস্বী মানব-সমাজে এসে পৌছেছি, সে সমাজের প্রেরণা তেজ, বীর্য, মেধা, জ্ঞান, মঙ্গল, অমৃত, আনন্দ, সংযম ও শান্তির বাণীতে ভরপুর।" মহাভারতে ভীষ্ম, বিকর্ণ, বিদুর, কর্ণ, গান্ধারী প্রভৃতি চরিত্রের সৃষ্টি ক'রে বেদব্যাস অমর হয়েছেন। ভীষ্মের কথায় আসি। পৃথিবীর কোন সাহিত্যে এতবড় চরিত্র অঙ্কিত হয় নি। হিন্দুর চিত্তে এই চরিত্র কি রকম রেখাপাত করেছে, তা এই থেকে বোঝা যাবে যে, আজও প্রতি হিন্দু তার বাপ-পিতামহের তর্পণ করতে গিয়ে চিরকুমার ভীষ্মের উদ্দেশে এক গণ্ডুষ জল দেয়। সেই ভীষ্মপর্বে গীতার অবতারণা ক'রে বেদব্যাস মহাভারতের মর্যাদা খুব বেশি বাড়ান নি। অবশ্য যে সব ভক্ত ক অক্ষর দেখলেই কেঁদে আকুল হন, তাঁরা অন্য রকম বলবেন।

এখন ওই আত্মার কথাটায় আসা যাক।

হিন্দুশাস্ত্রের মূল কথা হ'ল কর্মফলে বিশ্বাস। কর্মফল ভোগ করবার জন্যে হিন্দুশাস্ত্র আত্মার কল্পনা করেছেন। এই আত্মা দ্রষ্টা, শ্রোতা, ভোক্তা। দেহ হ'ল আত্মার কর্মসাধনের যন্ত্র। প্রাণশক্তি থেকে আত্মার পার্থক্য এই যে, আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরও আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে কর্মফল ভোগের জন্যে অনন্তকাল জীবিত থাকে। এই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলব।

জীবদেহে আত্মা প্রথম কখন আসে? আমরা জানি, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ বীজই প্রথম থেকে জীবিত পদার্থ। নিশ্চয় এদের প্রত্যেকেরই এক-একটা আত্মা আছে। অথচ সমস্যা এই যে, সাধারণত এদের মিলন না হ'লে কোন জীবের সৃষ্টি হয় না। এর মানে কি এই যে দুটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মার রাসায়নিক সংযোগে একটা বড় আত্মার সৃষ্টি হয়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে জলের সৃষ্টির মতো? আচ্ছা, তা হ'লে কয়েকটি বিশিষ্ট জাতির প্রাণীর যে পুরুষ সাহায্য ব্যতীত সন্তান হয় তা কি রকমে সম্ভব? তারপর এই আত্মা জীবদেহের কোথায় থাকে? হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস বা মস্তিষ্ক কোথাও থাকতে পারে না, কারণ এদের প্রত্যেকেরই অভাবে মানুষ অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বেঁচে থাকে। তারপর এমন জীব আছে, যাকে দু টুকরো ক'রে দিলেও প্রতি টুকরো একটা পৃথক জীব হিসেবে বেঁচে থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রতি বারো বছর অন্তর জীবের পুরানো জীবকোষ-গুলি সব চ'লে যায়, নতুন জীবকোষের আবির্ভাব হয়। তবে কি সঙ্গে সঙ্গে পুরানো আত্মা চ'লে গিয়ে নতুন আত্মা দেখা দেয়! তাঁরা আরও বলেন যে, জীবের মৃত্যুর পরও অনেকগুলি জীবকোষ কিছু সময়ের জন্য জীবিত থাকে। তা হ'লে ম'রে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা দেহ ছেড়ে চ'লে যায় না। আত্মা দ্রষ্টা, শ্রোতা, কর্তা বটে; কিন্তু চোখের optic nerve ব্যতীত তিনি দেখতে পান না, মস্তিষ্কের অংশবিশেষের অভাবে বোধ করতে পারেন না, অন্য অংশের অভাবে ক্রিয়া করতে পারেন না। অথচ বিশ্বাস করতে হবে যে, দেহমুক্ত আত্মা কর্ম অনুসারে ফলভোগ করে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন রকম প্রমাণ দিয়ে কেউই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অথচ এই জিনিসটাকে ধ'রে নিয়ে, এই আত্মার উপর ভিত্তি ক'রে শ্রীকৃষ্ণ একই কথা হরেক রকম ক'রে যুক্তি হিসেবে চালিয়ে গেলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা করলেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ করা, অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়; অতএব যুদ্ধ করা হচ্ছে তোমার ধর্ম। ধর্ম এমন কিছু, যা দেশ, কাল, ব্যক্তি, জাতি নিরপেক্ষ। ব্রাহ্মণের পক্ষে যা নিষেধ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যদি তা বিধি হয়, তবে সেটা, আর যাই হোক, ধর্ম নয়। স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি শ্রীকৃষ্ণের এই বিধানকে একটুও আমল দেবে না।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ এই চারটি শ্লোক বললেন,—

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন,—

"এই চারটি শ্লোক কি করিয়া এখানে আসিল তাহা বোঝা যায় না। এই চারটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই শ্লোকগুলির বিষয় না ধর্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব। ইহাতে বিষয়ী লোক যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশস্বরূপ ব্যবহার করে তাহা ছাড়া আর কিছু নাই।' এ ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ব্যতীত আর কিছু নয়। শঙ্কর এই কয়টি শ্লোকের কথাকে 'লৌকিক ন্যায়' বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি

লৌকিক ন্যায় পরিত্যাগ করিতে না পারেন তবে আমরা দাঁড়াই কোথায় ?"

কোথায় আর দাঁড়াবেন, অগাধ জলে।

কিন্তু ঠিক পরের শ্লোক থেকে মোড় ফিরল, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথা বললেন।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

খুবই উঁচুদরের কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটু পরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে আরম্ভ করলেন, তা নিছক গালমন্দ। আমরা তো শুনে এসেছি বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতীয়েরা বেদকে ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করেছিলেন। কপিল ঈশ্বর ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বেদ ত্যাগ করেন নি, অন্য দিকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। এখন আমরা পেলুম এক ভগবান আর এক ভগবানের বিধিকে গাল পাড়তে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করলেন, বললেন, বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী, তারা ঈশ্বর আরাধনার অযোগ্য। বেদ বলেছেন, কর্ম কর, আর কর্ম মানে হ'ল যজ্ঞাদি কর্ম। গীতা বললেন, ছ্যা ছ্যা, ও আবার কর্ম, ও সব বুজরুকদের কথা দেড়ে দাও, নিষ্কাম কর্ম কর। এখন আমরা করি কি!

যা হোক, শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। কর্ম কর কিন্তু কর্মফল কামনা ক'রো না, আবার ফল চাই নে ব'লে কর্মে বিরত হ'য়ো না। সুর খুব উঁচুতে উঠল, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে এসে শ্রীকৃষ্ণ আবার ধপাস ক'রে পড়লেন। দশম থেকে ষোড়শ পর্যন্ত শ্লোকগুলি একেবারে বাজে। একটি চক্রের কথা বলা হয়েছে, আর চক্রটি হ'ল এই,—

ব্রহ্ম থেকে বেদ, বেদ থেকে কর্ম, কর্ম থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে মেঘ, মেঘ থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীব—

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

হে পার্থ, ইহলোকে এই রকমের চক্র অনুবর্তন না ক'রে যিনি ইন্দ্রিয়ের সুখ উপভোগ করেন, তিনি পাপী, বৃথাই তিনি জীবন ধারণ করেন।

এই চক্রটি কি, আর একবার দেখা যাক। ব্রহ্ম থেকে বেদ। ব্রহ্ম কোথায় কবে কি ভাষায় বেদ লিখলেন আমাদের জানা নেই, তবে বেদ যে ঋষিদের লেখা তার প্রমাণ বেদেই আছে। বেদ থেকে কর্ম। বুঝলুম না। কর্ম থেকে যজ্ঞ। না, তা নয়। যজ্ঞ থেকে মেঘ। একালে যজ্ঞ হয় না, তবুও মেঘ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এ সব উক্তি অবৈজ্ঞানিক, অসত্য।

অধ্যায়ের পর অধ্যায় চলল, এক কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবার বলা হ'ল। মাঝে মাঝে ভাবের ঝলক আছে, আবার তখনই কতকগুলি অসার যুক্তিহীন কথার অবতারণা করা হয়েছে। এর মধ্যে এল একটা গাঁজা অধ্যায়, অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেহটাকে ফুলিয়ে বিশ্বজোড়া ক'রে ফেললেন।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

একেবারে অনন্তের ছড়াছড়ি। তবে সূর্য যদি চোখ হয়, তবে দু পক্ষের সৈন্যেরা তখনই ঝলসে মারা গেল না কেন?

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

হে বিষ্ণো! তুমি যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হয়ে নিজের প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করে বীরগণকে ভক্ষণ করছ।

বীভৎস দৃশ্য।

কেউ কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মেসমেরাইজ করেছিলেন। আমি বলি, তা নয়, অর্জুনের ম্যালেরিয়াজনিত বিকার তখনও কাটে নি।

শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

হে অর্জুন, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এই জন্যে তোমার হিতার্থ এই গুহ্যতম কথাগুলো বলছি।

শ্রীকৃষ্ণ ঠ'কে গেলেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় না হ'লেও সঞ্জয়ের কৃপায় আর ছাপাখানার দৌলতে ওই সব গুহ্যতম কথা জেনে ফেলেছি।

এইবার গীতার পরিসমাপ্তি।

আজকাল জওহরলাল ভারতবাসীকে ডেকে যা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই ব'লে শেষ করলেন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

"বেপরোয়া"

নিঃস্ব বিশ্বনাথ

আপনারে নিঃস্ব করি
বিশ্বযশা ধরণী-ঈশ্বর।
বক্ষে স্মৃতি অবিনাশী
মরতে কৈলাস কাশী
তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসি
দেখিবারে দেব বিশ্বেশ্বর।
ঝলসিছে অগ্নিবর্ণ,
বৃথা পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ
যক্ষপুরে কোথা পাব শুদ্ধসত্ত্ব দেবতা সাক্ষাৎ!
দ্বারে করে কোলাহল
বুভুক্ষু ভিক্ষুর দল
দম্ভীর মন্দিরে বন্দী অসহায় অনাথের নাথ।

শ্রীভোলানাথ দত্ত

শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী'র প্রথম খণ্ড এবং সদ্য-প্রকাশিত 'শরৎ-পরিচয়ে' পত্রাবলীর শেষাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুন হইতে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত শরৎ চন্দ্রের মাত্র চারিটি পত্রের অংশবিশেষ শ্রীনরেন্দ্র দেবের 'পাঠশালা' পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস-সম্পর্কে প্রমথনাথের নিকট লিখিত পত্রাবলী বিশেষ মূল্যবান। প্রমথনাথ মৃত্যুকালে এই পত্রগুলি সুহৃৎ এবং সহায়ক সাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ঘোষের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই অনুরোধ জানাইয়া যান যে, পত্রগুলি যেন তাঁহার ও শরৎ চন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত না হয়। শরৎ চন্দ্রের মৃত্যুর পর (প্রমথনাথ পূর্বেই গত হইয়াছিলেন) নবকৃষ্ণ পত্রগুলি প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এই সময় তিনি নিদারুণ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তার পর দীর্ঘ তিন বৎসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পত্রগুলি অপ্রকাশিতই থাকে। এই সময়ে শ্রীনরেন্দ্র দেব পত্রগুলির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার লিখিত শরৎ চন্দ্রের জীবনীতে তাহা ব্যবহার করিবেন বলিয়া সেগুলির নকল লইয়া যান। পরে একদিন জলধর সেনের সঙ্গে গিয়া ছাপিবার পূর্বে মূল পত্রগুলি মিলাইয়া লইতে হইবে বলিয়া সেগুলিও দুই দিনের মধ্যে ফেরত দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া লইয়া যান। নবকৃষ্ণবাবু পত্রগুলি দিবার পূর্বে যথাযথ নকল করিয়া ও মিলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আরও কিছুকাল নবকৃষ্ণবাবু জীবিত ছিলেন, এবং বার বার তাগাদা দিয়াও মূল পত্রগুলি নরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে ফেরত পান নাই। নবকৃষ্ণবাবুর পুত্রেরাও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তাঁহাদের শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল, নরেন্দ্র-বাবু পত্রগুলি সাধারণের ব্যবহারার্থ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে, নরেন্দ্রবাবু স্বসম্পাদিত 'পাঠশালা'য় মাত্র চারিটি পত্র আংশিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নবকৃষ্ণবাবুর ইচ্ছা ছিল, পত্রগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে এই কারণে তিনি যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদের ইচ্ছা পত্রগুলির বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের গোচরে আসে; সেই কারণে নকলগুলি আমাদের নিকট প্রকাশার্থ দিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর নিকট তাঁহাদের সহিত আমাদেরও নিবেদন এই যে, মূল পত্রগুলি তিনি যেন অবিলম্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দান করেন।]

১

D. A. G.s, Office, Rangoon
11. 3, 12.

প্রমথকে জানাইতেছি যে আমি ও দেশে মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকি এবং ভবিষ্যতেও যাইবার আশা রাখি। আমি যখন যাই অন্ততঃ শেষ দু-বারের মধ্যে চেষ্টা করিয়াও প্রমথর ঠিকানা না জানায় দেখা করিতে পারি নাই।

আমি নিজেও ভাল নই। কেন না বছর দুই আগে হৃদ্‌রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি, আজো সম্ভবতঃ আরোগ্য হই নাই, তবে যন্ত্রণাটা কমিয়াছে।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারির রাতে আমার বাড়ী ঘর দোর সব জলিয়া গিয়া একটু মুস্কিলে পড়িয়াছি। হাজার দুই টাকার জিনিসপত্র ত গিয়াছেই তা ছাড়া একটা দামী লাইব্রেরী ছিল—manuscript প্রভৃতি সবই গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম এই মে মাসের শেষেই একটা কিছু প্রেসে পাঠাইয়া দিব। কাহার উপরে ভার দিব ভাবিতেই অনেক বার প্রমথর কথা মনে হইয়াছে কিন্তু এটা মনে করি নাই যে সে আজো সম্ভবতঃ কলিকাতাতেই আছে। আশা করি খবর সব ভালই।—শরৎ

মে মাসের মধ্যে আবার কলিকাতায় যাইব।

২

D. A. G.'s Office, Rangoon
22-3-12.

প্রমথ—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে তাহা আমি জানি। কেন না, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত করিবেই!

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম! তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন, এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মরণ করাইয়া দিতে! আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোনো দিন কাহারো দেখা পাও—বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরু ভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্ম্মান্তিক করিবে না এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকুরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript—"নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসর publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয় তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যে রকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য সভা'র একটি মাত্র সভ্য 'নিরুপমা দেবীই' সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না?

আমার আগেকার কোনো লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি।

(1) Novel, History, Painting

কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত।

তোমার স্নেহের শরৎ

৩

D. A. G.'s Office, Rangoon
29. 4. 12

প্রমথ,—আমি মনে ক'রে আছি তুমি চিঠি লেখ না কেন—এ দিকে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা' আমার বাস্কেটেই পড়েছিল। মনে জানি নিশ্চয়ই পোষ্ট করা হয়ে গেছে।—এ রকম ভুল হওয়ায় বড়ই লজ্জিত হয়ে আছি যাহোক এ বারের মত বেশী কিছু মনে কোরো না এই অনুরোধ করি।

আমার Habit প্রভৃতি তুমি অপরের কাছে সন্ধান লইতে গেলে কেন? জিজ্ঞাসা করলে আমি কি বলতাম না মনে কর? অবশ্য তুমি আমার বর্ত্তমান মনের ও শারীরিক অবস্থা জান না—দেখ্‌লে বুঝতে পারবে—মিথ্যা কথা ব'লে কাজ বাড়াবার মত সময় আমার একেবারে নাই।

এ চিঠিতে বেশী কিছু লিখ্‌ব না শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে আমি মে মাসেই যাব—কবে, কি বৃত্তান্ত বল্‌তে চাই নে। আমাকে সশরীরে দেখলেই টের পাবে আমি এসেছি।—

এক রকম শরীরের স্বস্তি নাই তার ওপরেও ক'দিন থেকে আরো যেন অসুখ করেছে—

শীঘ্র জবাব দিও কাজ আছে।—শরৎ

৪

[৪ এপ্রিল ১৯১৩]

প্রমথ, তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম, তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস—আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি। আমি ত যোগ্য নই ভাই! আমার অনেক দোষ। তোমার সরল, স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাকে অনেক সময়ে সুখ দেয়—দুঃখ দিতেও ছাড়ে না। ভাবি, আমার সম্বন্ধে এই লোকটা ইচ্ছা ক'রেই আত্মপ্রবঞ্চনা করছে—না সত্যি এত সরল সুহৃৎ আজ কাল মেলে? তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, এ কথা কেউ যদি না বিশ্বাস করে প্রমথ, তুমি করবেই। আমার অনেক দোষের সময়েও যখন বিশ্বাস ক'রে এসেছ, তখন, এখন ত আমি ভাল ছেলের মধ্যেই। আজকাল প্রায়ই সত্যি কথা বলি।

আমার অনেক কথা আছে। আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলেবেলাকার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমারও ভাল লাগ্‌ত (মনে আছে বোধ হয়—পাথুরেঘাটায়) আমারও ভাল লেগেছিল লিখেওছিলাম। আজ তুমিও বড় হয়েছ আমিও। তোমারও ভাল লাগে নি, আমার ত অতি বিশ্রী লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয়! এও প্রকাশ করেছেন!

অনিলা দেবী ও তাঁর ভাই শরৎ—অর্থাৎ শরৎ এবং অনিলা দেবী—অর্থাৎ অনিলা দেবী এবং শরৎ 'যমুনা' কাগজে কথা দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধেছেন। আমি অনেক অপরাধ অনেক গর্হিত কায আমার প্রথম বয়সে করেছি—আর করতে চাই নে ভাই! আমি কথা দিয়েছি—তুমি আমার বন্ধু—এতে প্রফুল্লমনে সম্মতি দাও। লোভের বশে, বা তোমার মত বন্ধুর অনুরোধেও আর অসত্য সৃষ্টি না করি এই আশীর্ব্বাদ ক'রে আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভিক্ষা দাও। আমার মামারাও বিরূপ—তাঁদেরও অনেক অনুনয় করেছি। আমার লেখা, (ছোট গল্পে যদিও তেমন মজবুত নই) ফাল্গুন থেকে যমুনায় বেরোচ্ছে এবং তোমার অনুমতি পেলে আরও কিছু কাল নিশ্চয়ই বেরোবে। আমার মত্ এবং গল্পের ধারা সম্বন্ধে বিচার করবার জন্য দুই এক দিনের মধ্যেই যমুনা পাবে। যমুনা দেখে সমুদ্রের ধারণা তোমার না করতেও হয়ত হ'তে পারে। যমুনা দেখে যমুনার ধারণাই কোরো—তোমার স্বাধীন মত লিখে জানাইয়ো। বৈশাখও প্রথম বৈশাখেই পাবে। তাতে নারীর মূল্য ব'লে ক্রমশঃ একটা প্রবন্ধ অনিলা দেবী লিখছেন। তার সম্বন্ধেও মত দেবে।

'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তা ছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। আমার সম্বন্ধে (অবশ্য আমার recent লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে) যদি ভাল opinion হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো—কিন্তু, এখন নয়। নিঃশব্দে গোপনে—ঢাক ঢোল পিটে ফটোগ্রাফ দিয়ে নয়। আমি অত অর্ব্বাচীন নই। আরও

একটা কথা এই যে, চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা' সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্—Psychological—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি। সেটা পুড়ে যায় তার পরে ছুটো মিশিয়ে একরকম ক'রে লিখেছি।

আজ এই পর্য্যন্ত। বাড়ীর খবর ভাল ত? আমার কথাটা বাড়ীর মধ্যে একবার জানিয়ে দিয়ো। তোমার পিসীমাকে প্রণাম জানালাম।

তোমার স্নেহের শরৎ

প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব—মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিম্বা গল্প এক রবি বাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে—সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরাধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই। তোমাদের কাগজে ভাল লেখার অভাব হবে না; কেন না, তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই 'যমুনা'কে ছাড়ি, তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি meritএর আদর থাকে—তবে যমুনা বড় হবেই। আমি কোনদিন কোন কাজেই এলাম না ভাই, যদি এই একটা কাজ সম্পন্ন ক'রে তুল্‌তে পারি, তবুও একটু সুখে মরব। এর মধ্যে আমাকে জবাব দেবার প্রয়োজন নাই। একেবারে বৈশাখের যমুনা দেখে তোমার স্বাধীন মত দিয়ে চিঠি লিখো। দিদির নারীর লেখাটা সম্বন্ধে বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু Truth চাইই। আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক—খাতির ক'রে কথা বল্‌তে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব যথা—(১) নারীর মূল্য (২) ধর্ম্মের মূল্য (৩) ঈশ্বরের মূল্য (৪) নেশার মূল্য (৫) মিথ্যার মূল্য (৬) আত্মার মূল্য (৭) পুরুষের মূল্য (৮) সাহিত্যের মূল্য (৯) সমাজের মূল্য (১০) অধর্ম্মের মূল্য (১১)......(১২).

বোধ করি বছর দুই লাগবে শেষ করতে। মত কি? ভাল হবে? দ্বাদশ মূল্য নাম দেব মনে করছি। তোমার লেখার কি হ'ল? বলেছিলে পাঠাবে? যদি পাঠাও 'registered' পাঠাবে।

৫

১৭ই এপ্রিল ১৯১৩
রেঙ্গুন

প্রমথ, তোমার কাল পত্র পাইয়াছি আজ জবাব দিতেছি। সময় নাই কাযের কথা বলি। বৈশাখের যমুনায় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে চরিত্রহীন শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে। এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব স্থির করা যথার্থই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে (false position)এ পড়িবে এইটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলিয়াছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। যমুনায় ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন, তোমার সম্মান অসম্মানের কথা—এইটাই আসল কথা। জলধরবাবু প্রভৃতি নামজাদা লেখক—তাহাদের জোর করিয়া পয়সার লোভে লেখা উপন্যাস অবশ্য ভাল হইতেই পারে না কিন্তু, তবু নাম আছে—সেগুলো ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। অথচ, আমারটা যে তোমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে এরই বা স্থির কি? যাই হৌক তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনের' যতটা লিখিয়াছিলাম— (আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনরূপ বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর

সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে। তোমাদের জলধর সেন প্রভৃতির লেখাই বেশ হইবে। আমার এ সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে! তবে, তোমার উপর আমার এই শপথ রহিল যদি বাস্তবিকই আর দ্বিতীয় উপায় না থাকে তাহলে আর কি বলিব অন্যথা আমাকে ছাড়িয়া দিয়ো—যমুনার কলেবরই ইহাতে বৃদ্ধি করিব। তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে। তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত তাহলে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে, একটা কথা বলি—শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student—সত্য student. Ethics বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাই হৌক পড়িয়া ফিরিয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়। ষাঁড়ের বাড়ীর গল্পও নয়। যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই—আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো—

শরৎ

৬

[মে ১৯১৩?]

প্রমথ, তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস। এই জন্যই 'যমুনা' যাতে তোমার কাছে যায়, সে ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার স্বভাব জানই ত। যারা আপনার লোক তারা যে আমাকে ঠিক জানতে পারে, অথচ, পরে আমার কিছুই না জানে এই যে আমার স্বাভাবিক ব্যাধি—এর অনুরোধেই তোমাকে যমুনা পাঠানো এবং এর জন্যই তোমার কাছে 'চরিত্রহীন' পাঠালাম। আশা করি এত দিনে পেয়েছ। কি জানি আমার মনে একটা ভয় হয়েছে এই বইটা ভাল লাগবার সাহস তোমার নাই। Intellectually এ একেবারে নির্দ্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়—কিন্তু 'রুচির' কথা তুল্‌লে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশী। অথচ, সব বুঝেও আমি এর এক ছত্রও বাদ দিই নি—দিবও না। যাক্ এ কথা। তোমাকে পড়তে দিয়েছি তোমার honest opinion দিয়ে ফিরিয়ে দেবে আশা করি—অনুরোধ করি। তোমরা reject কর—আমার এই (ঈশ্বরের কাছে) আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ, তোমাকে তাহলে আর false positionএ পড়তে হবে না। সহজেই বলতে পারবে—এ পছন্দ হয় নি। একবার মনে করেছিলাম, প্রমথ, তোমাদের কাগজের জন্য কিছু ছোট গল্প সাধ্যমত ভাল ক'রে লিখব—কেন না, তুমি এ কাগজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু, হঠাৎ সে আশাও ছাড়লাম। এর সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম (ফণীবাবুর—যমুনা সম্পাদকের) তা থেকেই সব বুঝবে—এবং হরিদাসবাবুর আপনার লোকে যখন এরি মধ্যে আমার নামে এত মিথ্যা আমারি বন্ধুদের কাছে বলেছে, তখন ভবিষ্যতে (যদি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি) আরো যে কত মিথ্যা কুৎসা রটবে তা ত তুমিই বুঝতে পাচ্ছ। আমার নিন্দায় আমার চেয়ে তুমি নিজে বেশী কষ্ট পাবে তা' আমি বেশ জানি, কিন্তু, পাছে হরিদাসের প্রতি স্নেহ তোমাকে আমার দিকে অন্ধ ক'রে ফেলে তাই এত কথা লিখলাম—না হ'লে শুধু ফণীর

চিঠিটা পাঠিয়েই তোমার সৎ বিবেচনার উপর বরাত দিয়েই চুপ ক'রে থাকতাম। যা' আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড় লোকের নির্লজ্জ খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে যদি তোমাদের সঙ্গে 'সাহিত্যিক' সম্বন্ধ রাখি? তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের influence ছোট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রচুর—কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয় এবং টাকার কাঙালও নয়। অন্ততঃ আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালবাসা ছাড়া আমাকে কিন্‌তে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, ত' তোমাদের পাড়াটি ত ছোট। কি দুঃখ হয় জান? হরিদাস বাবুর manager সু— তাকে আমিও চিনি—আমার সম্বন্ধে এত মিথ্যা রটাতে তার একটু সঙ্কোচ বোধও হ'ল না? তারা মনে করে আমি তাদেরি মত হীন, নীচ, ব্যবসাদার সাহিত্যসেবীর মুখ ভ্যাংচানি—না? প্রমথ, বেশী গর্ব্ব করা ভাল নয়, আমি কি তা' আমি জানি। আমি যে কোন কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি—এ যদি তোমার মিথ্যা কথা ব'লে মনে হয়, বেশী দিন নয়—একটা বৎসর দেখো—তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না। যাক এ সব আমাদের আপোষের কথা এ নিয়ে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—কিন্তু, যদি তোমার ওঁদের ওপর এতটুকুও influence থাকে, আর যদি আমি তোমার শত্রু না হই, ত' এ সব মিথ্যা যাতে আর না রটে তা' কোরো ভাই। আমি ঝুড়ি ঝুড়ি লিখ্‌তেও পারি নে—লিখ্‌লেও ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি নে। ফণী আমাকে কিছুতেই একটি কথাও মিথ্যা বলবে না এ আমি নিশ্চয় জানি। তাছাড়া, আমিও ঐ হতভাগা বা—কে জানি অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে শুনেছি। তাই এত দুঃখ হয়েছে, যে তোমাকেও এ সব রূঢ় কথা লিখতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

প্রমথ, আমি 'যমুনা'কে ভালবাসি সে কথা তোমার অগোচর নাই, তবুও পাছে তোমাকে অমর্য্যাদা করা হয়, এই ভয়েই তোমাকে 'চরিত্রহীন' পাঠিয়েছি। (তুমি ভাল-মন্দ কি বল, না-বল সেটাও

আর একটা কথা) যদি একেবারেই না পাঠাই, তোমাদের দলের লোকের মনে হ'তে পারে, আমি তোমাকে ঠিক অত বেশী ভালবাসি না। কিন্তু ভাল যে বাসি এইটা সপ্রমাণ করবার জন্যেই তোমাকে পাঠান। তুমি পড়বে এবং reject করবে। ক্ষতি নাই, তবু তোমার মান থাকবে এবং আমার ওপরে যে তোমার জোর আছে সেটাও জানা যাবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ফণী পালকে লিখে দেব। সে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসবে।

আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্ব্বটাই তোমাদের দলের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। টাকা সবাইকে কিনতে পারে না। একটু সৎ, একটু honest হওয়া চাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? এখনও কাগজের অনুষ্ঠান-পত্র বার হ'ল না, এর মধ্যেই এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা গ্লানি? তোমরা পরে যে কি করবে আমি তাই ভাবছি। সমাজ যাতে ভাল হয়, লোক যাতে সৎ শিক্ষা পায়, মাসিক কাগজের সে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অথচ, এমনি তোমাদের manager যে—তাঁর কথা আর বেশী তুলতেও রাগ হচ্ছে। টাকা খরচ ক'রে, মাইনে দিয়ে কি এই লোক রাখে? এই সব নমুনা যাতে বেশী প্রশ্রয় না পায়, হরিদাস বাবুকে আমার সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে বলবে। বলবে—আমার পেশা চাকরি—তাতে দু-মুটো খেতে পাই। আমি সন্ন্যাসী—আমার নামের ওপর টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশী লোভ নেই। তাছাড়া, আমি ত' হরিদাস বাবুর কোন অন্যায় করি নি, যে, তাঁর "ডান-হাত" আমার 'ডান-হাত'টা কাটবার চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর এমন নির্ব্বাসনে এত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতাম না।

যাই হোক—তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু বললে যা মানে হয় তাই। তার এক তিল কম নয়। যা উচিত তুমি করবে।

'পথনির্দ্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা? না পড়লেও ক্ষতি নেই—কিন্তু, কেমন লাগল—লিখো। শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভাল

লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত-গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)

আজ ক'দিন যেন একটু জ্বরোভাব টের পাচ্ছি। জ্বর না হ'লে বাঁচি। তোমার ছেলে কেমন আছে? আশীর্ব্বাদ করি যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রাণধন বাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ে—আমার কথাটা একটু মনে ক'রে দিয়ো। নিতান্ত যেন ভুলে না যান এইটি মাঝে মাঝে কোরো।—শরৎ

প্রমথ, আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে সু—র অত কথার মধ্যে হয়ত একটু সত্য নিহিত আছে। হয়ত ওঁরা (অর্থাৎ হরিদাস বাবু প্রভৃতি) বলিয়াছেন যে আমার একখানি বই দয়া করিয়া তাঁর কাগজে প্রকাশ করিয়া দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব। মস্ত ভুল প্রমথ। মস্ত ভুল!!

প্রমথ, সু—র সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা কোরো তার 'জা—'তে যদি দয়া ক'রে আমার কিছু ছাপায় ত' কিছু টাকাকড়িও না হয় তাকে দিতে পারি। D—swine! সে লোকটা না কি 'পুণ্যের জয়' না কি একটা লিখেছিল। পুণ্যাত্মা লোকের এই লেখাই ত চাই।

৭

3/5/13

প্রমথ, 'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না.। ইতিপূর্ব্বে দু-চার দিন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম—কিন্তু এই যে নিজের কায হয়ে গেছে বস্ চুপ ক'রে আছ। যা হোক্ ওটা পড়্লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার ভাল লেগে উঠ্ছে না—অন্ততঃ ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু, ভালই হোক আর মন্দই হোক অ্যানালিসিস্ ঠিক্ আছে, না? দার্শনিক গোছের।—নিরস? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্যে' না হয় 'যমুনা'য়, না হয়, 'ভারতী'তে বেরুতে পারবে, কিন্তু, তোমাদের এটা নূতন কাগজ—একটু 'পুণ্যের

জয়,' কিম্বা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরছে কিম্বা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকেও খুব তারিফ ক'রে বল্‌বে—হাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিন্দু ideal বজায় হচ্ছে। তা নইলে এ সব লেখা একে ত' শক্ত, তার পরে তেমন হিঁদু মাখামাখি নয়। রুচির দিক্ দিয়ে ত objection নিশ্চয়ই হবে টের পাচ্ছি। এ ব্যবসায় কোন্‌টা ভাল দাঁড়ায় সেইটা দেখা প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কিন্তু, তোমার স্বাধীন নিরপেক্ষ মতও চাই। আমি জানতে চাই আমার বন্ধু প্রমথনাথ কি বলেন। যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হ'লে যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে লিখো আমি চিঠি লিখে দিলে ফণী গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র কি এখনও বার হয় নি? বার হ'লে আমাকে যদি দয়া ক'রে একটা পাঠাও ত' বড় ভাল হয়। এবং যখন কাগজে বেরোবে তখন এক কপি পাঠিয়ে দিলে দেখ্‌তে পারব।

তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি না কি ভার নিয়েছ, তাই বলা, না হ'লে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী—তপ—জপ—কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখবে। ওটা বাজারে বড় নাম ক'রে দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় ক'রে ম'রে যাবে—(একটা বিষ খাওয়া চাই।) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক যায়গায় মিলে যাবে। এ হ'লে লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নূতন কাগজ বার করতে হ'লে এই সব নবেলের বড় আদর। আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখ্‌বে। আমি সেই মতই রচনা স্থরু ক'রে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক।—ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও

একটু আভাস দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখিবে। ভাল কথা—তোমাদের পরম বন্ধু সু—র সম্বাদ কি, কেমন আছেন তিনি? কি করলে? কি কি মন্ত্রণা তিনি আজ পর্য্যন্ত দিলেন শুনি? মন্ত্রণা যে মূল্যবান্ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।—

তোমার স্নেহের শরৎ

প্রমথ, তামাসা কর্‌লাম ব'লে রাগ কোরো না যেন! নিছক তামাসা কারু ওপরে কোন রকম reflection নয় তাহা নিশ্চয় জেনো। তোমাকে একটু তামাসা করলাম শুধু এই জন্যে যে, তুমি না দেখেই 'চরিত্রহীনে'র জন্য মহা হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম এটা 'চরিত্রহীন' ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল Ethics আর Psychology! ধর্ম নয়। যা হোক তুমি যে তোমার দলের মধ্যে আমার জন্যে অপ্রতিভ হবে সেইটাই আমার বড় দুঃখ। যে কেহ তোমাকে এ সম্বন্ধে বলবে তাকেই এই ব'লে জবাব দিয়ো শরৎ লিখতে যে জানে না তা নয়, তবে এটাতে তার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় চোখে পড়ছে না। আমি যে গল্প বানাতে পারি তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ, সম্প্রতিও বোধ হয় পেয়েছ। এই ব'লে জবাবদিহি কোরো। আমি ভবিষ্যতে তোমাদের যাতে ভাল লাগে এই রকম ক'রে একটা নভেল লিখে দেবো, কিছু মনে কোরো না। আর এক কথা—অনিলা দেবী আমার দিদি—আমি নয়। কি কোরে তুমি জানলে যে একই ব্যক্তি? কেন এ কথা দ্বিজুবাবুকে বললে? ভাল কর নি, আমি ত তোমাকে কোথাও বলি নি এঁরা এক ব্যক্তি? দু কান চার কান করতে করতে কথাটা (যাহা মিথ্যা) প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তা হ'লে ভারী লজ্জার বিষয় হবে। কেন না, অনেক তীব্র সমালোচনা দিদি করবেন বলেছেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কত স্থানে কত ভুল সেই সমালোচনা করবেন ব'লে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। বোধ করি বড় grand হবে! শুন্‌ছি ঠাকুরবাড়ীর প্রায় সবাই শুধু নামের জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। সম্প্রতি ঋতেন্দ্রবাবুর একটা

সমালোচনা। (ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' কাণকাটার ইতিহাস ব'লে যা লিখেছেন) সমস্ত ভুল সম্বাদ, এমন মাথা উঁচু ক'রে সবজান্তা গোছ হয়ে যে মানুষে লিখতে পারে, দিদি লিখেছেন, এটা তিনি আর কখন কোন ইংরাজি বাঙলা বইয়ে পড়েন নি। আমার বিশ্বাস তাঁর অধ্যয়নটা a little bit wide. এ অবস্থায় লোকে যদি মনে করে একজন সামান্য কেরাণী এবং গল্পলেখক এই সমস্ত গম্ভীর সমালোচনা করছেন সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ভাল হবে না। তা ছাড়া দিদিও দুঃখ করতে পারেন। কথাটা পার ত উল্টে নিয়ো।—শ

৮

[জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ?]

প্রমথনাথ! তোমার একসঙ্গে দুইখানি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যদিও ফণীর পত্র পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি তোমার বৃদ্ধ—মশায়কে লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। বুড়ো মানুষ শাপ শাপান্ত করিবে ভাল নয়। একটু বিনয় ক'রে বলিও যেন আর কিছু না মনে করেন। তিনি যখন কিছু সত্যই বলেন নাই তখন এ কথা এই পর্য্যন্ত। আমার তোমাদের Ev. Clubএ যে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলে দ্বিজু বাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া আসিতাম; এর বেশী আর কিছুই করিবার আমার বোধ করি ক্ষমতা থাকিত না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই হয় যে, 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথনির্দ্দেশ' ঢের ভাল। দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথাটাই final হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে। 'ভারতবর্ষ' যখন তোমার কাগজের মতই তখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য আমিই স্থির করব। এ বিষয়ে মনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কথা, আমার বড় সময় কম। রাত্রে লিখিতে পারি না, সকালে ঘণ্টা দুই, তা হয়ত তাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না। তোমাকে আমার একটা নিবেদন আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা

তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয় একটু সে দিকে নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে যে তোমার অসম্মান ক'রে কিম্বা তোমাকে উপেক্ষা ক'রে, তা সে ফণী কেন, কাহারো জন্যই সেটা আমি পারিব না। সেই জন্যই 'চরিত্রহীন' পাঠাই। যদিও এই পাঠানো লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে এবং হইবে তাহা জানিয়াও আমি পাঠাইয়াছি। যা হোক্ তোমাদের যখন ওটা পছন্দ হয় নাই তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হইয়াছে সেই মত 'যমুনাতে'ই ছাপা হইবে। তুমি বলিয়াছ একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে। তুমি যা লিখিয়াছ তাহা আমিও জানিতাম। আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ। এ একটা Scientific Psych : and Ethical Novel : আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই ? কাউন্ট টলষ্টয়ের 'রিসরেকশন পড়েছ' কি ? His Best Book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য। যা হোক, ওটা যখন হইল না তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নতন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে, আমারও আর অন্য উপায় নাই। আমি উলঙ্গ বলিয়া artকে ঘৃণা করতে পারিব না, তবে যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব। আমাকে Registry ক'রে পাঠিয়ে দিও, ফণীকে দিবার আবশ্যক নাই।

তোমাদের প্রথম সংখ্যার জন্য কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব। হাঁ, আর একটা কথা, এর পূর্ব্বে আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া সুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়ত আলাদা পথ দিয়া যাবার চেষ্টা করতাম। তা সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন too late. 'পাষাণ'টা কি ভাল মনে নেই। নিজের কাছেও নেই। তা ছাড়া ও ছেলেবেলার লেখা। না দেখে না সংশোধন ক'রে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। করলে হয়ত কাশীনাথের মত হয়ে দাঁড়াবে। আমার 'চন্দ্রনাথ' গল্পটা মনে আছে? সেটাকেও এখন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। সেটা যমুনায় বেরুচ্ছে। এটা শেষ হ'লে চরিত্রহীন বার করা হবে ব'লেই সকলে স্থির করেছেন। সমাজপতি মশাইকে দিবার কথা ছিল, এবং এ জন্য তিনি পত্রাদিও লিখেছিলেন কিন্তু ফণীর কাগজ যে আমার কাগজ।

তুমি ফণীর উপরে রাগ কোরো না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে তুমি আমি কি, এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোক মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি ক'রে জানবে? তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না প্রমথ! যদি কোনদিন এ বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কথা হয় বোলো, বাইরের লোককে কি জানাব, শরৎ আমার কি এবং আমি শরতের কি! বরং না জানাই ভাল। তুমি আমাকে যা যা লিখেছ একটু ভেবে চিন্তে পরে তার জবাব দেব। তুমিও একটু শীঘ্র জবাব দিয়ো। হরিদাস বাবুকে এবং প্রাণধন ভায়াকে আমার কথা একটু মনে ক'রে দিও।—শরৎ

৯

[ডাকমোহর ১২ মে ১৯১৩]

প্রমথনাথ, তোমার তৃতীয় পত্র পাইলাম। পূর্ব্ব পত্রের যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি তাহার কারণ আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল্য দিই। আমার যাহা বলিবার বলি, তাহার পরেও

যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছাই থাকে, যথাসাধ্য তোমার অভিরুচি পালন করিতে চেষ্টা করিব। লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া?) হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার 'পথনির্দ্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভাল লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটা painter যেমন colour blind থাকেন, তুমিও তাই। 'রামের সুমতি'তে আর্ট কম তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর এ প্রায় সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথনির্দ্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে। অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া 'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে—সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে। যাক্। 'চরিত্রহীন' ফিরিয়া (registry) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি Tolstoy'র "Resurrection" (the greatest book) পড়িয়ো। অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কে শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কায আছে। সে কাযটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে

হইবে। Austin, Mary Corelli প্রভৃতি এবং Sara Grend সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তা ছাড়া central figure করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে? অবশ্য বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি, কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ ক'রে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তুমি বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাই, কিন্তু এই এক 'চরিত্রহীন' অবলম্বন করিয়া 'যমুনা'র কিরূপ উন্নতি হইবে না-হইবে, দেখাও আবশ্যক। মনে করিও না, যাহা ছোট, তাহা কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোটও বড় হয়, বড়ও ছোট হয়। সেও যাক্। গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম। তোমাদের কাগজের জন্য কিরূপ গল্প খাটিবে—এটা বুঝিতে পারাই আমার পক্ষে শক্ত হইবে। এ যদি সন্দেশ তৈরি হইত, না হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছানা চিনির ভাগ বেশী কম করিয়া করিতাম—কিন্তু এ যে মনের 'সৃষ্টি'। সেই জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগজের জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিকই যদি তোমার কাযে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমার কায যে তোমাদের কাছে অকায বলিয়া ঠেকিবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, রাগ করিও না—তোমার view এত narrow হইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি। তুমি "নারীর মূল্যে"র সুখ্যাতি করিয়াছ—জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা (যমুনা) পড়িলে তুমি যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার "অর্থের মূল্য" লেখ। কি রকম লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, খুব ভাল। তবে বিদ্বানের সব দেশে পূজা হওয়া (বড়লোকের চেয়ে) উচিত নয়—কথাটা প্রমাণ করিবে কি করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পূজা ত সে পায় না কিন্তু পাওয়া উচিতও নয় সেইটাই প্রমাণ করা শক্ত হইবে বোধ হয়। তোমাদে কাগজের চারিদিকেই নাম হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন দুই এক মা

নমুনা দেখিয়া তবে গ্রাহক হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিব। সুতরাং প্রথম দু এক সংখ্যা যা-তা হইলে কখনই চলিবে না। কেন না দাম ঢের বেশী—ঠিক এই পরিমাণেই লোকে আশা করিবে। অন্ততঃ এই ত বর্ম্মার view. প্রথমেই যেন লোকে prejudiced না হইয়া যায়। আশা করি ফিরৎ ডাকে 'চরিত্রহীন' পাঠাইবে। তোমাকে পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছি—ওটা যমুনাতেই বাহির হইবে—অবশ্য কাগজ বড় করিয়া। অবশ্য ফলাফল তার কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার কথা। এত কুরুচিপূর্ণ তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। যা শক্ত জিনিস সেই ভার সইতে পারে। আর এক কথা। চোখের বালি তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই; পরে কি করিব কি জানি! তুমি আমার উপর রাগ করিয়ো না প্রমথ। তোমাকেও যদি মন খুলিয়া না বলিতে পারি, তা হইলে আর কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু আর সাহস নাই। 'বিধবা' ছাড়া গল্প জমে না এই যখন তোমাদের negative standard—তখন আমার আর কিছুমাত্র উপায় নাই। তোমাদিগকেও একটা সামান্য উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়ো, না হয় করিও না। তোমাদের পোষা লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্ দিয়া লেখাও, আর প্রতিপদে overseerএর মত 'level' দড়ি হাতে মাপ জোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে। এ কাগজ ultimately failure হবে। যারা সুলেখক, এবং যথার্থই যাহাদিগকে 'কবি' বলিয়া মনে কর, তাহাদের সমালোচনা কর, কিন্তু লেখাও প্রকাশ কর। লোককে ভাল মন্দ দুইই বলিবার সুযোগ দাও—গাল দাও কিন্তু প্রকাশ হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়ো না। পাদরিদের 'hymn' বা গির্জ্জার 'prayer' শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে ক'রে তোল সে টিকসই হবে কি? আমি অনেক কথা লিখলাম—কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে পাছে মনে কর

আমার এই লেখার মধ্যে একটু রাগ বা জ্বালা আছে। কিচ্ছুটি নেই। তুমি যে আমাকে সরলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। এতে আমি বুঝতে পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিত্র ন'ন তিনি কি বল্‌বেন। অবশ্য বইটাকে immoral বলায় একটু দুঃখিত যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু উপায় কি? ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। 'পথনির্দ্দেশ' গল্পটাই যখন 'immoral' ঠেকেছে (কারণ লিখেছ,—"এটা ঠাট্টা" কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা বোঝা ভার) তখন 'চরিত্রহীন' এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিয়ে immoral করা হয়েছে। এও যাক। তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক কে? কিন্তু জলধর সেন টেনের বিশুদাদা টাদা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও বড় কম বাঙ্গালী নেই এবং যারা আছে তারা একটু বেশ বোঝে সোঝেও কিন্তু ওসব আর কেউ পড়তে চায় না। এমন কিছু বার কর্‌বার চেষ্টা কর যা—উজ্জ্বল। পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না আশা করি তোমরা যা বার কর্‌বে আমরা তাতে সেইরূপ—আকৃষ্ট হয়েই থাক্‌ব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই থোড়—বড়ি—খাড়া আর খাড়া—বড়ি—থোড়ে আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকৃত। আসা মাত্র কাড়াকড়ি পড়ে যেত। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি successful হয়। কারণ তোমাদের resource বিস্তর—হাতে বিস্তর লোক আছে। এবং সবচেয়ে বেশী (টাকা) জিনিসটাও আছে। শুনেছি, তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা কর নি। যাই হোক তাতে কি কি ছিল একটু সংক্ষেপে যদি লিখে জানাতে পার হয় ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত। কি জানি এত বড় দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি, কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশী। আমি কি

এতই হীন? যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশী ক'রেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া একটা fictitious নামে, (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভাল মন্দ যাই হোক consequence আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এত দিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না। আমার ভালবাসা জানিয়ো মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো।—শরৎ

১০

[ডাকমোহর ২৪ মে ১৯১৩]

প্রমথ, দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazetteএ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে খুব কম জানিতাম তাহা নহে; অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না। সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না। কে যে কখন যাত্রা করেন তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী মাত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমাদের পাড়ার যে কিরূপ ক্ষতি হইল তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার ছেলে, বাড়ী, Evening Club প্রভৃতির আরো একটু বিস্তারিত সম্বাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম—এবার যখন পত্র লিখিবে একটু জানাইয়ো। তোমাদের ভারতবর্ষের সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত, এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব ইহা টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন? তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। Compilerও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরাণ ধরণের। তিনি খুব সম্ভব failure হইবেন। সাহিত্য পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক ন'ন এটা মনে রাখিয়ো। অবশ্য তোমরা কলিকাতায় থাক আমরা মফস্বলে থাকি এ সব মতামত আমরা দিতে পারি না দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধ করি তেমন

গ্রাহ্য হইবে না—যাই হোক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই জানাইলাম। শেষে আমার কথা। তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য তাহা নিশ্চয়ই করিতাম কিন্তু এখন তিনি আর নাই। তিনি সাহিত্যিক এবং বোদ্ধা ছিলেন, তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন—এবং না বুঝিলেও, তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না—অভিমানও হইত না, কিন্তু এখন যে-সে আমার দাম কষিবে, হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়—হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা 'file' কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর।—তুমি আমার কত বড় সুহৃৎ তাহা আমি জানি—সে কথাটা এক দিনের তরেও ভুলিব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু, এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। সুরু হইতেই তোমাকে বলিতেছি তোমাদের লেখকেরা সাগরতুল্য। যাঁহাদের রচনা এবার বাহির হইবে বলিয়া লিখিয়াছ, অনুরূপা, বিদ্যাবিনোদ, নগেনবাবু প্রভৃতি। তাঁহাদের লেখার কাছে আমার লেখা যে গোষ্পদের মত দেখাইবে! আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই—এর বেশী আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা চরিত্রহীন সম্বন্ধে। আমার সুরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাস বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন ওটা এতই immoral যে কোন কাগজেই বাহির হইতে পারে না বোধ হয় তাই হইবে—কারণ তোমরা আমার শত্রু নয়, যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে—আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত argument ফণীকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস আমি এমন কিছু লিখিতেই পারি না যাহা immoral.

সেই জন্য বাধ্য হইয়া তোমার অনুরোধ ভাই রক্ষা করিতে বোধ হয় পারিলাম না। কারণ advertise করা হইয়াছে আর ফিরান যায় না। আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক, কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং immoral হোক, moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে করুক। তবে, একটা উপায় করিতে হইবে। 'রামের সুমতি'র মত সরল স্পষ্ট গল্প পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া চরিত্রহীনের effectটা mild করিয়া আনিতে হইবে। ফণী লিখিয়াছে লোকে আমার গল্প পড়িবার জন্য উতলা হইয়া আছে। যাক এ কথা। 'কাল' আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দু-ই করিবে সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল। যাক্। এই সময়টা যদি আমি কলিকাতায় থাকিতাম, তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য অনেক করিতে পারিতাম। কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটাই edit করিয়া দু এক মাস চালাইয়া দিতে পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে। তবে, যখন কলিকাতাতে নাই, এবং শীঘ্র থাকিব এ আশাও নাই—তখন এ সব কথার আলোচনায় লাভ নাই। এই দূর দেশে কম সময়ে আমি শুধু যমুনার জন্যই একটু আধটু লিখিতে পারি এর বেশী সময় এবং স্বাস্থ্য দু-ই নাই। তুমি আমার উপর যেন একটুও দুঃখ করিও না এই আমার মিনতি। দ্বিজুবাবু আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া। তা ছাড়া আমি একরকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব। এ জন্য আমার শিষ্যমণ্ডলীকেও অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এত শ্রদ্ধা করে, যে আমি অনুরোধ করিলে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবে

না—শুধু এই জন্যই এখনো তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। আশা আছে প্রমথ, এদের সাহায্য লইলে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইবে। শুনিতেছি এরি মধ্যে যমুনার বেশ আদর হইয়াছে। তাই প্রতি মাসে যদি এমনই আদর অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় হইবে আশা করা যায়। কাগজটা আগামী বৎসর হইতে ডবল সাইজে বাহির করিবার কথা আছে। তোমার কথা রাখিবার জন্য সমস্ত জানিয়াও এবার চরিত্রহীন পাঠাইয়াছিলাম আবার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার কথা রাখিবই। কিন্তু পরের জন্য আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। হরিদাস তোমার বন্ধু, আমি কি তার চেয়ে কম? তোমাকে যত লোক যত ভাল বাসিয়াছে, আমি কারুর চেয়ে কম বাসি নাই, সেই কথাটা যখন আমার উপর রাগ হইবে তখন স্মরণ করিয়ো। আর কি বলিব! আমি ওখানে লেখা দিয়া আর অপ্রতিভ হইতে ইচ্ছা করি না। ওখানে ঢের বড়লোক লেখেন, আমার জন্য এতটুকু এক তিলও ফাঁক পড়িবে না। ফণীও তোমার নাম করিয়াছে। বিস্তর সুখ্যাতি করিতেছিল।

তোমার নিজের সম্বাদ লিখিবে। আমার সম্বাদ একই রকম। কখন ভাল, কখন মন্দ। রেঙ্গুন আর সহ্য হইতেছে না প্রতি পদেই টের পাইতেছি কিন্তু অন্য কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। কি জানি এইখানের মাটিই কেনা আছে কি না!—তোমার স্নেহের শরৎ

১১

31. 5. 13
Rangoon.

প্রমথনাথ, আজ তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার পূর্ব্বেকার পত্র তোমার হাতে যায় নাই। যদি এত দিনে গিয়া থাকে নিশ্চয়ই সমস্ত বুঝিয়াছ। এই ত ভাব। তার পরে আমার যাবার কথা। আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব New-march. 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন "আমি মাধব চাটুয্যে নীলকরের গোমস্তা।" এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই।

Newmarchও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করতে ৩ দিন দেরী হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরাণ চিঠি বার হয় এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে, Deputy Acctt. General Chanter সাহেব, Dy. Acctt. General শ্রীনিবাস আইয়ার, Asst. Acctt. General সুন্দরাম, Asst. Acctt. General Mgset, ১ মাসের মধ্যে Medical certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে, আমাদের P. W. D. লোকেদের নিজের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10-30 to 6-30। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে reminder আসে—৬ মাসের জন্য ১০৲ হিসাবে (জরিমানা) reduction. এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সে দিন Local Govt.কে এই ব'লে move করেছেন যে আফিসের কেরাণী ঘুষ দিয়ে m. certificate দিয়ে পালায় তাতে আফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সেই জন্য আফিসের চিঠি না গেলে Civil Surgeon কাউকে যেন m/certificate না দেন। আমাদের এখন m. c. দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। M. c. দিলেও বলে ওর Service bookএ নোট ক'রে রাখ মিথ্যা m. c.। বর্ম্মা ব'লেই এত জুলুম চ'লে যাচ্ছে। দিন ৩।৪ পূর্ব্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটি আমার Sub Auditor ভৌমিক বাবু ও Peria Swamyর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। Explanation দিলাম আমারই oversight : ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০৲ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না এই জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি Newmarch দয়া ক'রে কোন কথাই বল্লেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না আমার আর resignation দেওয়া হ'ল না। কিন্তু শরীরও আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এত দিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দ্দশায় কখন পড়ি নি। সে দিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তির মশাইকেও চিঠি লিখি যে যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি resign দিয়ে চ'লে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায় শীঘ্র, যাবার বড় আশাও দেখি নে—তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য আফিসে application পর্য্যন্ত forward করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।

দেখি মিত্তির মশাই কি লেখেন।

আমার 'ভারতবর্ষে' লেখার অনেক গোলমাল। সারদা বাবুকে জানি না—তিনি যে কি করবেন তিনিই জানেন। দ্বিজুবাবুই এ কায পারতেন—এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে। ওর চেয়ে তোমার যোগ্যতা এতে বেশী। বিদ্যাপতি edit করা আর ভারতবর্ষ edit করা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া তাঁর অনেক কায। এ selection একেবারেই ভাল হয় নি। সারদাবাবু সত্যরঞ্জন রায়ের 'অবগুণ্ঠিতা'র যে প্রশংসা করেছিলেন, তাইতেই বোঝা গেছে উনি কি রসগ্রাহী!! সত্যরঞ্জন এখানে ছিল, তার অনেক লেখাই পড়েছি। অবগুণ্ঠিতার চেয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'অধঃপতন' ভাল।

Very bad selection—ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যে 'Failure' হবে !!!

এ যদি না হয়, মিথ্যাই এত দিন সাহিত্য সেবা করলাম।

দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়াই উচিত। এ কাগজ successful হবার হ'লে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে superstitionই বল আর যাই বল।

দ্বিজুবাবু আবশ্যক হ'লে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার মত সমালোচনায় যেমন ক'রে হোক আবশ্যক হ'লে চালিয়ে দিতে

পারতেনই—এ কি আর কারো কাজ। তা ছাড়া কাগজ যে ছোট নয়—৬৲ টাকা চাঁদা—সেটাও বড় কম ভাবনার বস্তু নয়। প্রবাসী এত দিনের কাগজ—একটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে ভরাতে হয়। ওর অর্দ্ধেকের উপর ত অপাঠ্য। তবু ওর চাঁদা কম। তোমাদের সে excuseও নাই। তা ছাড়া, ভাই, অনেকেই বলে লিখবে, কিন্তু শেষকালে যারা নিতান্ত তোমার আমার মত লেখক তারাই লেখে। তা ছাড়া ভাল লেখক প্রায়ই লেখে না। দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ influence পর্য্যন্ত গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর appreciationএর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভাল মন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?—শরৎ

১২

14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon.
[ডাকমোহর ৮ এপ্রিল ১৯১৩]

প্রমথনাথ, আজ তোমার পত্র পাইলাম। আজই একটা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম আমার পূর্ব্বপত্র রদ করিয়া, বোধ হয় পাইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়াছ। তোমার কথাই সত্য। ঠিকানা ছিল S. Chatterjee, Asst. Actt. General's Post office. আমার বুদ্ধিমান asst. নগেন ভৌমিক আমার অবর্ত্তমানে V. P. P. গ্রহণ করিয়াছিল, আমি উপস্থিত থাকিলেও হয়ত লইতাম। সেই জন্য দোষ আমার—তোমাদের নয়। তোমাদের দোষ নাই বলিয়াই টিকিটগুলো লইতে পারিলাম না—না হইলে তোমার মান রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতাম। Book Post পাই নাই এবং ভবিষ্যতে দিলেও পাইব না। ওসব আমার বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই পাই, অন্যথা পাই না।

S. Chatterjee, 14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon. এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার পত্রের একটা একটা করিয়া জবাব দিই। দুটি একটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই। তাম্রশাসন, আমার মত বেরসিক লোকেই পড়ে। সার অসার কি আছে না আছে আমাদের জানা উচিত। "কৌতূহল" ভাল।

৪। Variety হিসাবে তোমার কথা হয়ত সত্য; কিন্তু variety মানে যদি ৩২॥০ ভাজা হয়, ত খেতে মন্দ লাগে না। তাতে বড়-লোকের পেট ভরে, গরীবের ভরে না। Substantial জিনিস দুটোও ভাল, কিন্তু ৩২॥০ ভাজা ভাল নয়—আমি ওর পক্ষপাতী নই।

৫। ছবির সম্বন্ধে—noted.

৭। নির্ভীক মতামত—ঠিক কথা। যত দিন ঐ রকমের দ্বিজু বাবুর কাছাকাছি—ভাল মানুষ, সরল, অথচ গোঁয়ার-গোছের লোক না পাও, তত দিন সমালোচনা বাহির না করাই বুদ্ধির কায। তবে, সাহিত্যের সমালোচনার মত সমালোচনা ভদ্রলোকের বাহির করা উচিত নয়। কেবল তীব্র ভাষা অথচ কেন তীব্র ভাষা তার কারণ দেখানো নাই। "তোমারটা ভাল নয়" "ওতে অনেক কথা বলবার আছে" "এরকম সবাই জানে" "এ রকম না লেখাই উচিত" এ সব সমালোচনা নয়। সমালোচনায় যেন তাহার চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয় শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব এ মৎলব ভাল নয়। হাঁ কানকাটার সমালোচনার মত সমালোচনাই যথার্থ সমালোচনা। সবাই লিখ্‌তে পারে না তাও হয়ত সত্য। কিন্তু আমারও বড় অসংযত ভাষা হয়ে গেছে। ঐ যে তুমি লিখেছিলে সবাই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের লেখক—তাতেই আমার রাগ এবং একটু দ্বেষ হয়েছিল। সবাই যদি এত সহজে লিখ্‌তে পারে, তবে, কেন মিছে আমরা এত খেটে মরেছি? এই একটু রাগ—তাইতেই কিছু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে। তবে, তাঁরও জ্ঞান হবে যদি দয়া ক'রে প'ড়ে দেখেন—ভবিষ্যতে আর অমন ওপর-চালাকি করতে ব্যস্ত হবেন না। সত্যিই এতে একটু solid পরিশ্রমের দরকার হয়।

৮। না, যমুনাতে একসঙ্গে অত বার হবে না। চন্দ্রনাথ এখনো

শেষ হয় নি। নারীর মূল্য এবারে অসুস্থতার জন্য শেষ করতে পারি নি। আলো-ছায়া কি আমার লেখা? তাইতেই মনে হয়েছিল বটে, কোন অপরিণত কাঁচা লেখক আমার লেখার style অনুকরণ করেছে। আমি গত পত্রে ঠিক এই কথা ফণীকে লিখেছি। বড় অন্যায়! বড় অন্যায়!! বিন্দুর ছেলে প'ড়ে দেখো। শুনলাম যমুনার ৩২ পাতা হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল তোমাদের ভারতবর্ষে ওটা অশোভন হবে এবং ভালও হয় নি। তোমার ভাল লাগবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটুও প্রেমের কথা নেই নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা! অনেকটা মেয়েদের জন্য—তারা যেন একটু শিক্ষা লাভ করে—এই ইচ্ছায় লেখা। ঐ রামের সুমতির ধরণের তবে বেশী character আছে—এবং তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে। যাক্।

দেবদাস ভাল নয় প্রমথ ভাল নয়। সুরেনরা আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।

সত্যিই আজকাল কি গল্পই বার হয়! কেবল লোকের চেষ্টা কি ক'রে পাঠকের মনে কষ্ট দেয়! হয়, অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, না হয় খুনজখম করে—আরে বাবু রাস্তায় কুকুর ঠেঙ্গান দেখলেও ত কান্না পায়—সেইটাই কি তবে দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?

গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। কুৎসিৎ ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে। দীনেন্দ্র বাবুর সাহিত্যে 'দাদা' পড়েছ? প'ড়ে বাস্তবিক অভক্তি হয়ে গেল! গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ!" তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চল্‌ছি। রামের সুমতি, পথনির্দ্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ ক'রে একটা আনন্দ হয়—শেষ ক'রে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাস বাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে" এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ভাল কথা—"ক্ষুদ্রের গৌরব" "ছায়া" "বিচার" ওসব কি? আমার ত একটুও মনে নেই।

তোমাদের সমাজপতির সম্বন্ধে ওসব কেচ্ছার ব্যাপারটা কি? তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য আমি অভাজন কি করতে পারি ভাই? অত বড় বড় কৃতবিদ্য লোক রয়েছেন তার ওপরে আমি কি করব? তবে এক আধটা প্রবন্ধ বা গল্প লিখে দিতে পারি; তাও সত্যি সত্যি ভয় হয় প্রমথ, হয়ত বা ফেরৎ আস্‌বে। ঐ লজ্জাতেই আমার যেন হাত পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে! আচ্ছা বিন্দুর ছেলে প'ড়ে যদি এমন সাহস তুমি দাও যে ওটা তোমাদের ভারতবর্ষে পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হোতো, তাহ'লে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। এই কথা দিলাম। তবে আমি ভাই অশ্রদ্ধা ক'রে, যা-তা লিখে দিতে পারব না। নিজের অন্ততঃ চলনসই মনে না হ'লে পাঠাই নে। তোমরা ফণীকে দেখতে গিয়েছিলে শুনে বড় সুখী হোলাম। এই ত বন্ধুর মত কায!

আমার কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে লিখেছি। তবে কি না জানো ভাই 'সাহিত্য' অবলম্বন করতে আমার ভারী লজ্জা করে। ওটা যেন উঞ্ছবৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও একটা ৪০।৫০৲ টাকার চাকরি যোগাড় ক'রে দিতে পার ত যাই। আমার Govt. service ব'লে একটুও মায়া নাই। এ শালার আফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম।

আমার ইচ্ছে করে চাকরি ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ক'রে সাহিত্য সেবা ক'রে যদি দু পয়সা পাই ত বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পরে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার বড় প্রবল।

আমার 'চরিত্রহীন' বোধ হয় modified হয়ে, আশ্বিন কার্ত্তিক থেকে বেরুবে। তত দিনে চন্দ্রনাথ শেষ হবে।

হাঁ ভাল কথা। আমি কলিকাতা এবং আরো দু-এক যায়গা থেকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মতামত পেয়েছি। সত্যিই কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। সকলেই লিখেছে—ওঁদের মধ্যে "পছন্দ" ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা নমুনা দেখে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা ত ভেতরের কথা জানেন না। দ্বিতীয় issue দেখে তাঁদের মত ফিরবে ব'লেই আশা করি। 'ভারতবর্ষ' প্রথমে বিপুল আয়োজন ক'রে, দ্বিজু বাবুর সম্পাদকতায়

বার হবে শুনে আমাকে অনেক সম্পাদকই লিখেছিলেন, যে "আমাদের সংহার করবার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে" তাদের শাপ সম্পাতেই দ্বিজু দাদা মারা গেলেন—অত দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সেই সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কি করবে কপাল! দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও ভারতবর্ষ অক্ষয় হয়ে যেত তা নিশ্চয়! এখন এর stability সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়। পাছে লোকে ক্রমশঃ মনে করতে থাকে not worthpaying Rs 6 এই ভয়।

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখ্‌ব ব'লে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই!) কোনো theatreএ প্লে করিয়ে দিতে পার? আজ এই পর্য্যন্ত।—তোমার শরৎ

সংবাদ-সাহিত্য

বর্তমানে হিন্দু বাঙালীর অতিশয় দৈন্যদশা। তাহার বাসভূমি সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে সংক্ষিপ্ততম আকার গ্রহণ করিয়াছে। আশ্রয়- বা অন্ন ভূমি পর্যাপ্ত তো নহেই, এক বেলা এক মুঠা আহার যোগাইতেও অক্ষম; মাটিকে লালন করিয়া জাতিকে পালন করিবার বংশানুক্রমিক দায়িত্ব যাহাদের, তাহারা ভগ্ন শীর্ণ রোগজীর্ণ ক্লান্ত, সর্বপ্রকারে লক্ষ্মী-ছাড়া। বাণিজ্যলক্ষ্মীর আক্রমণে কৃষিলক্ষ্মী পরাস্ত এবং বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঙালীর করায়ত্ত নহে। সেখানে উপরে মারোয়াড়ী গুজরাটী ভাটিয়া পাঞ্জাবী সিন্ধী এবং নীচে বিহারী ও ওড়িয়া। মাঝখানে যে তথাকথিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাব এবং নথিপত্র রক্ষা অর্থাৎ কেরানীর কাজ করিয়া পরিবার পোষণ করিত, সেখানেও মাদ্রাজী আসিয়া তাহাদিগকে হটাইতেছে।

যে কারণেই হউক, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বাঙালীর প্রভূত প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। এখন বিস্তার রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পুরাতনের জের টানিয়া আজিও বাঙালী গৌরব বোধ করিয়া থাকে। সংস্কৃতিমূলক পুরাতন সমৃদ্ধি ও প্রাধান্যের মূলে ছিল প্রতিভাবান বাঙালী সাধকদের একনিষ্ঠ সাধনা এবং বনেদী ঘরের

বাঙালী ধনীদের অপার বদান্যতা। শোভাবাজারের রাজবাড়ি, পাইকপাড়ার তথা বেলগাছিয়া ভিলার সিংহভ্রাতৃদ্বয়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, জোড়াসাঁকোর দেওয়ান-বাড়ি বা সিংহবাড়ি (কালীপ্রসন্ন সিংহ) প্রভৃতি কলিকাতায় এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, কাশিমবাজার, নাটোর, নাড়াজোল, আন্দুল, লালগোলা প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবর্গ কি ভাবে অকুণ্ঠ সাহায্যদানে বাংলার শিক্ষা সাহিত্য সঙ্গীত অভিনয় শিল্পকলা এক কথায় সংস্কৃতির ক্রমোন্নতিসাধন করিয়াছেন, সে ইতিহাস আজও ভাল করিয়া লিখিত হয় নাই। যুগের পরিবর্তনে ইঁহাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দানের ক্ষমতাও প্রায় লোপ পাইয়াছে। এখনকার জনসাধারণ বা গণসাধারণ জাগ্রত ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া ঐতিহ্যের অভাবে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন; সুতরাং স্বভাবতই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। যাঁহারা বাঙালী-জাতির বর্তমান দৈন্য ঘুচাইয়া নবচেতনায় নূতনের পথে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিবেন, তাঁহারা বাঙালীর এই সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ইতিহাস নিশ্চয়ই অবগত হইবেন। এই ইতিহাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পণ্ডিতেরা পূর্বে করিয়াছেন এবং বর্তমানে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার বসু, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি করিতেছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা এত দিন পুস্তকাকারে দুর্লভ ছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা বাঙালীর রাজনৈতিক মতি পরিবর্তন লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারাও বাঙালীর চরিত্র ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক কাহিনী অবগত না হইলে যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না অর্থাৎ নেতৃত্বে অপারগ হইবেন। নেতারা আজকাল এই শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না বলিয়া বিফলকাম হইতেছেন।

আমাদের তরুণ বন্ধু শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ দীর্ঘকাল বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থা ধরিয়া গোড়ার কথা ও ভিতরের কথাগুলি চিন্তা করিতেছেন এবং সুখের বিষয় অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে তাঁহার প্রশ্ন ও ভাবনাগুলি সাধারণের গোচরে আনিতেছেন। সম্প্রতি তিনি

রোগশয্যায় বসিয়া বাঙালীর সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সরস চিন্তা করিয়াছেন, আমরা আমাদের পাঠকের নিকট তাহা উপস্থিত করিতেছি। বাংলা দেশে যাঁহারা চিন্তা করেন এবং লিখিতে পারেন, তাঁহারা এই বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিলে ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে আমরা অনেকটা সচেতন হইতে পারিব। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, স্বাধীনতাপর্বের প্রথম সাধারণ নির্বাচনও সম্মুখে; এই অবস্থায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা একটু আত্মচিন্তা করিলে অনেক বিভ্রান্তি হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব। বিমলচন্দ্রের গভীর প্রশ্ন দিয়াই আমরা এই একান্ত প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করিলাম :

বাঙালীর সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কথাটা খুব বেশি চলে ব'লেই বোধ হয় তার মানেটা সুস্পষ্ট নয়। বাঙালার সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি? জামা-কাপড়, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষা? এর কোন্‌টা সংস্কৃতি? এর উত্তরে বলতে হয়, যেমন মানুষের প্রাণ মাংসেই নেই রক্তেতে নেই, হৃৎপিণ্ডে নেই ফুসফুসে নেই, অথচ সব জায়গা পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে, সংস্কৃতিও তেমনই। কেবল ভাষাটাই সংস্কৃতি নয়, বেশভূষাও নয়, শিক্ষাদীক্ষাও নয়—অথচ সব মিলিয়েই সংস্কৃতি। যেমন প্রাণ না থাকলেও রক্ত-মাংসের জৈবিক সংগঠনে বাহ্যত কোনও তফাত চোখে পড়ে না—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তো পড়েই না, তেমনি যে জাতের সংস্কৃতিচ্যুতি ঘটেছে তার বাইরের বেশভূষা ভাষায় হয়তো কোনও তফাত কিছুদিন চোখে পড়বে না। কিন্তু আসলে সে মৃত। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন প্রাণের মধ্যেই ধৃত, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গও তেমনই সংস্কৃতির মধ্যে ধৃত,—সেইখানেই তার প্রাণশক্তি। সেই প্রাণশক্তি না থাকলে শুধু বাইরের চিহ্ন মিলিয়ে সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝা যায় না।

বাঙালীর সংস্কৃতি কি? বলা বাহুল্য, ফর্দ মিলিয়ে লক্ষণ বলতে পারব না। কড়ারকমের মানদণ্ডও ঠিক করতে পারব না, যার এক চুল এদিক ওদিক হ'লেই সংস্কৃতির বিচ্যুতি ঘটল ধ'রে নিতে হবে। অথচ সকলেই অনুভব করেছেন যে চালে-চলনে শিক্ষা-দীক্ষায় রাজনীতিতে ইতিহাসে ভুগোলে বাঙালীর একটা বিশিষ্টতা আছে, তাই

নিয়েই তার সংস্কৃতি। সে তো বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত। তবুও রাজপুতানার মরুভূমিতে মানুষের যে চালচলন গ'ড়ে উঠেছে নদীপ্লাবিত বাংলা দেশে সে সব চালচলন ঠিক গ'ড়ে ওঠে নি। অন্যত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে কট্টর রূপ দেখি এখানে তো তা নেই। কেউ কি কল্পনা করতে পারেন যে, মুসলমানের ভাজা খই কোনও কাশীর হিন্দু খাবে? অথচ বাংলা দেশে এর বহুলপ্রচলন আছে। মুসলমান মাঝির নৌকোতে ব'সে কি কোনও মথুরার চৌবে খাবেন? অথচ বাংলা দেশে এসব কথা মনে ওঠেই না। বাংলা দেশের চাষী কি কোনকালে পায়জামা পরেছে বা পরবে? এখানকার লোকে তো মিতাক্ষরা ছেড়ে দায়ভাগ সৃষ্টি করেছিল, নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি সৃষ্টি করেছিল নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে।

সে হিসেবে বাঙালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা সহজেই ধরা পড়ে। যুগে যুগে অবশ্য সংস্কৃতির রূপান্তর ঘ'টে এসেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর কবি ভারতচন্দ্রের আমলের বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রথম যুগের বাঙালীর মিল নেই। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী সমাজে বাবু ব'লে যে একটি বিশিষ্ট জীব ছিল, তারাই বা আজ কোথায়? এই সব বাবুদের বর্ণনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান॥ অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অপূর্ব বাবু-চরিত্রচিত্রণে সেকেলে বাবুদের পরিচয় দিয়েছেন। এই সব বাবুদের সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। তার বদলে অন্য চেহারার ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছে। একালের এক শ্রেণীর মেয়েদের চেহারা রবীন্দ্রনাথ এঁকে গিয়েছেন 'শেষের কবিতা'য় সিসি-লিসি-কেটি-বিসির মধ্যে। এখনও তাঁরা যে আমাদের সমাজ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন তা নয়, কিন্তু এরই মধ্যে আমরা আবার নতুন চেহারার বাঙালী দেখতে শুরু করেছি। বোতাম-খোলা শার্টের উপর জওহরকোট ঝোলানো, পরনে ঢিলে পায়জামা, পায়ে চটি, মাথায় তেল নেই, কোটরগত চোখে বড় বড় চশমা—এ চেহারার সঙ্গে মিহি গরদের জামা-পরা, কালো ফিতে ঝোলানো সোনালি প্যাঁশনে চশমার ঝলক

তোলানো ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা চেহারার তরুণদের কোন মিল নেই। আজকাল যে সব শুকনো-চুল, গাছকোমর-ক'রে-কাপড়-পরা, অলঙ্কার-বর্জিত ব্যস্ত-সমস্ত মেয়েদের রাজনৈতিক শোভাযাত্রার সামনে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের সঙ্গে ড্রয়িং-রুম-বিহারিণী হাই-হিল-ওয়ালা সিসি-লিসিদের কোনও মিল নেই। সেকালের কলকাতার সঙ্গে একালের কলকাতার তফাত কত বেশি! ঘরে ঘরে রাত্রে নারকেল-তেলের শেজ জ্বলত, রূপো-বাঁধানো মকরমুখ হাতলওয়ালা পালকির উপর ঘেরাটোপ চ'ড়িয়ে গৃহিণীরা গঙ্গাস্নানে যেতেন, সারা বছরের পানীয় জল মাঘ মাসে গঙ্গা থেকে তুলে জলভারীরা একটা অন্ধকার ঘরে বড় বড় জালায় জমিয়ে রাখত—সে সব দিন কবে চ'লে গিয়েছে। সেকালের পালকিবিহারিণী গৃহিণীদের দেখলে আজকালকার ট্রাম-বাসগামিনীরা যেমন মূর্ছা যাবেন, একালিনীদের দেখে সেকালিনীরাও নিশ্চয় সেই রকমই মূর্ছা যেতেন। জুড়ী গাড়ি তো দূরের কথা, কলকাতা থেকে ছ্যাক্‌রা গাড়িও উঠে যাচ্ছে, তার বদলে মানুষ বইছে রিকশওয়ালা, মাল বইছে মানুষে-ঠেলা ঠেলা-গাড়ি। সকালে সময়ে সময়ে বড় বড় বাড়িতে গানবাজনার আসর বসত, এখন পথে-ঘাটে রেডিওর গান।

এই সব তো সংস্কৃতির রূপান্তর নিশ্চয়ই, সমাজের চেহারা ক্রমশ এসবের মধ্য দিয়ে বদলাচ্ছে। কিন্তু এসবের মধ্যেও আর একটা গভীরতর জিনিস আছে, যা হ'ল সংস্কৃতির প্রাণ। সংস্কৃতির আসল পরীক্ষাই হ'ল মানুষের মনে। যে মন যতখানি আত্মস্থ, নানা রকম ঢেউয়ের দোলায় সব সময়েই এদিক ওদিক টলে না, সেই মন হ'ল ততখানি সংস্কৃতির আধার। এই রকম মন থাকলেই মানুষের সহজ গুণগুলি ফুটে উঠবার সহায়তা হয়। বাস্তবিক পক্ষে যে জাতের সংস্কৃতি খুব গভীর নয়, সে জাত খুব চট ক'রে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, আজকের এ ফ্যাশান ছেড়ে কালকে আর এক ফ্যাশানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরশু আর একটা। মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর ভাববন্ধন, মনের সঙ্গে মনের আত্মীয়তা, অপরের কথাটা বুঝবার চেষ্টা, বাইরের আঘাতে সহজে বিচলিত না হওয়া—এসব জিনিস কিছুতেই

সম্ভব হয় না, যদি না জাতের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সংস্কৃতি থাকে।

লেখাপড়া-জানা বাঙালী সমাজের কথা বলছি না। কিন্তু যে নিরক্ষর চাষা কোনকালেই লেখাপড়ার মুখ দেখে নি, তার মধ্যেও বহুকালকার অভ্যাসের ফলেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক সংস্কৃতি থাকতে পারে এ কথা বিচিত্র নয়। বাঙালীর মধ্যে এ জিনিস খুবই প্রচুর পরিমাণে ছিল। মানুষের প্রাণের উদ্বোধন, মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশ, এগুলি নিরক্ষর চাষীর মধ্যে অনেক সময় এতটা দেখা গিয়েছে য. হয়তো তথাকথিত লেখাপড়া-জানা লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। একজন বিখ্যাত বিপ্লবীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বিপ্লবের চেষ্টায় আপনাকে তো সারা ভারতবর্ষই লুকিয়ে চুরিয়ে ঘুরতে হয়েছে, বহু দেশের মানুষ চেনবার সুযোগও আপনি পেয়েছেন। কোন্ প্রদেশ আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, সব প্রদেশই ভাল, কিন্তু বাংলার সাধারণ অশিক্ষিত সমাজের তুলনা নেই। মা ব'লে ডেকে যে কোন বাড়িতে আশ্রয় চেয়েছি, কখনও বঞ্চিত হই নি। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখের অন্ন এই রকম অচেনা আশ্রয়প্রার্থীকে তখনই তুলে দেওয়া, এরও কোথায়ও ব্যতিক্রম হয় নি। এমন মধু-ঝরানো বুক-পোরানো স্নেহ আর কোথাও পাই নি। লাভ-ক্ষতির বিচার নেই, বিপদের ভয় নেই, আশ্রয়হীনের প্রতি স্বতঃ-উদ্বেলিত প্রীতি ও করুণা ঝ'রে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষা তর্কবিতর্ক ক'রে সব সময় এ জিনিস হয় না। বহুদিন মনুষ্যত্বের সাধনা করলে এ জিনিসের ঐতিহ্য স্থাপিত হয়; যখন সে সাধনা বিলুপ্ত হয়ে যায় তখনও তার জলানি অনেক দিন থাকে—খানিকটা সামাজিক অনুশাসন, খানিকটা প্রচলিত রীতি হিসাবেও এ জিনিসের জের চলতে থাকে। এ জিনিসকে লেখাপড়ার ঔদ্ধত্যে আমরা হয়তো সেন্টিমেন্টাল রাবিশ ব'লে উপহাস করতে পারি, কিন্তু সত্যকার লেখাপড়ায় যখন মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হয়, তার মনে মনুষ্যত্বের আশ্চর্য উদ্বোধন আসে, বৃহত্তর মানবিকতার ক্ষেত্রে যখন তার মৈত্রীকরুণার বান ডাকে, তখন সে বোঝে যে আমাদের দেশের নিরক্ষর চাষী যা করছে তা সে অজ্ঞানে

করছে বটে, কিন্তু তবুও তা বৃহত্তর মানবিকতার স্তের মাত্র। গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, মৃত্যুবিচ্ছেদকে লোকে কত সময় কত প্রশান্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছে, যা অনেক সময় সাংখ্যবেদান্তের পণ্ডিতদেরও সম্ভব হয় না। এই জন্য উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলতেন, বাংলার মাটি হ'ল বাংলার মা-টি। এর মাধুর্য, এর রসধারা, এর স্নেহকোমল ছায়া তাদের বোঝা সম্ভব নয় যারা কেবল মাটিকে মাটিই দেখে, মায়ের সন্ধান পায় না। "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান"—এ কথা গভীরতম অনুভূতির কথা।

বাঙালী সমাজের উপরটা বদলাচ্ছে তাতে কোনও দুঃখ নেই। সে তো বদলাবেই। না বদলালে বুঝতে হবে, সমাজ মৃত। এই যুগেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের সমাজ চলবে—এ আশা করাই অন্যায়। কিন্তু তা ব'লে সমাজ অস্থির হবে কেন? সব সময়ে ছটফট করবে কেন? মানুষের মৌলিক অনুভব, স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, জীবনের প্রসন্ন প্রশান্তি—এসব থাকবে না কেন? দুঃখদুর্দশা আমাদের প্রচুর, সেগুলো মেনে নিয়ে নির্বিচারে মার খাওয়াটা মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। সেখানে আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে, আন্দোলন করতেই হবে। কিন্তু সে আন্দোলনেও আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ থাকব না কেন, নিজেকে হারিয়ে ফেলব কেন, ক্রোধে এমন অধীর হব কেন, যাতে মনুষ্যত্বের গোড়ার কথাও উড়ে যায়? কেনই বা আমরা পাগলের মত আজ এটা কাল ওটা ধ'রে বেড়াব, আজ একটা ভেঙে আর একটা গড়বার চেষ্টা করলাম, কাল আবার সেটা ভেঙে আর একটা গড়বার চেষ্টা করলাম? এসব জিনিস আমাদের মানসিক অস্থিরতার প্রমাণ।

এ কথা বহুদিন আগে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন। তাঁর এক প্রবন্ধে (The Brain of India) তিনি বলেছিলেন যে, বাঙালীর বহু গুণ আছে। তার আবেগ আছে, কল্পনা আছে, সেই জন্য তারা বড় আইডিয়ার জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে। এসব নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও তার একটি দোষ আছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সেটি হ'ল এই :—

The Bengali is inferior to other Indian races...in the capacity of calm, measured and comprehensive deliberation....By itself the logical or reasoning intellect creates the accurate and careful scholar,

the sober critic, the rationalist and cautious politician, the conservative scientist, that great mass of human intelligence which makes for slow and careful progress. It does not create the hero and the originator, the inspired prophet, the mighty builder, the maker of nations...The rest of India is largely dominated by this faculty and limited by it, therefore it lags behind while Bengal rushes forward. ...On his side the Bengali, while in no way limiting the divine inrush or shortening the Titan stride, must learn to see the way he is going while he treads it. For want of a trained thought-power, he follows indeed the ideas that sieze him, but he does not make them thoroughly his own. He thinks them out, if at all, rapidly but not comprehensively, and, in consequence, though he has applied them with great energy to the circumstances immediately around him.

এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, এইখানেই আসল সংস্কৃতির সংকট। শ্রীঅরবিন্দ সে-যুগে যে জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন এ-যুগে সামাজিক সংকট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বেড়েছে। বাঙালী-চিত্ত আরও অস্থির হয়েছে, নানা রকম ঢেউয়ের দোলায় সে অনবরত এদিক ওদিক দুলছে। তাই তো তার মৌলিক প্রশান্তি নেই। যেমন দুর্গাপূজার সময় তার আর পূজার দিকে লক্ষ্য নেই। পূজাটাকে উপলক্ষ্য ক'রে সে হৈ-হৈ করতে চায় মাত্র। পূজো অবশ্য উৎসবেরও উপলক্ষ্য, কিন্তু তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। পূজোয় কাঁসর-ঘণ্টা না বাজালেও হয়তো চলে—কিন্তু সেখানে লাউডস্পীকার বসিয়ে তরল প্রেমের গান কিংবা অকথ্য ব্যঙ্গের রেকর্ড বাজানো বাঙালী-চিত্ত যে কি ক'রে বরদাস্ত করে বুঝি না। বিয়ে-বাড়িতে আগে সানাই বাজত, পাড়ার লোকেরও শুনে ভাল লাগত। এখন বাড়িতে বিয়ে হ'লেই সদর-দরজায় দিনরাত লাউডস্পীকারে রেকর্ড বাজানো হয়, অথচ সে রেকর্ড বাড়ির লোকে তো শোনেই না, পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা হয়, কাছাকাছি কোনও রোগী বা পরীক্ষার্থী ছাত্র থাকলে তাদের তো প্রাণান্ত। তার উপর যে সব রেকর্ড বাজানো হয়, রুচির মানদণ্ডে সেগুলির অধিকাংশই ওতরায় না। দেড়শো বছর আগেও বাঙালী-সমাজের বিয়েতে দানসামগ্রীর একটা বাঁধা ফর্দ ছিল। যতই বড়লোক হোন না কেন, তাঁরা পরে মেয়ে-জামাইকে প্রচুর

দিতেন, কিন্তু বিয়ের সভায় সে ফর্দকে অতিক্রম ক'রে যেতেন না। কুলীনদের নাকি পণ বাঁধা ছিল একশো এক টাকা। তার বেশি কেউ দিতেন না। বাংলার কোনও সমাজের কথা আমি জানি, যেখানে বিয়ের লৌকিকতা নেহাত একেবারে রক্তসম্বন্ধ না থাকলে, চার টাকা এবং দু টাকায় সীমাবদ্ধ, এই কড়া নিয়ম কেউই অতিক্রম ক'রে যেতে পারবেন না। গল্প আছে, অনেক দিন পূর্বে কোন ধনী তাঁর মেয়ের বিয়েতে সোনার দানসামগ্রী দিয়েছিলেন। সার্ রাসবিহারী ঘোষ নিমন্ত্রিত হয়ে সেই বিয়েতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সোনার থালা দেখেই নাকি তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আসেন। আসল কথাটা হ'ল, বিয়েটা একটা সামাজিক ব্যাপার। আমাদের বিয়ে তো রেজিস্ট্রি ক'রে হয় না, সমস্ত সমাজের সামনে, উপস্থিত সভার অনুমতি নিয়ে এবং তাঁদেরই সাক্ষী রেখে, বরকন্যা পরস্পরকে গ্রহণ করে। এর মধ্যে সমাজের সামগ্রিক সভার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ বিনয় আছে, তার বৃহত্তর অধিকারে নম্র স্বীকৃতি আছে, সকলের সম্মিলিত কল্যাণকামনার জন্য প্রার্থনা আছে। এই জন্য অর্থের অহংকার বা ব্যবহারের ঔদ্ধত্য সেখানে শোভা পায় না। অথচ আজকাল এই প্রকৃত বিনয়, যা সংস্কৃতিরই অবদান, তা সমাজ থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যে কোনও অর্থশালী লোকের বাড়িতে বিয়ে হ'লেই দেখতে পাওয়া যায়, বিবাহ-সভারই এক পাশে বাজার সাজানোর মত দানসামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রিত অভ্যাগতকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাই দেখানো হচ্ছে। কোনও বিবাহ-সভায় দানসামগ্রী দেখতে যাবার অনুরোধ করলেই আমি সেইজন্য ব'লে থাকি, আপনাদের অর্থ আছে, আপনারা মেয়ে-জামাইকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু তা আর আমরা দেখব কি? আর জিনিসপত্রই বা কি দেখব, বুঝতেই পারছি আপনারা বাজারের সব কিছু সেরা জিনিস নিয়ে এসে এইখানেই বাজার বসিয়েছেন। কিন্তু বাজার দেখবার জন্য তো আমার আসা নয়, আমার আসা এই উৎসব উপলক্ষ্যে নবদম্পতির কল্যাণ হোক শুধু এই কথাটুকুর স্বীকৃতি হিসেবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতে দু চার জন লোক লজ্জিত হ'লেও বেশির ভাগ

লোকই চটেছেন। আর তাঁরা চটবামাত্র আমি ভেবেছি যে, আজ বাঙালীর সংস্কৃতির হ'ল কি! অর্থের অহঙ্কারের এই প্রচ্ছন্ন প্রদর্শনী লোকে মেনে নেবে? শুধু মেনেই নেবে না, বরং তার বাহবা দেবে, তার অনুকরণ করবে? কেন সেই সুরুচি সুনম্র শ্রদ্ধাশীল মাধুর্যমণ্ডিত বিবাহ-সভাকে আমরা বিনষ্ট হতে দেব? এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি। পূর্বে ডাকের নিমন্ত্রণপত্র গ্রাহ্য হ'ত না, সমাজের প্রত্যেকের কাছে সশরীরে উপস্থিত হতে হ'ত। এরই নাম দ্বারস্থ হওয়া। আজকাল অবশ্য এ ব্যবস্থা পুরোপুরি চলতে পারে না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কত দূর দূরান্তরে বাস করে, আগেকার মত একটি গ্রামেই তো আর সবাই থাকে না। সেই জন্য প্রত্যেকের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন কি, কলকাতা শহরের মত বিরাট শহরেও কত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব থাকে, সকলের কাছে উপস্থিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। এসবই সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও কি সত্য নয় যে, এই "পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ"-এর অপব্যবহার আমরা করি না? আপিসের বড় সাহেবকে আমরা বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসি, তা তিনি যতই দূরে থাকুন না কেন, অথচ আমার নিকট-আত্মীয় যদি একটু গরিব হয় তা হ'লে আর তার বাড়ি না গিয়ে ডাকে চিঠি ছেড়ে দিই, যেন চিঠি পাওয়া মাত্র সে এসে একপাত খেয়ে যায়—এই ভাবটা। এ কি অবিনয়! সেকালের সমাজ একালে নিশ্চয়ই অচল, অবস্থা অনুসারে তার চেহারা বদল ক'রে নিতেই হয়। কিন্তু যে সমাজকেই আমরা রচনা করি না, যদি তার সামগ্রিক সত্তাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে না শিখি, স্বল্প অহংকারে উন্মত্ত হয়ে অবিনয় আর ঔদ্ধত্য নিরঙ্কুশভাবে চালিয়ে যেতে বাধা না হয়, তা হ'লে সংস্কৃতির পরিচয় তো পাওয়া যায়ই না, সমাজও টেকে না, পরস্পরের ধৃতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ বাঙালী আজ অহরহ এই কাজই করছে। যে সমাজে বাপের সামনে ছেলের ধূমপানটা অন্য কিছু খাওয়ার থেকে তফাত নয়— যেখানে এর স্বাভাবিকতা স্বীকৃত, সেখানে সমস্ত পরিবার একত্র ধূমপান স্বচ্ছন্দেই করতে পারে। বাঙালী সমাজে এ রকম পরিবার থাকলে সেখানে এ রকম ধূমপান দোষাবহ নয়। কিন্তু যেখানে এ রকম রীতি

নয়, সেখানে যদি ছেলে তার বাবাকে প্রাচীন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার অজুহাত দেখিয়ে তাঁর সামনেই ধূমপান শুরু করে তা হ'লে বুঝতে হবে সমাজসংস্কারটা অজুহাত মাত্র, আসলে তারই আড়াল দিয়ে ঔদ্ধত্য আর অবিনয় প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ এ সব জিনিস তো হামেশাই ঘটছে। কিন্তু এগুলি কি সংস্কৃতির পরিচয়, না, সংস্কৃতির ভাঙনের চিহ্ন, সংস্কৃতির সংকটের লক্ষণ?

বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাক, সে নতুন ঐতিহ্য রচনা করুক। কিন্তু সে যেন আসল জিনিস না হারায়। মনুষ্যত্বের মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হ'লে তার শিক্ষাদীক্ষা বৈদগ্ধ্য চাতুর্য কি কাজ দেবে? সবই যে ফাঁকি হয়ে যাবে। বাঙালী কি সেই দিকেই যাবে?

—

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে প্রথম দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' সর্বাগ্রে স্মরণীয়, ইহার প্রকাশ-তারিখ ১ আষাঢ় ১২৪৬ (১৪ জুন ১৮৩৯)—বাংলা প্রাত্যহিক পত্রের শুভারম্ভ দিবস। দৈনিক সংবাদ-পত্রের ভাষাকে সহজ সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার গৌরব দীর্ঘ ৬৫ বৎসর পরে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' অর্জন করিয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সাময়িকপত্রের ভাষা সহজীকরণের যে চেষ্টা সম্মিলিতভাবে মাসিক 'মাসিক পত্রিকা'য় ১ ভাদ্র ১২৬১ (১৬ই আগস্ট ১৮৫৪) আরম্ভ করিয়াছিলেন, আচার্য কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচারে' ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৫ নবেম্বর ১৮৭০) হইতে তাহারই বিকাশ এবং ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'য় তাহারই পূর্ণ পরিণতি। এই সকল মনীষীর সাধনার প্রত্যক্ষ ফল আজকাল আমরা ভোগ করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য 'সন্ধ্যা' যাহা করিয়াছিল, তাহা হিসাব হইতে বাদ দিলেও জনসাধারণের উপযোগী ভাষাসৃষ্টির জন্য 'সন্ধ্যা' চিরদিন আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করিবে। এই কারণে 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ-দিনটিও বাঙালী জাতির স্মরণীয় দিনরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঠিক তারিখটি আজও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ব্রহ্মবান্ধবের সমসাময়িক সহকর্মী অণিমানন্দ স্বামী ও স্বদেশীযুগের কর্মী বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের লিখিত সাক্ষ্যে প্রকাশকাল ১২০৪ বলিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। আলিপুর বোমার মামলায় সেশন্স জজ বীচক্রফট তাঁহার রায়ে এবং নর্টন সাহেব তাঁহার সওয়ালে 'সন্ধ্যা'র প্রকাশকাল ধরিয়াছিলেন ২০ নবেম্বর ১৯০৫। পুলিসের, বিশেষ করিয়া পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর সাক্ষ্য হইতে এই ভুল হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রও কোর্টের ডিক্লারেশন পত্র দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন, এই পত্রে তারিখ ২০।১১।১৯০৫। অর্থাৎ 'সন্ধ্যা' দীর্ঘকাল ডিক্লারেশন না লইয়াই বাহির হইয়াছিল। এই তারিখ ধরিয়া পরবর্তী কালে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভুল করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল এই তারিখটি ঠিক ধরিয়া বছরটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়া ১৯০৪ করিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিও স্বদেশীযুগের কাহিনী লিখিতে বসিয়া কেহ ১৯০৫, কেহ ১৯০৬ এবং কেহ বা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'সন্ধ্যা'র প্রকাশকাল টানিয়া আনিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, এক খণ্ড 'সন্ধ্যা' দেখিয়া কেহ এই দিনটি নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। পুলিসের অত্যাচারে ও ভয়ে 'সন্ধ্যা' প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, সরকারী দপ্তরখানায় অথবা পুলিসের গোপন সংগ্রহেও 'সন্ধ্যা' নাই বলিয়া শুনিয়াছি। একমাত্র বাংলা সরকারের অনুবাদ-বিভাগে মুদ্রিত বাৎসরিক বিবরণীতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তারিখ হইতে 'সন্ধ্যা'র বিভিন্ন প্রবন্ধ অংশত অনূদিত দেখিতেছি। অণিমানন্দের ব্রহ্মবান্ধব-জীবনী *The Blade* নামক পুস্তকে অনেকগুলি উদ্ধৃতি তারিখ-ওয়ারী দেওয়া আছে। অর্থাৎ 'সন্ধ্যা' যে ১৯০৫-এর ১২ জানুয়ারি তারিখে বর্তমান ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রাহার সংগ্রহে প্রথম বর্ষের ২৩৪শ সংখ্যা এবং পরবর্তী ৯ সংখ্যা 'সন্ধ্যা' প্রাপ্ত হইয়া তারিখ হিসাব করিয়া গত শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে (পৃ. ৩৭৮) দেখাইয়াছেন, " 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব যে ১৯০৫ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায়—এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।" আমরা এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে রক্ষিত আলিপুর বোমার মামলার কাগজপত্র হইতে নিম্নলিখিত নূতন সংবাদটি পাইয়াছি। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে 'সন্ধ্যা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'সন্ধ্যা'র ভূতপূর্ব

কার্যাধ্যক্ষ গিরিজাসুন্দর চক্রবর্তী (শ্যামাসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ১৯০৯ সনের ১২ মে তারিখে আলিপুরের সেশন্স জজ সি. পি. বীচক্রফটের নিকট সাক্ষ্যদানকালে বলেন :

I was manager of the *Sandhya* newspaper before I joined the *Bande Mataram*. Brahma Bandhab Upadhya was all in all on the *Sandhya*; we knew him to be proprietor. I was in the *Sandhya* nearly 2 years. The paper started at the beginning of Pous, I joined in Falgun.

ইহা ১৩১১ বঙ্গাব্দের কথা, পৌষের গোড়া হইলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ হয়। অবশ্য ইহাতেও মামলা নিষ্পত্তি হইল না। 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ-দিনটি সঠিক নির্ধারিত হইল না।

"শ্যামাঞ্জল" নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শোকার্তা শ্রীঅনুরূপা দেবী ('কথাসাহিত্য,' পৌষ ১৩৫৭) লিখিয়াছেন :

"তার সাহিত্যিক দানের মূল্য নিরূপণ এ যুগের যুগপতিরা, যাঁরা পরস্পরের অঙ্গাঘ্রাণ করেই সাহিত্যিকের গুরু কর্তব্য পালন করে থাকেন, তাঁদের কথা ধরি না, যেদিনে তাঁদের কারুর অস্তিত্বই বাংলা সাহিত্যের দরবারে এসে পৌঁছায় নি, অনেকে জন্মগ্রহণই করেন নি সেদিনের যাঁরা নিরপেক্ষ উচ্চাঙ্গের সমালোচক বর্তমান ছিলেন, তাঁদের সাহিত্যিক বিচারে নিরুপমা দেবীর সাহিত্যিক দানের মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। "অন্নপূর্ণার মন্দির" "দিদি" "শ্যামলী" একদিন বাংলা-সাহিত্যে বেশ বড় রকমেরই একটা আলোড়ন এনেছিল। তার মধ্যে স্তাবক দলের স্তুতি প্রচার-প্রচেষ্টায় রাতকে দিন করবার জন্তে প্রাণপণ প্রচেষ্টা নেই। ললিতকুমার, বিহারীলাল প্রভৃতি সত্যকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তখনকার বাংলা সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠা লেখিকাদের দানকে যাচাই করেছিলেন; মেয়েদের দানে বাংলা-সাহিত্য এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যে পুরুষ লেখকরা নাগাল পাচ্ছে না—অতএব একজন চ্যাম্পিয়ানকে খাড়া করে ওদের খাটো করা দরকার, এত বড় স্বার্থকলুষিত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি তাঁদের ছিল না। যে দেশে শীতলা মনসা ওলাবিবিরাও জগৎজননী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে একই উপচারে ও সমান নিষ্ঠায় বরঞ্চ ক্ষতিকারিণী শক্তি হিসাবে সমধিক ভয়ে ভক্তিতে পূজা প্রাপ্ত হন, সেখানে বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্তি, জগতের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ঔপন্যাসিককে সম-পর্য্যায়ে দাঁড় করাবার জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভক্তবৃন্দ ঢাক-ঢোল-দামামা পিটিয়ে অধিকার (অনধিকার বললেও অত্যুক্তি করা নিশ্চয়ই হয় না) স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে মন্ত্রের সাধনে শরীর পতন পণ করে। তা সাধনা করলে সিদ্ধি আসে বই কি।"

বান্ধবী বিয়োগে অনুরূপা দেবী শোকে দুঃখে ও রাগে এতখানি আত্মবিস্মৃত হইয়া না পড়িলে এক ঢিলে এতগুলা পাখি মারিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেন না। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিয়া তাঁহার জীবিতকালে অতিবড় ভক্তরাও মানিতেন না, কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টার আসনে বসিয়া তিনি যে সত্যদ্রষ্টার আসনও লাভ করিয়াছিলেন—এ কথা আজ তাঁহার অতিবড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মৌখিক গল্পচ্ছলে প্রায়-অপরিচিতা নারী নিরুপমাকে শরৎচন্দ্র অপমান করিয়া থাকিলেও লিখিত গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নারীজাতিকে তিনি অপরিসীম সম্মান দান করিয়াছেন, তাঁহাকে "যিনি এসব বাজে কথা রটনা করবার হীন কল্পনাবিলাস করে গেছেন তিনি যে কত অসত্যদ্রষ্টা তার প্রমাণ এইখানেই" বলিয়া উড়াইয়া দিতে ঋষি-ভূদেব-পৌত্রী অনুরূপা দেবীও পারিবেন না। আশু-মৃতার প্রতি দরদ দেখাইতে গিয়া বহুদিন-মৃত শরৎচন্দ্রকে ছোট করিবার চেষ্টা অশোভন হইয়াছে। ইহাতে পরলোকে নিরুপমা দেবীর আত্মাও সুখী হইবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের ধনী ও জমিদারকুলের সাহায্যে জনহিতকর বহু মহাগ্রন্থ বিনামূল্যে অথবা সুলভ মূল্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা রামায়ণ ও মহাভারতের মূল ও অনুবাদ, শোভাবাজারের রাধাকান্ত শব্দকল্পদ্রুম, জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ, পাণিহাটির প্রাণতোষ বিশ্বাস তন্ত্রসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। পরে কয়েকটি সংবাদপত্র কার্যালয় এই সুলভ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা দেশের জ্ঞান-বিস্তারে 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' 'বসুমতী' প্রভৃতির কীর্তি অবিস্মরণীয়। তাঁহারাই পুরাণ ও উপপুরাণগুলিকে সঞ্জীবিত রাখিতে পারিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের সাহিত্যকীর্তিও তাঁহারাই দরিদ্র জনসাধারণের গোচরে আনিয়া দিয়াছিলেন। পরে অনেক জন-

হিতকারী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। তন্মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখান-ওখান হইতে আংশিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিতান্ত ব্যক্তিগত সাধনায় জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলা দেশে যে কয়েকটি বড় কাজ সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের বাংলা ও হিন্দী 'বিশ্বকোষ' ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শব্দকোষ' প্রধান। অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনের সাধনা তাঁহার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত হইয়াছে—'মহাকোষ' স্বরবর্ণ ছাড়িয়া ব্যঞ্জনবর্ণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল মাত্র, শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'জীবনীকোষ' পৌরাণিক অংশ সমাপ্ত হইয়া ঐতিহাসিক কালের অর্ধেক পর্যন্ত আসিয়াই গ্রন্থকারের মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হইয়াছে: 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় সংস্করণও নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত বেদব্যাসের মহাভারতের মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইতে হইতে শান্তিপর্বের গোড়ায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম বৃদ্ধ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পুনরায় আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—শান্তিপর্বের সপ্তদশ খণ্ড পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আর তেরো খণ্ডে শান্তিপর্ব সমাপ্ত হইবে। তাহার পর যাহা বাকি থাকে, তাহাতেও প্রায় বাইশ খণ্ড লাগিবে। এখনও অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। যে কয়জন নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন তাঁহাদের সাহায্যেই পুস্তক-প্রকাশ সম্ভব ছিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার গ্রাহক আর নাই। এখন কোনও বদান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে এই মহৎ কার্য পণ্ডিত মহাশয় যে কি করিয়া সম্পন্ন করিবেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। বাংলা দেশ ধনীহীন হইয়াছে, তথাপি আশা করিতেছি, কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অথবা স্বাধীন বঙ্গ-সরকার এই বিরাট কার্য সম্পন্ন করিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে সাহায্য করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, নন্দকুমার স্থায়চুঞ্চু, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, রজনীকান্ত সেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—এই ষোলজন সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কীর্তি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'ভারত ও চীন' এবং 'স্বরবিতান' ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত 'স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম' ২য় খণ্ড ও পঞ্চানন ঘোষালের 'অপরাধ-বিজ্ঞান' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। বসুমতী-কার্যালয় সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ৪০ বৎসরের সাধনা দৃশ্যকাব্য-পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

৭৯ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন হইতে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত স্বপ্রণীত 'ভারত ও যুগসঙ্কট' প্রকাশ করিয়াছেন। অভিযান পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করিয়াছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী' ১ম খণ্ড। M. C. Sarkar & Sons কর্তৃক 1951 Hindusthan Year Book প্রকাশিত হইয়াছে। Paramita Prakashani প্রকাশ করিয়াছেন সুপর্ণা হোমের সচিত্র Our Bengal। যুগবাণী সাহিত্য চক্র বাহির করিয়াছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'অষ্টাবক্র'। বিহার সাহিত্য ভবন বাহির করিয়াছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'অষ্টক', এবং দেব-সাহিত্য-কুটির প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'মহীয়সী নারী'। ৫৯ সাদার্ন অ্যাভিনিউ কলিকাতা হইতে অমলকুমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন স্বপ্রণীত 'অজানিতের ডায়রী'। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে "সেবক"-প্রণীত 'ভ্রমণে দর্শন' বাহির হইয়াছে।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির বিস্তৃততর পরিচয় ও সমালোচনা বারান্তরে বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

শনিবারের চিঠি
২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৭

শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী

১৩

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 17. 7. 13.

প্রমথ, তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশী হইলাম। আগেকার পত্রে তোমার যেন একটা রাগের ভাবই আমার চোখে পড়িত, এবার দেখিতেছি সেটা গিয়াছে। তুমি শান্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম ভায়া আমার এবার ক্ষেপিয়া না গেলে বাঁচি। যাহোক ভালয় ভালয় যে সামলাইয়া গিয়াছ তাহা বড় সুখের কথা। আজ সুরেনকে দেবদাস পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলাম। কিন্তু, কোন কাযে আসিবে না ভাই। ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া, বোতল বোতল খাইয়া লেখা। লেখাগুলো পর্য্যন্ত আঁকাবাঁকা। যা মনে আসিয়াছিল তাই লিখিয়াছি।

আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব, নিশ্চিন্ত থাক। তবে, হয়ত একটু বড় হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। পূজার সংখ্যায় আমার জন্য ২০।২৫ পাতা ভারতবর্ষের খালি রাখিয়ো। তবে, tragedy লিখিব না। Tragedy ঢের লিখিয়াছি আর না। তা ছাড়া, ছেলে-ছোকরারা tragedy লিখুক, আমাদের এ বয়সে tragedy লেখা কালি কলমের অপব্যয়। আর, ইংরিজির তর্জ্জমা করা লিলি-টিলি আমার আসে না। খাঁটি দিশি জিনিস, একেবারে indigenous goods! চাই ত ব'লো। আর ইংরিজির ছাঁচে ঢালা তাও চাও ত লিখো। এ রকম ইংরিজি ধরণের গল্প লিখ্‌তে পারি নে যে তা নয়, তবে লজ্জা করে। যাক। সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক তাই। সমাজপতির মত স্পষ্টবাদিতার ভাণ ক'রে গালিগালাজ করা সত্যই ভাল নয়। তবে, তুমি যা বল্‌ছ গুণের কথাই বল্‌ব, দোষ দেখাব না এটাও ঠিক নয়। দোষ দেখাব, কিন্তু, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত। যেন সে নিজের দোষটা দেখ্‌তে পায়।

তা না ক'রে ঐ রকমের সমালোচনা—"অত্যন্ত কদর্য্য।" "কিছুই হয় নি" "পণ্ডশ্রম" "কালি কলমের অপব্যবহার" ইত্যাদিকে সমালোচনা বলে না। কোথায় দোষ করিয়াছি, কোথায় ভুল হইয়াছে যদি যথার্থ বলিয়া দিয়া লেখকের উপকার করিতে পার ত কর, না হইলে ও-রকম ওপর চালাকিতে কায হয় না শুধু শত্রু বাড়ে। পুস্তকের সমালোচনা এমন করিয়া করা উচিত, যেন সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়। যেন সেইটাই একটা পড়বার জিনিস হয়।

তোমার চিঠিতে ফণির অসুখের অবস্থা শুনে ভয় পেয়ে গেছি। সুরেনও ঠিক ঐ কথাই লিখেছে। বাস্তবিক ফণির অসুখে যদি 'যমুনা' বন্ধ হয়ে যায় সে ত বড় দুর্ঘটনা। আমি ঐ কাগজখানিকে বড় করিবার জন্য যে কত আশা করিয়া আছি তাহা আর কি বলিব। যদি তাহার changeএ যাওয়াই উচিত হয় ত তাই পরামর্শ দাও না কেন? দুই এক মাস ভাগলপুর কি মোজাফ্‌ফরপুরের মত যায়গায় গিয়ে থাকলে বোধ হয় দেহটা শুধরে যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কাগজটা চালাবে কে? তবে তুমি যদি একটা কিছু উপায় ক'রে দাও ত হতে পারে বোধ হয়। বেচারী একা, অথচ, এটুকু কাগজের জন্য লোক রাখাও যায় না সমস্তই একা করতে হয়, বড় মুস্কিল।

আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চ্চা ক'রে পেট ভরে না ভাই। তাছাড়া, ধর যদি এক মাস কিছু নাই লিখ্‌তে পারি, তা হ'লেই ত বিপদ। অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না। যাহোক মনে কচ্চি পূজার পর দু-এক মাসের ছুটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। সেই সময়ে মিস্তির মশায়ের সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু সেখানে চাকরি করতে আমি নারাজ। শুনি হাড়ভাঙা খাটুনি—মাইনে কম। কে ঐ কম মাইনের জন্য হাড়ভাঙা খাটবে আর তাতে সাহিত্যচর্চ্চাও বন্ধ হবে। সে আমি পারব না।

ভাল কথা। এবার 'সাহিত্যে' "দাদা" ব'লে একটা গল্প পড়েছ? কি ভীষণ লেখা। সবাই জানে অকৃতজ্ঞতা বাজারে আছে, তাই ব'লে কি ঐ রকম ক'রে লেখে? ওতে কার কি উপকার হবে? সমস্তটা

প'ড়ে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আসে, মন উঁচু হয় না। ওকে সাহিত্য বলা যায় না—ঐ গল্পই আবার সাহিত্যে বার হ'ল। ওর চেয়ে তোমাদের আষাঢ়ের ঐ দর্পচূর্ণ গল্পটি ঢের ভাল। মনের মধ্যে শেষে একটা আহ্লাদ হয় আমি ঠিক ঐ রকমই আজকাল ভালবাসি।

তোমার বায়স্কোপ দু বার পড়েছি। অনেক জিনিস যা জানতাম না জানা গেল। আর ঐ যে ছোট ছোট পাস্তুয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ওগুলি সবচেয়ে ভাল। কত ছোটখাট দরকারী ঘরের কথা যে ওতে জানা যায় তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ঐ রকম যেন প্রতি বারে থাকে।

আর না, মেল ক্লোস হয় হয়—

ভাল আছি।—শরৎ

প্রাণধন বাবু কি আমাকে আর মনে করেন? হয়ত ভুলে গেছেন, না? আমি তাঁকে কিন্তু প্রায়ই মনে করি। অতি অল্প দিনের আলাপে তাঁর উপর আমার একটা বোধ করি স্থায়ী আকর্ষণ হয়ে আছে। অবশ্য এ সব কথা তিনি যেন না শোনেন—হয়ত তা হ'লে কি মনে করবেন। তোমার বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শ

১৪

প্রমথনাথ, ভাই অনেক দিন যাবৎ তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ার সকলেও ভাল আছেন। পরশু V. P. ডাকে তোমার 'ভারতবর্ষের' এক খণ্ড sample copy দশ আনা পয়সা দিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ দাম ॥০ মাশুল খরচা ৵০ একুনে ॥৵০ সেখানি ক্লবে দিয়াছি—ফিরিয়া পাইলে পড়িব। যেদিন আসে, সেই দিন ঘণ্টাখানেক কতক কতক দেখিয়াছি মাত্র। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, যে, তোমাদের লেখার অভাব, কিন্তু ছাপাইয়াছ যে, এত ভাল জিনিস রহিয়া গিয়াছে যে স্থান সঙ্কুলান করিতে পার নাই। বাস্তবিক এটা বড় আশার কথা। কেন না আমিই এত বেশী telegraph, registered letter, শুধু পত্র, এবং উপহার মাসিক পত্র পাইতেছি, যে মনে হইয়াছিল, মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা লেখার

জন্য বড়ই অসুবিধা এবং অভাব বোধ করেন, তাই আমার মত নগণ্য লোককেও এত বিব্রত করেন। যাঁদের কখনও নামও জানি না, তাঁরাও লম্বা চওড়া চিঠি দেন, শুধু যে বিপদে পড়িয়াছি, এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি বাস্তবিক তাহা নয়, কেন না, তোমাদের মত এই মর্ম্মে 'প্রবাসী'ও ছাপাইয়াছেন যে তাঁহারা শীঘ্র আর কাহারও কোন লেখা পাইতে ইচ্ছা করেন না—কারণ ভাঁড়ারে তাঁহাদের অত্যন্ত বেশী জমিয়া গিয়াছে। আমি নিজেও অনেক দিন আর কিছু লিখি নাই মুখ্যতঃ অসুস্থ বলিয়াই। তবে, 'যমুনা'র জন্য না কি না-লিখিলেই নয়, তাই আষাঢ়ে গোটা দুই প্রবন্ধ (একটা প্রতিবাদ) লিখিয়াছিলাম মাত্র। গল্প লিখি নাই—লিখিতে ভালও লাগে না! তবে, তোমার কথামত আমার একটা মতলব হইয়াছে। "রামের সুমতি"র মত প্রেমবর্জ্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) series of stories লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালীর ideal অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। "বিন্দুর ছেলে" বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি—একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ' কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে। 'ভারতবর্ষে'র মত কাগজের অন্ততঃ ২৬।২৭ পাতা—তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।

কৈ প্রভাত বাবুর লেখা দেখিলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না, অথচ অগ্রিম টাকাও লইয়াছেন। এ দিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদকও 'বঙ্গবাসী' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রভাত বাবুর লেখা তাঁর কাগজ ছাড়া আর কোথাও বাহির হইবে না। ব্যাপার কি!

তোমাদের কাগজ বাহির করিবার জন্য তোমাকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হয়; এটা ভাল। এই সময়ে হয়ত তোমারও কাষ হইয়া যাইতে পারে। যদি, সত্যই তোমার ভিতরে পদার্থ থাকে নাড়া-

চাড়া করিয়া এই সময়ে বাহিরে আসিতে পারে। এ সাহিত্যচর্চ্চার সংস্রবই আলাদা। তোমার মত এক হিসাবে নিকর্ম্মা লোকের এই সময় যদি কিছু দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিবার সময় নিজের বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ এবং সুযোগ পায় সেইটাই লাভের কথা তোমার।

গত বারে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে "এ বিষয়ে এত সাধাসাধি" অনুনয় প্রভৃতি আরও কত কি হইয়া গিয়াছে যে আর বলা শোভা পায় না। আমি এইটাই ভয় করিয়াছিলাম যে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজেদের মন্দ না হইয়া যায় অর্থাৎ আত্ম মনোমালিন্যে না দাঁড়ায়।—শরৎ

১৫

[ডাকমোহর ২৫ জুন ১৯১৩]

প্রমথনাথ, ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আমার অসম্পূর্ণ চিঠিটা পেয়েছ। যে দিন চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ দেখি ডাক নিয়ে পিয়াদা যাচ্ছে, আর সময় নাই, কাজেই যেটুকু লিখেছিলাম, বন্ধ ক'রে পাঠালাম। আজ তোমার আর একটা পত্র পেলাম। প্রথমে কাজের কথা বলি। 'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না। শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা, তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral. বেশ্যা-চরিত্র ত আছেই, তা ছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আমার আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি—তা তোমাদের কাগজেই হোক আর ফণীর কাগজেই হোক। আষাঢ়ের 'যমুনা'য় "আলো ও ছায়া" ব'লে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু, এই একটা কথা যে আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি—হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো। সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কথা হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তুমি যে বার বার বল্‌ছ আমি চাকরি ছেড়ে দিলেও ভয় নেই, এ কথাটা বিশ্বাস করতে

পারলাম না। মিস্ত্রির মশাই জবাব দিয়েছেন যে তিনি ৬ মাসের ছুটিতে আছেন, এবং এ অবস্থায় কি করতে পারেন? কথা ঠিক। আরও ভাবছি যদি চাকরি করতেই হয়, তবে সেখানেই বা কি, আর এখানেই বা কি; মৃত্যু এক দিন হবেই, এবং তাহা সত্যই আসন্ন সে চিহ্নও চারি দিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক ছুটাছুটি ক'রে লাভ কি। তবে, এই পূজার সময় একবার কলকাতায় যাব। ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অধিক কিছু চিন্তা ক'রে নিজেকে এবং পরকে পীড়িত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে চুপ ক'রে আছি। 'ভারতবর্ষ' মোটের উপরে কি হয়েছে, তা কি তুমি নিজে জান না? আমাদের আষাঢ়ের 'যমুনা'য় এবার কিছু নেই, তবু বল দেখি ঐটুকু কাগজে যথার্থ readable matter যতটা আছে তার চেয়ে বেশী 'ভারতবর্ষে' আছে কি না! তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লক তোলা ছবির মত। রাগ ক'রো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছেই বলা যায় ব'লেই বললুম। দ্বিজুবাবু থাকতে লোকে কত আশা করেছিল, তার চার ভাগের এক ভাগও যদি প্রথম সংখ্যাটায় বার হ'ত সেও ভাল হ'ত, কিন্তু, তাও হয় নি। ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা, সাহিত্য হিসাবে সেইটুকুই ভাল। তার পরে তাম্র-লিপি আর বেদের তর্জ্জমা। কি করব আমরা নিরক্ষর লোকে বেদের তর্জ্জমা ক'রে? আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্ততঃ এমন একটা জিনিস continuously থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা bold review থাকা প্রয়োজন—কই তা? শুধু তাম্রলিপিতে সুবিধা হবে না দাদা, তা ব'লে দিলাম। গল্প অতি বদ। এই কি তোমাদের selection? 'ছিন্নহস্ত'টা বোধ করি হবে ভাল। তোমার লেখাও পড়েছি—কিন্তু একে সাহিত্য বলা চলে না। তবে প্রথম বারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না—খুব চেষ্টা কর যাতে 100 times ভাল হয়। এবারের 'প্রবাসী'ও দেখলাম। তারা তোমাদের কাগজের চেয়ে ভালই করেছে। এই সমস্ত আমার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত—এর কতটুকু দাম, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি কিছু থাকে, সেটা তুমি নিজের কাছেই গোপনে

রেখো। তবে, 'প্রবাসী' লোকের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়ছে, এই সময় ঠিক প্রতিযোগিতায় তাকে টলান যায়। অন্যথা যায় না। কারণ সে established! যাক এ সব কথা। কেন না, আমি দূরে থেকে যা বলব, হয়ত ঠিক না হতেও পারে। তোমরা সরজমিনে—man on the spot! প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ, গল্প কই হে? তার পরে তোমরা টাকা দিবার অধিকারে গল্পের জন্য যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন!

যা হোক এ সব বাজে কথা। আসল কথা এই যে এই সব বাহিরের হাঙ্গামা নিয়ে যেন আপোষে বিবাদ না হয়। তুমি গত বারে যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিলে, ভয় হয়েছিল এই বারে বুঝি ভীষণ একটা কিছু হয়। তোমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ কাল আছি ভাল। গত মাস দুই যাবৎ ঘাড় নীচু করলেই মাথা ধ'রে উঠত, তা লিখবই বা কি, আর পড়াশুনা করবই বা কি! গত চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি, যে একটা গল্প লিখে 'যমুনা'য় পাঠিয়েছি—বস্তুটা ভালও হয় নি, অথচ দীর্ঘকায় হয়েছে—তোমাদের কাগজে সেটা কিছুতেই চলত না। চলবার মত নয় বুঝেই আর পাঠালাম না। ও কি প্রমথ, আমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠিয়ে দাম আদায় করছ কেন? আমি গরীব মানুষ, তোমাদের অত দামী কাগজ কিনে পড়বার যোগ্য লোক নই ভাই—আমি কোথাও থেকে চেয়ে টেয়ে পড়বার চেষ্টা করব,—আমাকে আর পাঠিয়ো না। আমি দরিদ্র ব'লেই এ কথা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালাম—কিছু মনে ক'রো না। বাড়ীর খবর ভাল ত? তোমার নাটক প্লে হবে না কি? খুব ভাল, খুব ভাল—বড় আনন্দের কথা!—শরৎ

১৬

14 Lower Pozoungdoung Street
Rangoon

[ডাকমোহর ২৫ জুলাই ১৯১৩]

প্রমথ, তোমাদের প্রেরিত 'ভারতবর্ষ' ও তোমার পত্র উভয়ই পাইয়াছি। কাগজখানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এবারকার কাগজের

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। "বিন্দুর ছেলে" তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটি মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে "রামের সুমতি"র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় "পথনির্দ্দেশে"র কাছাকাছি। পূজার সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইব—কিন্তু, প্রকাশ করিবার জন্য কাহাকেও অর্থাৎ সম্পাদক-যুগলকে খোশামোদ করিও না। আমার শপথ রহিল। কেন না, তোমার ভাল লাগিলেই তাহা যে তাঁহাদের ভাল লাগিবেই অথবা প্রকাশের যোগ্য হইবে—সে কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। কেন, তাহা পরে বলিব। তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ১ম স্বরূজ কওর সম্বন্ধে। স্বরূজ কওর বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে এক স্থানে বলিতেছে—"এই ত দরশ পরশ হইল! আমি যে কায বলিয়াছি করিয়া আইস তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।" অর্থাৎ, সোজা বাংলায়, "কাজ ক'রে এলেই তোমার কাছে শোব।" ঠিক কি না? কেন না ইতিপূর্ব্বে, নির্জ্জন ঘরে বেশ্যা স্বরূজ "হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে" এবং "চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে" এবং "হরিসিং আঁচল ধরিয়া ওড়না টানাটানি করিয়াছে।" কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের driftটা কি? অনাবৃত রূপ যে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলসিংকেই দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে! তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে! সাবাস!! "তবে দেখ! রূপ দেখ!" অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে!

২। ১৯৩ পাতা—"অন্ধকার বৃন্দাবন"। চতুর্থ stanza: "করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার"। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধি মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখ্‌ছি! ভট্টিকাব্য

না কোথায় এই কথাটা আছে না ? কিন্তু এ ভট্টির দিন নয়—ইংরাজের রাজত্ব। আমি সময়াভাবে সব কাগজটা পড়ি নি—প'ড়ে বলব। এই কবিতাটির তৃতীয় stanza—"যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার"। শ্যামচাঁদটি তখন কোথায় শুনি ? বোধ করি মথুরা থেকে Bagpipe বাজাচ্ছিলেন, না হ'লে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা-জল শিহরে কি ক'রে ? অত দূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে ? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে ! ৪র্থ stanza—"যায় না চুরি নবনী ক্ষীর, বলিয়া ফেলে অশ্রুনীর"—ক্রিয়া আছে ছত্রের কর্ত্তাটি কি ? আর একটা কথা ভাই। ছেলে-ছোকরায় গল্প লিখলে ধরি নে। কোকিলেশ্বরের "ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ" বাপ রে ! যা হোক, ১৬ এবং ১৮ লাইনে লিখছেন, "দেবতাবর্গ" দেবতৃ শব্দের ষষ্ঠি কি হয় পণ্ডিত মশাইকে জেনে ব'লে দেবে ভাই ? যদি দেবতাবর্গই হয়, 'দেবতৃবর্গ' না হয় (বাঙলা ব'লে) তবে এবার থেকে যেন 'পিতাকুল' 'মাতাকুল' লেখেন। পিতৃকুল ইত্যাদি লেখেন না। কই বার কর দেখি এমনি লেখা। অক্ষয় মৈত্রের কিম্বা বিজয়বাবুর প্রবন্ধে ? তোমাদের কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সম্পাদকের কি এটাও নজরে পড়ে না ? যদি নাই পড়ে, ত অত বেদ বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া ঠিক নয়। ছুটো একটা ভুলও আছে। যথা "মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বৈশাখ" ২৯৪ পাতা। গল্প ও উপন্যাস—"রামের সুমতি"—কিন্তু "রামের সুমতি" ফাল্গুন ও চৈত্রে বার হয়েছিল। অর্থাৎ গত বৎসরে। বৈশাখের 'যমুনা'য় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না—তাতে "পথ-নির্দ্দেশ" আর "নারীর মূল্য" ছিল। নিশ্চয়ই কোনটা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে না, অবশ্য সে জন্য আমি দুঃখ করছি নে কেন না তাঁর কথার মূল্য আমার কাছে অতি অল্পই। কিন্তু ভাবছি 'অজ্ঞাতবাস' ফকির বাবুর বইয়ের মত আমার কোন একটা বই যদি থাকৃত আর বিদ্যাভূষণ তাঁর হতেন প্রকাশক—তা হ'লে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হ'ত। "রত্ন-দীপ" নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কেন না, নায়ক রাখাল পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ করবার মানসে যাত্রা করেছেন এবং 'মানসী'তে বার হচ্ছে।

হায় রে দ্বিজুদার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'। "সাহিত্য সমালোচনা"র মধ্যে পাঁচকড়ির 'নববর্ষ'ও উল্লেখযোগ্য! যার দুটো ছত্র consistent নয়। "তারে জোর ক'রে শ্যামের বাঁশী" আর "আমার মরণ হ'ল না" আছে কি না! 'নববর্ষ' প'ড়ে দেখো—এমন এলোমেলো গাঁজাখুরি jargon আর সম্প্রতি দেখেছি কি না মনে হয় না। আরো একটু মন দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পড়ি, তার পরে 'আশ্বিন' সংখ্যায় "সাহিত্যে" একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন registered letter এবং telegram পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে। প্রমথ ভাই, দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও—তার পরে এই রকম অবিচার এবং মানুষকে mislead ক'রো। নারীর মূল্য তাঁরও ভাল লেগেছিল—দুঃখ হয় শেষটা তিনি পড়লেন না। এতে অনেক সত্য কথা আছে তাইতেই এটা প্রবন্ধের যোগ্য নয়। যাক্। যথার্থ সুখও পেয়েছি। 'প্রাক্তন' গল্পটি যথার্থই উঁচু লেখা! আর জলধর বাবুর 'দিনাজপুর'টিও মন্দ নয়। 'ঘাটে' ছবিটি বেশ। নোলকটা না থাকলে আরো ভাল হ'ত। 'কানাকাড়ি' এখনও প'ড়ি নি। এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করি নি। 'Art' painting আমিও নিজে করি। Oil-painting আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি—কিন্তু 'যমুনা' ছোটো কাগজ ওতে সুবিধে হবে না। তা ছাড়া 'অনিলা দেবী' নাম নিয়ে সমালোচনা করতে আর ইচ্ছা করে না। আমাদের ফণীন্দ্রভায়ার proof দেখার চোটে, আমার লেখার ত ছত্রে ছত্রে ভুল বিরাজ কচ্ছেন—বিপক্ষ সেইগুলো তুলে ধরলেই ত গিছি! দেখা যাক কি হয়। যাই হোক তোমাকে না দেখিয়ে বা তোমার মত না নিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করব না। তবে, আর একটা কথা ব'লে রাখি ভাই। তুমি মনে ক'রো না আমি সেই পুরাতন কথার শোধ তুলছি। চরিত্রহীনের এখন বাজারে অত্যন্ত দুর্নাম, তা সত্ত্বেও আমি

সে জন্যে আজকের এই কথাগুলো লিখি নি। কথাগুলো যদি সত্য না হয়, ভালই, যদি সত্য হয়. ভবিষ্যতে সাবধান হ'লেই হবে। এই সুরঙ্গ কওর'টা আমাদের clubএর সকলেই একবাক্যে নিন্দা করেছে। অনেকে এমনও বলেছে ওটা প্রকাশ্য অনাবৃত immorality. সত্যিও ওর ছত্রে ছত্রে এই exciting ভাব ছাড়া আর কিছুমাত্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। যা হোক আমারও একটা নজির হয়ে রইল। চরিত্রহীন প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই—এমনি ক'রে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধ'রে expose করব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি। রবিবাবু প্রভৃতি সর্ব্বত্র হ'তেই।

হাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষে তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ। আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ওরকম না হ'লে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাক্‌বে। আমরা এক রকম আশা ক'রে আছি। ওতে 'যমুনা'র পশার বাড়বে। নইলে দেখছি ত ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই যাচ্ছে—কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি—অরণ্যবাস—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি"! ঐ পুরুত, আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না—অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়ি নি। অথচ আমার এই ব্যবসা।

দেখ না লেখবার কায়দা, বঙ্কিমবাবু রবিবাবুর। প্রথমেই একটা something! যাই হোক দেখাই যাবে। আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে কি না! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিল না। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশঃ হ'লে লোকের

patience থাকে না। তা যতই শেষে ভাল হোক্। কেমন আছ, বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শরৎ

মনে হয় প্রমথ নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি, কিন্তু তার বলায় কোন ফল হয় না। কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালিগালাজ—প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমি Jack of all trade কি না, সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক, নভেল, সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর ক'রে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' ক'রে দিতাম। হাঁ হাঁ—আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে। চোখ বেশ ক'রে খুলে রাখলেই দেখা যায়। দেখতে তুমিও পার, আমিও পারি, কিন্তু মনে রাখা চাই। আমি মনে ক'রে রাখি, তোমরা ভুলে মেরে দাও—এই প্রভেদ আর কিছু নয়।

১৭

Rangoon
9. 8. 13

প্রমথ, তোমার চিঠি যেদিন পাইলাম তার পরদিন manuscript পাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া দিয়া পাঠাইতে গেলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ২৩।২৪ শ্রাবণের আগে পৌঁছিবে না, সেই জন্য ভাদ্রে কিছুতেই ছাপা হইবে না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইলাম না। এমন কোন অর্থ নাই যে পরের মাসে না বাহির হইলে আর উত্তর দেওয়া চলে না। ওটা আশ্বিনে ছাপাইলেই হইবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবারও আছে। প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে এবং এমন সব কথা আছে যাহা 'ঝগড়া,' ওটা উচিত কিনা সন্দেহ। আমি ঐ কথাগুলাই আর একটা কাগজে লিখিয়া আশ্বিনের জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি। তবে, আক্রমণ করিতেই হইবে এবং তাহা একটু polite ধরণে—অনেকটা কানকাটার মত করিয়া। আশা করি ইহাতে তুমি মনে কিছু করিবে না। যাহা ভাল হইবে, নিশ্চয় তোমার জন্য তাহাই করিব।

তা ছাড়া দেখ, গৃহস্থ কি বলে ? দুঃখ এই যে আমি ওঁর original painting দেখি নি তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে তিনি বুঝিতেন এ কোন চিত্রব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়। আমি তোমার জন্ম গল্প লিখিতেছি অর্থাৎ দু-দিন লিখিয়াছি আর দু-দিন লিখিব। ছবি দেবে কি হে ? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিয়ো না—ওরে বাপ্ রে ! সেই "ফুলগাছ" আর সেই ব্যথিতের মৃত্যুশয্যা। আমি তাহ'লে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে। ১ হপ্তা পরে পাঠাব। তুমি সমাজপতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ফণি তার চেয়েও বেশী করিয়া লিখিতেছে—অথচ সমাজপতি মহাশয়ের কালকের রেজেষ্ট্রী পত্র এই সঙ্গে পাঠালাম পড়িলেই বুঝিবে, কি মুস্কিলে পড়িয়াছি। কি যে করি ঠিক করিতে পারি না, অথচ, আমার হাতেও গল্প লেখা নাই, মগজেও আসিতেছে না। তার ওপর আফিসের কাজ এত বেশী এই মাসটায় পড়িয়াছে যে রাত্রি সাতটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারি না। তার পরে লেখাপড়া, বিশেষ, মাথার ভেতর থেকে কিছু বার করা প্রায় অসাধ্য ! তবে আমার না কি বড় শক্ত মাথা তাই এত ঘা খেয়েও কিছু কিছু ঠুক্‌লে ঠাক্‌লে বার হয়। সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে, যিনি আছেন তিনি বলেন "খেতে পাবে না"। *ইনি ত দিনরাত জপতপ পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে কিন্তু কাজে আসে না। এক দিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে ব'লে যাই তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু, সুবিধা হ'ল না। "বরং" লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বরের ঐ টানটা কোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব ? অর্থাৎ " ং " হবে না " ং " হবে ? কাজেই আমাকে সমস্ত নিজেই লিখতে হয়। রাত্রে একটু আফিসের ঘোরও ধরে উঠে, ব'সে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কায করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে পারি নে তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিরীন এবং ভাগলপুরের আরো

দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। দেখা যাক 'যমুনা'র অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না এবং এই যা আশা। আর একটা কথা সেদিন একটা চিঠি পেলাম (ভাবী সম্পাদক হইতে) 'অয়ন' ব'লে একটা কাগজ ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' ব'লে আর একটা কাগজের জন্য তারা বিশেষ লোভ দেখিয়ে পত্র দিয়েছেন—কিন্তু লোভ দেখালে কি হয়? আমার পুঁজি কই আমি ত আর সত্যেন দত্ত নই যে বল্‌লেই কবিতা লিখে ফেল্‌ব! শুনছি 'অয়ন' পত্রিকা আমার "কোরেল" গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—তবে বেনামি ছাপাবে এ সর্ত্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা না কি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই। আচ্ছা, আজকাল হুহু শব্দে এত মাসিক পত্রের আয়োজন হচ্ছে কেন? এটা কি খুব লাভের ব্যবসায়? একে ত খোশামোদ ক'রে ক'রে প্রাণ অস্থির তার পরে ঐ যে লিখেছ, এতটুকু স্বাধীনতা নেই। আমার গল্পগুলো বই ক'রে ছাপিয়ে কি হবে? কে কিনবে? কত গল্পের বই রয়েছে আমার বই কি কেউ পড়বে? আমার নষ্ট করার মতো টাকা নেই—ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া হাঙ্গামা কত, advertise কর, ক্যানভাস কর, লোকের opinion সংগ্রহ কর—ও সব আমি চাইও না পারবও না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে পেলে বাঁচি। অত হৈ চৈ কে করবে? আমার ত সাধ্য নয়। প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি। এত দিন এ কথাটা আমার মনে ওঠে নি। এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ Sub-Editor কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের ক'রে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমিই দিতে পারব। তাছাড়া, ছবি judge করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা সাহিত্যিক আলোচনা এও, (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি ক'রে দেব। ১০টা থেকে ৪।৫টা পর্য্যন্ত খাটলে আমি খুব পারি। অবশ্য তাম্রলিপ্ত টিপ্তি পারব না। তার পরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কায করি তখনও করব। দেখো ত যদি কেউ আমাকে নিতে

স্বীকার করে। একজন ভাল Editor থাক্‌লেই আমি কায চালিয়ে দেব। অন্ততঃ ছিছি কাগজ কোন মাসেই হ'তে দেব না এ assurance তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাক্‌রি আমার খুব ভাল লাগ্‌বে তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দু-দিন পরেই বলে, তোমাকে চাই নে যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্ত্তা হয় আর তোমার চেনা-শোনা থাকে তাহ'লে চেষ্টা দেখো—আমার বর্ম্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে। সমাজপতির সম্বন্ধে কি পরামর্শ দাও ? তোমার মত ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিন্তু বিপদেও বড় পড়েছি তা বোধ করি বুঝতে পাচ্ছ। সমাজপতি সম্বন্ধে কি করা উচিত অতি সত্বর জবাব দিয়ো। আর চিঠিটা হারিয়ো না আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো কেন না, এক সময়ে যখন আমার নিন্দে সুরু করবে তখন কাযে আসতে পারে। Documentary evidence ! আজ রাত্রে কিছুই হ'ল না কেবল চিঠিই লিখছি ;—শরৎ

১৮

14 Lower Pczoungdoung Street
Rangoon, 18. 8. 13

প্রমথ, আজ তোমার পত্র পাইয়া অনেক কথা জানিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক মহা বিপদ ঘ'টে গিয়েছিল। একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০৷১২ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কি না, তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব ক'রে নড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেই ভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারি নে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা !! সে দিন রাত যে কি ক'রে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন Dentistএর কাছে গেলাম তিনি বল্‌লেন উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বল্‌লেন "ওরে বাপ রে। একটি দাঁত তুল্‌লে সব কটি দাঁত দু-দিনে ঝুর্‌ ঝুর্‌ ক'রে প'ড়ে যাবে এবং বেশ একটু scientific ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে

—অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাক্‌বে না। সাত পাঁচ ভেবে চ'লে আসা গেল, তার পর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না তার পরদিন তুলে এলাম। সে যা Dentist! প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধ'রে প্রায় আধ-ওপড়ানো-গোছ ক'রে তুলেছিল। যত বলি ওটা না ওটা না সায়েব থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তার পর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। Dentist বল্‌লেন, "বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।" কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুল্‌তে জানিস নে—রক্তপড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের! যা হোক এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর রক্ত বন্ধ ক'রে বাড়ী ফিরে এসে আবার জ্বর! আজো সেরে উঠতে পারি নি। ৮।১০ দিন লেখাপড়া আফিস সমস্ত বন্ধ! না হ'লে তোমাদের লেখাটেখাগুলো শেষ হয়ে যেত। যাহোক তাড়াতাড়ি ক'রে এইবার লিখে পাঠাব। ভেবো না। আমার ঐ তিনটা গল্প বই ক'রে ছাপানো সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই, যদি না কিছু ঝঞ্চাট পোহাতে হয়। হাঁ বিক্রী হবে ব'লেই মনে হয়, কারণ এর মধ্যেই অনেকে জান্‌তে পেরেছেন। তুমি যেমন ক'রে ছাপতে বল্‌বে তাই হবে—শুধু ছবি দেওয়া হবে না এইটি আমার অনুরোধ। Copyright বিক্রী করতে চাও কর, না করতে চাও ক'রো না—যা তোমার খুশী আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম এ সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবারও আবশ্যক নাই। তবে, এই আশ্বিনে 'ভারতবর্ষে' যে গল্পটা বার হবে সেইটে নিয়ে চারটে একসঙ্গে ক'রে ছাপালেই ভাল হয় বোধ হয়। Copyright বিক্রী ক'রে যদি টাকা পাই ত H. Spencer এর বইগুলো কিনে ফেলি। যাহোক যা হয় ক'রো। আমার চাকরি ছাড়ার এত আবশ্যক নাই—ছুটি নিয়ে যাই—দেখি শুনি তার পরে যা হয় করা যাবে।

সমাজপতিকে চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছি। এই রকম লিখেছি যে আপনি চতুর্দ্দিকে advertise করেন তাতে প্রসিদ্ধ গল্পলেখক এবং চমৎকার গল্পলেখক দীনেন্দ্র বাবু, প্রভাত বাবু, সরোজনাথ প্রভৃতির

উল্লেখ করেন কিন্তু আমার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় মনে করি আপনার মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমজদার ও সমালোচক যখন আমার গল্পের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন না তখন নিশ্চয়ই আমার গল্প ভাল নয়। এই সঙ্কোচেই আমি আপনার প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিতে ভয় পাই এবং ভবিষ্যতেও পাইব।

এখনো ত জবাব পাই নি। পেলে জানাব। বাস্তবিক লোকটি সহজ নয়। শুনলাম 'যমুনা'র বিনিময় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যত আক্রোশ তাঁর 'যমুনা'র উপর। অথচ, তিনি যমুনাখানি আগ্রহে পড়েন।

আজ আর না, রাত্রি ১।।০টা, শুইগে।—তোমার শরৎ

১৯

14. Lower Pozoungdoung Street
Rangoon.

[ডাকমোহর ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]

প্রমথনাথ, আজ তোমার চিঠি পেলাম। কন্যার জন্ম হয়েছে শুনে বড় খুশী হলাম। এই দুটি বেঁচে থাক—আর আবশ্যক নাই। জ্বর জ্বর হয়েই আছে। ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছি, পড়াশুনো একেবারে থামিয়েছি। কেন না, আমার এ বিষয়ে নেশার মত ঝোঁক ধরে। একবার সুরু করলে মোটেই moderation থাকে না, হয়ত রাত্রি ৩।৪ হয়ে যায়। হাঁ, নারীর মূল্য ও চন্দ্রনাথ দু-ই এইবারে শেষ হয়েছে। আমি তোমাকেও সময়ে গল্প পাঠাতে না পারার জন্য লজ্জায় তোমাকে চিঠি দিতেই পারছিলাম না। যাহোক শুনলাম প্রভাত বাবু প্রভৃতির গল্প পেলে আর তাড়াতাড়ি নাই। তাছাড়া, পূজার সংখ্যায় ওঁর গল্প দিয়ে আবার আমার গল্প দেবার স্থান সঙ্কুলানও হয়ত হ'ত না। হাঁ ঐসব গল্প বই ক'রে ছাপার জন্য কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দিতে হবে, কেন না বিস্তর ছাপার ভুল, sentence লোপ প্রভৃতি দোষ আছে। ভাই প্রমথ আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার আর বেশী দিন নেই। হয়ত বা এই বছরটাই শেষ বছর। যদি হঠাৎ মরি ভাই, মনে-টনে রেখো। তুমি ছাড়া আমার

বোধ করি আর বন্ধুই নেই—কত যে তোমাকে ভালবাসি, তা একটু পূর্ব্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখছিলাম। যাক্ এ সব মেয়েলি দুঃখের কথা—যেতে হয় যাওয়া যাবে। তবে আর একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাকব। মরি ত সদ্‌গতি হবে—বামুনের কাঁধে চ'ড়ে পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে, নিমতলায় যাওয়া যাবে। কেমন? আমার কতটুকু ক্ষমতা ভাই, কিবা জানি, মাতৃভাষা আমার কাছে আর কি আশা করে? শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে কষ্ট হচ্ছে—একটু জোর পেয়ে সব কথা ভাল ক'রে জবাব দেবো। প্রাণধনকে আমার কথা ব'লো। আর একটা কথা—'বিন্দুর ছেলে' গল্পটার অত্যন্ত সুনাম হয়েছে। অনেকের মত এইটাই best. অনেকের মত 'পথনির্দ্দেশ,' অনেকের 'রামের সুমতি'। ভাবি equally intelligent লোকেদের মধ্যে এ রকম মতভেদ হয় কেন? এমন সংবাদও পেয়েছি যে 'পথনির্দ্দেশ'টা immoral!! ভাদ্রের 'যমুনা'য় দ্বিজুদার সম্বন্ধে একটি কবিতা বেরিয়েছে—ভারি সুন্দর। ভাদ্রের 'ভারতবর্ষ' পাই নি। বোধ করি তাঁরা পাঠাতে ভুলেছেন কিম্বা হয়ত officeএর ঠিকানায় পাঠিয়েছেন কেউ মেরে দিয়েছে। যাই হোক সে কথা কাউকে জানাবার আবশ্যক নেই—তোমার কপিটা পাঠিয়ে দিয়ো, একবার প'ড়ে ফেরত পাঠাব।

দিদির সম্বাদ এখনও পেলাম না সেজন্য ভেবে ভেবে আরো যেন শরীর খারাপ হয়ে উঠেছে। সেখানে telegraph যায় না—চিঠির জবাবও পাচ্ছি না। সমাজপতির সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক সেই জবাবই পেয়েছি। আমিও বুঝেছি ব্যাপারটা কি! হ্যাণ্ডবিলও একখানা কপি পাঠিয়েছিল—বাস্তবিক মিথ্যে কথা এমন নির্লজ্জভাবে বলছেন যে, যে পড়ে তারও লজ্জা করতে থাকে। আমি তাঁকে কিছুতেই 'লেখা' পাঠাব না, কারণ তিনি তোমাদের শত্রু তার উপর সুবিধার লোক নন।—তোমার শরৎ

২০

30. 9. 13

প্রমথ, আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমার বাড়ীর খবর শুনে বড় চিন্তিত হয়ে থাকলাম, অতি শীঘ্র ভাল সম্বাদ দিয়ো। আপাততঃ একটু ভাল ক'রে ঘরের দিকে মন দাও, পরের কাজ দু-দিন পরে করলেও চল্‌বে। বোঠানের আবার কি হ'ল? বাহিরেই বা যাবে কেন? কলকাতায় থাকতে পেলেই ত লোক বেঁচে যায়—তুমি ছেড়ে যেতে চাও কেন? না, আমি পূজার সময় যাব না। যেতাম শরীর ভাল থাক্‌লে। অসুস্থ থাকা পর্য্যন্ত কারু কাছে কিছুতেই যাব না। ও আমার ভারী লজ্জা করে। সারলেই পালাব নিশ্চয়।

গল্পটা খানিক লিখেছিলাম—কিন্তু তোমার এম্‌নি নামের মহিমা যে সেটা একেবারেই কদাকার হয়ে উঠছিল; শেষ না হ'লে কোনমতেই বলা চলে না ছাপার উপযুক্ত কি না! যদি দেখি ভাল হয় নি, তোমার নামে ছাপতে হবে। অঘ্রাণে ছাপা হ'লেই ভাল হয়—আমিও দু-দিন বিশ্রাম করি। অর্থাৎ পড়া লেখা যেমন বন্ধ ক'রে আছি, তেমনিই থাকি! তবু তোমাদের কিছু সত্যিই আর আটকায় না, কিন্তু যে বেচারার সত্যিই আটকাচ্ছে তার জন্যেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। লিখি নে বটে, কিন্তু ভাবতেও ছাড়ি নে। সেটা ভাল ভাবনা নয় নিতান্তই দুর্ভাবনা। আমি ছাড়া সে বেচারার আর প্রায় কোন সম্বলই নেই। তবে, বুড়িকে একরকম পরওয়ানা জারি ক'রে দিয়েছি যে, 'যমুনা'কে বিশেষ সাহায্য করতেই হবে। সে আমার হুকুম কোন কারণেই অমান্য করতে পারে না, সেই ভরসা। তা হ'লে কি হয়, সে বেচারাও প্রায় শয্যাগত। আমার নারীর মূল্যও শেষ হ'ল; বিস্তর সুখ্যাতি ক'রে অনেক পরিচিত অপরিচিত লোকেরই এ সম্বন্ধে চিঠি পেলাম—কিন্তু ভাবছি লোকে আমার নাম জান্‌লে কি ক'রে? হয় ফণির দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে। এবার কি সুরু করি বল ত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধ করি সবচেয়ে interesting হ'ত, তাইতেই বন্ধু বান্ধবের ভীষণ আপত্তি! তারা কিছুতেই রাজী নয় যে আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি।

মনে করেছি Evolution of idea of God কিম্বা Evolution of idea of Soul সুরু করব। অবশ্য ঠিক নারীর মূল্যের ধরণেই। তুমি যা বল, তাই করব। আমি তোমাকে অনেক অপদস্থ করেছি, আমার সব মনে আছে—একটু ভাল হই, তার পর দেখা যাবে যদি শোধ করতে পারি। আমার ব্যবহারে তুমি যত ক্ষুণ্ণই হয়ে থাক না কেন, এক দিন এটা যাতে ভুলতে পার, সে কথা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলি না। চিঠির জবাব একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো। বড় ভাল নই।—তোমার শরৎ

পুঃ—চন্দ্রনাথ তোমার ভাল লাগবে তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কেন না ওটা আমার ভাল লাগে নি। একে ত ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই অপূর্ণতা বেশী, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস র'য়ে গেছে। এই উচ্ছ্বাস বস্তুটিতে আমার ভীষণ ভয়। যাই হোক পাঁচ জনের ভাল লাগলেই ভাল। তবে ভাষাটা খুবই সরল—বোধ করি আশ্চর্য্য সরল এবং direct এটা অস্বীকার করা যায় না।

২১

14, Lower Pozoungdoung Street.
Rangoon, 22. 10. 13

প্রমথ, তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ চিন্তিত হলাম। এখন অন্য সব আলোচনা আমার সত্যই ভাল লাগে না। তোমার বাড়ীর খবর একটু একটু ক'রে জানাবে। বো'ঠান কেমন আছেন, এবং কি রকম ব্যবস্থা করছ শীঘ্র লিখে চিন্তা দূর করবে। তোমার পিসীমা যখন ভাল হবেন, এবং অন্য খবর সব মঙ্গল ব'লে লিখতে পারবে তখন আমিও আমার সম্বন্ধে আলোচনা করব, এখন নয়। হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করতে বিলম্ব ক'রো না।

যা হোক দুটো কথা জানাবার আছে। 'যমুনা' সম্বন্ধে তুমি য বলেছ—noted.

দ্বিতীয়, তোমার জন্যে যেটা লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলাম

সেটা শেষ হ'ল। নিতান্ত মন্দ হয়নিই ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মস্ত বড় হয়ে গেল—দুয়ের বার হয়ে গেছে। 'বিন্দুর ছেলে'র দেড়া বড় হয়েছে, কি উপায় করি? আবার তাড়াতাড়ি আর একটা লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছি। তুমি যদি বল তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র ঐ বড়টা registry ক'রে পাঠাতে পারি। তোমাকেই পাঠাব কেন না তোমার জন্যে লেখা—যা খুশী করতে পার।

'মূল্য' 'টুল্য' সুরু করেছি বটে, এগোচ্ছে না। কারণ শরীর সারলেও বেশী চাপ দিতে সাহস হয় না। না, ওগুলো ফাঁকিতে সারা যায় না।

তোমাদের 'ভারতবর্ষ' যে রকম উন্নতি করেছে বাস্তবিক বড় সুখের বিষয়। কিন্তু, আমি ত সত্যই ভেবে পাই না এত উন্নতির হেতু কি? ইন্দ্রজাল তোমরা জানো বলতে পারি না। এক একবার ভাবি দ্বিজুদা বেঁচে থাকলে না জানি কি রকম হ'ত!

তোমার নিজের যা লেখা আছে ছাপাও না কেন? আমি না প'ড়েই বলতে পারি, তা তোমাদের কাগজে শীর্ষস্থানে স্থান পেতে পারবে।

বিভূতির নভেলটা তোমরা ছাপালে ত খুব ভাল হয়। এমন grand বই আমি অনেক দিন পড়ি নি—তাই বা কেন, কোন দিন পড়ি নি। কিন্তু দোষও আছে—সেটা হচ্ছে এই যে arrangementএ গোলমাল আছে ব'লে মনে হচ্ছে—অর্থাৎ chapter আর ঘটনাগুলা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে বসাতে হবে। বস্তু আর ভাব যা আছে তা যথার্থই অতি সুন্দর, যে-কোন কাগজের গৌরবের জিনিস হবে কিন্তু আমার ভয় হয়, arrangementএর, এই গোল থাকাতে অনেকেরই প্রথমটা প'ড়েই বিস্বাদ লাগবে। আর এগোতে চাইবে না—শেষ পর্য্যন্ত পড়বে না। আমি পুঁটুর (বিভূতির) চিঠি পেলে তোমাকে অন্য কথা জানাব।—শ.

আমার রামের সুমতি প্রভৃতির কাপিটাপি পরে হবে। তাড়াতাড়ি কি?

সমস্তই আমার ঠিক করা আছে, পাঠালেই হয়।

২২

31. 10. 13
Rangoon.

প্রমথ, তোমার পত্রের আশায় আশায় থাকিয়া বিলম্ব হইয়া গেল। আজ এই মাত্র তোমার চিঠি পাইয়াছি। যেমন সময়ে পাইলাম, তখন আর registry করিবার সময় ছিল না, এবং unregistered পাঠাইতেও সাহস হইল না বলিয়া আগামী মেলে পাঠাইতে হইবে। এ মেলে হইল না। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম এই ভাবিয়া যে, এত বড়টা তোমাদের কাযে লাগিবে কি না। এখন দেখিতেছি 'বিন্দুর ছেলে'র ডবল হইয়া গিয়াছে। আমার গল্পের একটা natural সমাপ্তি আছে, plot হিসাবে সেটা সম্পূর্ণ আপনা আপনি হয়, আমি গরজ বুঝিয়া তাহাকে ছোট কিম্বা বড় করিতে পারি না। এখানে আমার গুটিকতক সমজদার সাহিত্যিক বন্ধু আছেন, তাঁদের মতে, আমার অপরাপর গল্পের চেয়ে—art প্রভৃতি হিসাবে, এবং লেখার হিসাবেও far more excellent—তবে আমি নিজে ঠিক সে কথা বলিতে পারিব না, আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে নিজে ঠিক judge নই। তোমরা ভাল বলিলেই এখন সার্থক হয়। একটু মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়ো—তবে, এটা অবশ্য বলিতে পারি, তোমাদের কাগজে এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার চেয়ে কোনমতেই নিকৃষ্ট হইবে না। এখন তোমাদের রুচি। একে তুমি যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি করিয়া প্রকাশ করিতে পার অর্থাৎ যা ভাল বুঝিবে তাই করিয়ো। আমার শুধু এই অনুরোধ যে ছবি দিতে পারিবে না। তাহাতে অনর্থক পয়সার শ্রাদ্ধ অথচ আমার মতে আবশ্যকীয় নয়। অন্ততঃ আমার গল্পে নয়। আশা করি আমার এই অনুরোধটা একবার রাখিবে। তাহাতে আমারও আহ্লাদ হইবে। তোমাদেরও পয়সা বাঁচিবে। এবং গ্রাহকও খুশীই হইবে অন্ততঃ দুঃখিত হইবে না।—শরৎ

আগামী মেলে registered তোমার ঘরের ঠিকানায় পাইবে।

২৩

'বিরাজ বৌ'

প্রমথনাথ, আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছ। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তার পর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম। গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং immoral ইত্যাদি ছুতা করিয়া reject করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও reject করার কারণ দর্শাইয়ো না। আমার "চরিত্রহীন" তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে "Charitrahin creating alarming sensation." আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হোক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে—(character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্য্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যেই এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই। (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন। সোনার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই সুরু করিয়া দিয়াছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত। Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠানদি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা তেমনি এও)। কোন দোষ নাই কেন না নাম 'রত্নদীপ!' (এবং লেখক প্রভাতবাবু) আর আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধে অপরাধী? যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিম্বা জার্ম্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই immoral কি না। কিন্তু তোমরাও ভুল বুঝিয়াছ বলিয়াই আমার যত দুঃখ। তোমাদের 'সুরজ কওর' সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না। টলষ্টয়ের Resurrection বেষ্ট বই! যাই হোক আমি এখনও

স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে 'চরিত্রহীনে' এক বর্ণও immorality আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা পাঁচ জনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন,' এর মধ্যে "কুল-কুণ্ডলিনী" জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। 'রত্নদীপ' নাম দিয়া—বাড়ীর কেচ্ছা সুরু করি নাই। যাই হোক, তোমাকে আমি একটু ভয় করি বলিয়াই 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে এইটুকু আবেদন করিলাম। এবং তোমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে immoral বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি registered ফিরিয়া পাঠাইবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না তোমাকে কোন কিছু পাঠাইয়াছিলাম কি না। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার বাড়ীর অনেকটা ভাল খবর পাইয়া খুব সুখী হইলাম। হাঁ changeএ পাঠাও। আমার যাওয়ার সম্বন্ধে—শরীর বেশ করিয়া না সারিলে এক পা নড়িব না। যেমন আছি, তেমনি থাকিলে X'mas নাগাদ দেখা যাইবে।

মূল্য সুরু করিয়াছি। 'ভগবানের মূল্য' 'বিধবার মূল্য' পূর্ণ তেজে অগ্রসর হইতেছে। ভাল কথা, তোমার সেই কাণাকড়ির মূল্যের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—আজ তাহাকে হঠাৎ পাইয়াছি। দুই চারি দিনে তাহাকেও ঠিক ঠাক করিব।

আমার 'রামের সুমতি' প্রভৃতির কাপি শীঘ্রই পাঠাইব। একটু ভালো করিয়া ছাপাইলে ভাল হয়—অবশ্য যা বুঝিবে তাই করিবে।

এইবার কাযে মন দিই।—শরৎ

২৪

Rangoon

13. 3. 14

প্রমথ, পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়াছি। রক্ত আমাশা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। বেশ রোগটি, না? তোমার কেমন? শুনিলাম, আমি নাই,

এই মর্ম্মে হরিদাস বাবুকে জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু, তুমি বুদ্ধিমান্ হরিদাস বাবুকে সে সম্বাদটা দাও নি কেন? তা হ'লে তিনি ত আমার চিঠি না পাওয়ার দরুন, লেখা না পাওয়ার দরুন দুঃখ করতেন না! আজ ২০০৲ পেলাম। ভাল। ছোটগুলাও পাঠাচ্ছ। লোভে পড়ছি না, কি, তাও আবার ভাবছি। শুনি সাহিত্যিকের মৃত্যু ইহাতেই ঘটে। হরিদাস বাবুকে বলিয়ো তিনটা ছোট গল্প যেন না ছাপান। এইবারের ছোট গল্পটা (সম্ভব ভালই হবে) এক ক'রে চারটা গল্প চতুষ্পদ নাম দিয়ে ছাপালে বেশ হবে, কি বল? বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে। ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগ্‌গীর দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাতবাবুও দোষ খুঁজে না পান। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে—ঐ গুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। 'হরিনাম' যেই করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি 'হরিনাম' গাইব। দেখি এতে কি হয়। বৈশাখের জন্য হরিদাস বাবুকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস 'গৃহ-দাহ' নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি—এতেও ঐ শিক্ষা কাযে লাগাব। ফাঁদে পা দেব না। 'বিরাজ বৌ' নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে—ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।

কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কেমন? গৃ— কেমন? ভায়া, পিসিমা —সব ভাল ত? সম্ভব 20th April start ক'রব।—তোমার শরৎ

কি খাটুনি বাপ রে। রক্ত আমাশা হয়ে শাপে বর হয়েছে—আর যাচ্ছি না।

২৫

Rangoon
28. 3. 14

প্রমথ, নানা কারণে তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি করিয়াছি। Inject করিতে আমার ভরসা হয় না—ওসব আমি পারিব না। জান বোধ হয় আমি ভয়ানক opium-eater—তাহায় রক্ত আমাশা!

ব্যাপার এই। যা হোক এ দেশে ম্যাংগোষ্টিন ফলে এ রোগ খুব সারে আমি তাই খাই—প্রায় সেরে এসেছে। ভয় নেই। না হ'লে, এ মুল্লুকের রক্ত আমাশায় লোক ২৪ ঘণ্টায় পর্য্যন্ত মরে। তবে ভাবনা এই ছিল যে আমার অত সুকৃতি নাই। আমার এই, তার পর এদিকের হঠাৎ neuralgic pain পিঠের নীচে হইয়াছে গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ শনি—২০।২৫ টাকা বোধ করি ঔষধ শুধু লাগ্‌ল—কিছুতেই সারছে না। রাঁধাবাড়া, অফিসের কাজ করা, ডাক্তার ঔষধ মালিশ করা—সমস্তই দরকার—গোদের ওপর বিষফোড়া চাকর পালিয়েছে। মন কি রকম বোঝা বোধ করি শক্ত নয়। তার ওপর ফণির যমুনায়— থাক সে কথা। একটা গল্পের অর্দ্ধেক লিখে আজ পাঠাব মনে করেছিলাম কিন্তু রেজেষ্ট্রির সময় নেই—সেইটা তোমার ঠিকানায় আগামী মেলে পাঠাব যদি সময় থাকে, আর আমার ওপর ভরসা করতে পার তা হ'লে অর্দ্ধেকটা ছাপিয়ো—১০।১২ দিন পরে শেষটা শেষ ক'রে দেব। খানিকটা পড়লেই বুঝতে পারবে। তবে ছাপাবার তখন সময় থাকবে কি না জানি না। এবারের 'ভারতবর্ষ' পেয়েছি। প্রবন্ধগুলি সবই প্রায় ভাল। হরিদাস বাবুকে চিঠি লিখতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।—শরৎ

২৬

54, 36th Street, Rangoon.
[ডাকমোহর ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫]

প্রমথ, তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম তাহারা সবাই ভাল আছে। তোমার আবার জ্বর হইতেছে শুনিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। ব্যাপার কি, ম্যালেরিয়া না কি? বোধ হয় তাই। তা' যদি হয় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। খাট দুটা ভাল হয় নাই তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম—নেহাৎ জাবাড়ে-গোছের হইয়াছে—মিস্ত্রীর অসুখ না হইলে আর একটু চলনসই হইলেও পারিত। যা হোক কতক কাজে লাগাইতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মাপ দিতে ভুল করিয়াছিলে তাই আবার বেঞ্চি করিয়া গচ্ছা লাগিল—সেটা নেহাৎ তোমারই দোষ।

খাটের দাম ২৩৲ + ১৲ পেতলের স্ক্রু। আর বাঁধবার দড়ি, কিছু কুলীর খরচ। সেটা contingent expense.

এই ২৪৲ টাকার বাকী ২০৲ টাকা দেবার জন্য তোমার যেন আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। প্রতি পত্রেই সেই কথা। এটা জানিয়া রাখ বিশ টাকা না পাইলেও আমার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিবে না, পাইলেও বিশেষ দুঃখ দূর হইবে না। আমার অভাব উহাতে বাড়েও না কমেও না। দিলে ভাল হয় দাও, না দিলে ভাল হয় দিও না। আমি আর বকাবকি করিতে পারি না। কি একটা তুচ্ছ কথা কত বার উল্লেখ করিবে? তুমি ত আমাকে ঢের জিনিস দিয়াছ আমি ত অম্লান মুখে লইয়াছি—কখনও টাকা দিবার জন্য মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। যেমন করিয়া দিলে তোমার ভাল বোধ হয় তাই দিয়ো। চোরবাগানেই দিও। যাক্।

এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবা মাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য B. I. S. N.কে intimation দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ জাহাজে berth পাওয়া যাইবে। তার পর যেদিন হোক্ টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিয়ো। তাঁর 45-0-0+ভেলুর 4/-=49/-.

তোমার শরীর অসুস্থ তোমাকে কোন উপরোধ করিতেই লজ্জা করিতেছে। কিন্তু আমার একটি বন্ধুর ৪।৫ মার্চ্চ নাগাদ ফিরিবার কথা আছে। খুব সম্ভব তিনি ছেলে মেয়ে পরিবার লইয়া আসিবার পথে চোরবাগানের সন্ধান লইয়া আসিবেন—সে হইলে অনেক আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই বড় কষ্ট পাইতে হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। যে সব জিনিসের আবশ্যক নাই (কারণ আমি ১ বৎসরের মধ্যেই আবার ফিরিয়া যাইব) তাহা তোমার ওখানে থাকিলেই সুবিধা। তবে বইগুলা কোনমতে প্যাক করিয়া নষ্ট না হয় এরূপে আনা চাই। রঙের বাক্স আরও একটা ছোট বইয়ের বাক্স আনিবার আবশ্যক নাই। বড় সিন্দুকটাও দরকার নাই।

কি কি আনা চাই তা' সেই ভাল জানে।

আর একটা কথা। ৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড় সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সুতা—ভাই, নিশ্চয় দিয়ো। ওঁর কাছে টাকা চাহিয়া লইয়ো। আর সেই ঘড়িটা যদি চলে তবে, না হ'লে নয়। অচল ঘড়ি আমার বইয়ের আলমারিতেও একটা আছে। মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে থামে। তাতে আবশ্যক নাই।

যাহোক first available টিকিট রিসার্ভ করিবার চেষ্টা করিবে।

আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে চাই না—তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো না।

হরিদাস ভায়াকে বলিবে আমি একটা গল্প লিখিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। এইবার শেষ করিয়া পাঠাইব। এ মাসে যাবে না বোধ করি, কারণ সময় নেই।

এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না—সব লোকেই দেখ্‌তে চায় উঁকি মারে—এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায় অনেক লিখেছিলাম—ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছু হয়ে উঠছে না—দেখছি।

হরি ভায়ার পিতাঠাকুর মশায় আছেন কেমন? বোধ করি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। আমার প্রায়ই তোমার সেই কথাটা মনে পড়ে, সেই যে বলিয়াছিলে হরিদাসের টাকা চুরি প্রভৃতি দেখিয়া ভয় হয় পাছে বৃদ্ধের কোন বিঘ্ন হয়। বাস্তবিক তাই। সত্যই তাঁর দুঃসময় পড়েছিল। কিন্তু এ বৎসর আর ভয় নেই। হরিদাসের কথা আমি প্রায়ই মনে করি। সত্যই a good man যথার্থ এই, উপাধিটা আজকাল কেন সব কালেই পাওয়া শক্ত। আমার মনের বিশ্বাস He deserves respect & affection—না? তোমার কথাই সত্য। যাক্‌ পরচর্চ্চায় কাজ নাই। Sarkar & Sonsদের সম্বন্ধে তোমাকে পরে লিখব। আগে নিজে একটা জবাব দিই।—শরৎ

ভাল কথা, আজকাল 'ভারতবর্ষ' আগের চেয়ে ঢের ভাল হচ্ছে,

না? আমার মতও এই, আজকাল অনেক বন্ধুবান্ধবেরও মত দেখছি এই। যারা মোটেই সুখ্যাতি করত না বরং নিন্দা করত তারাও এখন বলে—'মন্দ না'—আমাদের দেশের তুলনায় এই এর চেয়ে আর ভাল হয় না। বুঝেছ? এইবার আর 'ভারতবর্ষে'র মার নাই—টিকিয়া গেল।

সমাপ্ত

দূরদৃষ্টি

টেলিস্কোপের চোঙার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ আছে,
দূরের জিনিস আনবে টেনে কাছে?
মিথ্যে কথা। শোনই বাবা, কালকে কি প্রকাণ্ড
হ'ল সে এক ভীষণ বিষম কাণ্ড।
ঠিক দুপুরে নাওয়া-খাওয়ার পরে,
মা বৌমা কাকা সবাই ঘুমিয়ে আছে ঘরে,
বুণ্ডি গেছে ইস্কুলে, আর মেজদি গেছে চ'লে
গড়িয়াহাটায়, ঘুটুবুটুলুর মোজা কিনবে ব'লে।
দিদি আমি দু ভাই মিলে টেলিস্কোপটা নিয়ে
চুপি চুপি ছাতের উপর গিয়ে
তো বসলাম। কিন্তু বসলে হবে কি!
এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই, চার দিকেই দেখি
খালি জঙ্গল আর জঙ্গল আর জঙ্গলেরই ঠেলা,
কিসের ছাতু দূরের জিনিস কাছে এনে ফেলা!

দক্ষিণ দিকে বলেছিলে সুন্দরবন আর মহাসাগর থাকে,
দেখতে গেলাম তাকে—
দেখি খালি বাঁশবাগানের পাশে
শীলাদি-দের হাঁসগুলো সব ডোবার জলে উল্টো হয়ে ভাসে।
পশ্চিমে তো বিলেত থাকে? দেখতে গেলাম তারে;
তাকিয়ে দেখি, ছাতের ঠিক কিনারে

কাদের যেন মস্ত বাড়ি, রাজার বাড়ির মতো।
ঐ তো বিলেত। দিদি কিন্তু বললে, না রে, ও তো
সরকারদের লম্বা বাড়ি। বাবাঠাকুর-তলায়,
দেখছিস তো গাবগাছটা ঝাঁটা বেঁধে গলায়
লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? ওরই ডালের ফাঁকে
এম্‌নি-চোখে তাকিয়ে দেখ্‌ না দেখবি বাড়িটাকে।
টেলিস্কোপের কলে
এসছে শুধু একটুখানি না হয় কাছেই চ'লে।
আমি বললাম, তাই তো, তবে বিলেত গেল কোথায়?
দিদি বললে, বোকা একটা, বিলেত বুঝি হোথায়?
জানিস না কি গোল পৃথিবী—দাঁড়িয়ে তার এক ধারে
অন্য দিকের জায়গা নাকি সবাই দেখতে পারে?
আমি বললাম চ'টে গিয়ে, চাই নে দেখতে তাকে,
ঘোড়ার ডিমের বিলেত ভারি! সেখানে তো থাকে
মোটা মোটা সাহেব খালি! পূবের দিকে ঘুরে
দেখব আমি, বাবা কোথায় আছে দোলুতপুরে।
দোলুতপুর তো অল্পদূরে, সকলে তা জানে
ট্রেনে চ'ড়েই যাওয়া যায় সেখানে।
টেলিস্কোপটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে গেলাম যেই,
অবাক কাণ্ড কোথাও কিচ্ছু নেই—
কোথায় বা তার অশোকগাছ আর কোথায় কলেজ-বাড়ি,
দেখি খালি দাঁড়িয়ে সারি সারি
লক্ষ্মী-নারাণ কলোনিতে রিফিউজীদের ঘর।
ধ্যাতেরিত্তের চ'টে গিয়ে বললাম, দিদি, ধর্‌,
ঘোড়ার ডিমের দূরবীক্ষণ, কাছবীক্ষণ কি এ?
তুই নে বাপু, কাজ নেইক আমার একে দিয়ে।

দিদি কিন্তু এমন হ্যাংলা, জানলে বাবা, যেই—
যেই বলেছি—নিবি এটা, অমনি সে এসেই

দূরবীক্ষণ ঘুরিয়ে নিয়ে লাগিয়ে তাতে চোখ
দেখতে শুরু করল পথের লোক।
একটু দেখে, একটু ঘোরায়, দূরে আবার কাছে
শেষকালেতে ফেলল নিয়ে মোকোদের আমগাছে।
ফেলেই সে এক রাম চীৎকার—ভুতু, দেখবি আয়,
ওদের গাছের আম এসেছে মোদের এ ছাতটায়।
সে কি কাণ্ড, ছুটে তাড়াতাড়ি
দেখি সত্যি শীলাদি-দের বাড়ি
ঝুলছিল আমগাছে,
ঝুলছে সে ঠিক টেলিস্কোপের সামনে মুখের কাছে।
তারপরে চোখ বাইরে এনে দেখতে গেছি যেই,
দিদি কোথায়?   আর তো ছাতে নেই!
আমার যখন চক্ষু-জোড়া টেলিস্কোপের ফুটো
দিদিচন্দ্রের এমন বুদ্ধি, বাড়িয়ে হাতের মুঠো
ধরতে গেছেন আম—
ছাত ফসকে রেলিং ভেঙে নীচেই চিৎপটাং।
সবাই এল ছুটে,
কাকা তাকে কোলে ক'রে রিক্শা ডেকে উঠে
নিয়ে গেল চ'লে
হাসপাতালে, ভাঙা ঠ্যাংটা সারিয়ে দেবে ব'লে।
কালকে গেছে, আজ এখনও ফিরল না তো বাড়ি।
সারল কি না, দেখতে তাড়াতাড়ি
মা বৌমা কাকার সঙ্গে গেছে শ্যামবাজারে,
কাকার হাসপাতালটা সেথায়, বড় পার্কের ধারে।
আমি কিন্তু যাই নি।   গেলে, হাসপাতালের লোকে
'ভাইটি তোমার পড়ল না তো তুমি কেন পড়লে' ব'লে
বকেই যদি ওকে!
আমি একলা বাসায় আছি, ব'সে ব'সে খালি
ডেকে বলছি, হে মা দুর্গা, কালী,

হে হরিবোল, হে গান্ধীজী, তোমরা মিলে সবাই
সারিয়ে দাও দিদিকে মোর—আমরা মাত্র দু ভাই।
প্রার্থনা তো করছি ব'সে সারাটা দিন ধ'রে।
আচ্ছা বাবা, বল তো ঠিক ক'রে
দিদি আবার ফিরে আসবে কবে?
সে না এলে এবার আমার হাতেখড়ি কেমন ক'রে হবে?
সরস্বতীপূজো, সে তো কদিন মাত্র বাকি,
এর মধ্যেই সেরে যাবে নাকি!
হাতেখড়ি দেবার জন্য দাদু আসবেন বরিশালের থেকে,
দিদি আছে হাসপাতালে, কি বলবেন দেখে?
হয়তো চ'টে সকলেরে রাম-বকুনি দিয়ে
'বরিশালেই ফিরে গেলাম' ব'লে আবার বাসে উঠবেন গিয়ে।
বৌমা যতই বলবে, ভুতুর একটুও দোষ নেই,
থামবে না তার রাগ কিচ্ছুতেই।
হয়তো বলবেন, দুষ্টু পাজি ছেলে
তুই নিশ্চয় ফেলে দি'ছিস ঠেলে।
মাও অমনি সেই পাবে এক ছুতো,
দুই থাপ্পড় লাগিয়ে দেবে ভুলেই যাবে একটা মোটে ভুতো।
কিন্তু বাবা ভগবান তো অন্তর্যামী,
তিনিও জানেন, মিথ্যে কথা কই নে কভু আমি—
তুমি যে দিন বুঝিয়ে দিয়ে বারণ ক'রে গেলে,
তারপরে আর মিথ্যে কথা কয় না তোমার ছেলে।
কিন্তু বাবা, কলগুলো সব মিথ্যেবাদী কেন?
সত্যি কথা বলতেই নেই যেন।
দূরবীক্ষণ দূরের জিনিস টেনে আনে কাছে,
এর চেয়ে কি মিথ্যা কথা আছে!
ধাপ্পা দিল দূরের জিনিস কাছে আনল ব'লে।
ধরতে গিয়ে কাছের মানুষ দূরেই গেল চ'লে!

"সমুদ্র"

কল্যাণ-সঙ্ঘ

২৪

পরদিন শহরে বাড়িতে বাড়িতে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। কোনও বাড়িতে ঝি, চাকর, বামুন আসে নি। বাড়ির মেয়েদের মাথায় আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। এঁটো বাসন মাজতে হবে, কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে, এই গ্রীষ্মে আগুনের আঁচে রান্না করতে হবে। হাতের তেলো খসখসে হয়ে যাবে, এত যত্নে কাটা নখগুলি ক্ষ'য়ে যাবে, নখের কোণে ময়লা বসবে, ঘামাচিতে গা ভ'রে যাবে। তা ছাড়া সারাদিন পরিশ্রম। ননীর মত কোমল, কাচের মত ঠুনকো দেহে তা কি সইবে? গৃহিণীরা তর্জন করছেন।

মেথর আসে নি। নর্দমা ভ্যাটভ্যাট করছে। দুর্গন্ধে বাড়িতে টেঁকা যাবে না সারাদিন। গৃহে গৃহে কর্তারা গর্জন করছেন।

ধান-কলে, তেল-কলে, মজুররা কাজে আসে নি। কলের মালিকেরা লোক পাঠিয়েছেন বস্তিতে বস্তিতে। লোক ফিরিয়ে দিয়েছে মজুরেরা। একদিন কল বন্ধ থাকলে কত ক্ষতি হিসেব ক'রে কলের মালিকদের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। গালাগালি দিচ্ছে তাদের, যারা মজুরদের উসকে দিয়ে এই ক্ষতি করাচ্ছে।

বৈশাখ মাস। যাদের খড়ের ঘর তারা এ সময়ে ঘরের চাল মেরামত করায়, নতুন খড় দিয়ে ছাওয়ায়। কারও ঘরের চাল একেবারে খোলা হয়ে গেছে, আগাগোড়া নতুন ক'রে ছাওয়া হবে। কাল ঝড়-বৃষ্টিতে বড় কষ্ট গেছে তাদের। তা ছাড়া কাল ঝড়ে অনেক ঘরের চালের খড় উড়ে গেছে। অবিলম্বে ছাওয়া দরকার। সব ছুটেছে ঘরামী-পাড়াতে। 'বাবা বাছা' ব'লে তাদের মন নরম করবার চেষ্টা করছে, অনুনয় বিনয় করছে; নেহাত ভদ্রলোক ব'লে হাতে পায়ে ধরতে পারছে না। কিন্তু সব মাথা নাড়ছে ব'সে ব'সে। ভদ্রলোকদের দুরবস্থা দেখে মনে মনে হাসছে আর বিড়ি টানছে। যারা চাষী-বাসী লোক তারা মজুরদের বাড়িতে ধন্না দিচ্ছে। কাল একটা বড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ একবার জমিতে চাষ দেওয়া দরকার। বলছে তাদের অনেক ক'রে। কিন্তু কেউ রাজী হচ্ছে না; বলছে, আজ

হবেক নাই আজ্ঞে, কাল যাব। অনেকে লম্ফ-ঝম্প করছে, শাসাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ ফল হচ্ছে না।

রিক্‌শাওয়ালারা গাড়ি নিয়ে বেরোয় নি। রিক্‌শা ক'রে যাঁরা আপিসে যান, পদব্রজেই যেতে হবে তাঁদের। যাদের স্টেশনে যেতে হবে, তারা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে—তিন মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে হবে এই কড়া রোদে।

সমরেশদের বাড়িতে কোন গোলমাল নেই। নফরের মা বুড়ো মানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই। বাড়ি থেকে বেরোয় না বেশি। তা ছাড়া কানে শুনতে পায় না। কাজেই কম্যুনিস্টদের বাণী তার কানে বা প্রাণে পৌঁছতে পারে নি। সে নিজের কাজ করছে সকাল থেকে।

তিনুদের বাড়িতে হাঁদা কিন্তু সকাল থেকে গা-ঢাকা দিয়েছে।

তিনু বাসন মেজেছে, ঘর ঝাঁট দিয়েছে, নর্দমা পায়খানা ধুয়েছে নিজের হাতে। লতু সাহায্য করতে গিয়েছিল, ধমকে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। সমরেশ যখন ওদের বাড়িতে গেল, তিনু তখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে জল তুলছিল।

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বললে, ও কি হচ্ছে? হাঁদা কোথায়?

রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে তিনুর। কপাল থেকে ঘাম ঝরছে; ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, আমি কি ক'রে জানব? জিজ্ঞাসা করগে তোমাদের দলপতিকে?

সমরেশ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। লতু বললে, চাকরিরা ধর্মঘট করেছে আজ, জানেন না?

সমরেশের মনে পড়ল সব। বললে, আমাদের নফরের মা তো কাজ করছে।

তিনু ব্যঙ্গের স্বরে বললে, তবে আর কি! সবাইয়ের দুঃখ ঘুচে গেছে তা হ'লে।

সমরেশ এগিয়ে গিয়ে বললে, তুমি সর, আমি জল তুলে দিচ্ছি।

তিনু রাগের সুরে বললে, থাক্ থাক্, আর দরদ দেখাতে হবে না।

আরে! আমি কি জানি? আমি কি ওদের দলের যে, আমার ওপরে রাগ করছ?

দলে তো আনাগোনা কর।

আনাগোনা করি তো প্রতুলের কাছে। পুরনো বন্ধু ব'লে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, যতদূর জানি, প্রতুল এটার মধ্যে নেই।

নেই নয়, খুব আছে। পালের গোদা ও। স্বামীজীর আজ বক্তৃতা হবে কিনা, সেইটিকে পণ্ড করবার চেষ্টা করছে।

সমরেশ অনুনয় ক'রে বললে, তুমি নামো না, আমি তুলে দিচ্ছি।

লতু হাসতে হাসতে বললে, তাই নামো না মাসীমা, মেসোমশায় তুলে দিন।—ব'লেই জিব কেটে ব'লে উঠল, কি ব'লে ফেললুম! সমরেশ ও তিলু দুজনেই তার দিকে তাকাল। সমরেশ হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে রইল। তিলু তর্জন ক'রে উঠল, লতু! ভারি ফাজিল হয়ে যাচ্ছ তুমি, বিয়ে হবে ব'লে নিজের মাসীকে ঠাট্টা করতে হবে, তার কোন মানে নেই। বালতিটা দুম ক'রে নামিয়ে দিয়ে নেমে এল কুয়োর পাড় থেকে; আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললে, তাই তোল দেখি, কত জল তুলতে পার। এ স্বদেশ-সেবা নয় যে, মুখের জোরেই হবে, এতে হাতের জোর চাই।

দুইই আছে।—ব'লে সমরেশ জল তুলতে লাগল।

মহেশবাবু আর্তনাদ করছেন সকাল থেকে। হাঁটুতে তেল মালিশ হয় নি। আর চা খেয়েছেন মাত্র দু কাপ। হাঁকছেন, লতু, দে না দিদি, আর এক কাপ চা ক'রে। আর তেলটা একটু গরম ক'রে দে। নিজেই মালিশ করব।

তিলু লতুকে বললে, যাও না। দাদুর জন্যে এক কাপ চা ক'রে দাও। তারপর পার তো তেল মালিশ ক'রে দিও। আমি নেয়ে নিই। আমাকে তো এর পর রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

সমরেশ বললে, কেন বামুন-ঠাকুর?

তিলু বললে, সেও তো আসে নি আজ।

সমরেশ বললে, ধর্মঘট পুরোপুরি তোমাদের ঘাড়েই চড়েছে তা হ'লে।

তিলু বললে, ঠাট্টা করবার ভাবনা কি! ব'লে স্নানের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

চুরুট টানতে টানতে এলেন গুণেনবাবু। বললেন, কি করছিস রে?

সমরেশ বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

গুণেনবাবু মুচকি হেসে বললেন, তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাকে যে বিশ-বাঁও জলে নামিয়ে দিচ্ছিস।

কেন?

এমন ক'রে কাজ দেখালে, আমাকে কি আর পছন্দ করবে তিলু?

তিলুর কাছে তো চাকরির উমেদারি করছেন না।

এক রকম চাকরি বইকি। যা দিনকাল পড়েছে, এ রকম তো হামেশাই হবে। সকাল থেকে ব'সে ব'সে শুধু চা খেয়েছি আর চুরুট টেনেছি। একটা বাসনও যদি মেজে দিতে পারতাম। ভুল হয়ে গেছে দেখছি। উচ্চকণ্ঠে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে সবাইকে, হ্যাঁ রে, পারবি? না, দেব কয়েক বালতি তুলে?

সমরেশ বললে, আমি থাকতে আপনি জল তুলবেন? তা ছাড়া ও বয়সে এসব চলবে না আপনার।

কথাটা বদলে দিয়ে গুণেনবাবু বললেন, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়ির ঝি এসেছে তো?

সমরেশ ঘাড় নেড়ে হাঁ জানাতেই বললেন, তা তো আসবেই। তোরা দলের লোক কিনা, তোদের অসুবিধে কি ক'রে করবে?

সমরেশ প্রতুলের বাড়িতে এল কিছুক্ষণ পরে। জিজ্ঞাসা করলে, মা কেমন? প্রতুল শুকমুখে ঘাড় নেড়ে বললে, ভাল নয়। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। ব'লে গেলেন সাবধান হতে। ঝি-চাকর ধর্মঘট করেছে আজ। আমাদের দুখীও আসে নি। শৈলীকে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে। জল-তোলা, বাসন-মাজা আমিই করছিলাম এতক্ষণ।

সমরেশ বললে, আমিও।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়িতেও আসে নি বুঝি?

সমরেশ চুপ ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে এল পদ্মা ও রাধা। প্রতুল পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করলে, আজ বিকেলে কি কি হবে?

পদ্মা বললে, সকলে পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে পাঁচটা রাস্তা দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে দোতলায় যাবে; সভার পাশে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে আসবে।

মেয়েরাও যাবে নাকি?

না। রোসেনারা মত দেন নি।

সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছিলেন না। কলকাতা গিয়েছিলেন। এস. ডি. ও. সাহেব আর পুলিস সাহেব দুজনেই তো মুসলমান। কাশেম সাহেব গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসেছেন।

প্রতুল চুপ ক'রে রইল।

পদ্মা বললে, মা কেমন আছেন?

প্রতুল বললে, দেখগে ভিতরে গিয়ে। শৈলীকে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে হয়েছে, আজ।

পদ্মা উদ্বেগের স্বরে বললে, তাই নাকি! আমি রান্না ক'রে দিগে। মা তো আর খাবেন না?

প্রতুল রাধাকে বললে, রাধার কি খবর? মাধব রোজ দুবেলা আসছে। তুমি তো খবরই নাও না, দাদার কি হচ্ছে!

লজ্জিত মুখে মাথা নীচু ক'রে রইল রাধা।

পদ্মা বললে, ও যে ঘর গুছোচ্ছে। তাই সময় পায় নি। তা ছাড়া শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ওর।—ব'লে পদ্মা চোখের ভাষায় কি বলতে চাইল।

প্রতুল বুঝল বোধ হয়; বললে, তাই নাকি! কিন্তু রাধা, নতুন ঘরে এলে, আমাদের খাওয়ালে না?

রাধা মাথা নীচু ক'রে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল।

পদ্মা বললে, তাই বলতে এসেছে ও। আজ সন্ধ্যেবেলায় ওর বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে বলছে আপনাদের।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল ক'রে প্রতুল বললে, তাই নাকি রাধা! কাকে কাকে নেমন্তন্ন করছ?

পদ্মা বললে, বেশি কাউকে বলবে না। আপনাকে, শৈলীদিকে আর শুক্তিদিকে।

আর সব রাগ করবে না?

রাগ করবেন কেন? আপনারা ওর আপনার জনের চেয়েও বেশি। আপনাদের সঙ্গে কার তুলনা?

রাধা পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে চোখে চোখে কি জানাল। পদ্মা সমরেশকে বললে, দাদা, আপনি যেতে পারবেন? আমাদের হাতে কি খাওয়া চলবে আপনার?

প্রতুল বললে, এই দেখ পদ্মা! তোমাদের এখনও সঙ্কোচ গেল না। খেতে যখন কাউকে বলবে, জোর ক'রে বলবে। আত্মীয়, যেমন আত্মীয়কে বলে। অত অনুনয়-বিনয়ের দরকার কি? তোমরা যে কারও চেয়ে ছোট নও—এ ধারণা মনের মধ্যে শক্ত ও সহজ ক'রে নেওয়া চাই।

সমরেশ বললে, হ্যাঁ, যাব বইকি! জাতে বামুন আমরা। নেমন্তন্ন কি সহজে ছাড়ি কোথাও! নিশ্চয় যাব আমি। বল তো এখন থেকে গিয়ে ব'সে থাকতে পারি।

রাধা ও পদ্মা দুজনেই হাসল। তারপর চ'লে গেল বাড়ির ভিতরে।

প্রতুল বলতে লাগল, খুব ছোটবেলায় রাধার বাপ-মা মারা যায়; খুব ছোটতেই বিয়ে হয়েছিল মাধবের সঙ্গে। মাধবকে তুমি দেখেছ ঐ যে ছেলেটি—ডাক্তার বাবুর ড্রাইভার! মাধবেরও বাবা ছিল না। মা আর দুটি বোন ছিল। রাধা থাকত শাশুড়ী-ননদের কাছেই। মাধব কোন একটা বাস সার্ভিসে কাজ করত। অত্যন্ত মাতাল হয়ে উঠেছিল। সংসারে কিছু দিত না। রাধার শাশুড়ী বউ-মেয়েদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে পেট চালাত। রাধাকে দিয়েছিল এক

মুসলমান ব্যবসাদারের গচ্ছিত ক'রে। লোকটা দুর্দান্ত মাতাল। রাধাকে টাকা-কড়ি কাপড়-জামা দিত। কিন্তু মাতাল হ'লে মারধোর করত। রাধা ভয়ে শুকিয়ে যেত তাকে দেখলে, কিন্তু কোথাও পালিয়ে যাবার জায়গা ছিল না ওর। শাশুড়ীটা ছিল মুসলমানটার তাঁবেদারের লোক। কড়া নজর রাখত বউয়ের ওপরে। লোকটারও ছিল কড়া শাসন। একটু বেচাল দেখলেই ওকে এমনই মারত যে, দু-তিন দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হ'ত। পদ্মা ওর খবর দেয় শুক্তিকে। শুক্তি ওকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসে। লোকটা খবর পেয়ে মাতামাতি শুরু করল, মারধোর করবে ব'লে শাসাতে লাগল, শাশুড়ীটাকে দিয়ে মামলা করাবার ফন্দী আঁটতে লাগল। সেই সময়ে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিল সুধীন রায়। তাকে চেন নিশ্চয়ই। আমাদের সঙ্গে পড়ত। সুধীনকে গিয়ে সব বলতেই, ও পুলিস সাহেবকে দিয়ে লোকটাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে। তার পর থেকে শুক্তির কাছেই থাকত রাধা। শুক্তি ওকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করত; ভাল উপদেশ দিত; দেহ ও মন যে মানুষের 'পরে ভগবানের অমূল্য দান, এ দুটোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যে পাপ, বোঝাত ওকে। বোঝালেই যে সবাই বোঝে তা নয়; তবে রাধা অনেক কষ্ট পেয়েছিল ব'লে বুঝেছিল। কিছু দিন পরে মাধব পড়ল গুরুতর অসুখে। মা-বোন সেবা করতে চাইল না। শুক্তি তাকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। অনেক সেবা-চিকিৎসায় সারিয়ে তুলল ওকে। তারপর ডাক্তারবাবুর গিন্নীকে ব'লে ওর চাকরি ক'রে দিল। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে বাইরের ঘর আছে কয়েকটা। সেখানে মাধবের থাকবারও ব্যবস্থা ক'রে দিলে। রাধাকেও পাঠিয়ে দিলে মাধবের কাছে। ডাক্তারবাবু আর ওঁর গিন্নী—দুজনেই ওদের ভালবাসেন, সাহায্য করেন। সেটাও শুক্তির জন্যেই। ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই এতদিন ছিল ওরা। মাধব যা টাকা জমাত শুক্তির কাছে রাখত। টাকাটা একটু বেশি হয়ে উঠতেই শুক্তি ওকে একটা ঘর করতে পরামর্শ দেয়। রাধার পৈতৃক প'ড়ো ভিটেতে একটা ঘর করেছে ওরা। ডাক্তারবাবুরা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে

নতুন ঘরে উঠে এসেছে মাস দুই আগে। বেশ সুখে আছে দুজনে। পরিচ্ছন্ন পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করছে।

২৫

প্রতুল সন্ধ্যার পর সমরেশকে নিয়ে রাধার বাড়িতে গেল। শৈলী এল না। আসবে না জানিয়ে দিয়েছিল সকালেই। বাউরী-পাড়ার এক প্রান্তে রাধাদের বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা বড় বকুল-গাছ। অজস্র ফুল ফুটেছে। ঝরা ফুলে ছেয়ে গেছে নীচেটা। বাতাসে একটা মৃদু গন্ধ। রাধাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ চ'লে গেছে অদূরবর্তী মুসলমান-পাড়াটার দিকে।

রাধাদের ঘরটি ছোট। এক কুঠরি। খড়ের চাল। সামনে এক ফালি বারান্দা। এক পাশে একটি নেহাত ছোট রান্নাঘর। সামনে সংকীর্ণ উঠন। চার পাশে বাঁশের উঁচু বেড়া।

রাধা ও পদ্মা উঠনে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের প্রতীক্ষায়। সমরেশ ও প্রতুলকে দেখে ওদের মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। বোধ হয় আশা করতে পারে নি ভাল ক'রে, ওরা আসবে ব'লে। ওদের বাড়িতে ভদ্রলোকের ছেলেদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসা, ওদের জীবনে অসম্ভব ব্যাপার। উঠনে একটা মাদুর পাতা ছিল। সসম্মানে বসতে অনুরোধ করল মাণ্ড অতিথিদের।

প্রতুল বললে, আগে তোমাদের ঘর দেখি। ঘরের ভিতরে ঢুকল প্রতুল ও সমরেশ। ঘরের এক পাশটা হাঁড়ি-কুঁড়ি, সংসারের যাবতীয় জিনিসে ঠাসাই করা। আর এক পাশে একটা চৌকি, তাতে ওদের সামান্ত শয্যা। সামান্ত হ'লেও পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে একটি ছোট আয়না টাঙানো, চিরুনিটা আটকানো রয়েছে পিছনে। নীচেই একটি ছোট নতুন ট্রাঙ্ক। নানা রঙের শাড়ির পাড় জুড়ে তৈরি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। একটি ছবিওলা বাংলা ক্যালেণ্ডারও টাঙানো রয়েছে এক পাশে। ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকেই বোধ হয় সংগ্রহ ক'রে এনেছে মাধব। দেওয়ালে আঁটা কাঠের তৈরি আলনা থেকে ঝুলছে মাধবের একটা ধুতি, একটা শার্ট, রাধার শাড়ি-শেমিজ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রতুল বললে, বেশ হয়েছে। জানলা দু-একটি বেশি রাখলে ভাল হ'ত। একটু অন্ধকার হয়েছে। পরে ফুটিয়ে নিলেও হবে। আর হাঁড়ি-কুড়িগুলো রান্নাঘরে রাখলে ভাল হয়। ভারি আনন্দ হ'ল। সুখে থাক তোমরা।

রাধা হঠাৎ ঢিপ ক'রে প্রণাম করল প্রতুলের পায়ের কাছে; তারপর সমরেশেরও। প্রতুল ব'লে উঠল, ও কি হ'ল আবার!

পদ্মা হেসে বললে, আশীর্বাদ করলেন কিনা।

প্রতুল হেসে বললে, আশীর্বাদের পরে প্রণাম! লাভটা হাতিয়ে নিয়ে টাকা লগ্নি করা! হাসল সবাই।

রাধার দু চোখে আনন্দ ও অশ্রু টলটল করছে। অনেক ক্লেশ ও ক্লেদের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে পৌঁছেছে এই পরিচ্ছন্ন জীবনে। নিজের একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর, সচ্চরিত্র স্বামী, শুদ্ধ-সংযত জীবন-যাত্রা করা বাউরীর মেয়ের ভাগ্যে কবে জুটেছে? ভদ্রলোকদের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কতদিন ঈর্ষার কাঁটা ফুটেছে ওর মনে। তাদের সাজসজ্জা, আদব-কায়দা দেখে নয়। সে তো পয়সা থাকলেই করা যায়, করেও অনেক বাউরীর মেয়ে। রঙ-বেরঙের শাড়ি-ব্লাউজ পরে, ঢঙ-বেঢঙের কায়দা দেখিয়ে অনেক ভদ্রলোককেও হকচকিয়ে দেয় তারা। লোভ হ'ত, ঈর্ষা হ'ত তাদের স্বামী সংসার সুন্দর ছেলেমেয়েদের দেখে। কত ভাগ্যে শুক্তির আশ্রয় পেয়েছিল! বেঁচে গেছে সে। স্বর্গ-সুখ কেমন কে জানে, কিন্তু পৃথিবীতে মেয়েমানুষের এই তো স্বর্গ-সুখ।

মাদুরের ওপর বসলে প্রতুল ও সমরেশ। প্রতুল বললে, আর কেউ এলেন না তো? পদ্মা চিন্তিত মুখে বললে, শুক্তিদি আসবেন বলেছিলেন, দেখি এগিয়ে গিয়ে, ব'লে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই বাইরে থেকে হেঁকে বললে, আসছেন শুক্তিদি! রাধা ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এল শুক্তি। রাধা ও পদ্মা পিছনে পিছনে এল। শুক্তি বললে, বেশ ঘরটি হয়েছে। ওটি বুঝি রান্নাঘর? রান্না চড়াও নি? চল, দেখিগে কি রান্না হচ্ছে!

রান্নাঘরের দিকে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পরে শুক্তি ফিরে এল। প্রতুল বললে, মেয়েদের দৃষ্টি সব সময়ে আসল জিনিসটির দিকে। আমরা এলাম, শোবার ঘর দেখলাম, আসবাব-পত্র বাক্স-বিছানা দেখলাম, তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে পড়লাম। শুক্তি এসেই গেল রান্নাঘরে। কি খাবার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে এল, হয়তো চেখেও এল।

শুক্তি মৃদু হাসল।

সমরেশ বললে, ব্রাহ্মণের ক্ষিধের বহর তো জানেন? দু-দুটি ব্রাহ্মণ উপস্থিত। আনাড়ী ছেলেমানুষেরা যথেষ্ট রসদ সংগ্রহ করেছে কি না তাই দেখে এলেন উনি।

পদ্মা একটি আসন পেড়ে দিতেই শুক্তি বসল। প্রতুল বললে, নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘ তা হ'লে নারী-সমিতির সঙ্গে মিশে গেল! তোমাকে বাদ দিয়েছে নিশ্চয়!

শুক্তি বললে, আমাকে একা নয়, পদ্মাকেও।

প্রতুল বললে, পদ্মা তা হ'লে ওর নৈশ-স্কুলে যাচ্ছে না?

শুক্তি বললে, নিষেধ-পত্র এসে গেছে ওর কাছে। আমি পদ্মাকে বলেছি, ক্ষমা চাইবার জন্যে। কি দরকার ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে? ওকে যখন এখানেই থাকতে হবে।

প্রতুল বললে, আর তোমাকে?

ম্লান হেসে শুক্তি বললে, আমি না থাকতেও পারি।

প্রতুল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তোমাদের সঙ্ঘের মেয়েরা এতটা রাগ করল কেন বুঝলাম না। এমন কি অপরাধ হয়েছে?

হাসল শুক্তি; বললে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গিন্নী নাকি অপমানিত বোধ করেছেন। তাতেই ওদের রাগ।

বাড়ির সামনে দিয়ে মদের ভাটি থেকে এ পাড়ার পুরুষরা ফিরছে। কারও মুখে বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতা, কারও মুখে হতাশ প্রেমিকের গান; কেউ একেবারে গুরু-গম্ভীর। সবাই চলেছে টলতে টলতে। পাড়ার যুবতী মেয়েরা সাজগোজ ক'রে বেরিয়েছে। দু-চার জন এদের ব'সে থাকতে দেখে বাড়ির সামনে জড়ো হ'ল; কিছুক্ষণ হাসাহাসি করল নিজেদের মধ্যে; তারপর চ'লে গেল নিজের নিজের শিকারের সন্ধানে।

পদ্মা একটা লণ্ঠন এনে সামনে রাখল। তারপর রাধা আর পদ্মা নিয়ে এল খাবারের থালা, নামিয়ে দিল এক-একটি এক-এক জনের সামনে। প্রত্যেকটি থালায় নানা রকমের খাবার—সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি, তিন-চার রকমের মিষ্টি। ভাল দোকানের তৈরি। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল এনে দিলে।

প্রতুল বললে, আরে, করেছ কি! এত কি খাওয়া যায়? ব্রহ্ম-হত্যার পাতকে পড়তে চাও নাকি তোমরা?

রাধা সলজ্জ মুখে বললে, বিশেষ কিছুই না তো।

প্রতুল বললে, এই তোমার কিছু না? তা হ'লে যে দিন কিছু খাওয়াবে, তার আগে সাবধান ক'রে দিও। মহাপ্রস্থানের ব্যবস্থা ক'রে বাড়ি থেকে বেরুব। সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে, তুমি যে বেপরোয়া চালিয়ে দিচ্ছ?

সমরেশ বললে, চালিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। বক্তৃতা করবার জন্যে নয়।

শুক্তির দিকে তাকিয়ে প্রতুল বললে, তুমিও আরম্ভ ক'রে দিলে?

শুক্তি মৃদুস্বরে বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

প্রতুল পদ্মা ও রাধার দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে বললে, তা হ'লে আমিও আরম্ভ করি। যা হবার একসঙ্গেই হোক।

রাধা ও পদ্মা হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রতুল বললে, তোমাদের জন্যে, মাধবের জন্যে রেখেছ তো? না সব ধ'রে দিয়েছ আমাদের?

সমরেশ বললে, খবরটা একটু দেরিতে নেওয়া হ'ল না?

প্রতুল বললে, তা হোক। তবু তো নিলাম। তোমরা তো নির্বিকার। শুক্তির অন্তত নেওয়া উচিত ছিল।

পদ্মা বললে, শুক্তিদিই তো সাজিয়ে দিয়ে এলেন খাবার। সবার জন্যেই।

প্রতুল বিস্ময়ের স্বরে বললে, তাই নাকি! ঘাড় নেড়ে বললে, তাই ঐ থালাটার সব জিনিস বেশি বেশি মনে হ'ল।

শুক্তি হেসে প্রতিবাদ করলে, হ্যাঁ রাধা, তাই?

রাধা বললে, উনি সবচেয়ে কম নিয়েছেন।

গভীর সন্দেহসূচক ঘাড় নেড়ে প্রতুল বললে, উঁ-হু, তা তো মনে হ'ল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের যেমন বুদ্ধি! আগে এলাম, অথচ খাবার সাজিয়ে দেওয়ার খেয়াল হ'ল না।

সমরেশ বললে, এই খাবার বেশি হয়েছে ব'লে লম্ফ-ঝম্প করেছিলে আর এখন কম খাবার ব'লে হা-হুতাশ করছ?

রাধা রান্নাঘরে গিয়ে আর একথালা খাবার নিয়ে এসে বললে, আর দেব দাদা? এই দেখুন, এখনও কত খাবার রয়েছে। ব'লে প্রতুলের থালায় খাবার দেবার উপক্রম করতেই প্রতুল ব'লে উঠল, আরে না না। রাধা গোটা কয়েক সিঙাড়া ও মিষ্টি থালায় দিতেই বললে, দিয়ে ফেললে? বেশ। ব'লে খেতে শুরু ক'রে দিল।

রাধা সমরেশকে বললে, আপনাকে দেব কি দাদা?

সমরেশ বললে, না না, থাক।

প্রতুল মাথা নাড়তে নাড়তে ভরাট মুখে বললে, দাও, দাও। ভারি লাজুক ও। শুনো না ওর কথা।

রাধা খাবার নামিয়ে দিলে সমরেশের থালায়। তার মুখে চোখে আনন্দ ধরছিল না, বিস্ময়ও। নিজে হাতে কোনদিন এদের খাওয়াতে পারবে, এ আশা কি কোনদিন করেছিল? বাউরীর ঘরে বামুনের ছেলেরা কোনদিন খেতে পারে—এ কোনদিন চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি।

মাধব এসে হাজির হ'ল। ছুটতে ছুটতে এসেছে। হাঁপাচ্ছিল। দম নিয়ে বললে, ভারি মারামারি হ'ল। সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলে, কোথায়?

মাধব বললে, মীটিঙে। হিন্দু সভার লোকেরা খুব মেরেছে কম্যুনিস্টদের।

প্রতুল বললে, তাই নাকি! কজনকে মেরেছে? কি রকম মেরেছে?

মাধব বললে, তা আমি বলতে পারব না। আমি তো গিন্নীমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িতে থাকতে হয়েছিল আমাকে। গোল-

মালটা হ'ল সভার পেছন দিকে। সভা চলছিল। এমন সময়ে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই' ব'লে কম্যুনিস্টরা হাঁকতে শুরু করল। হিন্দু মহাসভার লোকেরা তাদের প্রথমটা থামাবার চেষ্টা করল। সেই সময় নাকি ঢিলও পড়ল কতকগুলো সভার মধ্যে। অমনই শুরু হয়ে গেল মারামারি।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করলে, পুলিস ছিল না?

মাধব বললে, পুলিস ছিল। তারাই কম্যুনিস্টদের ঘেরাও ক'রে সরিয়ে দিলে।

প্রতুল বললে, কেউ জখম হয়েছে নাকি?

মাধব বললে, তা ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনলাম, দু-চার জনের ওপর মার একটু বেশি হয়েছে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, সভার কি হ'ল?

মাধব বললে, গোলমাল হয়েছিল প্রথমে। গোলমাল থামলে সভা চলল, এই একটু আগে শেষ হ'ল। আমি গিন্নীমাকে পৌঁছে দিয়েই ছুটে আসছি।

প্রতুল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে বললে, তা হ'লে আমি একবার খবর নিই। আপিসে সবাই জড়ো হয়েছে নিশ্চয়।

শুক্তি গম্ভীর মুখে বললে, আপনাকে তো ডাকে নি ওরা?

প্রতুল ম্লান হেসে বললে, ডাকার অপেক্ষা করলে কি আমার চলে? উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভাই সমর, আমি তা হ'লে যাই। তোমার আর গিয়ে কাজ নেই ওখানে। পদ্মা ও রাধাকে বললে, আমি চলি তা হ'লে, কেমন? ইচ্ছে ছিল, একটু ব'সে গল্প করব। আমাদের খাওয়া যেমন দেখলে, তোমাদেরও খাওয়া দেখব। তা হ'ল না। আর একদিন হবে, কেমন?

শুক্তি বললে, আর একদিনের নেমন্তন্ন বাগিয়ে রাখছেন নাকি?

প্রতুল বললে, না না, তা নয়। হ'লেও রাধা-মাধব পিছপা আছে ভাবছ নাকি? মাধবের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে, বল না? সকলে হাসতে লাগল। তারপর প্রতুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২৬

বাড়ি ফিরবার পথে তিলুদের বাড়িতে ঢুকল সমরেশ। তিলু তাকে তাদের সঙ্গে সভায় যেতে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিল। সে যেতে পারবে না জানিয়েছিল। কিন্তু কেন পারবে না, তার কারণটি জানাতে সাহস করে নি। তার জন্যে ধমক তার পাওনা। সেটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

বাড়ির মধ্যে উচ্চকণ্ঠে আলোচনা চলছে। খুব সম্ভব সভা সম্বন্ধে। গুণেনবাবুর গলাটা সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে। বাইরের বারান্দায় মহেশবাবু ব'সে আছেন ঈজি-চেয়ারে। হাঁদা তাঁর হাঁটুতে বাতাস্তক তৈল মালিশ করছে। (দুপুরে খাবার সময়ে হাঁদা ধর্মঘট শেষ ক'রে বাড়ি ফিরেছে।) মহেশবাবুর মুখে যন্ত্রণাসূচক ভাব। সমরেশকে দেখে বললেন, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে যাস নি বুঝি? ভাল কথা শুনতে মতি হবে কেন? তা হ'লে যে মানুষ হয়ে যেতিস! কোথায় আড্ডা মারছিলি, অ্যাঁ?

জবাব না দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল সমরেশ। জোর মজলিস চলেছে ভিতরের বারান্দায়। সমরেশের মাও আছেন তার মধ্যে, এক পাশে ব'সে আছেন। লতু ও তিলু আছে দাঁড়িয়ে। গুণেনবাবু বসেছেন আসন-পিঁড়ি হয়ে।

সমরেশকে দেখে গুণেনবাবু ব'লে উঠলেন, তুই গেলি নে? একটা ভাল জিনিস মিস করলি। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে সবার। তিলু মুচকি হেসে বললে, ও বালাই থাকলে খুলবে তো! লতু ব'লে উঠল, হ্যাঁ ভোঁদুমামা, তোমাদের দলের লোক-গুলো অমন কেন? এমন গোলমাল করতে লাগল! শেষে ঢিল-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করল!

তিলু বললে, যেমন কুকুর তেমনই মুগুরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর কেউ ঘেউ ঘেউ করতে সাহস করবে না।

গুণেনবাবু বললেন, তুই ওদের সঙ্গে ছিলি না কি রে?

তিলু ধারাল স্বরে বললে, থাকবে না? যেখানে গোলযোগ সেখানে না থাকলে চলে? ঢাক বাজলেই গাজনের ভক্তের পিঠ

চড়চড় ক'রে ওঠে যে! জেল থেকে বেরিয়েছে। লাপসি খাওয়ার জন্যে প্রাণটা হু-হু করছে। আর একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো?

মা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, সে কি কথা মা! ও ঐ গুণ্ডোর দলে ছিল?

তিলু বললে, ছিল বইকি কাকীমা। না হ'লে আমাদের সঙ্গে গেল না কেন? আর যদি ওখানে নাই ছিল, তো কোথায় ছিল শুধোন ওকে।

মা সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোথায় ছিলি?

গুণেনবাবু হেসে বললেন, একেবারে মৌনী বাবা হয়ে গেলি যে রে? আজ সাইলেন্স ডে নাকি?

সমরেশ বললে, প্রতুলের কাছে ছিলাম।

তিলু ঘাড় নেড়ে বললে, তা হ'লেই হ'ল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, প্রতুল হ'ল গুণ্ডার দলের সর্দার। সে নিশ্চয় ওখানে ছিল, আর ও তার কাছে ছিল। তা হ'লে ও কোথায় ছিল বুঝুন। মুচকি হেসে বললে, বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই ব'লে জানতাম, কিন্তু দেখছি বুদ্ধি বেশ খুলতে শুরু করেছে ওদের সঙ্গে মিশে।

মা সক্ষোভে বললেন, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, জান মা? ওর পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দি। আর পারছি না মা ওকে নিয়ে। বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

গুণেনবাবু মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বলতে লাগলেন, সত্যি ভোঁদু। কি অন্যায় তোর বল্ দেখি? কাকীমার বয়স হয়েছে। কোথায় কাজকর্ম ক'রে দু পয়সা আনবার চেষ্টা করবি, কাকীমা যাতে সুখী হন তার জন্যে চেষ্টা করবি, না, যার-তার সঙ্গে মিশে যা-তা ক'রে বেড়াচ্ছিস! ওদের জানিস না? যত সব বদমাস ছোটলোক নিয়ে ওদের কারবার। ছোটলোকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকদের জব্দ করাই ওদের কাজ। কুলী-মজুরদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে কলওয়ালাদের কলে ধর্মঘট করায়, আবার কলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ধর্মঘট মিটিয়ে দেয়। এই ওদের ব্যাবসা।

ব্যাবসাটা মন্দ নয়। দু পয়সা আসে। কিন্তু তা ভাগ ক'রে নেয় বড় বড় চাঁইরা। তুই যে দু দিন ঢুকে তাতে ভাগ বসাতে পারবি, তার আশা করিস নে। আর পারলেও নিরাপদ নয়। কুলী-মজুররা টের পেলে সহজে ছেড়ে দেবে না।

তিনু বললে, ঝি চাকর, বামুন বন্ধ ক'রে, রিকশওয়ালাদের হরতাল করিয়ে, কত রকমে সভাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। তাতেও যখন পারল না তখন সভায় গিয়ে গোলমাল শুরু করল; তাতেও না পেরে ঢিল-পাটকেল মারতে লাগল। স্বামীজী ঠিক বলেছেন, এরা বিভীষণ। এদের মত শত্রু আর নেই। মুসলমানরা ছুরি মারছে আমাদের বুকে, এরা ছুরি মারছে আমাদের সমাজ ধর্ম ও সংসারের বুকে।

গুণেনবাবু বললেন, তবে ব্যাবসায় লাল-বাতি জ্বালতে হবে এবার। অন্তত এ শহরে। স্বামীজী কালীপূজো করবেন। যজ্ঞ হবে। শহরের যত ছোটলোক আছে, সকলের নেমন্তন্ন হবে। ছোটলোক ভদ্রলোক সবাই পূজোতে যোগ দেবে, পুষ্পাঞ্জলি দেবে. তারপর এক পংক্তিতে ব'সে প্রসাদ খাবে। স্বামীজী বলেছেন, ছোটলোকদের প্রত্যেককে একটা ক'রে পৈতে পরিয়ে দেবেন, আর খাওয়ার সময় ছোটলোকদের দিয়ে পরিবেশন করাবেন। এইটি হ'লেই ছোটলোক ক্ষেপিয়ে পয়সা রোজগার করা বন্ধ হয়ে যাবে।

মা ইতিমধ্যে সামলে উঠেছেন। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ বাবা, অনেক টাকা খরচ হবে তো! স্বামীজী কোথায় পাবেন?

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে গুণেনবাবু বললেন, স্বামীজীর আবার টাকার ভাবনা! রায় বাহাদুর আছেন; বড় বড় মাড়োয়ারী ব্যাবসাদাররা আছে, যুদ্ধের বাজারে যেমন ওরা দু হাতে টাকা লুঠেছে, তেমনই ভাল কাজে টাকা ঢেলে দেয়।

সমরেশ বললে, মা, তুমি কি বাড়ি যাবে? আমি যাচ্ছি।

মা বললেন, একটু দাঁড়া না। জামাই দুটো ভাল কথা বলছেন, কান পেতে শোন্ না।

নতু জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ভোঁদুমামা! এ রকম গোলমাল হবে, আপনি আগে জানতেন?

জবাব দিলে তিলু, নিশ্চয়। রাতদিন ওদের ওখানে প'ড়ে আছে—

লতু অনুযোগের সুরে বললে, তা হ'লে আমাদের ব'লে দেওয়া উচিত ছিল। সভায় না হয় ভলাণ্টিয়ারের ব্যবস্থা ছিল, ওরা কিছু করতে পারল না। কিন্তু ওরা যদি আরও দলে ভারী হয়ে আসত, সভায় মারধোর চালাত, মেয়েদের আক্রমণ করত—

তিলু বললে, তার জন্মে তো ওর চিন্তার সীমা নেই। আমরা না হয় পর, কিন্তু নিজের মায়ের জন্যে চিন্তা হয় না, এমন মানুষ দেখেছ কেউ?

মা বললেন, মানুষ নয় মা, অমানুষ।

গুণেনবাবু বললেন, ওরা সবাই হিন্দু, না, মুসলমানও আছে ওদের মধ্যে?

তিলু বললে, আছে বইকি।

গুণেনবাবু বললেন, মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কেন? হিন্দু মেরে মেরে অরুচি ধ'রে গেল নাকি?

লতু বললে, না বাবা। হিন্দুরা চালাক হয়ে উঠেছে কিনা। শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই ওরা ঐক্যের জন্যে চীৎকার করতে শুরু করেছে। না হ'লে ছুরি মারবার সুবিধে হচ্ছে না।

গুণেনবাবু বললেন, আমারও পূজোর জন্যে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কিছু দেব নাকি তিলু?

যেন গৃহিণীর কাছে পরামর্শ চাইছেন গৃহকর্তা, তেমনই সুর বেজে উঠল প্রশ্নটায়। তিলু একবার সমরেশের দিকে তাকাল। হাসছে বুঝি? মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, আপনার টাকা, ইচ্ছে হয় তো দিন।

লতু বললে, হ্যাঁ বাবা, দাও। দেওয়া উচিত।

গুণেনবাবু সমরেশের মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকীমা কি বলেন, দোব?

মা বললেন, ভাল কাজে তো দিতে-থুতে হয় বাবা।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

মহাবাণী

১

প্রকাশের বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে হিমালয়;
প্রস্তর-পঞ্জর ভেদি' লক্ষ ধারা হয়েছে বাহির।
প্রপাতের কলোল্লাসে
নির্ঝরের সঙ্গীত-ধারায়
তরঙ্গিছে পাষাণের বিগলিত আত্মনিবেদন
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি—"
উদ্বেলিত সমুদ্র-সঙ্গমে
সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র তারস্বরে করিছে ঘোষণা,
'হে সমুদ্র, আমি আছি,
অতিক্রমি' বহু দূর পথ
আসিয়াছি অবশেষে
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

২

প্রকাশের বেদনায় উন্মুখ অধীর হিমালয়;
অনন্ত নিখিল শূন্যে সমুৎসুক চূড়ায় চূড়ায়
অতি দূর তুঙ্গলোকে
সন্ধানিছে নব ছন্দ নবতর ভাষা
আত্মপ্রকাশের।
ভাব-মৌন শান্ত শুভ্রতায়
গম্ভীর গর্জনে কভু ঝঞ্ঝা-আলোড়নে,
বাণী তার শূন্যে শূন্যে মাগিছে প্রকাশ,
তন্দ্রাহীন নিত্য নবরূপে।

সে-ও কহিতেছে—
'আমি আছি, আমি আছি
শোন, শোন, আমি আছি আছি—'
রাধানাথে, গৌরীশৃঙ্গে, কাঞ্চনজঙ্ঘায়
ঊর্ধ্বমুখী অসংখ্য চূড়ায়
অবিরাম চলেছে ঘোষণা
'হে আকাশ, আমি আছি
অতিক্রমি' বহু বিঘ্ন বাধা
আসিয়াছি এত দূর,
বহি এই চিরন্তনী বাণী
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
যে বহ্নি তোমার ওই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরে করেছে উজ্জ্বল
সেই বহ্নি মোরও শিরে পরায়েছে তুষার মুকুট,
যে পূর্ণতা শূন্যতায় হয়েছে অসীম তোমার অনন্ত বক্ষে
সেই পূর্ণতাই আমারে দিয়াছে সীমা,
তুমি আমি ভিন্ন নহি
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

আজি শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথি
নিখিলের বাণীমূর্তি আজি হংসারূঢ়া আকাশচারিণী,
সর্ব অবচেতনার সচেতন রূপ
মূর্ত আজি শত শতদলে।
আজিকার পুণ্যলগ্নে
কবির অন্তর-লোকে ধ্বনিত হইল মহাবাণী—
অতি ক্ষুদ্র জড় হিমালয়
প্রকাশের আবেগেতে
সাগরের আকাশের সন্ধান পাইয়া থাকে যদি,

হে মানব,
তোমার সন্ধান হবে নাকি মহত্তর আরও ?
তোমার কল্পনা
মহাকাল-ভালে
অঙ্কিত করিবে নাকি নব চন্দ্রলেখা ?
নবীনা উমার ক্রোড়ে নবীন কুমার সম্ভব হইবে নাকি ?
নব প্রেরণায় করিবে না নব সৃষ্টি তুমি
দূর করি সর্ব মলিনতা
নিখুঁত নবীন সৃষ্টি পরিকল্পনার তুমিই তো একমাত্র যোগ্য অধিকারী
হে কবি, হে সৃষ্টিকর্তা
জাগো তুমি, ওঠো— ।*

"বনফুল"

যম

হঠাৎ সেদিন রাস্তায় ফটিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললাম, তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল, ফটকে।

কি ?

তুই তো পাড়ার লাইব্রেরিতে বই বিলি করিস। বল্ তো আজকাল লোকে কি ধরনের বই পছন্দ করে ?

ফটকে বললে, চাল-ডাল-তেল-নুন করতেই সারা সময়টা কেটে যায়, বই পড়বার সময় কোথায় লোকের! আর যা-ও পড়ে, তা হচ্ছে বেশির ভাগ যৌনতত্ত্বের বই আর না হয় যৌনতাত্ত্বিক উপন্যাস। অবশ্য আজকাল রাজনৈতিক, বিশেষ ক'রে রাশ্যার বিষয়ে লেখা বইয়েরও চাহিদা মন্দ নয়। তবে নাটক কবিতা প্রবন্ধের বই একেবারে অচল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কাব্য-টাব্য চলে না ?

আরে ছ্যাঃ, ওসব দিন আর নেই।—ব'লেই ফটকে ফটাস-ফটাস্

* ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সাহিত্য-সভায় পঠিত

টির শব্দ ক'রে চ'লে গেল। আমিও অচল হয়ে গেলাম যেন। সেই থেকে আমার কলমও ছিল অচল হয়ে।

* * * *

আরও কিছুদিন অচল হয়েই থাকত কলম, যদি না সে রাত্রে আমায় দেখা দিতেন যম—হ্যাঁ, স্বয়ং মৃত্যুরাজ। আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রক্তবস্ত্রপরিহিত যমও সেই কথাই বললেন।—তোমার কলম যদি সচল না কর, তবে—। ব'লেই তাঁর কাঁটা-মুগুরটা ঠুকলেন মাটিতে।

আমি বললাম, বাজারে এত সব সাহিত্যরথী, মহারথী, ভাগীরথী প্রভৃতি থাকতে এই অভাগার প্রতি এত করুণা কেন স্যার?

যম চেয়ারে বসলেন। বললেন, তুমি তো কাব্য লিখবে ভাবছিলে?

ভাবছিলাম তো! কিন্তু সে দিন ফটুকের কথায় একেবারে ডিস্‌কারেজ্‌ড হয়ে পড়েছি।

ডিস্‌কারেজ আমিও তোমায় করছি।—যম বললেন, ওসব বেশি বা শক্ত কিছু পড়বার সময়ও নেই লোকের। যা পটাপট মরছে সব! বাঁচতে পারছে কতটুকু! একে তো বেরিবেরি, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি, তার ওপর তোমাদের ঐ রাজনীতির কচাকচি আর কচাকচের ব্যাপার। ৪৬এর ১৬ই আগস্টের পর থেকে এত কাজ বেড়ে গেছে আমার যে, নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। দূতের সংখ্যাও বাড়িয়েছি অনেক—আরও বাড়ালে ভাল হয়। আর চিত্রগুপ্ত! বেচারা গলদঘর্ম হয়ে গেল। হাতে বোধ হয় কলম আটকে আছে তার। তার ওপর কাগজের অভাবে খাতা তৈরি করা যাচ্ছে না। তেমন ভাল বাইণ্ডার্সও নেই যে খাতা বাঁধাবে। সব নাকি পাকিস্থানে চ'লে গেছে।

বললাম, কেন, সেখান থেকে তো ভাল বাইণ্ডার্স আনাতে পারেন!

ও বাবা! সে সব আলাদা ডোমিনিয়নের ব্যাপার। কেন, বাউণ্ডারির ব্যাপারে কি সব হচ্ছে জান না?

বললাম, জানব না কেন? হাড়ে হাড়ে জানি। ঐ ম্যাড

হেসে বললাম, সে গুড়ে বালি! বিশ্বের যত কিছু দুর্নীতি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জমেছে। সে সব জঞ্জাল দূর ক'রে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেখানে দরকার এখন ডাক্তারের এবং ধাঙড়ের। ডক্টরেট-ফক্টরেট এখন দেবেই বা কে? আর নেবেই বা কে? যা নেপোটিজ্‌ম্‌ চলেছে! নেপোরাই দইটুকু সব মেরে দিচ্ছে। বরং যদি আপনার বিষয়ে কিছু লিখতে হয় তো আত্মরক্ষার জন্যেই লিখব। নিজে বাঁচলে তো বাপের নাম।

বেশ বেশ।—যম একগাল হেসে গোঁফটা চুমরে বললেন, এই তো শুভ বয়ের মত কথা। আর জান, বাজারে আরও অনেক সাহিত্যরথী থাকতে তোমার কাছে এলাম কেন?

কেন?

দেখলাম, তুমি আজেবাজে কাব্য রচনা ক'রে তোমার এনার্জি নষ্ট করতে চাও, সরকারের কাগজ নষ্ট করতে চাও, প্রকাশকের পয়সা নষ্ট করতে চাও। তাই ভাবলাম, তোমাকে একটা প্রপোজাল দিই: কাব্য না লিখে কাব্যের উপেক্ষিত হিসাবে আমাকে নিয়ে একটা লেখ কিছু। দেখ, তোমাদের এখানে আমার প্রচারই হ'ল না ভাল ক'রে।

ঐ কথাটি স্যার মাপ করতে হবে।—ব'লে ফেললাম, এখানে প্রচার আপনার খুবই আছে।

না না।—যম নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, আই মীন, আমার পূজোটা তোমাদের এখানে কেউ প্রচারই করলে না। কানী যে মনসা, সেও চাঁদ-সদাগরকে দিয়ে তার পূজোটা তোমাদের এখানে প্রচার করিয়ে নিলে। আর আমি যার ওপরে ভর ক'রে আমার পূজো প্রচারের চেষ্টা করছি, অমনি সে ব্যাটা হঁক ক'রে ম'রেই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সে তো হবেই। তার আর কি দোষ বলুন?

তাই তো ভাবলাম, লেখার মারফতে আমার মহিমা গরিমা, অভাব অভিযোগ জানাব। এ ভার তোমার ওপর দিলাম।

তথাস্তু।

আচ্ছা দেখ, তুমিই বল, আমি তো একজন দেবতা?

নিশ্চয়ই।

অথচ দেখ, আমার এখানে কোন সম্মানই নেই।

কিন্তু লোকে তো আপনার ভয়ে তটস্থ।

ভয়! ওসব ভণ্ডামি ছাড়।—যম রাগ করলেন, ভয় যদি আমাকে সত্যিই করত, তবে ভক্তিও করত, পূজোও করত। কেন, দেখ নি, 'মার দয়া' যাতে না হয় তাই শেতলার পূজো, কোন কাজ পাছে গুপ্লেট ক'রে দেয় সেই ভয়ে হস্তি-মুখো গণশার পূজো, পাছে লোকের দুর্গতি করে, সেই ভয়ে সিঙ্গী-চড়া ধিঙ্গী মেয়ে দুগ্গোর পূজো; তা ছাড়া টাকার লোভে লক্ষ্মীর, বিদ্যার লোভে সরস্বতীর পূজো তো আছেই। এমন কি, ইতু-কেতু সবারই একটু না একটু ভোগের ব্যবস্থা আছে। অথচ আমার বেলায় এই অবহেলার হেতু কি বলতে পার?

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল। বললাম, কেন, আপনার নামেও তো 'যম-পুকুর' পূজো হয়?

শুনেই যম ধমকে দিতেই থমকে থেমে গেলাম। যম চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ও সব বুজরুকি ছাড়। অন্য দেবতার বেলায় মূর্তি গ'ড়ে, ঢাক-ঢোল-কাঁশি বাজিয়ে, রোশনাই জ্বালিয়ে, জাঁকজমক ক'রে পূজো হবে, আর আমার বেলায় বুঝি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পূজো! ফাঁকিবাজি বুঝি নে ভাবছ? তখন মনে হয় কি জান?

কি?—ভয়ে আমার গলা শুকনো।

ইচ্ছে করে, দিই ঐ গর্তের জলে ঘাড়টা গুঁজে, যাতে আর তাকে পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া না যায়।

আমি বললাম, আমার মনে হয়, লোকে ভাবে, জন্মেছি যখন, মরতে তখন হবেই। মরণ তো আর রোধ করা যাবে না। কাজেই অযথা যম-পূজো ক'রে পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি?

ও, আর ওদের পূজো ক'রে বুঝি খুব লাভ হচ্ছে? বসন্ত কমছে? লোকের দুর্গতি কমছে? সব কাজে সিদ্ধি হচ্ছে?

তা নয়। তবে যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।—ভয়ে ভয়ে বললাম।

আচ্ছা পাগল তো তুমি!—যমের মুখে হাসি, বললেন, তোমার সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কলি আলোচনা করব ব'লেই তো আজ এসেছি। নইলে যম কখনও কারুর ঘরে এসে চেয়ারে ব'সে গল্প করে? বল, বল, কি বলবে তুমি?

ঢোক গিলে বললাম, বলছিলাম, যমকে কে আর পূজো ক'রে ঘরে আনতে চায় বলুন?

এই ঠিক বলছ। এতক্ষণে পথে এস বাছাধন।—যম যেন বাজি জিতলেন, বললেন, আসলে লোকে আমাকে ভয়-ভক্তি করে না, ঘৃণা করে, অবহেলা করে। কিন্তু জেনে রাখ, আমি কাউকে ভয় দেখিয়ে কিংবা মনসার মত চাঁদ-সদাগরের নৌকো ডুবিয়ে, মানে, কারও ক্ষতি ক রে পূজো আদায় করতে চাই নে। অত নীচ মন আমার নয়।

তা সত্যি।—সত্যি কথাই বললাম।

অথচ দেখ।—যমের স্বর আবেগ ভরা, লোকে উল্টে আমার নাম ক'রে এ ওকে গালাগালি দেয়। বলে, তুই আমার যম; সাক্ষাৎ যম যেন। কই, কেউ তো গালাগালির সময় বলে না, তুই আমার কার্তিক কিংবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যেন! শুধু তাই কি, মূর্খ লোকগুলোর স্পর্ধা কত! বলে, যমে মানুষে লড়াই ক'রে অমুক রুগীকে বাঁচানো গেছে। আরে, আমি যদি কারও গায়ে হাত দিই, তবে কি তার আর রক্ষে থাকে? তবে যদি নেহাত দেখি, বিধাতা-পুরুষ তাকে আরও আয়ু দিয়েছে, ছেড়ে দিই তাকে।

সে তো বটেই।

আর দেখ, ঐ বিধাতা-পুরুষের জন্য আমাকে পাঁচটা কথা শুনতে হয়। তিনি লোকের কপালে লিখে দেবেন অকাল-মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু ইত্যাদি। আর লোকে বলবে, যম দেখছি চোখের মাথা খেয়ে আমার অমুককে নিলে।

বললাম, সত্যিই অন্যের জন্যে আপনাকে কথা শুনতে হয়?

হ্যাঁ।—যম বললেন, অন্যেরা অনেক কিছুই করেন এবং সম্মান পান, এবং আমি সে সব কিছু না ক'রেই পাই অবজ্ঞা।

কথাটা বুঝলাম না ঠিক।

ছেলেমানুষ দেখছি তুমি।—যম মুচকে হাসলেন, তোমরা যে কি চাও বা কি বোঝ, তা তোমরাই জান। দুশ্চরিত্র লম্পট ইন্দ্র হ'ল তোমাদের দেবরাজ! রাজকার্য তো করতে দেখি নে, কেবল দেখি রাজসভায় বাইজী নাচাচ্ছে আর সুরা গিলছে হরদম। তোমাদের মহাদেব কেষ্ট ওদের লীলার কথাও কি খুলে বলতে হবে? কিন্তু দেখ, পরম শত্রুও আমার চরিত্রে দোষ দিতে পারবে না।

তা ঠিক।

তাই আমি তোমাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র ঘৃণার পাত্র।

যম একহাত নিলেন। পরে বললেন, আবার তুমি এটা লক্ষ্য করছ কি?

কি?

মেয়েরা পর্যন্ত আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করে না।

মেয়েরা?—অবাক হলাম।

হ্যাঁ।

কি রকম?

বলছি, সব বলছি একে একে। বলতে যখন বসেছি, তখন বাকি কিছুই রাখব না।—যমের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল, বললেন, আচ্ছা দেখ, ভাই-ফোঁটার দিনে তুমি মেয়ে তোমার ভাইকে ফোঁটা দিচ্ছ, আমার তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, আর আমি কোন বাধাও দিচ্ছি না। অথচ তুমি আমার দরজায় অযথা কাঁটা দিচ্ছ কেন? অন্যায় নয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। বলে বটে—ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম-দুয়োরে পড়ল কাঁটা।

তা হ'লেই বোঝ।—যমের গলার স্বর আরও ভারী হয়ে এল।—একে কি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা বলে না? আমার দরজা খোলা, তা তোমার এত রাগ কেন? আমি যদি আমার কাছে আসতে কাউকে বাধা না দিই, তাতে তোমার এত গাত্রজ্বালা কেন? তুমি যদি না এসে পার, এস না। স্বর্গের দরজার মত আমার দরজা

সব সময় বন্ধ রেখে দিলে তখন বোধ হয় ঢোকবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি প'ড়ে যেত।

কথাটা শুনে কৌতুক অনুভব করলেও যমের মনের ও মুখের অবস্থা দেখে গম্ভীর হয়েই বললাম, সত্যি, এ তো বড় অন্যায়।

অথচ মজা দেখ, তোমার বাড়ির দরজার পাশে কেউ যদি একটু ময়লা ফেলে তো তুমি রেগে কাঁই হবে।

সে তো আমারই হয়েছিল। সত্যিই হয়েছিল, আমার পাশের বাড়ির অনিলবাবু একটা ভাঙা কুলোয় ক'রে ছাই ফেলেছিল আমার বাড়ির দরজার গোড়ায়। দিলাম সেদিন এক চিঠি ঠুকে কর্পোরেশনে। অবশ্য হ'ল না কিছুই।

তবু তো নালিশ করবার জায়গা আছে একটা। আমার যে তাও নেই। ভাইফোঁটার দিনে যদি আমার দরজার কাছে একবার গিয়ে দেখ তো দেখবে কাঁটায় কাঁটায় আমার দরজা ঢাকা প'ড়ে গেছে প্রায়। যাতায়াতের কোন উপায় থাকে না বললেই চলে। কাজেই আবার লোক লাগিয়ে দরজা পরিষ্কার করতে হয়।

সে তো এখানে ব'সেই বুঝতে পারছি। ওখানে গিয়ে আর দেখে বোঝবার দরকার করে না। মনে মনে বললাম, যেতে ভয় করে না বুঝি?

যম বললেন, আবার দেখ সাবিত্রীর কাণ্ডটা! তোমরা তো তাকে একেবারে মাথায় ক'রে রেখেছ। অমন মেয়ে নাকি দেখা যায় না! কিন্তু কি রকম জাঁহাবাজ মেয়ে, সেটা লক্ষ্য করেছ কি?

না তো।

না তো! যম ভ্যাংচালেন।—তা লক্ষ্য করবে কেন? শোন বলি, সত্যবানের তো আয়ু ফুরাল, মারা গেল। হাজার হোক বড়ঘরের ছেলে; তার ওপর ধার্মিক; তাই ভাবলাম, দূত না পাঠিয়ে যাই নিজেই একবার সেখানে। আমাকে দেখে সাবিত্রী অমনি ক'রে বসল অন্যায় আবদার, তার স্বামীকে নাকি ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম কতবার—আমার কোনও হাত নেই, আমাকে অনুরোধ ক'রো না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা মেয়ে কি শুনল সে কথা? কত

বারণ করলাম, তবু পিছু ছাড়ে না। শেষে ভণিতা ক'রে আমায় বললে—আমার একটা কথা রাখবে? আমি অত-শত না ভেবে বললাম, তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর যা চাও দোব। তারপর বুঝলে, যাঁহাতক ঐ কথা বলা, অমনি ব'লে বসল—আমি হতভাগিনী, আমার স্বামীকে তো নিয়ে নিলে। আমি এখন কি নিয়ে থাকি? তুমি বরং আমাকে শত পুত্রের জননী ক'রে দাও। আমি ভাবলাম, যাকগে, মেয়েটার দুঃখু যদি তাতে কমে, তবে তাই হোক। ও মশায়, যেই বলেছি—বেশ তাই হবে—অমনি ব'লে কি, তা হ'লে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। স্বামী ছাড়া কি ক'রে আমি শত পুত্রের জননী হতে পারি। দেখ একবার ব্যাপারটা! আমাকে ভালমানুষ পেয়ে কি ভাবে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা! শেষে কি করি? কথা দিয়ে ফেলেছি। আর তো কথার নড়চড় করতে পারি না। হার মেনে ফিরিয়ে দিতে হ'ল সত্যবানকে। এ ব্যাপারের জন্যে বিধাতা-পুরুষের কাছে আমাকে কম কথা শুনতে হয়েছে নাকি? এ জন্যে সত্যবানের কপালে আবার তাঁকে নতুন ক'রে লিখতে হয়েছিল।

যমের ওপর কেমন যেন অনুকম্পা হ'ল আমার—তাই তো, আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে যা-তা ভাবে ঠকিয়েছে তো সাবিত্রী!

অথচ, একটু ভেবে দেখ, ঐ সাবিত্রীর ব্যাপারটা আমার কাছে না হয়ে যদি ইন্দ্র বা কেষ্টর কাছে হ'ত, তখন সতী সাবিত্রীর মানটা থাকত কোথায়? অথচ তার মানটা রাখতে গিয়ে অপমানটা হতে হ'ল আমাকেই।

বাস্তবিক, আপনি মহৎ!

যম বললেন, কেন, বেহুলাকে নিয়ে কি কাণ্ডই না হ'ল! বেচারীর স্বামী মারা গেছে! মেয়েটা পাগলের মত হয়ে আছে, আর তখন তাকে ব'লে কি না—নাচ দেখাও, তবে তোমার স্বামীকে ফেরত দেব। ওঃ, হাউ ক্রুয়েল! বেচারীকে ঐ অবস্থায় নাচতে হ'ল, তবে পেল লখিন্দরকে। তার মানে, নাচ দেখে গদগদ হয়ে আমার ওপর হুকুম হ'ল, লখিন্দরকে ফেরত দাও। ওদিকে লখিন্দরকে স্টোরে

একনটি ক'রে নেওয়া হয়েছিল; কাজেই আবার চিত্রগুপ্তের খাতায় জমা কাটিয়ে, খরচ লিখিয়ে রাইট-অফ ক'রে বেহুলার হাতে লখিন্দরকে জমা দেওয়া হ'ল। বোঝ তা হ'লে, নিজেরা ফুর্তি মারলেন নাচ দেখে, আমার কাজ বাড়ল। আর শুধু কি কাজই বাড়ল, কতবড় অপমান আমার?

ঠিকই তো বটে।

ঠিকই তো বটে নয়।—যম মনে করিয়ে দিলেন, এ সব কথা সব তোমায় লিখতে হবে কিন্তু। প্রচার করতে হবে জনসমাজে। বুঝলে?

নিশ্চয়ই করব।—আমি বললাম, সত্যিই আপনি উপেক্ষিত, অবহেলিত।

যম অতি দুঃখে বললেন, একেই বলে কপাল! কেউ হলেন পতিতপাবন শম্ভু, কেউ হলেন ভক্তের হরি, কেউ হলেন দুর্গতিনাশিনী, আর, আমি শালা খেটে মরি! এ খাটুনির যে কবে শেষ হবে জানি নে! জীবনে একটা দিনও ছুটি নেই।

মনে প'ড়ে গেল "ডেথ টেক্‌স্ এ হলিডে" নামে বিলিতী ছায়াছবির মজার গল্পটা। বললাম, আপনি ছুটি নিলে চারিদিকে বিভ্রাট দেখা দেবে। লোকে দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে হাসবে কিংবা রাস্তায় কোন ছেলে লরি চাপা পড়লে আবার উঠে দাঁড়িয়ে তার থেঁতলানো মাথাটা থাবড়ে-থুবড়ে গোল ক'রে নিয়ে আবার স্কুলের দিকে যাবে, সে সব আবার কেমন হবে দেখতে, হ্যাঁ মশায়? যুদ্ধ-টুদ্ধ লাটে উঠে যাবে যে! জিনিসের দাম বাড়বে না। কালোবাজারীদের টাকা বাড়বে না—

কিন্তু, আমার ভক্ত-সংখ্যা বাড়বে কি না বলতে পার?—যম বললেন, দেখ ভেবে। চাও তো, ছুটি ক'রে ব'সে থাকি। নিমতলা-কেওড়াতলার শ্মশানের জমি চ'ষে "গ্রো মোর ফুড" করগে; খুব ভাল সারের জায়গা ওসব।

তা ঠিক, তবে মরণ বন্ধ হ'লেও আপনার ভক্ত কেউ হবে কি না ঠিক বলতে পারছি নে।

কেন ?

মরণ হচ্ছে না দেখলে অনেকেই আপনার ওপর চ'টে যাবে।

সে কি হে ?—যমের স্বর বিস্ময়-ভরা।

বিজ্ঞের মত বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলছি, ঠিকই বলছি।

যম কৌতূহলী হয়ে বললেন, এ জগতে কে এমন আহাম্মক আছে, যে মরণ না হ'লে চ'টে যাবে ?

আছে স্যার, আছে, এবং তারা আহাম্মক নয়। বরং যারা তাদের চেনে না, তারাই আহাম্মক। শুনুন তাদের লিষ্টি।

বল।

মরণ হচ্ছে না দেখলে, বড়লোক বাপেদের এক ছেলেরা, নিঃসন্তান ধনী বিধবার ভায়েরা, ধনী বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রীরা, মেয়েদের বিজাতীয় প্রেমিকেরা, ছেলেদের অবাঞ্ছিতা প্রেমিকারা, স্বামীদের অসতী স্ত্রীরা ও তাদের প্রণয়ীরা বা স্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতক স্বামীরা ও তাদের প্রণয়িণীরা, জমিদারির পরশ্রীকাতর শরিকেরা, মহাজনেদের পুরনো দেনদারেরা, কিপটে বাড়িওয়ালাদের ভাড়াটেরা, কড়া বড়বাবুদের অধীনস্থ কেরানীরা—এরা সবাই আপনার ওপর চ'টে যাবে, এবং এরা সবাই যদি আপনার ওপর চ'টে যায় তবে আপনার ভক্ত হবে কারা ? কাজেই মৃত্যুরাজ, আমার মনে হয়, ছুটি নিলে কিছু সুবিধা হবে না আপনার।

যম দুঃখিত হয়ে বললেন, বেশ, তবে যেমন খেটে যাচ্ছি, তাই যাব। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। অনেক দূর যেতে হবে। বাহনটি য, এক মাইল পথ যেতে এক ঘণ্টা সময় নেবে।

মনে পড়লো, যমরাজের বাহন মোষের কথা। বললাম, তাও তো বটে। আপনার মোষটি কোথায় ?

বাইরে বাঁধা আছে।

তা বাইরে বেঁধে রেখেছেন কেন ? ছেড়ে রাখলেই তো পারতেন, ততক্ষণ একটু চ'রে খেত।

সে কি ? তোমাদের শহরে রাস্তায় মোষ যদি যথেচ্ছ চ'রে বেড়ায়, তবে লোকজন গাড়িঘোড়া চলবে কেমন ক'রে ?

হেসে বললাম, না, আপনি সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন বটে! আমাদের শহরের রাস্তা দেখেন নি বোধ হয়, তাই বলছেন। এখানে আমরা ট্যাক্সো দিই, আর মোষ গরু ষাঁড় এরাই চ'রে বেড়ায়। যদি পারেন তো ফেরবার সময় মানিকতলার পোলের কাছে খালধারের রাস্তাটা একবার দেখে যাবেন; বুঝতে পারবেন না— মোষের খাটাল, না, রাজপথ!

তাই নাকি?

শুধু কি তাই! সেদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম ফরসা জামাকাপড় প'রে, হঠাৎ একটা মোষের গোবর-মাখানো ল্যাজের ঝাপটা এমন গায়ে এসে মার্কা দিয়ে গেল যে, আমাকে ফিরে আসতে হ'ল বাড়িতে। সেদিন তো দেখি, এখনও মনে পড়লে হাসি পায়, এক ভদ্রলোক কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ফুটপাথে ষাঁড়ের গোবরে তাঁর পা পড়ায় একেবারে পপাত ধরণীতলে হয়ে গেলেন। তা যাক।— মৃত্যুরাজকে একটু তাতিয়ে দিলাম, এত রকম বাহন থাকতে আপনার ভাগ্যে বাহনটিও তো হয়েছে ভাল!

ঠিক বলেছ।—যম মনের মত কথা শুনে সোৎসাহে বললেন, দেখ না, নিজেদের বেলায় সিংহ হাতী ময়ূর রথ হাঁস। আর আমার বেলায় কিনা কালো-ধুমসো মোষ!

কেন, শিবের ষাঁড়, লক্ষ্মীর পেঁচা, শীতলার গাধা, এরাই বা কি এমন ভাল?

খুব ভাল না হ'লেও আমারটার মত অমন অচল অটল অনড় অকেজো নয়।—যম বললেন, নিজেই নড়তে পারে না, আর আমি চড়লে তো কথাই নেই। যাক, কথায় কথায় অনেক দেরি হ'ল, আমি উঠি। ওদিকে আবার কি হচ্ছে, কে জানে?

কোন্ দিকে?

যমালয়ের সাজাগারে?

সাজাগারটা আবার কি?—বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম।

যম বললেন, কেন, জান না? ঐ ডিপার্টমেন্টের তদারক করতে জীবন আমার ওষ্ঠাগত। জেলারগিরি গো, জেলারগিরি।

সে আবার কি ?

নাঃ, তুমি দেখছি শুধু হ্যাকা নয়, বোকা। কোন খবরই রাখ না।—যম বিরক্ত হলেন, কেন, কোন ছবির দোকানের সামনে দাঁড়ালেও তো চোখে পড়ে, মানুষ কে কি রকম পাপ করলে কি রকম শাস্তি পায় আমার সাজাগারে! দেখ নি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, একটা ছবি-বাঁধানোর দোকানে ঐ ধরনের একটা ছবি টাঙানো ছিল; তাতে কোন লোক চুরি করায় যমদুতরা তাকে এক কড়া গরম তেলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, আর সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। আর একটি স্ত্রীলোককে নগ্ন অবস্থায় যমদুতরা তার মাথাটাকে করাত দিয়ে দু ভাগ ক'রে কাটছে। ছবির তলায় লেখা অপরাধ: ব্যভিচার। ঐ ধরনের আরও নানা রকমের শাস্তির ছবি আর তলায় লেখা, কোন্ পাপের কি শাস্তি।

মৃত্যুরাজকে বললাম, হ্যাঁ, দেখছি বটে ঐ ধরনের ছবি।

তা হ'লে বোঝ।—যম বললেন, ঐ অত রকমের শাস্তির অ্যারেঞ্জমেণ্ট ও ম্যানেজমেণ্ট আমাকেই করতে হয়। কাকে কতক্ষণ গরম তেলে সেদ্ধ করতে হবে, কার মাথাটা কতটা চিরতে হবে, যাতে শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হবে, অজ্ঞান না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—

কেন ?

কেন আবার ? লিমিটের বেশি গেলেই শাস্তিভোগীরা ফট ক'রে হায়ার-অথরিটির কাছে একটা কমপ্লেন ঝেড়ে দিক, আর আমার যমগিরির দফা গয়া হোক আর কি!

হাসি পেল আমার, বললাম, তা হ'লে, মুখে যাই বলুন মৃত্যুরাজ, গদির মায়া ছাড়তে পারেন নি এখনও।

মৃত্যুরাজের ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গেল বিরক্তিতে। মুখ বেঁকিয়ে বললেন, দেখ ছোকরা, তুমি নেহাতই অনভিজ্ঞ দেখছি। জেনে রাখ, গদির মায়া, প্রাণের মায়ার চাইতেও বেশি। যাক, যা বললাম, মনে রেখো। আমার প্রচারের ভার তোমার ওপর দিলাম। সাবধান, অবহেলা করলে নিস্তার নেই কিন্তু।

আমি বললাম, বেশ, আমি লিখব আপনার অভাব অভিযোগ অবহেলার কথা। কিন্তু আমার লেখা যদি কোন পত্রিকার সম্পাদক না ছাপে তো আমার দোষ নেই কিন্তু। সে কথা আমি আগে থেকেই ব'লে রাখছি।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুমি লেখ তো?

পাশের খাটাল থেকে একটা বাচ্চা মোষের আর্ত চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শেষ ট্রাম

ঘুরে ঘুরে যবে ঘরে ফিরে দেখি, মোড়ের গায়
একটা কুকুর চীৎকার করে যন্ত্রণায়,
ভিখিরী ছেলেটা ঢুলে ঢুলে পড়ে পথের 'পর,
গ্যাসের বাতিটা যাপিছে একক স্বয়ম্বর।

আশ্রয়ে ফিরে ক্লান্ত মনেব আখর প'ড়ি,
দেয়ালে অবোধ টিক্‌টিক্ করে দেয়াল-ঘড়ি,
বন্ধ ঘরের কবন্ধ কালো অন্ধকারে
মনে মনে বৃথা হারানো দিনের সূত্র ধরি।
কি হ'ল, হ'ল না, শত আবর্ত অবিশ্রাম
ছায়া ছায়া সব, মনে মনে কাঁপে ক্লান্ত নাম।

সীমায়িত এই মনের জমিতে পদচারণ—
শত সুড়ঙ্গে ঘুরে ঘুরে দিশা হারায় মন,
হঠাৎ কখন অগ্‌চেতন অন্ধকারে
আঁধারে উধাও বর্শার মত, মত্ত সুর
তীব্র তরল ইঙ্গিতে জ্বলে অনেক দূর,
কে যেন কালের অন্তরশায়ী যন্ত্রণারে

জানাল হঠাৎ; কাঁপায়ে সুপ্ত সপ্তগ্রাম—
বিছানায় শুয়ে শুনি দিশাহারা অন্ধকারে,
কে জানে কোথায় চ'লে গেল বুঝি শেষের ট্রাম।

পরিণতিহারা এই নাগরিক নিঃস্বতায়
ইঙ্গিত-গাঢ় বিদ্যুৎ-স্বর কাঁপে হাওয়ায়
আঁধারে উধাও, চলেছে কোথায়? কোথায় শেষ?
চাপা শঙ্কায় থরথর কাঁপে মাটির দেশ।

জানি এ পথের শেষ নেই দূর দিগন্তের
বনানী-নীলিম শূন্য আঁধার দিনের গায়,
মনে মনে জানি, ভীত অবশেষ এই পথের
অতি-পরিমিত মহানাগরিক নিঃস্বতায়।
জানি সব জানি, তবুও যে কথা জানি না তার
আবেগে অবাক্, টলমল করে অন্ধকার॥

অসিতকুমার

আলো

অন্ধকার আমাদের কাছে ভয়ের জিনিস। যত কিছু অজানা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। ঘুটঘুটে অমাবস্যা রাত্রে শ্যাওড়া গাছে যখন ঝোপ ঝোপ অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, তখন আমাদের গা ছমছম করে, মনে হয়, ওখানে কি জানি কি আছে! সেইজন্য দিনদুপুরে ভূত পেত্নী শাঁকচুন্নি ব্রহ্মদত্যি কিছুই দেখা যায় না, অথচ রাত্তিরবেলায় তারা দলে দলে বেরুতে আরম্ভ করে। মানুষ সেই-জন্য এই অজানাকে, এই মহারহস্যকে ভয় করে, তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আলো সেইজন্য তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু, জীবনের প্রতীক— অন্ধকার যেমন মৃত্যুর। মানুষ কেন, জীব-জন্তুর পক্ষেও তো এ কথা সত্য। ভোরে প্রথম আলোর ডাকে তারা সাড়া দেয়, কত কলরব

জাগতে থাকে। আবার সন্ধ্যাবেলা দিনের আলো মিলিয়ে গেলে তারা বাড়ি ফেরে, চুপচাপ থাকে। আদিম মানুষের চোখে আলোর চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু তো আর কিছুই ছিল না। উষার আভাসে রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, ভোরের আকাশ ক্রমে অরুণরাঙা হয়ে এল, সারা আকাশে বিচিত্রবর্ণসমারোহ, মেঘে মেঘে রঙের খেলা, ক্রমে সূর্যের তীব্র জ্যোতিতে পৃথিবী উদ্ভাসিত; তারপর সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই অপরূপ রঙের মেলা। এর চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আদিম মানুষের চোখে পড়ে নি। সেইজন্যই তার প্রথম বন্দনা-গানের মধ্যে আলোর স্তুতির এত ছড়াছড়ি, উষা সূর্য চন্দ্র আমাদের বন্দনীয় দেবতা। সেইজন্যই তার আকুলতা অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার জন্য, তমঃ থেকে জ্যোতিতে যাবার জন্য।

আদিম মানুষ এই আলো দেখে যে রকম বিস্মিত হয়েছিল, অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার জন্য তার যেমন ব্যাকুলতা, সেই বিস্ময় সেই ব্যাকুলতা তো আজও আমাদের কাটে নি। আলো চাই, আরও আলো চাই, অন্ধকারকে দূর করতে চাই। প্রাচীন কালের গুহাবাসী মানুষ রাত্রে অন্ধকার দূর করবার জন্য হয়তো মৃত জন্তুর বসা জ্বালত, নয়তো এমনই আগুন জ্বালিয়ে রাখত। আমরা এ যুগে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানকে সেই অন্ধকার দূর করার কাজে লাগিয়েছি। চকমকির আগুন থেকে প্রদীপ, প্রদীপ থেকে মোমবাতি, মোমবাতি থেকে কেরোসিনের লম্প, তা থেকে লণ্ঠন, লণ্ঠন থেকে গ্যাস, গ্যাস থেকে ইলেক্‌ট্রিক। যত রকমে সম্ভব বেশি আলো চাই, তীব্রতর আলো চাই। ইলেক্‌ট্রিক আলোরই বা কত রকমভেদ! সেই সেকালের মিটমিটে কুড়ি-ক্যান্ডল-পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক বাতির সঙ্গে আজকালকার ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোর তুলনা করুন। তা ছাড়া সার্চলাইট স্পটলাইট ইত্যাদি কত রকম লাইট! ঘরে ঘরে, সুদূর পল্লীতেও, টর্চলাইট এমন ছড়িয়ে গিয়েছে যে তার কথা আর উল্লেখ নাই করলুম।

সমাজশাস্ত্রীরা এক সময় বলতেন, সমাজের অগ্রগতির চিহ্ন হ'ল সমাজ status থেকে contractএর দিকে কতটা এগিয়েছে। আমি

বলি, সমাজপ্রগতির তার চেয়ে বড় চিহ্ন তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। সেটা হ'ল অন্ধকার থেকে আলোকে যাত্রা। অন্ধকার দূর করবার জন্ম আমরা কতখানি আলোর ব্যবস্থা করতে পেরেছি! ভেবে দেখুন তো কলকাতা শহরের কথা। রাত্তিরবেলাতেও অন্ধকার নেই, ঝক্‌ঝক্ করছে আলোয়,—দোকানের আলো, বাড়ির আলো, পথের আলো, গাড়ির আলো। এমন কি শ্মশান—যেখানে গেলে গা ছমছম করে—সেই শ্মশানও কলকাতায় অন্ম চেহারার। ফট্‌ফট্ করছে আলো, মাজাঘষা কেতাদুরস্ত—প্রায় বৈঠকখানার মত আর কি! রাত্তিরের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের যেন কলকাতায় প্রবেশ নিষেধ।

বাস্তবিক, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অভিযান আমাদের এমনই বেড়ে চলেছে যে, আলোর দিকে ক্রমাগত চলতে চলতে আমরা আর দিনের আলোও যথেষ্ট মনে করছি নে। কাজেই দিনের বেলাতেও ফোটো তুলবার সময় আমরা দিনের আলোর বদলে কৃত্রিম আলোই বেশি পছন্দ করি। অপারেশন করবার সময় ডাক্তারেরা দিনের আলোর বদলে ছায়াবিহীন আকল্যাম্পই বেশি পছন্দ করেন। দিল্লীর সেন্‌ট্রাল অ্যাসেমব্লি হল দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল। তাই সেই হলের মাথার দিকে বড় বড় জানলা আছে। রৌদ্র হ'লে পর্দা টেনে দেয়, অন্ম সময় পর্দা সরানো থাকে আলো আসবার জন্ম। বাংলার অ্যাসেমব্লি হল দিল্লীর পরে তৈরি হয়েছে। সেইজন্ম এখানে আর জানলা-টানলার বালাই নেই। সবটাই ঘেরা, সব সময়েই কৃত্রিম আলো জ্বলছে। বেলা তিনটের সময় ঢুকে দেখুন যে রকম আলো, রাত আটটার সময় বেরিয়ে আসুন তখনও ঠিক সেই রকম আলো। কখন যে সূর্য ডুবল, সন্ধ্যা হ'ল, দিনের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—এ সব কিছুই বুঝবার উপায় নেই, অর্থাৎ আমাদের নতুন ফরমুলা অনুসারে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের আরও প্রগতি হয়েছে। দিল্লী তো আমাদের তুলনায় অনগ্রসর, কেননা, সেখানে দিনের আলো আসে! এখানে আমরা সে ব্যবস্থাটি রাখি নি। অন্ধকার থেকে আলো, আলো থেকে কৃত্রিম আলো—এই হ'ল আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি।

কিন্তু, বাস্তবিক, এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। বিশেষত যাঁরা শহরে থাকেন। আমি বলি, এখন আলো থেকে অন্ধকারে যাবার জন্য একটা অভিযান শুরু হোক। কি অসহ্য অবস্থা ভেবে দেখুন দিকি! কলকাতায় এমন বাড়ি খুব কমই আছে, যেখানে রাত্তিরবেলায় সত্যি সত্যি অন্ধকারে আরাম ক'রে চোখ বুজে ঘুমনো যায়। হয় রাস্তার গ্যাসের এক ফালি আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়বে, নয়তো পাশের বাড়ি থেকে ইলেকট্রিকের আলো, নয়তো গভীর রাত্রে পথ-চলতি মোটর গাড়ির হেডলাইট, মোট কথা নিশ্চিন্তে অন্ধকারে ঘুমতে পারবেন না। সেই সঙ্গে শব্দও। নানা রকম শব্দেরও বিরাম হবে না, এমন কি নিষুতি রাত্তিরেও। মানুষ কি ক'রে এ রকম ভাবে থাকে! আমরা শহরের মানুষেরা পল্লীগ্রামের কথা ভেবে অনেক সময় চমকে উঠি বটে, ভাবি যে কি ক'রে সেখানকার মানুষ সন্ধ্যা হ'লেই কুঁড়েঘরগুলিতে ঢুকে অন্ধকারে ব'সে থাকে! কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, বরং সে-ও ভাল—তবু দিনরাত্রি এই আলোর প্রখরতা সহ্য করা যায় না। চুলোয় যাক না সভ্যতা, কিন্তু যদি দেখতে পাই যে সন্ধ্যা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিগন্ত ব্যেপে অন্ধকার নেমে এল, মিট্‌মিট ক'রে আকাশে তারা জ্বলছে, সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির আবরণে ঢাকা, পৃথিবীর অজানা অনাদি সঙ্গীত ঝিঁঝির আওয়াজে, রাত-চরা পাখির ডাকে থেকে থেকে বেজে উঠছে, তা হ'লে মনটা এমন গভীর শান্তিতে ভ'রে যাবে যে, তখন যদি হঠাৎ একটা সাদা-থান-পরা ব্রহ্মদত্যি পৈতে ঝুলিয়ে খড়ম খট্ খট্ করতে করতে এগিয়েও আসে তা হ'লে ভয় তো পাবই না, বরং খুশি হয়েই বলব, আসুন আসুন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

—

তদা — বিজয়ায়

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ জননী সঁপেছে ভব পায়,
সে কথা ভুলিয়া বৎস, আজও কয় হাসান-হোসেন।
ধর্ম গেল, অর্থ গেল, ভূস্বর্গ কাশ্মীরও বুঝি যায়—
খোকার পাল্লায় পড়ি মা বুঝি বা আঙুল চোষেন।
কামহীন হয়ে মোক্ষ লভিছেছে উদ্বাস্তুরা হায়,
আম-নির্বাচনে মাতে হতভাগা সুকুমার সেন॥

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

জনৈক অখ্যাত বিপ্লবী (কারামুক্তির পর)

প্রথম শ্রেণীতে আমি ব'সে এক ট্রামে
চলিতেছিলাম লক্ষ্যহীন।
মাঝে মাঝে চলে ট্রাম, মাঝে মাঝে থামে,
কভু দলে দলে আর কভু বা একক ওঠে নামে
যাত্রী ও যাত্রিনী—
কখনো বা মনে হয় "চিনি না চিনি না"—
কভু মনে হয় "চিনি চিনি"—
অনন্ত জীবন-পথে লোক হতে লোকান্তরে
(কিংবা লোকান্তর হতে লোকে)
মানুষ যেমন চলে ঠুলি-বাঁধা চোখে,
জানে না কোথায় যাবে, তবু চলে, চলে রাত্রিদিন—
আমিও তেমনি ব'সে প্রথম শ্রেণীর ট্রামে
চলিতেছিলাম লক্ষ্যহীন।

চড়িলাম ট্রামে আজ বহুদিন পর
হয়তো বা উনিশ বছর
কিংবা আরো বেশিদিন হয়ে গেছে পার।
এর আগে শেষবার
যেদিন চড়েছি ট্রামে সেদিন কি-বার ছিল ? কিংবা কোন্ মাস ?
কোন্ সাল ? স্মরণে এখন তার নাহি তো আভাস।
শুধু মনে আছে
ধরার আনন্দ-ধারা ছিল এই হৃদয়ের কাছে,
ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ছিল, ছিল আশা, পিতা, মাতা, ভাই—
আজ তারা নাই নাই নাই।
চলে ট্রাম, বৈদ্যুতিক রথ—
চরণ-চক্রের তলে দলে লৌহপথ।

দু পাশে লোকের ভিড়, ট্যাক্‌সি, রিক্‌শা, ফুটপাথ, দোকান,
অট্টহাসি, হট্টগোল, গ্রামোফোন-রেকর্ডের গান,
কোথাও বা রেডিওতে বাজে বাঁশী—
সহসা আমার পাশে কন্‌ডাক্টর আসি,
চাহিল ট্রামের ভাড়া। সিকি দিনু করপদ্মে তার।
সে কহিল, "কোথাকার ?"
অর্থাৎ—কোথায় যাব! হায় কি দারুণ প্রশ্নখানি!
সবিনয়ে কহিলাম, "বন্ধু, কোথা যাব নাহি জানি।
আমারে বিশ্বাস কর ভাই,
উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কোথা কেহ প্রতীক্ষিয়া নাই।
এই মহানগরীর জন-মহাসমুদ্রের বুকে
আমি এক নগণ্য বুদ্বুদ, ক্ষুদ্র দুখে ক্ষুদ্র সুখে
আপনাতে আপনি রয়েছি হারা।"
কন্‌ডাক্টর কহে, "তবু দিতে হবে ভাড়া।"
কহিলাম, "আচ্ছা তবে, বেশ।
সেথার টিকেট দাও এ যাত্রা যেথায় হবে শেষ।"
যাত্রাশেষে নামিলাম ট্রাম হতে,
মিশিয়া গেলাম জন-স্রোতে।
কিন্তু······তারপর ?
কোথা যাব ? কার কাছে ? কে দেবে উত্তর ?

রামী ধোপানীর পাথর

এই যে দেখছেন ক'য়ে-যাওয়া পাথরখানা,
এরই ওপর কাপড় কাচত রামী ধোপানী ;
আর ঐ যে ওখানে দেখছেন একটা ভাঙা ঘাটের চিহ্ন,
ওখানে জলে ছিপ ফেলে ব'সে থাকত চণ্ডীদাস।
যা বলব খাঁটি আর হুবহু বলব—
এ সব আমাদের পূর্বপুরুষের নিজের চোখে দেখা কিনা !
আর আমরা এখানকার অনেক পুরুষের বাসিন্দে।

চণ্ডীদাসের আরেক নাম ছিল চণ্ডুদাস,
ও নাম অবিশ্যি সবাই জানে না। থাক্‌গে ও নাম।
চণ্ডীদাসের কাব্যিরোগ ছিল কাঁচা বয়স থেকেই,
তাই রামী ধোপানীকে সে বললে শুদ্ধ ভাষায়,
"রজকিনী রামী।"
আর কাব্যি ক'রে বললে,
"ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি।"
তা, রামীর চরণের আর দোষ কি বলুন?
জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কাপড় কাচলে
চরণ শীতল হবে না তো কি?
সে যাই হোক, রামী শরণ দিতে রাজী হয়ে গেল।
তা নিয়ে নানান কেচ্ছা, নানান কেলেঙ্কারি,
সে তো আপনারা সবাই জানেন—
আর কিছু না হোক
চণ্ডীদাস-ফিল্মখানা তো দেখেছেন অন্তত?
দুর্গাদাস, উমাশশী, কানা কেষ্টো?
আপনারা কিন্তু মশায় দুজন চণ্ডীদাস খাড়া ক'রে
বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন—
বড়ু চণ্ডীদাস আর ছোট্টু চণ্ডীদাস।
তা ছাড়া সেদিন শুনলুম মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেছে
ঐ এক 'নীল শাড়ি'র ব্যাপার নিয়ে।
চণ্ডী তো লিখেই খালাস
"চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।"
মাথা-ফাটিয়েদের আর দোষ কি বলুন?
এক দল বললে, "নীল শাড়িটা শদ্দেরের।
ওটাকে কেচে নিঙড়তে নিঙড়তে
যাচ্ছিল রামী ধোপানী।"

উল্টো দল বললে, "মোটেই নয়।
ঐ নীল শাড়ি পরা ছিল রামীর।
ভিজে শাড়ি জড়িয়ে ধরেছিল রামীকে,
তারি খানিকটা নিঙড়তে নিঙড়তে
যাচ্ছিল রজকিনী রামী।
আর তাই দেখে মোচড় খাচ্ছিল
চণ্ডীদাসের প্রাণ।
নইলে খদ্দেরের শাড়ি নিঙড়তে দেখে
চণ্ডীর প্রাণ মোচড় খাবে কেন?"
বাস্, আর যায় কোথা? সেই থেকে মুখোমুখি,
চুলোচুলি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, ফাটাফাটি।
অথচ হেলায় প'ড়ে আছে এই পাথরখানা
রজকিনী রামীর কত কাপড় কাচার ইতিহাস বুকে নিয়ে।

শেষ ধন্যবাদ

ঘনিয়ে আসছে শেষ বিদায়ের লগ্ন জানি,
ডাক্তাররা যাই কেন না বলুক, কিংবা করুক কানাকানি।
শীগগিরই রওনা হয়ে যেতে হবে সেই রহস্যময় পথে,
যে পথে গেছে অ্যারিস্‌টোফ্যানিস, এস্‌কাইলাস, কালিদাস,
ভবভূতি, শেক্‌স্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ,
রহমৎ মিয়া, নফর কোলে, পাঁচু ধোপা,
চণ্ডীদাস, রামী, হের্‌মান গোয়েরিং,
সীতা, সত্যবান, অরুন্ধতী, মহামতি গোখলে,
গড্‌সে, বায়রন, 'চরিত্রহীন'-এর শরৎচন্দ্র
আর 'চাঁদমুখ'-প্রণেতা শরৎ চাটুজ্জে—
শুধু এরা নয়, আরো, আরো অনেকে—
আর যে পথে যাবে ট্রুম্যান, স্তালিন,
ম্যাক আর্থার, রাজাগোপালাচারী, মুন্সী, যাদুকর যতীন সাহা,
ধোপা, নাপিত, কবি, নাটুকে, কাঁচা, পাকা,

ছোট, বড়, টেকো, বাবরি-ওয়ালা, আমীর, ফকির সবাই।
মানে—সোজা কথায়, শীগগিরই অক্কা পাব।

আমি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট।
পৃথিবীর ব্যঙ্গ-সাহিত্যে এনেছি যুগান্তর।
ব্যঙ্গ-সাহিত্যে পৃথিবীর ইতিহাসে
থাকব আমি অমর, বলছেন সুধীবৃন্দ আর অগুনতি অ-সুধী।
আমার রচনার বহু প্রকাশক, অগুনতি পাঠক-পাঠিকা,
অগণ্য আমার ভক্ত।
বিদায়ের আগে তাদের সকলকে জানিয়ে যাই
আমার শেষ ধন্যবাদ—ভদ্রতার খাতিরে।
আমি ঋণী নই তাঁদের কাছে, তাঁরাই আমার কাছে ঋণী।

কিন্তু তোমাদের কাছে আমি সত্যিকারের ঋণী,
তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে যাই শেষ ধন্যবাদ
অন্তরের গভীর গহন থেকে—
ওগো দেশের যত ভণ্ড, শয়তান, বেইমান,
বেল্লিক, উজবুক আর রাজনৈতিক বহুরূপী!
তোমরাই তো ভণ্ডামি, শয়তানি, বেইমানি,
বেল্লিকপনা, উজবুকিয়ানা আর বহুবার ভোল বদল ক'রে
যুগিয়েছ আমার সাহিত্য-রচনার খোরাক।
ধন্যবাদ তোমাদের, যারা সাদা গান্ধীটুপি প'রে
কালো বাজারে কারবার চালিয়ে মারছ মানুষ
আর মোটা মোটা মুনাফা।
আমার ধন্যবাদ নাও সেই মুষ্টিমেয় তোমরা,
যারা দেশের কোটি কোটিকে শুষে সাদার চাইতে সাদা ক'রে
নিজেরা হচ্ছ লালের চাইতে লাল।
যদি না থাকতে তোমরা,
তা হ'লে আমার ব্যঙ্গ-সাহিত্যে কাদের চাবকে

রচনা করতুম আমার সেই তিন-তিনটি ব্যঙ্গ-নাটক,
যা অভিনীত হয়ে রাতের পর রাত
তিন-তিনটি হাউসে 'হাউস ফুল' যাচ্ছে ?

ধন্যবাদ নাও তারা, যারা দরিদ্র-দরদী সেজে
নিজেদের দারিদ্র্য ঘুচাবার ফিকিরে থাক—
তোমাদেরই নিয়ে জনপ্রিয় ব্যঙ্গ-কবিতা
অনেক করেছি রচনা।

হে রামগাধা ! হে হস্তিমূর্খ ! (দেশে যত আছ)
তোমাদেরই অনুপ্রেরণায়, আমার কবিতায়
এঁকেছি তোমাদের রূপ এবং স্বরূপ—
তোমাদের সকলকেই মডেল ক'রে
রচনা করেছি আমার অনেক কবিতা,
জীবন্ত মডেল-রূপে তোমাদের না পেলে
হ'ত না আমার জীবন্ত সাহিত্য রচনা।
তাই ধন্যবাদ জানাই তোমাদের।

ধন্যবাদ তোমাদের যারা মন্বন্তরে না খেয়ে মরেছ,
ধন্যবাদ তোমাদের যারা মন্বন্তরে না খাইয়ে মেরেছ,
আর ধন্যবাদ তোমাদের যারা মন্বন্তরী আধমরাদের
লঙ্গরখানায় লপসি খাইয়ে আধ-বাঁচিয়েছ।
তোমরাই নিজে ম'রে আর মেরে খোরাক যুগিয়েছ
আমার যুগান্তকারী উপন্যাসের—
যার নাম 'মন্বন্তরের ইতিহাস'।

তোমাদের কাছেও ঋণী আমি ওগো বাস্তুহারার দল
টুকরো হয়ে গেল ভারত,
আর তোমরা হ'লে স্রোতের শ্যাওলা।

তোমরা ওপারের ঠেলা খেয়ে এপারে এলে
আশ্রয় পাবে ব'লে, আর সহানুভূতি।
কিন্তু পেলে না।.....................
পেলে না !!!.......!!!.......!!!..........!!!
হ'লে পথের ভিখারী,
বেআইনী মিছিল ক'রে খেলে পুলিসের লাঠি।
তোমাদের বুকে অতীতের স্মৃতি,
অন্ধকার তোমাদের বর্তমান, অন্ধকার ভবিষ্যৎ।
তোমাদের ট্র্যাজেডির চিত্র এঁকেছি
আমার অধুনাতম যুগান্তকারী বাস্তবোপন্যাসে।
তোমরা বাস্ত হারিয়ে যাযাবর হয়ে
সকলের মুখে 'যা যা' না শুনলে,
আমার সে উপন্যাস লেখা হ'ত না।
তাই আমার শেষ বিদায়ের বেলায়
তোমাদের— জানিয়ে যাই—
আমার শেষ ধন্যবা—

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

জাতিভেদের উচ্ছেদ

সম্প্রতি বাংলা দেশের তপসিলভুক্ত জাতিবৃন্দের রাজনৈতিক সম্মেলন হইয়া গেল। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে একটি বিচিত্র বিষয় লক্ষিত হয়। তপসিলভুক্ত শ্রেণীদের চাষের উন্নতিবিধানের জন্য প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষক-পরিবারকে কিছু জমি দিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে গভর্মেণ্টকে সমবায় প্রথা অনুসারে চাষের বিষয় শিক্ষা ও সুযোগ দিতে হইবে, স্বাস্থ্য ও লেখাপড়ার উন্নতিবিধানের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যানুসারে আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রিসভায় উল্লিখিত শ্রেণীবৃন্দের জন্য একজন তপসিলী সমাজের মন্ত্রী নির্বাচন করিয়া তাঁহারই উপরে

স্বজাতির উন্নতিবিধানের ভার দিতে হইবে, ইত্যাদি নানাবিধ প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।

একটু অনুধাবন সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, তপসিলভুক্ত শ্রেণীদের মধ্যে যাঁহারা কিছু শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অপরাপর জাতির সঙ্গে যাহাতে রাষ্ট্রনৈতিক মহলে বা চাকুরি ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমতা প্রাপ্ত হন, সে বিষয়ে সুদৃঢ় ইচ্ছা রহিয়াছে। উপরন্তু যাহারা আজও শিক্ষালাভ করে নাই তাহারাও যাহাতে দ্রুত শিক্ষা পায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা তপসিলী জাতিবৃন্দের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন সমবায় প্রথা অনুসারে আর্থিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষাও কম নয়। ধনতন্ত্র যখন মরিতে বসিয়াছে, রুশ দেশে যখন সমবায় কৃষির দ্বারা গ্রামের সাধারণ কৃষকের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতির সংবাদ আমাদের দেশেও পৌঁছিতেছে, তখন আমাদের দেশেও যে সে বিষয়ে শিক্ষা ও সুযোগের ব্যবস্থা করা গভর্মেণ্টের পক্ষে কর্তব্য, এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

কিন্তু শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দাবি কি একা তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়েরই দাবি? আজ বাংলা দেশে তপসিলভুক্তই হউক অথবা নাই হউক, এমন যে কেহ আছে, যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের বশে অথবা অন্য কারণে ব্যর্থতায় মরিতে বসিয়াছে, এ তো তাহারই দাবি। অতএব শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিলে তপসিলী জাতিবৃন্দের সামাজিক সমস্যা কি করিয়া মিটিয়া যাইবে, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম না। ধরা যাউক, সকলে শিক্ষিত হইল, অর্থাৎ লেখাপড়া শিখিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা লেখকের বৃত্তি গ্রহণ করিল, তাহা হইলেই কি জাতিভেদ মিটিয়া যাইবে? শহরের অধিবাসী যে মধ্যবিত্তেরা অপেক্ষাকৃত উন্নতজীবন যাপন করে, তাহারা কি জাতিভেদের বিষ সমাজ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে? ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সহিত শিক্ষিত কর্মকার পরিবারের সামাজিক আদানপ্রদান কি অবাধে ঘটিতে পারে? অতএব সাধারণ শিক্ষাবিস্তার ও আর্থিক উন্নতিবিধানের দ্বারাই যে সমস্যা আপনা

হইতে কালক্রমে মিটিয়া যাইবে, এরূপ ভরসা পাওয়া যায় না। শুধু লেখাপড়া শিখাইয়া চাকরির জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে কোন বিশেষ নূতন ধারায় শিক্ষা দান করিলে যদি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করা যায়, সেই বিষয়েই বরঞ্চ আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

গ্রামদেশে ঘুরিলেই দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির যদিও কৌলিক কতকগুলি বৃত্তি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও অধিকাংশ উচ্চবর্ণের মানুষ আজ আর স্ববৃত্তি অনুসরণ করিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারেন না। কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে স্ববৃত্তির অনুগামী জনসংখ্যা আজও অনেক বেশি। মেথরের ছেলে মেথরের কাজ করে, ডোমের ছেলে চাষ ভিন্ন বাঁশের ঝুড়িও বোনে। প্রতি জাতির একটি বৃত্তি মোটামুটি পূর্বে বাঁধা ছিল। গত দুই শতাব্দীর পরিবর্তনের ফলে স্ববৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা কম-বেশি সকলেরই শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই শৈথিল্য শিক্ষিতের মধ্যে বেশি, অশিক্ষিতের মধ্যে কাহারও বেশি, কাহারও কম। এরূপ ভিন্নতার নানা কারণ আছে। তাহা আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয় নয়।

কিন্তু আজ আমরা মেথরকে গ্রামদেশে নীচু বলি, তাহার কারণ, তাহাকে দিয়া নীচু কাজ করানো হয় বলিয়া। চর্মকারদের মধ্যে যাহারা চামড়া খালানোর কাজ করে তাহারা নীচু বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু যাহারা বাজনা বাজায় তাহারা নিজেদের অপেক্ষাকৃত উঁচু মনে করে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নাই। জাতিভেদের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি ব্যবসাযে জাতিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার। আর সমাজের মধ্যে নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাজকে আমরা উঁচু নীচু বলিয়া আলাদা করিয়া থাকি। যে উঁচু কাজ করে, সে জাতি উঁচু, যে নীচু কাজ করে, সে জাতি নীচু। কোনও মেথরের সন্তান বাপের মত নোঙরা কাজ না করিলেও পিতার বৃত্তিগত দোষের জন্য সেও নীচু বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাই জাতিভেদ প্রথার মূল স্তম্ভ। জাতিভেদের একটি মাত্র স্তম্ভ নয়, ইহার ছোট বড় আরও কতকগুলি খুঁটি আছে। কিন্তু মূল স্তম্ভ যদি ভাঙা যায়, অপরগুলি জাতিভেদের জীর্ণ অট্টালিকাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; অট্টালিকা ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য।

কিন্তু মূল স্তম্ভ, অর্থাৎ কর্ম সম্পর্কে উঁচু-নীচুভেদ ও বৃত্তিতে কৌলিক অধিকারকে ভাঙার উপায় কি? আমার মনে হয়, এ বিষয়ে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ। তিনি মেথরের কাজে, চামড় পাকাই বা জুতা সেলাইয়ের কাজে, ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণের কর্মীদের নিযুক্ত করিতেন। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, বা অন্য কাজেও সকলকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, সমাজের যে কাজই প্রয়োজন হউক না কেন, সে কাজ শিক্ষিত নরনারীর পক্ষে নিজের বলিয়া স্বীকার করা উচিত। অর্থাৎ তাহারা এইরূপে বৃত্তিতে কুলগত অধিকারের বেড়াকে ভাঙিয়া ফেলিবে। উপরন্তু মেথরের কাজ শিক্ষিত লোকে করিলে সে কখনও অপরিচ্ছন্নভাবে বর্তমান কালের অশিক্ষিত মেথরের মত সে কাজ করিতে পারিবে না। বরং মলমূত্রকে কৃষিভূমির জন্য উত্তম সারে পরিণত করিবে। বর্তমান কালে তথাকথিত নীচু বৃত্তিগুলির মধ্যে অশিক্ষা বা অপরিচ্ছন্নতার যে দোষ রহিয়াছে, তাহা শিক্ষিত লোকের সমাগমে দূরীভূত হইবে। কাজটিই যদি আর নোঙরা না থাকে, সমাজের সম্পদবৃদ্ধির উপায়স্বরূপ হয়, তাহা হইলে সমাজের মতি পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। বাটার কারখানায় যে ব্যক্তি দামী এবং চকচকে কলে জুতা সেলাই করে, সে ব্রাহ্মণ হইলেও আমরা তাহাকে মুচির সমান ভাবি না। কারণ আজ মুচি বলিতে নোঙরা অন্ধকার ঘরে অপরিচ্ছন্ন মানুষের ছবি ছাড়া আর কিছু আমাদের মনে জাগে না।

যে উপায়ে গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম। হুগলী জেলায় সম্প্রতি কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী গ্রামের মাঠে গরুর হাড় কুড়াইয়া তাহা ঢেঁকিতে কুটিয়া স্বীয় অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিতেছেন ও গ্রামেও উন্নত সারের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের পিতা ইতিমধ্যে তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। তিনি কিন্তু তাহাতে দমেন নাই, কারণ তিনি আজ আর একা নন। এইরূপ সমাজ-বিপ্লবে যথার্থ উৎসাহী কর্মী স্বীয় আদর্শ এবং দুঃখ বরণের দ্বারা যে শিক্ষা সমাজকে দিতেছেন তাহার দ্বারাই জাতিভেদের মূল দ্রুত উৎপাটিত হইবে, চাকরির যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সেরূপ দ্রুত হইবে না, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়।

সর্বশেষে, গান্ধীজী মনে করিতেন, এরূপ দেশসেবকগণ জাতিভেদের ব্যবধান না মানিয়া তথাকথিত নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান করিবেন। তাহাই আমাদের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্নবৃত্তিধারী ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে যদি বাধা দূরীকৃত হয়, তখন সমাজ সমতাসম্পন্ন হইয়াছে, এ কথা বলা চলিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সংবাদ-সাহিত্য

আমরা বাঙালী, বাঙালীয়ানার গৌরব করি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে নূতন ভারতবর্ষ গঠনে এবং শিক্ষায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে ধর্ম-সমাজ-সংস্কারে ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে নব্য ভারতকে প্রতিষ্ঠা দানে বাঙালীর সাধনা ও সিদ্ধির কথা শুধু আমরাই বলি না, ভারতবর্ষের বাহিরে জ্ঞানী মনীষীগণ অকুণ্ঠিত প্রশংসার সহিত সে কথা স্বীকার করেন। সেকালের বাঙালী সাধকদের ভারত-মুখীতা আজ সর্বজনবিদিত। সেকালের ধনীরাও বাঙালীর সাহিত্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য অকৃপণভাবে দান করিয়াছেন। ফলে বৎসরে বৎসরে বিরাট সমারোহের সঙ্গে বাংলা দেশের নানা স্থানে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মেলন ঘটিয়াছে, কি উপায়ে আরও প্রসার ও প্রতিপত্তি সম্ভব তাহার জন্য সমবেতভাবে চিন্তা ও কার্য হইয়াছে। অর্থাভাবে দীর্ঘকাল এই সম্মেলন বন্ধ হইয়া আছে। বাংলা দেশে সাহিত্য-সমাজ বলিয়া যে কিছু আছে, ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া জাতির কল্যাণের জন্য সাহিত্যিকেরা যে সকলে মিলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন, ইহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দুর্গাপূজার কলা-বউয়ের মত পূজার উৎসবে স্মৃতিসভায় অথবা পাড়ার ব্যায়ামাগার-প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যিকের একটা স্থান ও একগাছি মালা নির্দিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু ওই পর্যন্ত। সারা ভারতবর্ষে প্রবাসী সাজিয়া বৎসরে বৎসরে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে

ব্যবধান বাড়াইয়া চলিয়াছে, বাঙালীর সাহিত্য-সম্মেলনের ইহা অপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা অধুনা দেখা যাইতেছে না।

* * *

গত মাসেক কালের মধ্যে এলাহাবাদে কলিকাতায় পাটনায় হিন্দী সাহিত্যিকদের সম্মেলন হইয়া গেল এবং দুই-এক দিনের মধ্যে দিল্লীতে প্রধানত হিন্দীওয়ালাদের সম্মেলন হইবে। সমারোহ হাঁক ডাক ও ব্যয়ের আধিক্য দেখিয়া মনে হয়, সমস্ত হিন্দীভাষাভাষী সমাজ এই সকল সম্মেলনের পিছনে আছেন। তাঁহাদের শুধু সহানুভূতি নয়, সক্রিয় সহযোগ আছে। তাঁহারা ভারতবর্ষের কোথাও প্রবাসী নন, সর্বত্রই তাঁহাদের সমান অধিকার। শুধু গভর্মেণ্টের সহায়তা দ্বারা যে এরূপ হইতে পারিয়াছে তাহা নয়, ভাষা সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিন্দীওয়ালারা এখনও হিম (callous) হইয়া যান নাই, একদা ফার্স্ট হইয়া চিরতরে পড়ায় ঢিল দেওয়ার দুর্বুদ্ধি বাঙালীর কাছ হইতে এখনও তাঁহাদের মধ্যে সংক্রমিত হয় নাই, তাঁহাদের এখন উঠ্‌তি অবস্থা। আমরা বাঙালীরা কাজের হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, শুধু কথার হাল ধরিয়া বসিয়া আছি এবং শুক্‌না ডাঙায় মাঝে মাঝে "হেঁইয়ো হো হেঁইয়ো হো" করিতেছি বটে, কিন্তু বাকি সময় "পীর বদর পীর বদর" বলিয়া বুক চাপড়াইতেছি। বাংলার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এতাবৎকাল পৃষ্ঠপোষক জমিদার-সম্প্রদায় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু হালী বড়লোক যে অনেক নাই তাহা নহে, তাঁহাদিগকে দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল করিয়া তুলিবার মত চেষ্টা নাই। শিল্পী সাহিত্যিক মনীষীদের সমাজ ও সম্মেলন জীবিত ও সক্রিয় থাকিলে তাঁহারা মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতেন। ইঁহারা জনসাধারণের ও ধনীসম্প্রদায়ের সহিত নানাভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারিলে তাঁহারাও যে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেন না—এ কথা বিশ্বাস্য নহে।

পৃথিবীর পূর্বাপর সকল ইতিহাসেই দেখা যায়, সর্বত্র ধর্ম ও রাষ্ট্র আন্দোলনের সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের নবজাগরণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কিছু দিন যাইতে না যাইতে সাহিত্যে ও শিল্পে গতানুগতিকতার দৈন্য দেখা দেয়, আসল বস্তু নিষ্প্রাণ হইয়া নানাবিধ বাহ্য আড়ম্বরে বিচিত্র সূক্ষ্মতার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সাহিত্য ও শিল্প তখন ডিকাডেন্ট বা পতিত বলিয়া চিহ্নিত হয়। তখন এক-একজন মহামানব বা অবতারকে কেন্দ্র করিযা অথবা একটা মহান তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া গতানুগতিক মানুষ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, মানবদেহে নূতন রক্তসঞ্চারের মত সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেহে নূতন ভাবাবেগের সঞ্চার হয়, সাহিত্য ও শিল্প আবার নূতন হইয়া দেখা দেয়। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করিযা এবং বাংলা দেশে চৈতন্যদেবকে লইয়া এই নব জাগরণ আমরা দেখিযাছি। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফরাসী-বিপ্লব, রুশ-বিপ্লব বিভিন্ন তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিযাছে এবং এই বিপ্লবের আগে ও পরে সাহিত্য ও শিল্পেও নূতন ভাব ও উন্মাদনা দেখা গিয়াছে। বাংলা দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় স্বদেশী-আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যে নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে দেশের আপামরসাধারণ এই আন্দোলনে, কাজের দিক দিয়া না হউক, মনের দিক দিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সাহিত্য ও শিল্প জাতীয়-আন্দোলনকে যেমন পুষ্ট করিয়াছিল, জাতীয়-আন্দোলনও তেমনই সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছিল।

*

তাহার পর মহাত্মা গান্ধীর নব-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে যে বিপ্লব ঘটিল, সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালীর মনের সায় কোন দিনই ছিল না। বাংলা দেশ তন্ত্রের দেশ। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় সত্ত্বেও বাঙালী মনেপ্রাণে শাক্ত, মাতৃতন্ত্রের উপাসক। বাঙালীর মনীষা ও সাধনাই দেশকে মা বলাইতে শিখাইয়াছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র একান্ত বাঙালীরই দান। ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্রের তো কথাই নাই, তাঁহারা যে মনে প্রাণে মাতৃতন্ত্রের সাধক ছিলেন ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি'তে এবং বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' 'আনন্দমঠে' তাহার প্রমাণ আছে। ধর্মগতভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দও মাতৃমন্ত্র দেশকে

শুনাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বাঙালী রবীন্দ্রনাথও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তাঁহাকে গাহিতে হইয়াছিল—

"ওগো মা…
ডান হাতে তোর খড়্গ জলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে, রৌদ্র-বসনী।"

এই আন্দোলনে "মা মা" বলিয়া ডাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়াই বাঙালীর সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ব্রহ্মবান্ধব অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জন মুখে মায়ের নাম লইয়া কাজেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে পরবর্তী কালে বাঙালীর মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি ধীরে ধীরে সাড়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় কখনও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয় নাই। তাই বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা কোনও দিনই এই আন্দোলনের ফলে সামান্যমাত্র বিকাশ লাভ করে নাই। যে অনুপ্রেরণায় অথবা ভাববিহ্বলতায় রবীন্দ্রনাথ রুদ্র, শিবাজী ও অরবিন্দকে সম্বোধন করিয়া যথাক্রমে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'
হে রুদ্র, তব সঙ্গীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী,—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়ডমরু বাজাব।

ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে।
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥"

["সুপ্রভাত"—১৯০৯]

"মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজা বলে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে॥
মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমুরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি হে রাজন্,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ॥"

["শিবাজি-উৎসব"—১৯০৪]

"ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝংকার,—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,

নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন।
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার॥"

[নমস্কার"—১৯০৭]

সেই রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে ভারতের অদ্বিতীয় নেতা গান্ধীজীর বন্দনা লিখিতে বসিয়া একটা গুরুগম্ভীর ছন্দ পর্যন্ত স্মরণে আনিতে পারিলেন না, ছড়ার ছন্দে "গান্ধী মহারাজ" লিখিয়া কর্তব্য সমাধা করিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত গান্ধী মহারাজের রাজত্ব চলিল, বাঙালী জেলে গেল, চরকা খদ্দর প্রচার করিল, হুঁটো কাপড় পরিল, হরিজনকে কোল দিল; কিন্তু সাহিত্যে সেই রাজত্বকে জয়যুক্ত করিতে পারিল না। এই অসহযোগের ফলে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বলীয়ান অবাঙালী-ভারতবর্ষ বাঙালী জাতির প্রতি বিমুখ হইয়া যদি তাহার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকেও কোণঠাসা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তাহা সহ্য করিতেই হইবে। গান্ধীজীর তিরোভাব ঘটিলেও তাঁহার মানসপুত্রেরাই আজ ভারত-শাসনক্ষেত্রে প্রধান ও প্রবল। বাঙালীর মাতৃমন্ত্রকে বিসর্জন দিয়া তাঁহারা ইতি-মধ্যেই জনগণমন-অধিনায়ককে সেই আসনে বসাইয়াছেন। ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও তাহার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ শক্তিশালী ও জয়যুক্ত করিবার জন্য ভারতরাষ্ট্রের অধিনায়কেরাই এখন চেষ্টিত হইয়াছেন। ইংরেজী ভাষাকে আমরা যেমন একদিন মানিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, হিন্দীকেও সেইরূপ মানিতে হইবে। তবে ইংরেজী সাহিত্যের বিপুল সমৃদ্ধি হেতু সে ভাষা শিখিবার সহজ আকর্ষণ ছিল, অল্প আয়াসেই প্রেম জন্মিয়াছিল। ফলে দেড় শত বৎসরের মধ্যেই ইংরেজী আমাদের হাড়ে মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। আমরা বাংলাতে যত বই লিখিয়াছি ইংরেজীতে তাহা অপেক্ষা কম লিখি নাই, বাংলায়

যত বক্তৃতা করিয়াছি, ইংরেজীতে বক্তৃতার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশি বই কম হইবে না। সত্য বটে হিন্দীর সে সমৃদ্ধি নাই, সুতরাং সে আকর্ষণও নাই; কিন্তু সেদিক দিয়া সুবিধাও আছে। বাঙালী ইংরেজীতে গল্প উপন্যাস কবিতা সাহিত্যসমালোচনা লিখিয়াও সেই সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠার একটি পংক্তিও অধিকার করিতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়া, ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজীর মধ্যস্থতায় বিশ্বসাহিত্য উপভোগের দিক দিয়া, তাহার প্রভূত লাভ হইয়াছে। সে এখানে অধমর্ণ হইয়াই আছে এবং থাকিবে, কখনও উত্তমর্ণ হইতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দীর ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা বিপুল। সে যদি প্রেম করিয়া হিন্দী শেখে এবং সেই ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে উত্তমর্ণ হইয়া সুদে-আসলে দীর্ঘকাল উপস্বত্ব ভোগ করিতে থাকিবে। যে ভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে তাহা বিশেষ কোনও প্রদেশের ভাষা নহে, সকলকেই ইহা শিখিতে হইয়াছে ও হইতেছে। ইতিপূর্বে বাঙালী এই ভাষা শিখিয়াছে ও শিখাইয়াছে। আজ হঠাৎ নানা কারণে বাংলা ভাষার অনাদর হইয়াছে বলিয়া চাৎকারে ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে হিন্দীর প্রতি বিমুখ হইলে আখেরে আমরাই ঠকিব।

* * *

এই সহজ সরল কথাটা বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য আজ বাংলা দেশের সাহিত্যিক শিল্পী ও মনীষীদের সম্মেলন হওয়া আবশ্যক। বাংলা লিপিকুশলতাহীন অশিক্ষিত বর্বর জাতির ভাষা নহে। ইহার ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরাতন। ইহার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি বিপুল, শুধু উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্য যে বিপর্যয় উন্নতি করিয়াছে পৃথিবীতে তাহা তুলনাহীন। ইংরেজী শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা এবং বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে মারিতে পারে নাই বরং উন্নত করিয়াছে। হিন্দী বাংলাকে কোনকালেই মারিতে পারিবে না, ইহার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হয়তো না হইতে পারে। কিন্তু হিন্দীকে—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষাকে আমরা

সাহিত্যসম্পদে উন্নত করিতে পারি, ইহার মর্যাদা বাড়াইয়া নিজেরা লাভবান হইতে পারি। সে সুযোগ ছাড়িলে ক্ষতি আমাদেরই। হিন্দীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রসার নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে। বর্তমানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া একান্ত কূপমণ্ডুক হইয়া কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। ইংরেজী সাহিত্যের বর্তমান সমৃদ্ধির ইতিহাস ইহার উদারতার সাক্ষ্য দিতেছে; এ যুগে অবাধ বৃদ্ধির পক্ষে দেওয়া এবং নেওয়া দুইই সমান প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলার সাহিত্য-বুদ্ধি শাণিত হইয়াছে। সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দী সাহিত্যকেও আমরা সহজে আয়ত্তে আনিতে পারিব। দুই ভাষার উৎস এক, অন্তর্ধর্মও এক; সঙ্কোচ ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়োগ-কৌশল অধিগত করিতে পারিলেই বাঙালী সাহিত্যিকের কলকণ্ঠে হিন্দী সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিবে; বিষয়বস্তু আমাদের মোটেই অপ্রতুল নয়। পূর্বতন কমঠবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নূতন উদার প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য অচিরাৎ বাঙালী সাহিত্যিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দিল্লী-পাটনার আদর্শে কলিকাতার সরকার এই সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয়ভার যাহাতে বহন করেন, বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট সেই আবেদন জানাইতেছি।

* * *

আমরা উপরে যে সকল কথা বলিলাম, তাহার আংশিক সমর্থনে অধুনাবিস্মৃত একখানি গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। শ্রীঅমল হোম তাঁহার সংগ্রহ হইতে বইখানি আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই ইংলণ্ডের তদানীন্তন পার্লামেণ্টারী সভ্য এবং পরে প্রধান মন্ত্রী জে. র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়া *The Awakening of India* 'ভারতের জাগরণ' নামে একখানি বই লেখেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন ভারতের ইংরেজ সরকার এ দেশে বইখানির প্রচার রহিত করিয়া দেন। বইখানিতে

"The Genius of Bengal" "বাংলার প্রতিভা" শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—

The Bengali inspires the Indian nationalist movement. In Bombay, the nationalist is a Liberal politician, a reformer who takes what he can get and makes the best use of it. In the Punjab, he is a dour unimaginative individual who shows a tendency to work in a lonely furrow. In Bengal, he is a person of lively imagination who thinks of *India* and whose nationalism finds expression not only in politics but in every form of activity. Consequently, Bengal politics are too volatile, too philosophical, too nervous. There are no good political leaders there. There are excellent speakers and eloquent writers, but none of the prominent men seem to have that heaven-given capacity to lead. They can prepare men to be led, but no shepherd then steps forward to pipe the flocks to the green pastures. If Bengal could unite leaders and agitators the system of our rule in India would change as by magic.

But Bengal is perhaps doing better than making political parties. It is idealising India. It is translating nationalism into religion, into music and poetry, into painting and literature....It is creating India by song and worship, it is clothing her in queenly garments.

অরবিন্দ-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

I called on one whose name is on every lip as a wild extremist who toys with bombs and across whose path the shadow of the hangman falls. He sat under a printed text. "I will go on in the strength of the

Lord God"; he talked of the things which trouble the soul of man; he wandered aimlessly into the dim regions of aspiration where the mind finds a soothing resting-place. He was far more of a mystic than of a politician. He saw India seated on a temple throne. But how it was to arise, what the next step was to be, what the morrow of independence was to bring—to these things he had given little thought. They were not of the nature of his genius....Arabindo Ghose has made the connection between his devout Hinduism and his strenuous Nationalism clear. Man has to fulfil God, he has written, and that is only possible by fulfilling himself, this again being possible only through nationality. On this religious conception rests his belief in Swadeshi and his desire to see the English predominance in India ended.

জাতীয় আন্দোলনে মাতৃমন্ত্রের বা মাতৃপূজার প্রয়োগ বিশেষভাবে বাঙালী প্রতিভার দান।* ইহার প্রভাব ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

Hinduism is the pivot round which the life of India turns. It is a reservoir of prejudice, of feeling, of sympathy, of power as yet almost untapped, but if tapped capable of displaying a force like a swollen river which has burst its banks. It is in the worship of his gods, in his religious devotions, in his following the footsteps of his gurus that the Indian seeks after his mother, India. The Matripuja—the worship of the mother—has become a political rite....And now, when the Indian youth sees his benign mother no

---

* যাঁহারা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত খবর চান, তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সদ্য-প্রকাশিত 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী' পাঠ করিবেন।—সঃ শ. চি.

longer sitting in ashes on the wayside but enthroned in splendour and majesty on a seat of authority, it is as a goddess that he pictures her. India is indeed the mother goddess. The worship of maternity, which runs like a golden thread through nearly every one of his popular faiths, inspires the Indian's "Bande Mataram" and makes it seditious by the abondon of its filial worship, the whole heartedness of its childlike allegiance to the soil of his birth, and the luxuriant growths of tradition and sentiment which it bears. He returns to his gods and to the faith of his country, for there is no India without its Faith and there is no Faith without India.

সুতরাং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আমরাও তাঁহার কথা শুনাইয়া উদ্ধৃতি শেষ করিতেছি—

The prodigal son wanders back to his father's door. Beneath many veneers of faith, of worship, of culture, the Hindu personality persists. Let any one take up the biography of Swami Upadhyay Brahmabandhab, the catholic convert, the christian propagandist, the lecturer at Cambrige and Oxford, who never really forsook the worship of Shri Krishna, who participated in the Shivaji festival, whose Catholicism was but Hinduism plus a cross, and whose message to his countrymen was : "Whatever you are be a Hindu, be a Bengali"—and see how Hinduism can persist.

* * *

ব্রহ্মবান্ধবের এই কথাই আজ আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি যাহাই হও না কেন, হিন্দু হও এবং বাঙালী হও। রসসুষমাহীন কঠোর গান্ধীবাদের দ্বারা বাঙালীর কবিপ্রাণ উদ্‌ব্দ্ধ হয়

নাই, জৈন বিশুষ্কতায় তাহার প্রতিভা বিন্দুমাত্র বিকশিত হইতে পারে নাই। তাই পরবর্তী ভাবোচ্ছ্বাসময় মাতৃতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক্ষায় তাহাকে থাকিতে হইবে; যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন তাহার প্রস্তুতির কাল। ইংরেজী আর চলিবে না, সমগ্র ভারতবর্ষকে তখন আয়ত্ত করিবার জন্য বাঙালীকে এখন হইতেই ভাষা ও সাহিত্য লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

—

ব্রহ্মবান্ধব-প্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ-তারিখ সম্বন্ধে আমরা এমন একজনের স্মৃতির সমর্থন পাইতেছি, যিনি 'সন্ধ্যা'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইনি 'সন্ধ্যা'র ম্যানেজার শ্রীসারদাচরণ সেন গুপ্ত। রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ইনিও অভিযুক্ত হন এবং ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইবার পর ইনি মুক্তিলাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত "সারদা হাজতে কষ্ট পাচ্ছে" এই কাতরোক্তি উপাধ্যায় বার বার করিয়াছিলেন। 'সন্ধ্যা'-মামলার পরে সারদাবাবু যশোরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন, পরে ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে অ্যাটর্নি হন। তিনি অল্প দিন পূর্বে অবসর গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। আমরা যখন 'সন্ধ্যা' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট বাঙ্গালোরে ছিলেন। সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ-তারিখ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

"'শনিবারের চিঠি'র মাঘের "সংবাদ-সাহিত্যে" 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ-তারিখ সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহার পরিপূরক হিসাবে আমার স্মৃতি হইতে এইটুকু বলিতে পারি যে, 'সন্ধ্যা' ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ বাহির হইয়াছিল।

১১এ সাদার্ণ এভিনিউ শ্রীসারদাচরণ সেন গুপ্ত
কালিঘাট, কলিকাতা ২৬ ২৮. ২. ৫১"

অর্থাৎ, 'সন্ধ্যা' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, পরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করেন।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ গলদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেন। তদন্ত কমিটি গত বৎসরে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। কাটজু সাহেব নিশ্চয়ই তাহা পাঠ করিয়াছেন। তিনি তাহা বিবেচনার জন্ত সিনেট সভায় দিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবুর নামে কতকগুলি অভিযোগ করা হইয়াছে; কমিটির মতে এই অভিযোগগুলি হয় সত্য, না হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরিয়া লই কমিটি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে সেনেট সভায় ইহা পুনরালোচনা করিতে দিয়া কাটজু সাহেব ভাল করেন নাই। আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় কমিটি তাঁহার নামের অভিযোগগুলি সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে কাটজু সাহেব রমাপ্রসাদ-বাবু রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হইলে তাঁহার নির্বাচনে সেনেট সভার আলোচনার পূর্বে সম্মতি দিয়া ভাল করেন নাই। কারণ Indian Universities Act VIII of 1904-এর ৫ ধারার ৩ উপধারায় আছে—

'The election of any ordinary fellow shall be subject to the approval of the chancellor.'

রমাপ্রসাদ বাবুর নির্বাচনে সেনেট সভার আলোচনার পূর্বে কাটজু সাহেব approval বা সম্মতি দিয়া সরকারী চাকুরে তথা nominated fellowদের অসুবিধার ফেলিয়াছেন। কাটজু সাহেবের এই কার্যের কি যুক্তিযুক্ত সদুত্তর তাহা আমরা জানি না। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া দেন তো বড় ভাল হয়।"

আমাদের একজন পাঠক উপরের আবেদনটি সাধারণের গোচরার্থে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। কোনও ওয়াকিবহাল

ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করিলে অনেক সকারণ বা অকারণ সন্দেহ হইতে বাঙালী পাঠক নিষ্কৃতি পাইবেন।

বিভূতিভূষণ-প্রসঙ্গ

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "বিভূতিভূষণের জীবন-কথা" লিখিয়াছিলাম। উপকরণ কিছুই ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা কথা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিম্বদন্তীর উপরও নির্ভর করিয়াছিলাম। বিভূতিভূষণের জন্মতারিখ লইয়া গোলমাল ছিল সর্বাধিক। বিভিন্ন গল্পসংগ্রহ-পুস্তকে লেখকের জীবনী-অংশ স্বভাবত লেখকেরাই সরবরাহ করেন, এইরূপ তিনখানিতে বিভূতিভূষণ স্বয়ং জন্মতারিখ ২৯ ভাদ্র এবং জন্মের সাল ১৩০৩ হইতে ১৩০৫ দিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান ও প্রতিষ্ঠান হইতে বিভূতিভূষণের জন্মদিবস পালনের ব্যবস্থা করিতে গিয়া উদ্যোক্তারা সঠিক তারিখের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিয়া যে জবাব পাইয়াছেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত সেইরূপ পত্রও দুই-তিনখানি দেখিয়াছি। ২৯ ভাদ্র ১৩০৩কেই জন্মতারিখ বলিয়া চালাইবার আগ্রহ প্রবল দেখি। বিভূতিভূষণের পরিবারে বুধবার তাঁহার জন্ম-বার বলিয়া বরাবর পালিত হইয়াছে। ২৯শে ভাদ্র এবং বুধবার ধরিয়া পুরাতন পঞ্জিকানুযায়ী হিসাব করিয়া ২৯ ভাদ্র ১৩০০, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ পাইয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে বয়স দেওয়া ছিল (১৯৷৷) আমাদের হিসাবে তাহা এক বৎসর কম ছিল। সম্প্রতি বিভূতিভূষণের শ্যালক শ্রীমান চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ঘাটশিলা হইতে বিভূতির পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহের খাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। তাহাতে শুধু বিভূতি কেন, মহানন্দের সব কয়টি পুত্র-কন্যার জন্মকাল ও তৎসহ কোষ্ঠীর খসড়া লিখিত আছে। মাঝে মাঝে গদ্যে ও পদ্যে কুল-পরিচয়ও আছে। এই খাতা হইতে দেখিতেছি, বার বুধবার কিন্তু তারিখ ২৯ নয়, ২৮ ভাদ্র। সুতরাং আমাদের তারিখে ঠিক এক দিন কম এক বৎসরের ভুল হইয়াছে। বিভূতিভূষণের পিতার খাতা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে হুবহু তুলিয়া দিলাম—

"জন্মপত্রিকা

(শুক্লপক্ষ) ১৩০১ সাল ২৮শে ভাদ্র বুধবার দিবা ১০॥ সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয় ॥ মুরাতিপুর গ্রামে। ইংরাজী ১৮৯৪। ১২ সেপ্টেম্বর। দিবা ৩০।৪২ রাত্র ২৯।১৮

২৮ ভাদ্র বুধবার ত্রয়োদশী ৬০। শ্রবণা নক্ষত্র ১২।৪৫ ইং দিবা ১০।৫৮ কৌলবকরণ অতিগণ্ডযোগ ১২।২২ ইং দিবা ১।৪৮।৪৮ যাত্রা নাস্তি পাপযোগ·········জন্মে মকর রাশি দেবগণ শূদ্রবর্ণ·· ······

শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী কথক

সাং বারাকপুর। মহকুমা বনগ্রাম"

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ যাহা এই খাতায় আছে, তাহাও এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি—

"১২৯৬ সাল। ২৪ জ্যৈষ্ঠ পক্ষান্তরে বিবাহ করি।

এই মাসেই পরিবারের বয়স পূর্ণ ১২।"

এই কন্যাই বিভূতিভূষণের মাতা মৃণালিনী দেবী। ইনি বর্ধমান শহরের খোশবাগানপাড়ানিবাসী গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। গুরুচরণের দেশ ছিল মুরাতিপুর, পোস্ট অফিস কাঁচড়াপাড়া।

"বিভূতিভূষণের মাতামহ গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রমাতামহ রামহরিরাম চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ প্রমাতামহ লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ দর্পনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান। (সর্ব্বানন্দী)"

মৃণালিনীর গর্ভে মহানন্দের ৫টি সন্তান হয়। যথাক্রমে তাঁহাদের নাম ও জন্মকাল এই—

১। বিভূতিভূষণ ২৮ ভাদ্র ১৩০১
২। ইন্দুভূষণ ১৮ ভাদ্র ১৩০৪
৩। জাহ্নবী ৬ চৈত্র ১৩০৫
৪। সরস্বতী ["আশালতা" নহে] ১১ আশ্বিন ১৩০৮
৫। নুটবিহারী ৮ শ্রাবণ ১৩১২

"বিভূতিভূষণের উপনয়ন

শুক্লপক্ষ চন্দ্র ফাল্গুন আমার পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবাজীর উপনয়ন সন ১৩১৩ সাল ৫ ফাল্গুন রবিবার পঞ্চমী তিথিতে দেওয়া গেল। বারাকপুর ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী। ১৯০৭"

মহানন্দের খাতায় আর একটা কৌতুককর জিনিস আছে—কুল-পরিচয়। ইহা বিভূতিভূষণের জবানীতে মহানন্দ পয়ারে রচনা করিয়াছিলেন।—

"কুলপরিচয়

কুলপরিচয় মম শুন সর্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্মপরায়ণ॥
ফুলিয়া খড়দহ সর্ব্বানন্দী আর।
বল্লভী নামেতে আছে বাঁধা মেল চার॥
খড়দহ মেলে থাকি কুলে বড় খাঁটি।
বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্যঘাটী॥
নবাই সবাই আর বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্বপুরুষ তিন সহোদর॥
সুন্দরের বংশাভাব এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান নানা স্থানে পরিচিত॥
মধ্যম সবাই বড় ধর্ম্মপরায়ণ।
তস্য বংশধর আমি করহ শ্রবণ॥
ভাবে ভঙ্গ নহে ব্যঙ্গ প্রবরেতে তিন।
শাণ্ডিল্য গোত্রে মম কভু নহি হীন॥
কুলিনের পরিচয় আর কত চাও।
মেকী টাকা নহি আমি বাজাইয়া নাও॥"

বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রাম হাইস্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র (ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস নহে) তখন মহানন্দের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইহা বাংলা ১১১৮ সন, ইংরেজী ১৯১১-১২।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭

কয়েকটি প্রশ্ন

ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছে, সকলের কাছে তাহা নিবেদন করিতেছি।

প্রথম প্রশ্ন দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে যে কথাটা সব চেয়ে বেশি করিয়া মনে হয়, সেটা হইল জনসাধারণের বর্তমান মানসিক অবস্থা। কত আশা ছিল, সে সব আশা হতাশায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। ক্ষোভ, ক্রোধ, অসন্তোষ রুদ্ধ গর্জন আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের এখন প্রত্যেকেরই কাজ করা দরকার, তাহা না হইলে এ সব দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ সমাধান হইবে না—এ কথাটা আমরা এখনও ভাল মত বুঝি নাই। কিন্তু আমাদের কি ধরনে চিন্তা করা উচিত, সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। কি পথে আমাদের চিন্তাধারা চলিতেছে, সেই কথাটাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যাহা বাস্তবে ঘটিতেছে সেটা হইল এই:—আমরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝিতেছি না, অথচ দুঃখ-কষ্ট যতই বাড়িতেছে, আমাদের ক্ষোভ, হতাশা ও ক্রোধও তেমনই বাড়িতেছে। ফলে চিন্তাভাবনা করিয়া কাজ করার অভ্যাস যেন আমরা ছাড়িয়াই দিয়াছি। "ধুত্তোর, যাহা হয় হউক" বলিয়া যাহা কিছু মনে আসিবে তাহাই করিতে আমরা যেন আর ইতস্ততঃ করিতেছি না, যাহা কিছু সামনে পাইব তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে আমাদের আর যেন কোনও বাধা নাই। অবস্থাটা যেন দাঁড়াইয়াছে ঠিক এইরকম:—

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us. (Dickens : *A Tale of Two Cities*)

কিন্তু এই বর্ণনাটা হইল ফরাসী বিপ্লবের সময়ের ফরাসী দেশের বর্ণনা। তবে কি যে মনোবৃত্তি হইতে বিপ্লব হয়, যে আবহাওয়ায়

বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়, এ দেশেও সেই মনোবৃত্তির সন্ধান, সেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে? ইহা কি বিপ্লবের পূর্বাভাস? অর্থাৎ লোকে নিজেরা বিপ্লব করুক আর নাই করুক, যদি কোনও রকমে গোলমাল শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে তাহারা বাধা তো দিবেই না, বরং তাহার জন্যই তাহাদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়া আছে—ইহাই কি বর্তমান কালের ইঙ্গিত?

ইহাই হইল প্রথম প্রশ্ন।

দুই

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মার্ক্স বলিয়াছেন যে, ভূমিতান্ত্রিক সমাজে যেমন ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের বীজ ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়, ফলে ভূমিতান্ত্রিক সমাজের বদলে ধনতান্ত্রিক সমাজই ক্রমে দেখা দেয়; তেমনই ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসের বীজ ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই নিহিত আছে। মার্ক্সের কথায়, not only has the bourgeoisie forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the men who are to weild these weapons—the modern working class, the proletarians. কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা মজুর ছিল না, তাহারাও ক্রমে সর্বহারা মজুরে পরিণত হয়। মার্ক্সের কথায়, The lower strata of the middle class—the small tradespeople, shopkeepers and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat....Thus the proletariat is recruited from all classes of the population.

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তো এখন নূতন করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজ গড়িতেছে। কিন্তু বাংলার অবস্থা তাহার বিপরীত। এখানে মধ্যবিত্ত সমাজ বহু পূর্বেই হইয়াছিল, ভাঙনও ধরিয়াছে অন্যান্য প্রদেশের আগেই। কিন্তু সে কথা যাক। আজ বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর অধিকাংশই তো আর 'ভদ্রলোক' থাকিতে পারিতেছে না, মজুরির পেশাই গ্রহণ করিতেছে। তবে কি মার্ক্স যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তাহাই দেখিতেছি?

হারাই কি কমিউনিজ্‌মের সক্রিয় সজ্ঞান অগ্রদূত? তাহা ছাড়া ীরাও তো ক্রমেই ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হইতেছে?

তিন

ধনতন্ত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন ঐভাবে সটারিয়েটের জন্ম হইতে থাকে, অন্য দিকে তেমনই ধনতন্ত্রের প্রসার শের সীমানা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এই টাই লেনিন খুব জোর করিয়া বলিয়াছিলেন। ধনতন্ত্রের একটা শিষ্ট্যই হইল সে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন সে সেই দেশের মূলধনকে নষ্ট করিতে চায়, দাবাইয়া রাখিতে চায়। ইংরেজ-াজ্যবাদের অধীনে ভারতবর্ষের সে অবস্থা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু য যখন অধীন দেশগুলিতে গণচেতনার বিকাশ হয়, সাম্রাজ্যবাদের ষ্ট কমিতে থাকে, অধীন দেশগুলিতেও মূলধন জড়ো হইতে থাকে, ন অধীন দেশগুলির মূলধনের সঙ্গে বৈদেশিক মূলধন রফা করিয়া লে। এই রকম সন্ধির মারফৎ ধনতন্ত্রের জাল জগৎময় বিস্তৃত তে থাকে।

আজ তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার হইতে ভারত মুক্তি ইয়াছে। কিন্তু আজ এখানে যে মূলধন জড়ো হইয়া উঠিয়াছে, টিশ মূলধন কি তাহার সহিত একটা রফা করিতেছে না? এইভাবে তন্ত্রের জাল কি দেশময় ছড়াইতেছে না? ভারতবর্ষে একালে বলা-ন্যুফিল্ড, টাটা-মার্শাল, সেন-র‍্যালে প্রভৃতি যে সংযুক্ত প্রচেষ্টা তেছে, ইহা কি তাহারই নিদর্শন? আমরা কি ধনতন্ত্রে সেই পর্যায়ে সিয়া পৌছিয়াছি?

সমাজশাস্ত্রীরা বলেন, এই পর্যায়ের পরই দেখা যায় যে দেশী ধনতন্ত্র ের ধাপেই বিদেশী ধনতন্ত্রকে আরও হটাইয়া দিয়া নিজেই কাইয়া বসে। এখন বাধ্য হইয়া সে বিদেশী ধনতন্ত্রের সহিত চুক্তি য়া আছে। কিন্তু আরও একটু সবল হইলেই, আরও একটু ত-কলেবর হইলেই সে আর বিদেশী ধনতন্ত্রের সহিত রফা করিবার য়োজন অনুভব করিবে না, নিজেই প্রভু হইয়া বসিবে। আমাদের য়ের ধাপ কি তাহাই?

চার

কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন মনে হয়। যদি বিপ্লবের এ...
সব লক্ষণই দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে বিপ্লব ঘটিতেছে না কেন?
কমিউনিস্ট দল ভারতবর্ষে কিছুদিন হইতে মারামারি হৈ-চৈ করিয়া
বিপ্লবের চেষ্টা করিতেছিলেন—অন্তত সেই দিকেই তাঁহারা ভাবিতে-
ছিলেন। তাহাতে জনসাধারণ সাড়া দেয় নাই। কিছুদিন পূর্বে
কমিউনিস্ট দল নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভুল
করিয়াছিলেন। এইরূপ মারামারি কাটাকাটির চেষ্টায় জনমন সাড়া
দেয় নাই, ফলে সে চেষ্টা করিতে গিয়া কমিউনিস্টরাই জনসাধারণ
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নীতি
বদলাইয়াছেন। পূর্বে তাঁহারা মধ্যবিত্ত সমাজকেও পরগাছা বলিয়া
নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু এই নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত
সমাজের—বিশেষত নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের—স্বপক্ষে তাঁহারা বলিতে
শুরু করিয়াছেন।

তবে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বিপ্লব যে সব কারণে হয়, সে সব
নানা কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এবং বিপ্লবের অনুকূল মানসিক
প্রস্তুতিও খানিকটা থাকা সত্ত্বেও দেশের লোক হাতেকলমে বিপ্লবে
সাড়া দিবার উৎসাহ পাইতেছে না?

যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি? এই নিরুৎসাহ, এ কি
ভারতবর্ষের চিরাচরিত কুঁড়েমি,—অজগরের ঘুম? অথবা বিপ্লবের
প্রতি সজ্ঞান বিতৃষ্ণা? যদি প্রথমটা হয়, তাহা হইলে যেদিন সে ঘুম
ভাঙিবে, সেদিনই দেশময় বিপ্লব আরম্ভ হইবে। যদি দ্বিতীয়টি হয়
তাহা হইলে অবশ্য অন্য কথা। ইহা কোন্‌টি?

পাঁচ

বিপ্লব বলিতে এই প্রসঙ্গে কি বুঝি? নানা নূতন আইনকানুন
করিয়াও তো সমাজের বৈপ্লবিক চেহারা-বদল করা যায়। কিন্তু
যাঁহারা বিপ্লবের কথা বলেন, তাঁহারা তো সে ধরনের বিপ্লবের কথা
বলেন না। লেনিন বলিতেন, বিপ্লবের অর্থই হইল forcible des-
truction of the state machine। জোর করিয়া ভাঙা চাই।
ওসব আইনকানুনের মধ্য দিয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় না।

সুতরাং আজ কি প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, যদি আইনকানুনের মধ্য দিয়া আমরা সমাজের আমূল পরিবর্তন না আনিতে পারি তাহা হইলে কি সশস্ত্র বিপ্লব এবং forcible destruction of the state machine অনিবার্য ? লোকে আইনের উপর ভরসা হারাইলেই নিজের হাতে আইন লইবে, ইহাই কি ইতিহাসের ইঙ্গিত ? আমরা কি আইনের মধ্য দিয়া সমাজের বৈপ্লবিক বদল করিতে পারিব না ?

ছয়

শেষ পর্যন্ত কি ইহাই দাঁড়াইতেছে, যে যদি লোকে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, আর যদি বোঝে যে (১) রাষ্ট্র যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে এখন দুঃখকষ্ট যতই হোক না কেন, পরিণামে মঙ্গল হইবে ; (২) রাষ্ট্র যে মঙ্গল সাধন করিতে চাহিতেছে তাহা জনসাধারণরই মঙ্গল, অন্ত স্বার্থের নহে ; (৩) তাহারা যে দুঃখকষ্ট আপাতত ভোগ করিতেছে তাহা সকলেই সমানভাবে ভোগ করিতেছে—কেহ বেশ আরামে আছে, অপর সকলের কষ্টের অবধি নাই—এমন নয় ; তাহা হইলেই তাহারা বেশ নিশ্চিন্তে থাকিবে, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবিবে না ? বিশেষত যখন কুঁড়েমি আমাদের মজ্জাগত এবং ঐরকম মারামারি কাটাকাটি সাধারণত আমাদের শান্তশিষ্ট ধাতে পোষায় না ?

অর্থাৎ, সশস্ত্র বিপ্লব হইতে যদি অব্যাহতি পাইতে হয় তাহা হইলে উপরে উল্লিখিত কাজগুলি না করিলে উপায় নাই ?

"দায়ভাগী"

গীতাভাষ্য

(আলোচনা)

মাঘ ১৩৫৭-র 'শনিবারের চিঠি'তে "বেপরোয়া" নাম দিয়া একজন লেখক "গীতাভাষ্য" প্রবন্ধে গীতার সমালোচনা করিয়াছেন। শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ গীতার অধিকাংশ শ্লোক স্বয়ং ভগবানের বাণী বলিয়া মান্য করিয়াছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি আধুনিক মনীষিগণ ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ; পাশ্চাত্য বিদ্বানগণও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যথা, Von

Humboldt বলিয়াছেন, আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি আমাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন যে আমি গীতা পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আলোচনা সংযতভাবে করা উচিত, কিন্তু লেখক অসংযত ভাষায় অপমানজনক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত নিন্দার্হ। তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি অত্যন্ত অন্যায় কার্য করিতেছেন, এজন্য নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই, ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া গুপ্তঘাতকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।

লেখক উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কোনও সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, উপনিষদ পড়িলে মনে হয় "আমরা যেন আর এক জগতে এক উন্নততর মহত্তর অতিবলিষ্ঠ ও তেজস্বী মানবসমাজে এসে পৌঁছেছি যে সমাজের প্রেরণা তেজ, বীর্য, মেধা, জ্ঞান, মঙ্গল অমৃত আনন্দ সংযম ও শান্তির বাণীতে ভরপুর"। উপনিষদের প্রশংসা করিয়া এবং গীতার নিন্দা করিয়া তিনি পরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। কারণ গীতা উপনিষদের সারবস্তু।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

মৃত্যুর পরে আত্মা নূতন দেহ গ্রহণ করে—এই কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন বলিয়া লেখক নানারূপ বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। লেখক কি ইহা জানেন না যে, পুনর্জন্মবাদ উপনিষদেও আছে, হিন্দুর সকল ধর্মগ্রন্থে আছে,—ইহ হিন্দুধর্মের সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত? কঠোপনিষদ বলিয়াছেন

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম যথা শ্রুতম্॥ ২।২।৭

অর্থাৎ, "দেহ ধারণ করিবার জন্য কতকগুলি আত্মা যোনির মধ্যে প্রবেশ করে, অন্য আত্মা উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করে,—কর্ম ও বিদ্যা অনুসারে বিভিন্ন আত্মা বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন যে, পূর্বজন্মে যাহারা ভাল কর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং

বা, কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিমাপদ্যন্তে
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা। ৫।১০।৭

পূর্বজন্ম স্বীকার না করিলে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া যায় না কেন একজন সুস্থ দেহে জন্মগ্রহণ করে, কেন একজন রুগ্ন দেহে জন্মগ্রহণ করে। তথাপি লেখক এই পুনর্জন্মবাদকে "শ্রীকৃষ্ণের বাজে কথা" বলিয়াছেন। ইহা "শ্রীকৃষ্ণের বাজে কথা" নহে। ইহা উপনিষদের বাণী। ইহা সকল হিন্দুদর্শনের মত। বুদ্ধদেবও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

লেখক কেবল পুনর্জন্মবাদকে উপহাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আত্মার অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি নাকি উপনিষদের উপর গভীর আস্থা পোষণ করেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন জীবদেহে আত্মা কখন প্রথম আসে? ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০ অধ্যায়ে আত্মার স্বর্গ হইতে আসিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিবার বিবরণ আছে,—চন্দ্রমণ্ডল হইতে নামিয়া মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে আসে, তাহার পর শস্যের মধ্যে অবস্থান করে, পরে ওই শস্যভোজনকারী পুরুষের দেহে প্রবেশ করে, পুরুষের দেহ হইতে তাহার শুক্রের সহিত রমণীর গর্ভে প্রবেশ করে। লেখক বলিয়াছেন, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বি বীজ মিলিত হইয়া মনুষ্য-দেহ সৃষ্টি করে, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উভয়বিধ জীবের ক্ষুদ্র আত্মা মিলিত হইয়া কি পুরুষের "বড় আত্মা"র সৃষ্টি করে? উপনিষদের বিবরণ হইতে বোঝা যায়, শুক্রকীটের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র আত্মা হইতে মনুষ্যের আত্মা পৃথক। মনুষ্যদেহের বহুসংখ্যক জীবকোষের আত্মা হইতে মনুষ্যের আত্মা পৃথক। লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেহমুক্ত আত্মা কর্মফল ভোগ করে না। সুতরাং তাঁহার মতে বেদ-পুরাণ কোরাণ-বাইবেল-ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-যোগ সবই মিথ্যা। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও গীতাকে লক্ষ্য করিয়া কেন বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন ইহা বলা কঠিন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, "অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার কর্তব্য, তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে তোমার পাপ হইবে।" লেখক শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের নিন্দা করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, "ধর্ম এমন কিছু যাহা দেশ-কাল-ব্যক্তি ও জাতি নিরপেক্ষ" "স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি শ্রীকৃষ্ণের এই বিধানকে একটুও আমল দেবে না।" সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে দণ্ডনীয় হয়, সকল দেশেরই এই নিয়ম। লেখকের

মতে একজনের যাহা ধর্ম, সকলেরই তাহা ধর্ম হওয়া উচিত। ইহাও যথার্থ নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বধ করা সৈনিকের ধর্ম হইতে পারে, সেবাব্রতীর (nurse) তাহা ধর্ম নহে। গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ও সন্তান উৎপাদন ধর্ম হইতে পারে, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা অধর্ম। হিন্দুশাস্ত্রে দুই প্রকার ধর্ম আছে,—সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম। সাধারণ ধর্ম মনুষ্যমাত্রের পালনীয়, যথা অহিংসা, সত্য, পরদ্রব্যের গ্রহণ না করা, দেহ ও মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম (অহিংসা অর্থাৎ অবৈধ হিংসা, রাবণ বধ বা কংস বধ হিংসা নহে)। বিশেষ ধর্ম, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধর্ম, পুত্রের ধর্ম, শিষ্যের ধর্ম, পত্নীর ধর্ম। বিশেষ ধর্ম যাহার জন্য বিহিত তাহারই ধর্ম,—অন্যের নহে। পাশ্চাত্য সমাজেও যুদ্ধ করা সৈনিকের কর্তব্য; পাদ্রির নহে।

গীতায় ২য় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ শ্লোকে বেদের একটা বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যার নিন্দা করা হইয়াছে, বেদের নিন্দা করা হয় নাই। লেখক তাহা বুঝিতে পারেন নাই এবং সেজন্য বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নাকি এখানে বেদকে "নিছক গালমন্দ" দিয়াছেন। শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২।৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ২।৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪৪

ইহার অর্থ এইরূপ :—বেদে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গে গিয়া নানা সুখভোগ করা যায়; কতকগুলি অপণ্ডিত বেদের এই সকল বাক্যের উপরেই জোর দেয় এবং বলে যে, স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোক্ষ বলিয়া কোনও বস্তু নাই; স্বর্গ লাভের জন্য যজ্ঞ করিতেই তাহারা উপদেশ দেয়; ভোগচিন্তায় তাহাদের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট হয় যে তাহারা ঈশ্বরলাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাধি অবলম্বন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, এই মত ভ্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য এই যে, নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করা উচিত। যজ্ঞ ত্যাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। গীতায় অন্যত্র তিনি ইহা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।

এতন্যাপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮।৬

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাদের অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহারা চিত্ত শুদ্ধ করে, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করা উচিত, ইহা আমার নিশ্চিত মত।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্। ১৫।১৫

"সকল বেদের দ্বারা আমাকে জানিতে হয়, আমি বেদান্ত সম্প্রদায় সকল প্রবর্তন করিয়াছি, আমিই বেদের প্রকৃত অর্থ জানি।"

পুনশ্চ বলিয়াছেন,

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। ১৬।২৪

অর্থাৎ কোন্ কর্ম কর্তব্য এবং কোন্ কর্ম কর্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ বেদ এবং বেদমূলক পুরাণাদি গ্রন্থ। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বেদের নিন্দা করা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। গীতার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, গীতা সকল বেদের সার "তদিদং গীতাশাস্ত্রং নিখিলবেদার্থ সারভূতং"। শঙ্কর যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ" অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়। লেখক বলিয়াছেন, এখন যজ্ঞ হয় না তবু মেঘ হয়, অতএব শ্রীকৃষ্ণের এ সব উক্তি "অসত্য"। লেখক যে মনে করিয়াছেন—যজ্ঞ এখন হয় না, তাহা সত্য নহে। এখনও পূজা পার্বণ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বহু যজ্ঞ হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামী করপাত্রীজির উদ্যোগে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিল্লী, কানপুর, কাশী প্রভৃতি নানা স্থলে বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। এখনও প্রতি বৎসর হয়। তাহা ছাড়া গীতাতে অনেক প্রকার যজ্ঞের কথা আছে, সবই দ্রব্যযজ্ঞ নয়। দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয় ইহাও বলা হইয়াছে।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, লেখক তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার প্রতি কর্তব্যবোধে এই প্রবন্ধ তিনি ছাপাইয়াছেন, যদিও তিনি জানেন ইহা সত্য নহে। শিক্ষকের প্রতি তাঁহার কর্তব্য পালন

করিতে গিয়া তিনি হিন্দুধর্মের নিকট, গীতার নিকট, ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। যে কোনও ধর্মের অন্যায় ভাবে অপমান করা পাপ, নিজের ধর্মের অন্যায় ভাবে অপমান করা আরও বেশি পাপ। যেমন অপরের পিতাকে অপমান করা অপেক্ষা নিজের পিতাকে অপমান করা আরও বেশি পাপ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেছেন, 'বেপরোয়া বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের গীতাভাষ্যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্মগ্রন্থ গীতাকে কোতল করা হয়েছে। প্রথম কথা, একে গীতার একটি আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ভাষ্য বলব কি না! দ্বিতীয় কথা, যদি একে ভাষ্যই বলি, তা হ'লেও এই ভাষ্যে গীতাকে কোতল করা হয়েছে কি না।

গীতার পনের-ষোলটি প্রামাণ্য ভাষ্য বিদ্যমান। ভাষ্যকারেরা সকলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গীতার আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন—অবশ্য নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী। বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের ভাষ্যে সমগ্র গীতার আলোচনা নেই। আছে কয়েকটির শ্লোকের সমালোচনা—তা মারমুখো। কাজেই আর যা হোক এ ভাষ্য হয় নি। গীতায় যা আছে তা তাঁর কাছে অসঙ্গত, আজগবী, বীভৎস মনে হ'লে, ভারতবর্ষের মত বাক্‌স্বাধীনতার দেশে অবশ্যই তিনি তা বলতে পারেন। আমার কিন্তু মনে হয়, ভাষ্যলেখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রস-রচনা—গীতাকে উপলক্ষ্য ক'রে।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় একে কেন কোতল করা বলেছেন বোঝা গেল না। কোতল করতে হ'লে মাথাটাই কেটে ফেলতে হয়। বৈজ্ঞানিক মহাশয় গীতার এখান থেকে কিছু, ওখান থেকে কিছু শ্লোক সঙ্কলন ক'রে, সেগুলো টেরা-বাঁকা আরশিতে প্রতিবিম্বিত ক'রে মজা দেখিয়েছেন। আক্রমণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়—একটু সুড়সুড়ি দেওয়া মাত্র। যদি আক্রমণই তিনি ক'রে থাকেন, তা হলেও আঁচড়ানো খামচানোর বেশি হয় নি—কোতল তো নয়ই।

এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলার হিন্দু মহারাজা গীতা চুম্বন ক'রে শপথবাণী পাঠ করেছিলেন, খৃষ্টানী বাইবেল চুম্বন করা প্রথার অনুকরণে। আদালতে এই প্রথা এখনও বোধ হয় প্রচলিত। গীতা কেউ পূজো করুন বা

পুরানো-কাগজ-ওয়ালার কাছে বিক্রি করল তাতে গীতার কি আসে যায়। গীতার মূল্য তো আর কোন বিশেষ একখানা ছাপার অক্ষরের বইয়ের বন-ইঞ্চি ক'ষে বা সের-ছটাকে মেপে নয়। ধর্মের গোড়ামি বা স্থূল রূপ সর্বত্রই কিছু-না-কিছু আছে। দেখবার কথা, সে অক্ষরের, এবং সম্ভবত ভাল বাঁধাই গীতা নামক বইখানার উপর মহারাজের ভক্তি সরল না লোক-দেখানো? সরল হ'লে ঐ ব্যাপারে হাসতে পারি, উপহাস করতে পারি নে। আর তার জন্ত গীতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কটাক্ষও করতে পারি নে।

তৎকালে রেডিও টেলিভিশন না থাকলেও, সঞ্জয় হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত-কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব্যাসের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ ক'রে। বৈজ্ঞানিক মহাশয় এ কথা মানতে চান না। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে না-মানারই কথা। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক—তা তিনি যত বড় বৈজ্ঞানিকই হন না কেন—বলতে পারেন কি, তাঁর জানার বাইরে কিছুই থাকতে নেই? যোগশক্তিতে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা বলেন, যোগশক্তির প্রভাবে এ রকম দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, পরমযোগী ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন। আধুনিক ব্যাখ্যাকার গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বলেছেন, সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে যাওয়া-আসা করতেন, সংবাদ আনতেন আর তা ধৃতরাষ্ট্রকে বলতেন।

ব্যাপার যাই হোক, গীতার তত্ত্বোপদেশের মূল্য সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। দিব্যদৃষ্টি মিথ্যা কথা হ'লে, সমগ্র গীতা মিথ্যা হয়ে যায় না। সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি সত্য হতে পারে, রূপকও হতে পারে।

বিশ্বরূপ দর্শনের সময় আবার এই দিব্যদৃষ্টির কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে আলোচনা পরে যথাস্থানে আসছে।

গীতা, বা যে মহাভারতের অন্তর্গত এই গীতা, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি উক্তিকে কেউ যদি অক্ষরে অক্ষরে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে মনে করেন বা দাবি করেন, তা হ'লে বাড়াবাড়ি হবে। ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও, মহাভারত বা গীতা ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ঠিক কত লোক মারা গিয়েছিল, যত লোকের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে, তত লোকের স্থানসঙ্কুলান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে হতে পারে কি না বা

তৎকালের আদম-সুমারীর খাতাপত্রে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত লেখা আছে, অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্তা যুদ্ধারম্ভের মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হওয়া সম্ভব কি না, তাঁরা নিজ নিজ বক্তব্য লিখে এনেছিলেন, না, তখন-তখনই বানিয়ে বলেছিলেন—এ সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে যাওয়া নিশ্চয়ই অতি-ঐতিহাসিক ব্যাপার। মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করব, না, মক্ষিকা উপলক্ষ্য ক'রে প্রাণিতত্ত্বের গবেষণা করব বা চাকের কক্ষগুলির জ্যামিতিক আকার নির্ণয় করব? অতি-বৈজ্ঞানিক হওয়ায় কিছু অসুবিধে আছে—তাই ব'লে একেবারে অবৈজ্ঞানিক হওয়াও ভাল কথা নয়।

মহাযুদ্ধের ফলে সমাজজীবনে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। তার মাঝে বর্ণশঙ্করের আশঙ্কা ও পিণ্ডলোপের ভয় তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে খুবই স্বাভাবিক। অর্জুন সে কথা ব্যক্ত ক'রে এমন কি দোষ করলেন? এখনকার লোকে হয়তো বলবে, কথাটা সত্য হ'লেও অত ধারাবাহিক বর্ণনা সুরুচিসম্মত হয় নি। রুচি যুগে যুগে বদলায়। উপনিষদে ও মহাভারতে ওরকম কথা যথেষ্ট আছে—ওর চেয়েও আপত্তিকর (আধুনিক রুচিতে) বাক্যের অভাব নেই। সেজন্য কি ঐ সকল গ্রন্থকে ছি-ছি করব? অর্জুন যা বলেছেন তা যে সত্য, গত মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপের war babies সমস্যাই তার প্রমাণ।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, কাজেই ব্যাসের রচনা। গীতার তত্ত্বকথা উপনিষদ্‌সমূহ থেকে গৃহীত। অনেক স্থলে হুবহু উপনিষদের শ্লোক, অনেক স্থলে কিছু পরিবর্তিত, অনেক স্থলে উপনিষদের ভাবে নূতন শ্লোক। ব্যাসদেব রচয়িতা হ'লেও, গীতার ভাবধারা ও তত্ত্বকথা সমস্তই উপনিষদের। আত্মার অবিনশ্বরতা উপনিষদেরই কথা। সৌদামিনী-নরহরির উপাখ্যানে বৈজ্ঞানিক মহাশয় দেহ ও দেহী নিয়ে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেছেন। দেহীর স্ত্রী-পুরুষ ব'লে কিছু নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই, আহার-অনাহার নেই, কাজেই খোরপোষের দুশ্চিন্তা, মাথা না থাকলেও মাথাব্যথার মত।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বড় বড় তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন, ব্যাসের কলমে। অন্যত্র কাশীরাম দাসের কলমে, যদুবংশ ধ্বংস হচ্ছে দেখে তিনি কাঁদছেন। যাঁর যেমন কলম-জোর আর কল্পনার দৌড়। বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের বোধ হয় বৈষ্ণব কবিদের কথা মনে হয় নি। হ'লে, কৃষ্ণচরিত্রে

উপলক্ষ্য ক'রে এখনও ভাটিয়ালী সুরে প্রেমের গান বাঁধা হচ্ছে—বিশ্বাস না হয়, রেডিও খুলে দেখতে পারেন।

আত্মা, কর্মফল, জন্মান্তর—এই সমস্ত কথার অবতারণা ক'রে বৈজ্ঞানিক মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন, জীবদেহে আত্মা প্রথম কখন আসে? আত্মাকে তিনি হাইড্রোজেন অক্সিজেন বা তার চেয়েও সূক্ষ্ম ইলেক্‌ট্রনের মত একটা বস্তু ধ'রে নিয়েছেন। উপনিষদ বা গীতা আত্মাকে অ-বস্তু বলে। কাজেই বস্তু-বিজ্ঞানের ধারায় ভাবলে আত্মাকে পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন রকম প্রমাণ দিয়ে কেউই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। ঠিক কথা। শাস্ত্রকারেরাও তাই বলেছেন। প্রমাণের দ্বারা আত্মার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাঁরা বলেন, কেবল শুদ্ধ ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।

বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে যা নিষেধ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা যদি বিধি হয়, তবে সেটা আর যাই হোক ধর্ম নয়। কিন্তু, যাবতীয় শাস্ত্রের, এমন কি এখনকার বিধিতেও, তো দেখি, একের পক্ষে যে কাজ ধর্ম, অপরের পক্ষে তা অধর্ম। যে নরহত্যা প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছে সেই নরহত্যার কথাই ধরা যাক। সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধে নরহত্যা অধর্ম নয় ধর্মই—যদিও সাধারণের পক্ষে নরহত্যা পাপ। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কাজের ভালমন্দ বা ধর্ম-অধর্ম বিচার হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছেন তার অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে, ক্ষত্রিয় হ'লেই সে যখন খুশি নরহত্যা করবে, তাই তার ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হ'ল যুদ্ধ করা, এবং যুদ্ধে নরহত্যায় তার পাপ নেই। এ ব্যবস্থা এখনও বলবৎ।

সেকালের বর্ণাশ্রম ভাগ করা সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বাঁধাধরা ছিল, একালে তা নেই। এখন যে-কেউ সুযোগ সুবিধা মত যে কোন বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। মহাভারতে উপাখ্যান আছে—ব্যাধ জীবিকার জন্য পশুপক্ষী হত্যা ক'রেও পরম ধার্মিক হয়েছিলেন। তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁরই কাছে ধর্মোপদেশ লাভের জন্য উপস্থিত হলেন। ধর্মপরায়ণ বৈশ্যের উপাখ্যানও আছে। দৈববাণী পেয়ে ব্রাহ্মণ মুনি তাঁর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য গেলেন। ধর্ম দেশ কাল ব্যক্তি জাতি নিরপেক্ষ। প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এ কথা কি অর্থে বলেন বোঝা গেল না। অন্নদান ধর্ম ক্ষুধার্তকে—অক্ষুধার্তকে নয়। একই কাজ কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম, কোনও ক্ষেত্রে অধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ নাকি বেদের গালমন্দ করেছেন। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের কথাই ঐ শ্লোকগুলির লক্ষ্য। ইহলোকে ধনরত্নাদি বিত্ত ও পরলোকে স্বর্গলাভের জন্ত যে সমস্ত বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করা হয়, নিষ্কাম কর্মের স্থান তার উপরে। শ্লোকগুলোর মোট কথা হ'ল এই। গীতায় যা কিছু মতবাদ সমস্তই পূর্ববর্তী উপনিষদ্‌সমূহে পাওয়া যায়। মুণ্ডক-উপনিষদেও বেদের সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়।

প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ।

এই অষ্টাদশাঙ্গ (ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী) যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্র কর্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জর-রোগাদি অনর্থসমূহ দ্বারা অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। (অনুবাদ: সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)

ব্রহ্ম থেকে বেদ, বেদ থেকে কর্ম, কর্ম থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে মেঘ, মেঘ থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীব। বৈজ্ঞানিক মহাশয় এই চক্রের দুটো খুঁত ধরেছেন। প্রথম খুঁত, ব্রহ্ম বেদ লেখেন নি, লিখেছেন ঋষিরা। দ্বিতীয় খুঁত, একালে যজ্ঞ হয় না, তবুও মেঘ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এ সব উক্তি অবৈজ্ঞানিক, অসত্য।

ব্রহ্মসূত্রে আছে, সাক্ষাৎ পরমাত্মা বেদের অপরিণামী লৌকিক উপাদান। শ্রুতিও আছে—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ'—এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিশ্বাস ঋক্‌-যজু-সাম বেদ। ব্যাসদেব

একালের লোক হ'লে, ঐ সমস্ত শ্রুতির কথা না ব'লে হয়তো ঐতিহাসিক মত সম্বলিত শ্লোক রচনা করতেন।

একালে যজ্ঞ হয় না, তবুও মেঘ হয়। যজ্ঞধূম থেকে মেঘের উৎপত্তি এ কথা নিক্তির ওজনে বৈজ্ঞানিক কথা না হ'লেও একেবারে অবৈজ্ঞানিক নয়। যজ্ঞ-ধূমের অর্থ ধূম-ধর্মী—যা ধোঁয়ার মত হয়ে উপরে উঠে যায়। এ অর্থে জলীয় বাষ্পকেও ধূম আখ্যা দেওয়া যায়। মনুসংহিতায় আছে—অগ্নিতে আহুতি দিলে তা আদিত্যে গমন করে, আদিত্য হতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হতে অন্ন, অন্ন হতে প্রজাসমূহের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি। অভ্রংভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে। অনুরূপ ভাব বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়—বায়োঃ বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্। তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। এই যখন শ্রুতি-সম্মত আবর্তনচক্র, তখন বেদব্যাস অন্য কথা কি ক'রে বলবেন? বললে anachronism হ'ত।

বিশ্বরূপ দর্শনের অধ্যায়কে বৈজ্ঞানিক মহাশয় গাঁজা অধ্যায় বলেছেন। আর বলেছেন, লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ। (জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা সমস্ত লোককে গ্রাস করিয়া চতুর্দিকে লেহন করিতেছে) এ অতি বীভৎস দৃশ্য। গীতার সমস্ত ব্যাপারটাই নাকি অর্জুনের ম্যালেরিয়া জ্বরের কাণ্ড, আর বিশ্বরূপ দর্শন তাঁর বিকারের ঘোর। বিকারের ঘোরেও যিনি এমন সুললিত ছন্দে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সুদীর্ঘ কথাবার্তা চালাতে পারেন, সেই অর্জুন আর কিছু না হ'লেও পরম পণ্ডিত সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনটা কি? আগেই বলেছি, যোগশক্তিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা দিব্যদৃষ্টির কথা অসম্ভব মনে করেন না—বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্তি অর্জুনের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন। যোগশক্তির কথা শাস্ত্রে আছে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মানা-না-মানা স্বতন্ত্র কথা। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধেও অনেক কিংবদন্তি শোনা যায়। অলৌকিক ঘটনা বা শক্তিবলে কিছু হতে পারে কি না নিঃসংশয়ে হাঁ-না বলা কঠিন।

অর্জুনের কি উপায়ে বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল, বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব কি না, সে আলোচনা না ক'রে, দেখা যাক, বিশ্বরূপ দর্শনের কোন অর্থ পাওয়া

যায় কি না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেহটাকে ফুলিয়ে বিশ্বজোড়া ক'রে ফেললেন, এ কথা ঠিক নয়। বিশ্বরূপ তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) অর্থাৎ ভগবানের আছেই, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি না পেলে তা দেখা যায় না। দিব্যদৃষ্টি না পাওয়া পর্যন্ত অর্জুন তাঁকে দেখছিলেন সীমাবদ্ধ মনুষ্যাকৃতিতে। দিব্যদৃষ্টি পেয়ে তবে তাঁর বিশ্বরূপ দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কি না বা ভগবান ব'লে আদৌ কিছু আছে কি না, সে কথা জড়-বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না, পড়ে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে। আমরা মাত্র জানি ভক্তিবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁরা ভগবান ব'লে মানেন। বৈজ্ঞানিক ও ভক্তে ও-প্রশ্ন নিয়ে তর্কাতর্কি করুন, মীমাংসা হবে কি না কে জানে?

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ—দৃশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হতে পারে, কিন্তু মহাকালের এই সংহারমূর্তি অস্বীকার করব কি ক'রে? সৃষ্টি যেমন সত্য, ধ্বংসও ঠিক তেমনি সত্য, যে দিব্যচক্ষু পায় সেই তা দেখতে পায়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গুহ্যতম কথা বলেছিলেন, ছাপাখানার দৌলতে বৈজ্ঞানিক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে ঠকিয়ে তা জেনে ফেলেছেন ব'লে গর্বিত। শ্রীকৃষ্ণের injunction ছিল তপস্যাবিহীন, ভক্তিহীনের কাছে গীতার কথা বলবে না। সে তো দ্বাপরের কথা, দ্বাপরেই চুকে গেছে। সেকালে বক্তার কদর ছিল। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা বক্তার কাছ থেকে তত্ত্বকথা আদায় করতে হ'ত। দিনকাল পালটে গিয়েছে, এখন বক্তা অনেক পাওয়া যায়, শ্রোতাকে খোসামোদ ক'রে এনে বক্তৃতা শোনাতে হয়।

ধর্মোপদেশ দেবার পর ওই ধরনের নিষেধবাক্য বলার প্রথা উপনিষদেও পাওয়া যাব,"এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন, অথবা গুরু প্রিয় শিষ্যকে বলিবেন। অন্য কাহাকেও বলিবে না। যদি কেহ সমুদ্র-বেষ্টিত ধনপূর্ণ পৃথিবীও দান করে তাহা হইলেও নহে।"

গীতার পরিসমাপ্তি 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' নয়,

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

জয়লাভের জন্য বুদ্ধিবল বাহুবল দুই-ই চাই। কৃষ্ণের বুদ্ধি, অর্জুনের বাহুবল। অর্থাৎ 'বলং বলং বাহুবলং' আর 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'-এর সমন্বয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

২৭

পরদিন। প্রতুল চা খাচ্ছিল বসবার ঘরে ব'সে। শুষ্ক, ক্লান্ত চেহারা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। সমরেশ এল। বললে, কি হে, এই উঠলে নাকি?

প্রতুল বললে, হ্যাঁ। কাল সারারাত জাগতে হয়েছে। সারারাত মা ভারি ছটফট করেছেন। মুখ কুঁচকে বললে, অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। চা খাবে নাকি? চাকরটাকে ডাক দিয়ে এক কাপ চা আনতে ব'লে দিলে।

সমরেশ বললে, তোমাদের তো অনেক কর্মী রয়েছে, কেউ রাত্রে এসে সাহায্য করতে পারে না?

প্রতুল ম্লান হেসে বললে, কই আর করে? পদ্মা রাধাকে দিয়ে তো চলবে না। মায়ের ছুঁই-ছুঁই বাতিক। শুক্তি আসতে চেয়েছিল, আমিই নিষেধ করেছি।

চাকরটা চা নিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে শৈলী এসে ডাক দিলে, দাদা!

সমরেশ শৈলীর দিকে তাকাল। কদিনে মেয়েটা আধখানা হয়ে গেছে; কালো হয়ে গেছে। পরনে আধ-ময়লা শাড়ি; মুখখানি অত্যন্ত ম্লান; অগোছাল চুলে কোন রকমে খোঁপা বাঁধা; কুচো চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে।

শৈলী উদ্বেগের স্বরে বললে, মা সকাল থেকে নেতিয়ে রয়েছেন। নিশ্বাসের টানটা যেন বেড়ে গেছে। কথার জবাব দিচ্ছেন না ভাল ক'রে। ডাক্তারবাবু এখনও এলেন না তো?

প্রতুল বললে, আসব তো বলেছিলেন।

শৈলী বললে, একবার তো খবর দেওয়া দরকার।

প্রতুল বললে, তুই চা খেয়েছিস? এখন চান ক'রে দুটি কিছু মুখে দে। মায়ের সেরে উঠতে কতদিন লাগবে কে জানে? না নাইলে খেলে সেবা করবি কি ক'রে?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শৈলী বললে, মা কি ভাল হয়ে উঠবেন দাদা?

আমার মন বলছে, মা এবার চ'লে যাবেন। চোখ জলে ভ'রে এল শৈলীর, আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

দুজনে ডাক্তারের বাড়ি চলল।

যেতে যেতে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কাল কি হ'ল? প্রতুল বললে, গিয়ে দেখলাম, আপিসে জড় হয়েছে সব। জন ছয় সামান্য জখম হয়েছে। দুজনের মাথা ফেটে গেছে, পুলিস এসে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে গেছে। কিছু করবে না ওরা। কে মেরেছে তার সাক্ষী-প্রমাণ কোথায়? তপন তো আর নেই। ও থাকলে কিছু করা যেত। পুলিস সাহেব কাশেম ও শশধরকে ডেকে ধমকে দিয়েছে। একজন মুসলমান ছেলে জখম হয়েছে। এ নিয়ে মুসলিম-লীগ নাকি গরম হয়ে উঠেছে। হিন্দু মহাসভা তো আগে থেকেই গরম। একটু থেমে বললে, এমনই একটা কিছু হবে ব'লে আমি অনুমান করেছিলাম। সেই জন্যেই নিষেধ করেছিলাম ওদের। ওরা তো আমার কথা শুনল না। কিছুক্ষণ পরে বলতে লাগল, এখানে আমাদের বরাবর উদ্দেশ্য ছিল কাজ করা। মতবাদের মাদল বাজিয়ে মাতামাতি করা ভাল লাগে নি আমাদের। আমরা চেয়েছিলাম মতবাদকে কাজের পেছনে রাখতে। ওরা তা চায় না। ওরা চায় আগে মতবাদ প্রচার, তারপর কাজ। তা ছাড়া শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষেপিয়ে দিতে চায় জমিদার ও ধনিকের বিরুদ্ধে, তাদের রুখবার ক্ষমতা আয়ত্ত না ক'রেই। আমরা তা চাই নি। আমরা শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, এবং কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম-স্বার্থ-বোধ জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। হয়তো পেরে উঠি নি। কিন্তু আমাদের চেষ্টার মধ্যে ভেজাল ছিল না। নতুন যারা এল আমাদের পরে, নতুন পথে চলতে চায় তারা। আমাদের পুরনো ব'লে, পাশে সরিয়ে দিতে চায়। এবার জানুয়ারি মাসে বাসুদেবপুরে ওরাই জোর ক'রে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করবার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অনেক জায়গায় এ আন্দোলন চলেছে। কৃষকদের মাতিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাল ধরতে পারেন নি নেতারা। গুলি চলেছে। মেয়ে-

পুরুষ বিস্তর মারা গেছে। জোতদার ও সরকারের সমবেত আঘাতে কৃষকদের শক্তি চূর্ণ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর। প্রতুল ও সমরেশ বারান্দায় ব'সে ছিল। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন এই মাত্র। রোগী দেখেছেন। ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। স্যালাইন দিতে হবে বলেছেন। তাঁর কম্পাউণ্ডার রাত্রে আসবে। সারারাত্রি স্যালাইন দেবে রোগীকে। এ যাত্রা সামলানো কঠিন—এই মত প্রকাশ করেছেন।

প্রতুল বললে, শৈলীকে নিয়ে যে কি করি? মনের জোর ছিল কত? কাজে কত উৎসাহ ছিল? বাসুদেবপুরের কাজ তো ওরই হাতে গড়া। তপন ওকে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেছে। তপনকে ভাল-বেসেছিল ও। তপনকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরছিল। তপন হঠাৎ ওর জীবনের কেন্দ্র থেকে স'রে যেতেই, ও যেন ছিটকে পড়েছে ওর জীবনের কক্ষ থেকে। অনন্ত অন্ধকারময় শূন্যতার মধ্যে গন্তব্যহীন গতিতে ছুটে বেড়ানোই যেন ওর ভবিষ্যৎ। মায়ের কাছে ব'সে আছে দিন-রাত। তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। গভীর উৎকণ্ঠায় ওঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। মায়ের মৃত্যুর পর যে নিরাশাময় নিঃসঙ্গ জীবন ওকে যাপন করতে হবে, তারই কথা ভেবে ও যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কিন্তু ভালবাসা কি জীবনের চেয়েও বড়? জীবনকে আশ্রয় ক'রেই তো ভালবাসা, ভালবাসা আশ্রয় ক'রে জীবন নয়। তা হ'লে ভালবাসা ব্যর্থ হ'লেও জীবন ব্যর্থ হবে কেন?

একটা রিক্‌শ এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। প্রতুল সোৎসুক কণ্ঠে বললে, কে আবার এল এ সময়ে? উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। আগন্তুকও গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। কাছে আসতেই প্রতুল দেখলে একজন গেরুয়াধারী সাধু। প্রতুল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি?

সাধু বললেন, এ বাড়িটি কি ৺রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের?

প্রতুল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাধু বললেন, আমার নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ। এ শহরে এসেছি প্রায় মাসখানেক আগে। তুমি কি রামতারণবাবুর ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমার শিষ্য ছিলেন না বটে, তবে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তোমার মাও আমাকে চেনেন। তোমাদের যে এখানে বাড়ি তা আমি জানতাম না। জানলে এখানে এসেই তোমাদের খোঁজ করতাম। তোমার মাও বোধ হয় জানতেন না আমি এখানে এসেছি ব'লে।

না। তাঁর অসুখ হয়েছে আজ দিন কয়েক হ'ল। তা ছাড়া অনেক দিন ধ'রেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। কোথাও বেরুতেন না বা বাইরের কোন খোঁজখবর রাখতেন না।

তোমার মা সপ্তাহ দুই আগে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, আমার কাশ্মীর আশ্রমের ঠিকানায়। সেই চিঠি আজ সকালে আমার হাতে পৌঁছেছে। একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমার উপদেশ চেয়েছিলেন।

কিন্তু মায়ের কোনও জ্ঞান নেই। কথাবার্তা বলতে পারছেন না। বুঝতেও পারছেন না।

স্বামীজী বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, তাই নাকি! কি হয়েছে তাঁর?

নিমোনিয়া।

চল, তোমার মাকে দেখি গিয়ে।

প্রতুল নিয়ে গেল স্বামীজীকে মায়ের ঘরে। মেঝেয় পাতা শয্যার উপরে প্রতুলের মা শুয়ে আছেন। ফরসা রঙ রোগের আক্রমণে মলিন হয়ে গেছে। অত্যন্ত আচ্ছন্ন ভাব। চোখ দুটি মুদ্রিত। অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। নিশ্বাস টানবার সময়ে নাকের আগাটা ব'সে যাচ্ছে। বুকটা দুলছে হাপরের মত। হাতের মুঠি দুটি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেন জীবনটাকে দু হাতের মুঠি দিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছেন।

পাশে ব'সে আছে শৈলী। মায়ের মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টি হয়ে।

মায়ের ডান হাতটি কোলে নিয়ে অতি মমতার সঙ্গে হাতের মুঠি খুলে দিচ্ছে।

প্রতুল মায়ের মাথার কাছে ব'সে ডাক দিল—মা! অনেকবার ডাকের পর চোখ খুলে চাইলেন মা। ঘোলাটে চোখের ভিতর দিয়ে বাইরের ছায়া পড়ল না চোখের পটে; শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ। তারপর ক্লান্তির ভারে চোখের পাতা দুটি মুদে এল।

স্বামীজী শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ রোগিণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পাশে ব'সে চোখ বুজে, বাঁ হাতের নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

শৈলী একদৃষ্টে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে হাতটি সন্তর্পণে নামিয়ে দিয়ে স্বামীজী একবার শৈলীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন; তারপর গম্ভীর মুখে প্রতুলকে বললেন, তা হ'লে আর কি? চল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞানানন্দ প্রতুলকে বললেন, তোমার মাকে কয়েকটা কথা বলবার ছিল। যে অবস্থা দেখলাম, সে কথা বলবার সুযোগ বোধ হয় আর হবে না। কাজেই যা বলবার তোমাকেই বলতে হবে। একটু গোপনে কথাগুলি বলতে চাই। সমরেশ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকালেন জ্ঞানানন্দ। সমরেশ বললে, আমি এখন তা হ'লে চলি প্রতুল। খেয়ে আবার ফিরে আসছি এখনই। প্রতুল সাগ্রহে বললে, আসবে ভাই! তা হ'লে খুব ভাল হয়। সমরেশ চ'লে গেল।

জ্ঞানানন্দ বললেন, অন্য একটা ঘরে চল।

প্রতুল তাঁকে তার শোবার ঘরে নিয়ে এসে বসাল। তারপর বললে, একটা আলো নিয়ে আসি। জ্ঞানানন্দ বললেন, প্রয়োজন নেই। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে তুমি ব'স।

দুজনে মুখোমুখি বসল। জ্ঞানানন্দ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন, প্রায় আঠার-উনিশ বৎসর আগেকার কথা। তোমার বাবা তখন গয়ার সরকারী ডাক্তার। আমাদের গয়ার আশ্রমে প্রায়ই আসতেন। আমাদের নানা রকমে সাহায্য করতেন। তোমাদের

বাড়িতে আমিও প্রায় যেতাম। তুমি তখন সেখানে ছিলে না। তাই আমাকে দেখ নি।

প্রতুল বললে, আমি তখন জেলে ছিলাম।

জ্ঞানানন্দ বললেন, হ্যাঁ, সে কথা শুনেছিলাম। তোমার বাবা মা অত্যন্ত দুঃখ করতেন তোমার জন্যে।

জ্ঞানানন্দ তারপর বলতে লাগলেন, আমাদের আশ্রমের একটি হাসপাতাল ছিল। হাসপাতালের একটি প্রসূতি-বিভাগও ছিল। একদিন একটি বাঙালী মেয়ে সেই বিভাগে ভর্তি হ'ল। মেয়েটি বিধবা। কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গিয়েছিল। স্বামী ছিল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক। স্বামীর মৃত্যুর পরে মেয়েটি নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হয়ে পড়েছিল। দেশেও নাকি আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে শহরে এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করছিল। আমি নিজে বাঙালী। কাজেই বিদেশে বিপন্না এই বাঙালী মেয়েটির উপরে আমার মনে একটা সহানুভূতির ভাব জেগে উঠেছিল। মেয়েটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই প্রায় মেয়েটির খবর নিতাম। ভারি শান্ত শিষ্ট ভদ্র মেয়েটি। এক পাশে মুখটি শুকনো ক'রে ব'সে থাকত। আগামী নিদারুণ ভবিষ্যতের ভাবনায় মেয়েটি আকুল হয়ে উঠেছিল সম্ভবত। দিন কয়েক পরে সে একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করল। তারপর হ'ল তার অসুখ। অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। তোমার বাবা প্রায় হাসপাতালে আসতেন। তিনিও মেয়েটির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতেন। শেষে মেয়েটির চিকিৎসার ভার তাঁর হাতেই দিলাম। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটি বাঁচল না। তখন কি ক'রে মাতৃহীন শিশুটিকে বাঁচানো যাবে সেই নিয়ে হ'ল আমার চিন্তা। তোমার বাবা ও মা শিশুটির ভার নিতে রাজী হলেন। তুমি তাঁদের কাছে ছিলে না। কাজেই তাঁদের সন্তান-বাৎসল্য একটি আশ্রয় খুঁজছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সস্নেহে তাঁরা মানুষ করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তোমার বাবা গয়া থেকে বদলি হয়ে গেলেন। যাবার আগে তাঁকে ও তোমার মাকে দিয়ে একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিলাম যে,

মেয়েটির বিবাহ যেন তাঁকে না জানিয়ে দেওয়া না হয়। বলেছিলাম, মেয়েটির জন্ম-মুহূর্তে দুষ্ট গ্রহের অশুভ দৃষ্টি আছে। তার প্রতিকার না ক'রে বিবাহ দিলে বিবাহের ফল শুভ হবে না। ওখান থেকে যাবার পরও তোমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে পত্র দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিজের কন্যা ব'লেই পরিচয় দিয়েছেন জানিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শৈলীর জীবন-ইতিহাসের এই আকস্মিক উদ্‌ঘাটনে গভীর বিস্ময়ে প্রতুল পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল। কোন মতে বললে, আমার বোন কি তা হ'লে—

জ্ঞানানন্দ বললেন, না, তোমার নিজের বোন নয়। ও তোমার বাপ-মার পালিতা কন্যা।

ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠে প্রতুলের দম বন্ধ ক'রে আনতে লাগল। অন্ধকারে দুই বিহ্বল চক্ষু মেলে তাকিয়ে রইল স্বামীজীর দিকে। তার মনে হতে লাগল, স্বামীজী যেন মানবদেহধারী মৃত্যু। আজ এসেছেন শুধু মাকেই ছিনিয়ে নিতে নয়, শৈলীকেও তার জীবন থেকে ছিঁড়ে ফেলতে।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, আজ তোমার মায়ের চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ। বেশি দিন আর বাঁচবেন না। মেয়েটির বিবাহ দিয়ে দায়-মুক্ত হতে চান। গ্রহদোষ খণ্ডনের জন্য কি কি কর্তব্য তাঁকে যেন অবিলম্বে জানানো হয়।

একটু থেমে স্বামীজী বললেন, যে কথাটি তোমার বাবা-মাকে এতদিন বলি নি, সে কথাটি বলবার সময় এসেছে। দোষ মেয়েটির জন্ম-মুহূর্তে ছিল না, ছিল জন্মে। ও ব্রাহ্মণের মেয়ে, অর্থাৎ ওর বাবা-মা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ওর মা ওর বাবার বিবাহিতা পত্নী ছিল না। ওরা ছিল কলকাতার লোক। একই বাড়িতে ভাড়াটে ছিল। ওর মা স্বামীকে ত্যাগ ক'রে লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। এ খবর মেয়েটির মা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে জানিয়েছিল। মেয়েটির

মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার বাবা-মার কাছে এ কথা গোপন করেছিলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোমাকে সব কথা জানালাম। এ সব জেনেও তুমি যদি মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে ও ওর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক, তা হ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই। আর যদি না থাক, আমি ওই মেয়েটির ভার গ্রহণ করব। কারণ ওর শুভাশুভ সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কম নয়।

আকস্মিক আঘাতের বিস্ময় ও বেদনা-বিহ্বলতাকে জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে প্রতুল বললে, ওকে আজ পর্যন্ত নিজের বোন ব'লেই জেনেছি, চিরদিন তাই জানব। যতদিন বেঁচে থাকব, ওর ভার আমি সানন্দে বহন করব। আপনি ওর জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বামীজী বললেন, তোমার মহানুভবতায় অত্যন্ত প্রীত হলাম। তবে একটা কথা ব'লে যাই, ওর বিবাহ দিও না। গার্হস্থ্য জীবন যাপন করা অপেক্ষা লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করাই ওর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তবে, যদি কোন উদার-হৃদয় যুবক, ওর জন্মের ত্রুটি জেনেও ওকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, তার হাতে ওকে দিতে পার।

প্রতুল বললে, আজকাল এ রকম উদার যুবকের বোধ হয় অভাব হবে না। কাজেই বাবা আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

স্বামীজী আর কিছু বললেন না। কতক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর, 'তা হ'লে আমি যাই' ব'লে উঠে দাঁড়ালেন। প্রতুলও উঠে দাঁড়াল। স্বামীজীকে নমস্কার করতে গিয়েই তাঁর পায়ে প্রণত হ'ল।

দরজায় কান পেতে শুনছিল শৈলী। হঠাৎ সতর্ক পদক্ষেপে স'রে গেল।

বাইরে এসে স্বামীজী বললেন, মেয়েটিকে একবার আশীর্বাদ ক'রে যেতে চাই।

প্রতুল বললে, আমি ডেকে আনছি। ব'লে যেতে উদ্যত হতেই

স্বামীজী বললেন, আচ্ছা, থাক্। আমি চলি বাবা।—ব'লে চ'লে গেলেন।

সমরেশ এল রাত্রি দশটার পরে। রাত্রি বারোটার পর রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে এল। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনল সমরেশ। তিনি আশা তো দিলেনই না, বরং রাত্রিটা ভালয়-ভালয় কাটবে কি না সেই সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। শুক্তি ও পদ্মাকে খবর দেওয়া হ'ল। খবর পেয়েই তারা এল। তাদের সঙ্গে এল রাধা, শ্বেতাঙ্গিনী ও মাধব।

রাত্রি তিনটার সময়ে মা মারা গেলেন। প্রতুল মায়ের পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। শৈলী পাথরের মূর্তির মত পাশে ব'সে রইল। এক ফোঁটা অশ্রু গড়াল না তার চোখ থেকে।

শেষকৃত্যের সমস্ত ব্যবস্থা করলে সমরেশ।

২৮

বিশ্বম্ভরের মত বিপদে কেউ কখনও পড়েছে কি? দোটানায় প'ড়ে হকচকিয়ে গেছে বেচারা। কোন্ দিকে এগুবে বুঝতে পারছে না। শ্বেতাঙ্গিনীকে ছাড়তে মন চাইছে না। নীরজাকে নিরস্ত করতে সাহস পাচ্ছে না। দুগ্ধ-ননী-পুষ্ট পুষি-বিড়ালের মত নরম নধর দেহ, কোমল-মিষ্ট স্বভাব, চুপচাপ-শান্ত হাবভাব, সাবেক ধরনের সাদা-সিধে চাল-চলন, সব মিলিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীকে তার ভাল লেগেছিল। এ বয়সে এর বেশি সে চায় নি বা চাইতে সাহস করে নি। বাঘিনী বশ করবার বয়স তার নেই, সাধ্যও নেই। কোনদিন ছিলও না। তার প্রথমা স্ত্রী ছিল রায়-বাঘিনী গোছের মেয়ে। যেমন গুরু-গম্ভীর মেজাজ, তেমনই তর্জন-গর্জন! পান থেকে চুন খসলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিত। কথার মার-প্যাঁচে নাকানি-চোবানি খাওয়াত। কতদিন রাত-দুপুরে ঘর ছেড়ে রোয়াকে রাত কাটাতে হয়েছে তাকে। এখনও তার কথা মনে হ'লে বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে তার। নীরজাকেও আজ দু বছর ধ'রে দেখে সে বুঝেছে, সেও কম জাঁদরেল মেয়ে নয়। যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনই কড়া মেজাজ। তাকে বরাবর সে ভয় করেছে,

এড়িয়ে চলেছে। নীরজাও কোন দিন তাকে পাত্তা দেয় নি। শ্বেতাঙ্গিনীকে অর্ধাঙ্গিনী করবার চেষ্টায় সবাই যখন সম্মতি ও সহানুভূতি জানিয়েছে, ও নাক তুলে, ভ্রূ কুঁচকে স'রে দাঁড়িয়েছে—যেন কুকুর বিড়ালের ব্যাপার! তার মত উঁচু-স্তরের জীবদের এ বিষয়ে মাথা ঘামানো অপমানজনক। সেদিন রাত্রে নীরজা যখন হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে তার বিছানায় নেতিয়ে পড়ল, জোর ক'রে তার কোলে মাথা তুলে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার জন্যে তাকে অনুরোধ করল, তখন তার প্রথমে হয়েছিল বিস্ময়, তার পরে ভয়। বুকের ভিতরটা ধকধক করতে শুরু করেছিল। সুন্দরবনের কোন মিস রয়েল-বেঙ্গল যদি হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে, ঘাড় না মটকে, নিরীহের মত তার গা-চাটতে শুরু করত, তাতেও সে এর চেয়ে বেশি বিস্মিত ও ভীত হ'ত না। কিন্তু ভালও যে লাগে নি তা নয়। নারীদেহের স্পর্শে তার সারা দেহের শিরা উপশিরা যেন সেতারের তারের মত রিমঝিম ক'রে বাজতে শুরু করেছিল, ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছিল কান দুটোর মধ্যে, মনটা বিকল ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর যখন নীরজা তার বিষয়-সম্পত্তির ফিরিস্তি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তার উপর দখলের পরওয়ানা জারি ক'রে দিয়ে গেল, তার পরে সে যে কতক্ষণ অবাক হয়ে ব'সে ছিল, তা তার মনে নেই।

পরদিন সকালে সমস্ত ব্যাপারটাকে তার স্বপ্নের মত অলীক ও অসার ব'লে মনে হয়েছিল প্রথমে। তারপর মনে হয়েছিল, নীরজার ও একটা মুহূর্তের খেয়াল। বা তার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে মর্মান্তিক খেলা। বাস্তব জীবনে এর আর হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে না। এর পর দেখা হ'লে নীরজা মুখ তুলেও তাকাবে না তার দিকে। স্পর্ধিত দূরত্বে থেকে দূরবীন ক'ষে অসীম অবজ্ঞাভরে এক-আধবার তাকিয়ে দেখবে হয়তো। একদা নির্জন ঘরের মধ্যে তাকে যে দেহ স্পর্শ করবার সৌভাগ্য যেচে দিয়েছিল, এ কথা স্মরণ করবারও প্রশ্রয় থাকবে না তার দৃষ্টিতে।

সকালে সে দোতলায় শুক্তির ঘরে গিয়েছিল। শুক্তি ও নীরজা চা খাচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গিনী চা খায় না। সে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

শুক্তি বললে, বিশ্বম্ভরবাবু, চা খাবেন নাকি? বসুন না। নীরজা নীরস গম্ভীর মুখে চা খেতে লাগল। একবার তাকালেও না। শুক্তি শ্বেতাঙ্গিনীকে বললে, দাও না এক কাপ চা তোমার বিশ্বম্ভরবাবুকে।

শ্বেতাঙ্গিনীর শ্বেতপদ্মের মত মুখখানি এক মুহূর্তে স্থলকমল হয়ে উঠল। চোখ জুড়িয়ে গেল বিশ্বম্ভরের। স্থান ও স্থানীয়দের কথা ভুলে গিয়ে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। নীরজা যে চোখের কোণ থেকে দৃষ্টির সঙিন উঁচিয়ে আছে, তার খেয়াল রইল না।

শ্বেতাঙ্গিনী চ'লে যাবার পরেও সে ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে রইল। নীরজা বললে, বিশ্বম্ভরবাবু, কাল যে শাড়িটা বিক্রি করলেন, তার দামটা কত বললেন মনে নেই। কত বলুন তো? ধ্যানস্থতা ধোঁয়া হয়ে উবে গেল এক মুহূর্তে। বিশ্বম্ভর আমতা-আমতা ক'রে বললে, বিক্রি করলাম! তা বেশ। তা বিক্রি যখন বলছেন, তা—

নীরজা ভ্রূ কুঁচকে ধারাল কণ্ঠে বললে, অত 'তা তা' করছেন কেন? দামটা ব'লে ফেলুন না। লাভ করবার মতলব আছে বুঝি?

বিশ্বম্ভর অপ্রতিভ হয়ে বললে, পাগল! লাভ করতে পারি আপনার কাছে! যার জন্যে কিনেছিলাম, সেই যখন পরল না তখন ওর আর দাম কি! যা ইচ্ছে হয় দেবেন।

নীরজা বললে, দয়া করছেন নাকি? ওসব আমার কাছে নয়, অন্য জায়গায় করবেন।

শ্বেতাঙ্গিনী এক কাপ চা নিয়ে হাজির হ'ল। বিশ্বম্ভর কাপটা নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, বেশ চা।

শুক্তি শ্বেতাঙ্গিনীকে বললে, তুমি বিশ্বম্ভরবাবুর আনা শাড়িটা পরলে না। ভারি দুঃখ করছেন উনি। শাড়িটা বিলিয়ে দেব বলছেন। তা পর না কেন? পরতেই হবে যখন একদিন।

লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে শ্বেতাঙ্গিনী স'রে পড়ল। শুক্তি বললে বিশ্বম্ভরকে, যদি বিলিয়ে দেবেন তো আমাকেই দিন। শাড়ি নেই আমার।

বিশ্বম্ভর কৃতার্থ হয়ে বললে, বেশ তো, নেবেন। নীরজা ফ্যাঁস ক'রে উঠল, মানে? আমি ওটা নিয়েছি। ও আর আমি কাউকে

দেব না। শাড়ি বিক্রীতে হয় তো আর একটা কিনে আনবেন। এ শাড়ির দাম দিয়ে দেব আমি দিন দুই পরে।

দুপুরে খাওয়ার পর। শুক্তি চ'লে গেছে স্কুলে, শ্বেতাঙ্গিনী গেছে তার পাঠশালায়। ঝিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্বম্ভরবাবু বিছানায় প'ড়ে দিবানিদ্রার চেষ্টা করছে। নীরজা ঘরে ঢুকল। চোখ মেলে দেখেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল বিশ্বম্ভর। নীরজা এসে চেয়ারটায় বসল। মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। বললে, শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করবার মতলব আপনার এখনও যায় নি বুঝি? কাল আমার গায়ে হাত দিয়ে, আবার শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছেন? আমাকে আপনি বোধ হয় ভাল ক'রে চেনেন নি, না?

বিশ্বম্ভর নির্বাক।

কথা বলছেন না যে?

বিশ্বম্ভর বললে, কি আর বলব? আমি ভাবলাম, আপনি আমার সঙ্গে খেলা করেছেন।

চাপা শ্লেষের সুরে নীরজা বললে, খেলা? মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষের সঙ্গে ঐ রকম খেলা? কি ভাবেন আপনি আমাকে?

কঠিন কণ্ঠে বললে, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে আমি কাল এসেছিলাম আপনার কাছে। আপনার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলাম। এর পর আর কোন পুরুষকে বিয়ে করা আমার চলে না; আপনারও আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করা চলে না। করলে ধর্ম আপনাকে ক্ষমা করবে না; আইনও। বিশ্বম্ভর সভয়ে ব'লে উঠল, আপনি আইন-আদালত করবেন নাকি? নীরজা বললে, দরকার হ'লে তা করতে হবে বইকি!

বিশ্বম্ভর করুণ কণ্ঠে বললে, শ্বেতাঙ্গিনীর কি হবে?

নীরজা তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে বললে, সে নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। শ্বেতাঙ্গিনা তা বুঝবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বললাম যে কাল, শ্বেতাঙ্গিনী এক কড়াও ভাল বাসে না আপনাকে। আপনার হাত থেকে ছাড়া পেলে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এ কথা একদিন আমাকে বলেছে—

সবিস্ময়ে বিশ্বম্ভর বললে, তাই নাকি!

নীরজা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। তা ব'লে ওকে এখন জিজ্ঞাসা করতে গেলে ও স্বীকার করবে নাকি! কম সেয়ানা মেয়ে নয় ও! অনেক ঘাটের জল খেয়েছে তো!

বিশ্বম্ভর চুপ ক'রে ব'সে রইল। অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিকল ভাব।

নীরজা বললে, কি অত ভাবছেন? ওসব ভাবা-টাবা ছাড়ুন। যা ব'লে দিচ্ছি তাই করবেন।

বিশ্বম্ভর করুণ কণ্ঠে বললে, কি?

শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে কথা বলবেন না। ওর দিকে তাকাবেন না পর্যন্ত।

চোখের সামনে যদি এসে পড়ে?

চোখ ফিরিয়ে নেবেন।

যদি কথা বলতে আসে?—বিশ্বম্ভর বললে।

নীরজা সাগ্রহে বললে, আসে নাকি? ভারি গায়ে-পড়া বেহায়া মেয়ে তো!

বিশ্বম্ভর বললে, না না, কখনও আসে নি।

নীরজা বললে, এলেও পাত্তা দেবেন না।

কিন্তু আপনি—

নীরজা বললে, আপনি, না, তুমি।

বিশ্বম্ভর এক গাল হেসে বলল, তুমি বলব?

নীরজা বললে, সকলের সামনে নয়, আমি যখন একা থাকব তখন।

বিশ্বম্ভর ক্ষোভের সুরে বললে, সকলের সামনে তো মুখের দিকে তাকাও না পর্যন্ত। শাড়িটা বিক্রি করেছি ব'লে দিলে।

নীরজা বললে, আপনার বুদ্ধি বড় কম। ও কথা না ব'লে, বলব কি যে, আপনি আমাকে 'প্রণয়োপহার' দিয়েছেন? মাথার ঝাঁকানি দিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললে, যতদিন এখানে আছি, কাউকে জানানো চলবে না। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে যে, আমাদের ভাব হয়েছে। বুঝলেন? ভালয়-ভালয় আপনাকে এখান থেকে নিয়ে পালাতে পারলে, তখন যা ইচ্ছে হয়

করবেন। ঝিটা উঠে পড়বে এখনই। আমি চললাম। আমার কথা ভাবুন ব'সে ব'সে। ব'লে চ'লে গেল নীরজা।

নীরজা যাবার পরেই শ্বেতাঙ্গিনীর কথা মনে এল বিশ্বম্ভরের। আহা! বড় অভাগিনী! কত কষ্ট পেয়েছে জীবনে! ভদ্রলোকের মেয়ে দাসীবৃত্তি করছে! তা ছাড়া কত নিরীহ শান্ত! মুখে কথাটি নেই। মুখ বুজে সব কাজ করে ওদের। কত সাদা-সিধে! বিলাসের লেশমাত্র নেই। ওকে বিয়ে করলে নিরুপদ্রবে নি-খরচায় জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। পেটের জ্বালায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এইটুকুই তো দোষ! আজকাল অত বাছ-বিচার নেই; বেশ্যা পর্যন্ত বিয়ে করছে কত ভদ্রবংশের ছেলে। তা ছাড়া কলকাতায় গেলে শ্বেতাঙ্গিনীর অতীত জীবন কেই বা জানতে চাইবে?

সন্ধ্যেবেলায় ঝি নীচে ছিল না। শ্বেতাঙ্গিনী গা ধুতে এসেছিল নীচে। বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে যেই উঠনে পা দিলে, বিশ্বম্ভর সতর্ক চাপা গলায় ওকে ডাকলে, শ্বেতাঙ্গিনী! শ্বেতাঙ্গিনী মুখ তুলে তাকাল। বিশ্বম্ভর হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। শ্বেতাঙ্গিনী মুখ টিপে হেসে ওপরে চ'লে গেল। মুখটা বিশ্রী ক'রে বিশ্বম্ভর বললে, হতভাগা মেয়ে! নিজের ভাল বোঝে না! ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝবে যেদিন, মাটিতে মাথা ঠুকলেও উপায় হবে না।

পরদিন দুপুরবেলা। গুমট গরমে বিশ্বম্ভর অজস্র ঘামছিল আর পাখা নিয়ে বাতাস করছিল নিজেকে। এমন সময়ে এল নীরজা। বললে, এঃ! ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন যে! দিন পাখাটা।

বিশ্বম্ভর বললে, না না, থাক্।

থাক্ কেন? দিন!—ব'লে জোর ক'রে পাখাটা কেড়ে নিয়ে হাওয়া করতে লাগল নীরজা।

নীরজা বললে, চুল ছাঁটতে বলেছিলাম যে সেদিন; ছাঁটেন নি কেন?

বিশ্বম্ভর বললে, নাপিত পাই নি।

নাপিত পান নি তো সেলুনে যান নি কেন?

বিশ্বম্ভর মাথা চুলকে বললে, যাওয়া হয় নি।

হাসি চেপে নীরজা বললে, থাক্, আর গিয়ে কাজ নেই। কাল দুপুরে নাপিত ডেকে নিয়ে আসবেন। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চুল ছাঁটিয়ে দেব। তারপর কণ্ঠস্বর মোলায়েম ক'রে তুলে বললে, আর দেখুন, একটা কথা; যেমন বিয়েই হোক, আয়োজন তো কিছু করতে হবে।

গাল চুলকোতে চুলকোতে বললে বিশ্বম্ভর, তা করতে হবে বইকি।

নীরজা ব্লাউজের ভিতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বের ক'রে বললে, একটা ফর্দ ক'রে এনেছি। আপনার তো খেয়ালই নেই। আমাকেই করতে হ'ল।

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বিশ্বম্ভর বললে, ভুল হয়ে গেছে।

কাগজটা দিয়ে নীরজা বললে, এই নিন ফর্দ।

ফর্দ দেখে বিশ্বম্ভরের চোখ কপালে উঠল; বললে, এ যে অনেক টাকার ব্যাপার!

নীরজা বললে, সস্তায় সারতে চান নাকি? বেশি কি লিখেছি? আমার শাড়ি সেমিজ ব্লাউজ স্যাণ্ডেল জুতো সেণ্ট পাউডার রুজ স্নো ক্রিম, আপনার ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি রুমাল জুতো চটি। এতেই খাবড়ালে চলবে কেন? নতুন ক'রে সংসার পত্তন করতে হবে, তার কত খরচ! সে সব কলকাতায় গিয়ে কিনলেই হবে। আর একটা কথা। আপনার প্রথম পক্ষের গয়নাগুলো আপনার কাছে আছে তো? ও তো আমার বরাবর পরা চলবে না। এখন ঐ দিয়েই কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। তারপর নতুন এক সেট গয়না পছন্দ ক'রে কিনলেই হবে বি. সরকারের দোকান থেকে।

বিশ্বম্ভর হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

নীরজা বললে, খরচপত্র একটু হবে বেশিই। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু বের করবেন বরং। বিয়ে হবার পরে যখন সব হাতে নেব, তখন দেখবেন কি রকম হিসেবী গোছালো মেয়ে আমি। যা খরচ হবে সব পুরিয়ে দেব। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। ঝিটা ঘুমোয় নি। মটকা মেরে প'ড়ে আছে। কি ভাববে আবার।

বিশ্বম্ভরের সারা গা বেয়ে কালঘাম ছুটতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, নীরজা মাকড়সার মত ক্রমে তার চারদিকে ঠাস-বুনোনি জাল বুনছে। মুক্তি পাবার সব পথ বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার।

দিন কয়েক পরে। বেলা আটটা; শুক্তি ও নীরজা দুজনই বেরিয়ে গেছে। শ্বেতাঙ্গিনী একলা দোতলার রান্নাঘরে রান্না করছিল। বিশ্বম্ভরও নিজের রান্নাঘরে ছিল এতক্ষণ। রান্নাঘরে শিকল লাগিয়ে দিয়ে দোতলায় গেল। রান্নাঘরের সামনে শ্বেতাঙ্গিনী তরকারি কুটছিল। বিশ্বম্ভর পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শ্বেতাঙ্গিনী মুখ তুলল না। বিশ্বম্ভর ডাকলে, শ্বেতাঙ্গিনী! শুনছ?

শ্বেতাঙ্গিনী মুখ তুলে চেয়ে বললে, কি বলছেন?

ঝিটা কোথায়?

ঝিকে নিয়ে কি করবেন?

মানে—দুটো কথা বলব।

ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলবেন তো নীচে যান। বাজারে গেছে। আসবে এখনই।

বিরক্ত হয়ে বিশ্বম্ভর বললে, ঝিয়ের সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে।

শ্বেতাঙ্গিনী মাথা নীচু ক'রে তরকারি কুটতে লাগল।

বিশ্বম্ভর বললে, খুব সাংঘাতিক কথা। জীবন-মরণের সমস্যা। তোমার, আমারও।

বিস্ময়ে চোখ ডাগর ক'রে তাকাল শ্বেতাঙ্গিনী।

বিশ্বম্ভর বললে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো?

শ্বেতাঙ্গিনী বললে, যা বলবার তো বলেছি শুক্তিদির কাছে।

বিশ্বম্ভর বললে, তা হোক, আর একবার বল আমার কাছে। মুখে না বলতে পার, ঘাড় নেড়ে বল।

শ্বেতাঙ্গিনী হাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

বিশ্বম্ভর পুলকিত হয়ে উঠে বললে, কবে করবে বল?

শ্বেতাঙ্গিনী লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। আবদারের সুরে বললে, তা আমি কি ক'রে বলব? শুক্তিদিকে বলবেন।

কড়া গলায় বিশ্বম্ভর বললে, শুক্তিদি-টুক্তিদি বাদ দাও। ওদের এদিকে গা নেই কারও। তোমাকে আমাকে নিয়ে মজা করে ওরা। ভাবে—পয়মাল মাল, বাজারে কি বিকবে এরা! হ্যাঁ! ওদের কথা ছাড়। যা ঠিক করতে হয় তুমি নিজে কর।

মুখ-চোখ কুঁচকে শ্বেতাঙ্গিনী বললে, বাঃ রে! আমি কি ঠিক করব? ফিক ক'রে হেসে বললে, কনে বুঝি নিজের বিয়ের দিন ঠিক করে?

বিশ্বম্ভর বললে, বরই কি বিয়ের দিন ঠিক করে? কি করবে বল? পূর্বজন্মে দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী ছিলে আমার। না হ'লে দেখবামাত্র এত ভাল লাগে? অনেকদিন পরে দেখা হ'ল যে দুজনে। না হ'লে তোমাকেও এত কষ্ট সহ্য করতে হ'ত না। আমাকেও হ'ত না। তবে একটি কথা জেনে রাখ, ভারি বিঘ্ন চারদিকে। যদি এ সব কাটিয়ে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারি তো সব খুলে বলব তোমাকে।

আঁতকে উঠল শ্বেতাঙ্গিনী; বললে, পালানো আবার কি? ওসবের মধ্যে নেই আমি। বিয়ে না হ'লে এক পা নড়ছি না এখান থেকে।

বিশ্বম্ভর বললে, এখানে বিয়ে হবে কি ক'রে? কলকাতা না গেলে কিছু হবে না।

শ্বেতাঙ্গিনী প্রবল ঘাড় নেড়ে বললে, না না, যা হবার এখানেই হোক। শুক্তিদিকে বলুন আপনি। ওঁকে বলতে না পারেন, প্রতুলবাবুকে বলুনগে।

সক্ষোভে বললে বিশ্বম্ভর, ওঁর কথা আর ব'লো না। এত দিনের আলাপ। আজকাল দেখা হ'লে যেন চিনতেই পারেন না। কিছু বললেই হাসেন আর বলেন, বেশ তো! এ দিকে যে কোথাকার জল কোন্ দিকে ছুটছে, বুঝবার ক্ষমতা নেই ওঁর।

সদর-দরজায় শব্দ হ'ল। ঝিটা ফিরেছে বোধ হয়। শ্বেতাঙ্গিনী ধড়মড় ক'রে উঠে, রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। ঝি হাঁকল,

বিশুবাবু কোথায় গেলেন ? রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ আসছে যে ! কি পুড়ছে দেখুন। বিশ্বম্ভর দ্রুতপদে নেমে গেল।

সেই দিন রাত্রি প্রায় বারোটা। বিশ্বম্ভর শোবার উদ্যোগ করছিল। নীরজা এল। বিশ্বম্ভর চমকে উঠে বললে, এত রাত্রে ?

নীরজা বললে, তা ছাড়া কখন আসব ? দিনের বেলায় কি প্রাণ খুলে কথা বলবার উপায় আছে ? এই যে চুল ছেঁটেছেন দেখছি। সেলুনে গিয়েছিলেন বুঝি ? বেশ করেছেন। বেশ দেখাচ্ছে আপনাকে। বয়স তো আপনার বেশি নয়। বুড়োর মত থাকেন যে ! ভাল ক'রে মাজলে-ঘষলে সাজলে-গুজলে আরও কম বয়স দেখাবে। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন না।

বিশ্বম্ভর বিছানার উপর বসল।

নীরজা চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে মুখোমুখি ব'সে বললে, টাকা বার ক'রে এনেছেন ?

বিশ্বম্ভর ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

ঝঙ্কার দিয়ে বললে নীরজা, আনেন নি কেন ? মতলব কি আপনার ? পথে বসাবেন নাকি ?

বিশ্বম্ভর আলগা-আলগা ভাবে বললে, না, না, সে কি !

নীরজা বললে, পথে বসাবেন না ? তবে এমন গাফিলতি করছেন কেন ? ব'লে কিছুক্ষণ বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আজ শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে কি কথা হ'ল সকালে ?

বিশ্বম্ভর চমকে উঠে সভয়ে বললে, কে বললে ?

ঝিটা বলছিল। সকালে নাকি আপনার তরকারি পুড়ে গেছে, শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন ব'লে।

বিশ্বম্ভর বললে, আড্ডা দেব কেন ? তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ওপরে। দেখলাম, শ্বেতাঙ্গিনী ব'সে ব'সে তরকারি কুটছে। কথা না বললে ভাল দেখায় না ব'লে এমনই দু-চার কথা—

নীরজা চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল, মানা করেছিলাম না ?

মাথা চুলকতে চুলকতে বললে বিশ্বম্ভর, ভুলে গিয়েছিলাম।

নীরজা বললে, কি কি কথা হ'ল ?

বিশ্বম্ভর বললে, এমন কিছু নয়, মানে—ভারি গরম পড়েছে কি না, ঘামাচি হয়ে গেছে আমার। শ্বেতাঙ্গিনীরও হয়েছে কি না—

নীরজা ব'লে উঠল, শ্বেতাঙ্গিনীর ঘামাচি হয়েছে কি না তা জানবার কি দরকার আপনার ? আপনি মেরে দেবেন বুঝি কাছে ব'সে ব'সে ? ভারি বেহায়া মানুষ তো আপনি ? একজন মেয়েমানুষকে ওসব বলতে লজ্জা করে না ? ভারি মুশকিল আরম্ভ হ'ল দেখছি। হয় শ্বেতাঙ্গিনীকে সরাতে হবে, না হয় আপনাকে নিয়ে সরতে হবে।

বিশ্বম্ভর বললে, না না, শ্বেতাঙ্গিনীর কোনও দোষ নেই।

নীরজা কড়া সুরে বললে, অত দোষী-নির্দোষী দেখবার সময় নেই আমার। মোদ্দা, পালাতে হবে এখান থেকে। সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন। কাল টাকা বার করবেন। না করেন তো ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি আমি। জিনিসপত্র বেশি কিছু কিনে কাজ নেই এখানে। লটবহর যত হালকা হয় ততই ভাল। কেনা-কাটা সব কলকাতায় হবে। কলকাতার ভাড়াটেদের একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে, শীগগির যাচ্ছেন। মোট কথা, প্রস্তুত থাকবেন সব সময়ে, যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বার জন্যে

উঠে দাঁড়াল নীরজা। বিশ্বম্ভরের মুখখানা ডান হাতে ধ'রে তুলে বললে, বেশ দেখাচ্ছে আপনাকে। সত্যি বলছি ! ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। মুখটা গোমড়া ক'রে আছেন কেন ? হাসুন না।

হাঁপাতে হাঁপাতে হাসবার চেষ্টা করল বিশ্বম্ভর। সেটা দেখাল কান্নার চেয়েও করুণ। নীরজা হঠাৎ দু হাত দিয়ে বিশ্বম্ভরের মুখটা ধ'রে, সর্পিণীর ছোবল মারার ভঙ্গীতে চুমু খেল ওর মুখে। বিশ্বম্ভর অবাক। মাথাটা ঘুরতে শুরু করল ; মনে হ'ল, সারা ঘরটা পাঁই-পাঁই ক'রে ঘুরছে। চোখের সামনে ধোঁয়ার পর্দা নামল।

নীরজা হেসে বললে, কেমন ! ভাল লাগল ? গাছে উঠতে না উঠতে এক কাঁদি জুটে গেল আপনার। কিন্তু একটি কথা। আর

এ-দিক ও-দিক করেছেন তো আপনার নাক কামড়ে বোঁচা ক'রে দিয়ে যাব একদিন।

নীরজা চ'লে গেল। বিশ্বম্ভর ব'সে ব'সে নাগরদোলায় দুলতে লাগল।

দিন কয়েক পরে। রাত প্রায় একটা। প্রতুলের মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবর পেয়েই শুক্তি ও শ্বেতাঙ্গিনী চ'লে গেল। নীরজা বাড়িতে রইল। একটু পরে সে নীচে নেমে গেল। একলা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে ছিল বিশ্বম্ভর। শুক্তি যাবার আগে, ওকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিল, বাইরের দরজা বন্ধ করবার জন্যে। তারপর থেকে ওর আর ঘুম আসছিল না। ভারি ভয় করছিল। মৃত্যু হানা দিয়েছে কাছে-পিঠে, তারই ডানা ঝাপটানোর শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিল বাতাসের সনসন শব্দে, ওর বুকের নিয়মিত ধকধক ধ্বনিতে। হঠাৎ বিশ্বম্ভরের মনে হ'ল, ওর নিজের উপরেও একদিন মৃত্যুর হানা পড়বে। যে মৃত্যু একদিন ওর স্ত্রীকে, সন্তানকে অতর্কিতে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে, ওকেও একদিন তেমনই ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না। ভাবতে ওর সারা দেহটা যেন হিম হয়ে গেল। বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবে ব'লে মনে হ'ল। অনেক দিন যা করে নি, তাই করতে আরম্ভ করল বিশ্বম্ভর। রামনাম জপ করতে লাগল মনে মনে।

নীরজা এসে দরজায় টোকা দিল। ভয়ে আঁতকে উঠল বিশ্বম্ভর। 'কে?' ব'লে জিজ্ঞাসা করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর বেরুল না। নীরজা বললে, খুলুন না। ঘুমিয়ে পড়লেন না কি?

নীরজাকে পেয়ে ব'র্তে গেল বিশ্বম্ভর। ওরও ভয় করছে বুঝি? তাই এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, করছিলেন কি?

বিশ্বম্ভর বললে, কিছু না। ভয় করছিল ভারি।

ভয় কিসের?

প্রতুলবাবুর মা মারা যাচ্ছেন তো? তাই শুনে।

হাসল নীরজা। বললে, ভারি ভীতু মানুষ তো! আমি মেয়ে-মানুষ, আমার ভয় করে নি। আর পুরুষমানুষ হয়ে ভয়! পিঠে হাত দিয়ে বললে, ভয় নেই। বসুন। কথা আছে।

দুজনে বসল।

নীরজা বললে, দেখুন, আজই সুযোগ। ওরা আজ রাত্রে আর ফিরবে না। আজই যেতে হবে ভোরের গাড়ি ধ'রে। আপনার সব গুছনো আছে তো?

বিশ্বম্ভর মাথা নেড়ে 'হাঁ' জানাল।

নীরজা বললে, তা হ'লে একটা গাড়ি ডেকে আনুন।

বিশ্বম্ভর বললে, আজ থাক্ না।

নীরজা বললে, পাগল হয়েছেন নাকি? আজই যেতে হবে। ও-সব টাল-মাটাল ছাড়ুন। চিনতে পেরেছেন তো আমাকে? ছাড়া পাবেন না কিছুতে। আমার কথা যদি আজ না শোনেন তো সকলের সামনে আপনার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল আঁটব কাল। ওসব কেলেঙ্কারি যদি না চান তো ভালয় ভালয় আজই চলুন। বুঝলেন? যান, গাড়ি ডেকে আনুনগে।

বিশ্বম্ভর বললে, এত রাত্রে একা—

নীরজা ব'লে উঠল, রাত আবার কোথায়? বারোটা বাজে নি এখনও, গাড়ির আড্ডায় গেলেই গাড়ি পাবেন। বিশ্বম্ভর কাঁচুমাচু মুখে ইতস্তত করতে লাগল। নীরজা বললে, আচ্ছা, চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি। একেবারে অপদার্থ আপনি। পুরুষমানুষ ব'লে মনে হয় না। দেখছি, আমাকেই সব দিকে হাল ধরতে হবে। শ্বেতাঙ্গিনীকে যে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! ওকে নিয়ে চলত কি ক'রে আপনার? মাঝ-দরিয়ার ভরাডুবি হতেন যে!

সেই রাত্রে নীরজা ও বিশ্বম্ভর বাক্স-বিছানা বেঁধে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেল।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

সাঁওতালী ও আরও কিছু

১

লণ্ডন নগরে ছিল এক পণ্ডিত,
সব কিছু করিত সে লণ্ডিত ভণ্ডিত
তর্ক বিতর্কেতে খণ্ড বিখণ্ডিত,
করিত সে সব কিছু রগ চটা পণ্ডিত,
আহা থাক্, আহা থাক্, কথা তোর থাক্ না—
রোগা বক উড়ে যায় মেলে সাদা পাখনা,
সোনারঙ রোদ্দুর গায়ে গায়ে মাখ্ না,
আকাশের মুখ দেখ্ খুলে নীল ঢাকনা ॥

২

তিরতির ঘুরছে তিতির
আগুনে নাচছে শালিখগুলো,
চড়াই চালায় কিচির মিচির
পাঁচিলে দুষ্টু বেড়াল গুলো,
সাদা হাঁসগুলো কমলা ঠোঁটেতে খুঁটে খুঁটে খায় ভাতের দানা,
লাল ঝুঁটি তুলে চলেছে মোরগ পিছে পিছে চলে পাঁশুটে ছানা,
খেজুরগুঁড়ির ভাঙা পৈঠায় শ্যাওলা খুঁজছে কাৎলা মাছে
জামদার তার আঙ রাখা গায়ে পাজি মাছরাঙা তাকিয়ে আছে।
তিনটি কাঠির ছাপ্‌কা পড়ছে, হালকা পাখায় উড়ছে ধুলো—
তির তির তির নাচছে তিতির চেঁচামেচি করে শালিখগুলো ॥

৩

কুড় কুড় কুড়—আরে আরে বুড়ী, ব'সে ব'সে ও কি খাচ্ছিস ?
লাতিন কোথায় ?—কথাটা আমার কানে কি শুনতে পাচ্ছিস ?
আরে পোড়া মন, দেখ্ না কেমন, সাদা কাশভগা সরছে
লাতিন এখন বালি খুঁড়ে খুঁড়ে কাঁকড়ার দাঁড়া ধরছে ॥

৪

খিন্ খিন্ খিন্ খিন্, খিন্ খিন্ খিন্ তা—
ফুরিয়েছে সব কাজ ঘুলিয়েছে চিন্তা

হাওয়ায় নেমেছে ঢল, পথে হাঁটে বাঁকা জল,
শাখে শাখে কোলাহল, ঝড় দেয় ঝাপটা—
গরাদের গায়ে ওঠে লাউডগা-সাপটা।
টলমল পুকুরের ঢেউ মাতে মাৎলা
দলে দলে ছাটু খেতে ঘোরে রুই কাৎলা
কাজ যদি নেই তোর তবে চেয়ে থাক্ না,
জল কেটে কেটে চলে ভীতু ভীতু পাখনা,
হাওয়ায় নেমেছে ঘোর, সময় এসেছে তোর,
থাকবে নাকেউ আর, মেঘ হ'লে পাৎলা—
ঝড় এসে ঝাপটায় পৃথিবীকে জাপটায়
দলে দলে মহাখুশি নাচে রুই কাৎলা॥

৫

আহা পৌষের শেষ রাতে শীতে ম'রে থাকে লাল ফড়িংগুলো
খড়-খোঁচা মাঠে কে বোনে কলাই, পথে জমে শুধু শুক্‌নো ধুলো
কাঠুরিয়া যারা গাঁয়ে এল তারা, তারা-টিম্‌টিম্ আঁধার রাতে
আগুন জলে না, ডিব্রিয়াতে;—
কুয়াশা-জমাট অসাড় জ্যোৎস্না, ভালুকের দল আপন মনে
চ'লে গেছে দূর পাহাড়ের গায়; আলো-থমথম মহুয়া-বনে॥

৬

পায়ে পায়ে শুধু বাড়ে পাহাড়
এ কি পৃথিবীর শুক্‌নো হাড়
এলাম কোথায়? কান্দাহার।
আমুদরিয়ায় জিইয়ে প্রাণ
পেরিয়ে তাক্‌লা মরু মাকান
হারিয়ে হৃদয়, খুইয়ে ঘর
এলাম কোথায়? এ কাশগড়।
এখানে কেবল মাঠ বড় বড়, কোথায় বা ঘর? কোথায় বেড়া?
পাহাড়ের কোলে পোড়া পোড়া গ্রাম, এদিকে ওদিকে চরছে ভেড়া
আকাশ অবাধ খাঁ-খাঁ করা মাঠ, কোথায় বা গলি কোথায় ঘুঁচি?

এলাম কোথায় ? এ উক্রুমুচি।
চারিদিকে হাওয়া হেসে যায় হা-হা
জ্বলে জলমরা বালির গাঙ্
সিং কিয়াঙ্।

৭

টিটিকারা হ্রদে আর বাইব না দাঁড়।
চারিদিকে চেয়ে আছে পুরোনো পাহাড়।
ছুপ্ ছুপ্ ভাঙে জল, বুক ভাঙে কার ?
চমকে চমকে ওঠে মনটা আমার।
কালো কালো গুহাগুলো চায় নিঃসাড়,
ভয়ে ভয়ে হাওয়া কি যে বলে বার বার,
টিটিকারা হ্রদে আর বাইব না দাঁড়॥

৮

আসবে কখন ? ক'রো নাকো আর ক'রো না দেরি,
এপ্রিলে ফোটে পাহাড়ের গায় গোলাপী চেরি।
যে মাসে হলুদে ফুলে ভ'রে যায় পাহাড়ী লতা,
তোমার সঙ্গে রয়েছে অনেক—অনেক কথা।
তারা শুনে শুনে হয়ে যাবে ভোর হাল্কা রাত
কখন আমায় বাঁধবে তোমার দুখানি হাত
বলতে পারি না, ক'রো নাকো আর ক'রো না দেরি,
গলছে তুষার ; জান না, এখনি ফুটবে চেরি!

৯

বুধ্রো, এখনি যা না, তাড়াতাড়ি যা না,
সন্ধ্যে ঘনায় এল না মোষের ছানা,
ও-ঘরেতে ওর মা'টা যে কেমন করে
থাকতে পারি না রাখতে পারি না ধ'রে।
বুধরো, এখনি যা রে, তাড়াতাড়ি যা রে
খুঁজে দেখ্ দেখি বুড়ো পাহাড়ের ধারে
উইচিপি দিয়ে জমেছে বেজায় ধুলো

তিরতির ক'রে পালায় সজারুগুলো
বুধরো, শোন্ তো, আহা নিস নাকো দোষ
ধরিস দিকিনি, যদি পাস খরগোশ।
বনটিয়াগুলো ঝাঁক বেঁধে থাকে গাছে
গুল্‌তিটা তুই রেখে দিস কাছে কাছে
আর দেখ্, যদি চিতি কি হুড়ার তাড়ে
টাঙ্গিটা তুলে সজোরে বসাস ঘাড়ে
কাটাকুটি হ'লে, সুরসতিয়ার জলে
চান ক'রে নিস, আর বেশি রাত হ'লে
পাহাড়ে ঘুমোস, জ্বালিয়ে আগুনখানা।
বুধরো, এখন যা রে তুই তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যে ঘনায় এল না মোষের ছানা॥

১০

এখানেতে নয়, তিনপাহাড়ীর পর
আমার প্রিয়ার ছোট্ট সে কুঁড়েঘর।
চ'লে যেও তুমি, করবে না কেউ মানা,
ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকবে কুকুরছানা,
ধুলোপায়ে গিয়ে দাঁড়ালে দোরের 'পরে,
আঁজলা আঁজলা দই দেবে হাত ভ'রে।
আহা, কতদিন মুখ রেখে তার মুখে,
ধুক ধুক কথা শুনেছি যে বুকে বুকে।
আহা, কতদিন হাত ঢেকে তার চুলে,
অবুঝ মনের বাঁধন দিয়েছি খুলে।
আহা, কত রাত শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি,
ভুলেছি এখন কেন যে হেসেছি হাসি,
এখানেতে নয় তিনপাহাড়ীর পর,
আমার প্রিয়ার যেইখানে কুঁড়েঘর॥

১১

টাট্টু টা যদি আনতে পারিস
আনতে পারিস তবে
বড়জোর মজা হবে।
সামনেতে আমি ঝুঁকে যাব, আর
তুই ঝুলে যাবি পিঠে,
তুলকি চলন তারপরে কড়ামিঠে;
চ'লে যেতে পারি যেখানেতে যেতে চাও
কিন্তু কোথাও যাব নাকো ভাই,
সোজা যাব বড়গাঁও।
হটের মেলায় কিনব লাড্ডু,
তারপরে দেব পাড়ি,
সন্ধ্যের ঝোঁকে ফিরব আবার বাড়ি।
কিছু যদি নাও হয় কেনাকাটা,
দেখব তো সারাদিন—
হাজারো মেয়ের ছোপানো হলুদ শাড়ি।

অসিতকুমার

বস্তু ও বাস্তব

আমি জানি যে, আমি সুন্দরী।

'পটের বিবি' করিয়া কেহ যদি রাখিতে চাহিত, তবে বোধ হয় আপত্তি করিতাম না। বোধ হয় বলিলাম 'থিয়োরী অব্ রিলেটিভিটি'র মর্যাদা রাখিতে। পৃথিবীর সেরা সেরা সব সুন্দরী যে-সকল পরিবেশে জীবন যাপন করিয়াছেন, সে সকল পরিবেশে মনের অবস্থা কি রূপ পরিগ্রহ করিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, কবি বা সাহিত্যিক-পরিকল্পিত সুন্দরী নায়িকার পদে যদি আজ আমাকে কেহ বহাল করে তবে বিনাদ্বিধায় আত্মসমর্পণ করিব।

অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের কাছে দুই-একবার কথাটি বলিয়াছি। তাহারা

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছি-ছি বলিয়া কানে আঙুল দিয়াছে। বলিয়াছে, 'ডিফিটিস্ট্ মেণ্টালিটি'। আরও যে সকল বাছা বাছা বুলি তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম না,—নারী-প্রগতি সম্বন্ধে যাঁহারা বিন্দুমাত্রও সজাগ আছেন তাঁহারা সকলেই সে সকল বুলির সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত।

বান্ধবীদের দোষ নাই। কলেজে তাহাদের পাণ্ডাগিরি করিয়াছি। বিবাহ মানেই যে পুরুষের দাসত্ব—এ কথা অবলীলাক্রমে তখন সপ্রমাণ করিয়াছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীসমাজকে বার বার কলেজের কমন-রুমে টানিয়া আনিয়াছি। খট্‌খটে মন লইয়া গট্‌গট্ করিয়া জীবনের যাত্রাপথে পুরুষের পদক্ষেপের তালে তাল রাখিয়া চলিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

সে সব কথা আজও ভুলি নাই। রমণী যে পুরুষের খেলার পুতুল—এ কথা আজও স্বীকার করি না। ।কন্তু নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। বুঝিয়াছি, দাসত্ব বহুরূপী। মনুষ্য-সমাজের সর্বত্রই সে শিকারের আশায় ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। নানা ভাবে মনুষ্য-সমাজকে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহকে বিমুখ করিলেও নর-নারী বন্ধন-রজ্জুকে বিকল করিতে পারে না। জৈবিক সমস্যাগুলিও দাঁত বাহির করিয়া ক্রমাগত হাসিতে থাকে।

জিজ্ঞাসা করিবেন, এত সব যখন বুঝিয়াছি, তখন বিবাহ করিতেছি না কেন?

সে কথা আমিও ভাবিয়াছি। বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে প্রেম আত্মগোপন করিয়াছে। পিছনে রাখিয়া গিয়াছে তাহার উপসর্গগুলি। ওই উপসর্গগুলির ভয়েই বিবাহ করিতেছি না। বিবাহের আর সকল দাবি হয়তো মানিয়া চলিতে পারিব, কিন্তু ভালবাসিবার ভান করিতে পারিব না। সত্যেন বলে যে, সে আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বধূভাবে সে আমাকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে না, আমি তাহা জানি। আমার সখীত্বের উপর ভরসা করিয়াই সে আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। তাই ভয়ে আমি পিছাইয়া পড়িয়াছি।

আপনারা বলিবেন, পারভারশন।

বলুন। কিন্তু আমি ভুলি কি করিয়া যে, 'পটের বিবি' যাহার জন্য পট ছাড়িয়া হাটের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাও নিতান্তই জৈবিক। শুধু জৈবিক বলিলেই ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সেই জৈব কারণটা অতীব স্থূলও বটে। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্যই চাকুরি করিতেছি। এটা 'শিভাল্‌রি'র যুগ নহে। আমার চাঁদপানা মুখের দিকে চাহিয়া কেহ কাব্য রচনাও করিবে না, ডুয়েলও লড়িবে না। বস্তুতান্ত্রিক জগৎ—বস্তুটাই এখানে প্রধান,—শুধু প্রধান নহে, প্রধানতম। মন জিনিসটা এখানে অবান্তর—ব্যাধিক্ষেত্র। তাই সেসব বালাই চুকাইয়া না দিলে এ জগতে বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর। নিছক বাঁচিবার তাগিদেই অর্থোপায় করিতে হইতেছে। একেবারে সংস্কারমুক্ত হইয়া উঠিতে পারি নাই, তাই নিছক বস্তুবাদী হইয়া উঠিতে বাধা অনুভব করিতেছি। প্রয়োজনের তাগিদকে তাই একটা আব্রুর আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছি। এ যুগের পুরুষদের মতই আত্মবিক্রয়ের সহজ পথটি বাছিয়া লইয়াছি। প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে মূলধন করি নাই, মননশীলতার বাই-প্রোডাক্ট অবিদ্যারই সাহায্য লইয়াছি। এক সরকারী অফিসে টাইপিস্টের কাজ করি।

আত্মপ্রতারণা করিবার অভ্যাস থাকিলে এতগুলি কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। মনের সানাই প্রতিনিয়ত বেহাগের আলাপ করিতেছে, আদর্শের জগঝম্প বাজাইয়া তাহা তলাইয়া দিতে পারি না। নারী আমি, নরের সঙ্গে পা মিলাইয়া তালে তালে চলিতে পারিতেছি—ইহাতে আত্মপ্রসাদ যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব না, কিন্তু এই আত্মপ্রসাদকে জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মানিয়া লইতেও পারিব না।

তাই ট্রাম-বাসে যখন অনেকেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আমার মুখের উপর আঁটিয়া বসিয়া থাকে, তখন মনে মনে উল্লসিত না হইয়া পারি না।

পুরুষের দল কি ভাবেন, আমার পক্ষে তাহা অনুমান করা শক্ত। তবে স্তুতি-নিবেদনের চিরাচরিত প্রথা তাঁহারা বদলাইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কালিদাস, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া

দিলাম—'লেডীস্ ফার্স্ট'-এর যুগও তাঁহারা পিছনে রাখিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। বস্তুযুগের মানুষ তাঁহারা, ভাবের ফানুস নহেন। কিন্তু সত্যই কি বস্তুবাদী তাঁহারা ?

প্রকৃত বস্তুবাদী ছিল আদিম মানুষ। বস্তুকে তাহারা পূজা করিত ; প্রয়োজনের কাছে নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করিত। নারীমন তখন তাহারা জয় করিত বলপ্রয়োগ করিয়া।

আধুনিক সভ্যতা বস্তুবাদকে জড়বাদে পরিণত করিয়াছে। বস্তুপ্রীতি নহে—লিপ্সা, প্রয়োজনের তাগিদ নহে—লালসা তাহাদের পরিচালনা করিতেছে। আদিম প্রকৃতি-পূজার উপর বহু প্রলেপ সে দিয়েছে। তাই এ যুগের মানুষ নারী-মন জয় করিতে চাহে না, ছলের সাহায্যে বিহ্বল করিয়া তুলিতে চাহে।

তাই কন্‌ডাক্টর যখন হাঁকে, 'লেডীস সীট—বাঁ দিকেরটা,' তখন সীটের অধিকারীরাই যে কেবল আগন্তুক মহিলার উপর বিরক্ত হন তাহা নহে, বাসের সকল যাত্রীই চঞ্চল হইয়া উঠেন।

একটা গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যায়। দুই-একটি বাঁকা মন্তব্যও কানে আসে। কিন্তু আমার রাগ হয় না। কারণ সে গুঞ্জনের প্রকৃত মর্ম আমি বুঝিতে শিখিয়াছি। তাচ্ছিল্যের মাধ্যমে স্তুতিনিবেদন। একটু ঘুরাইয়া বলা যায়—আমাদের ও তোমাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আজও রহিয়াছে, তোমরা সে কথা অস্বীকার করিতে চাও কেন ? ঘরে তোমাদের মর্যাদা দিতে পারি না, তাই বলিয়া তোমরা হাটের মধ্যে আসিয়া আমাদের বিব্রত কর কেন ? তোমরা রমণী, তোমাদের নারীত্ব ভুলিব কি করিয়া ?

তাঁহাদের প্রাত্যহিক এই সচকিত ভাবই আমার নারীত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অনেক পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি যে মেয়ের মনে আনন্দের সঞ্চার করে রীতির বা নীতির দিক হইতে তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সমাজ চাহে না। কিন্তু ওটুকু বাদ দিলে আমারও যে চলে না। ভিড়ের মাঝে এমনভাবে মিশিয়া যাই যে, নিজেকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না। সহযাত্রীদের বিরূপতাই আজ আমার নারীত্বের

স্বীকৃতি। তাঁহারা যদি আমাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতেন, তবেই আমার নারীত্বের বিলোপ হইত—বাঁচিয়া থাকিত ব্যক্তিত্বহীন একজন টাইপিস্ট মাত্র।

তাই একটা নির্বিকার ভাব মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া অচঞ্চল বসিয়া থাকি। অফিসে কাজের চাপে প্রাণ যখন পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে চাহে, তখন ট্রাম-বাস-পথ-ঘাটের সেই সব লুব্ধ দৃষ্টিগুলিকে নীরব-স্তুতি বলিয়াই মনে হয়। ওদের মনের কথা অপ্রকাশিত কবিতার মত মনের দুয়ারে আঘাত করে। টাইপ-রাইটারের চাবির উপর তড়িৎগতিতে চলমান নিজের আঙুলগুলিকেই চম্পকদল বলিয়া ভ্রম হয়। নিজের আঙুল লইয়াই কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করে।

তথাপি ঐ লোকটির চাহনি আমি সহ্য করিতে পারি না। রোজই বাস-স্ট্যাণ্ডে তাহার সহিত আমার দেখা হয়। বাসের পাদানির কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। আমি বাসে উঠিলে পিছন পিছন উঠে। আমার সীটের পাশেই আসিয়া দাঁড়ায়। রোজই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপর কাহাকেও আমন্ত্রণ করিয়া পাশে বসাই।

লোকটি কিন্তু কোনদিনই বলে না, বসতে পারি ?

যদি বলিয়া বসে, 'না' বলিতে পারিব না। আত্মসম্মানে বাধিবে ; কিন্তু সে বলে না।

দোহারা চেহারা। চুলগুলা ছোট করিয়া ছাঁটা। জামা-কাপড়ে কোন পারিপাট্য নাই। পিতলের রডটি ধরিয়া অবচলিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

দুই-একদিন আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়াছি, লোকটি অপাঙ্গে আমার দিকেই চাহিয়া আছে। আজকাল আর চাহিয়া দেখিবার দরকার হয় না। সে যে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারি।

মার্টিন কোম্পানির কাছে গাড়ি আসিয়া থামে। নামিয়া দেখি লোকটি একটি লাইট্-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। কখনও কখনও চোখাচোখি হইয়াছে, আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি ; প্রশান্ত সে দৃষ্টি, লালসা চিহ্নমাত্রও সেখানে নাই।

বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। রোজই ভাবি, ধর্মতলা ঘুরিয়াই অফিসে যাইব। কিন্তু সময় ও দূরত্বের পরিমাপ ভাবিয়া পিছাইয়া পড়ি।

সেদিন শনিবার। কিন্তু অফিসে কাজ ছিল। বাহির হইতে একটু দেরি হইয়া গেল। জানালার কাছে বসিয়া রাস্তার জনস্রোত দেখিতেছিলাম। ভিড়ের মধ্যে আমাদের বাসটা 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' করিয়া চলিতেছিল। লালবাজার পুলিস-স্টেশনের সম্মুখে আসিয়া একেবারেই থামিয়া গেল। পাশে দাঁড়াইয়া ছিল একটা ট্রাম। গৃহাভিমুখী চাকুরের দল হিতাহিতজ্ঞানশূন্যভাবে যে কোন অবলম্বন আঁকড়াইয়া ট্রামের সর্বত্র ঝুলিতেছে। ট্রামটি যেন দ্রাক্ষালতা, মানুষগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ হইয়া ঝুলিতেছে।

দেখিলাম, সেই লোকটিও আছে। এক হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরা, এক পা পাদানিতে অন্য পাখানি ট্রামের বাহিরে অবলম্বনহীন হইয়া ঝুলিতেছে। তাহার ও আমার মধ্যে মাত্র হাত দেড়েকের ব্যবধান। চকিতে চোখাচোখি হইল। ওই 'স-সে-মি-রা' অবস্থাতেও সে আমার দিকে তাকাইয়া আছে।

তাহার সম্পূর্ণ মুখখানি আজ দেখিলাম। হঠাৎ মনে হইল, মুখখানি যেন অন্য কোথাও দেখিয়াছি। কবে কোথায় মনে করিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। সহসা নিজের মূর্খতার কথা মনে হইয়া হাসি পাইল। ক্ষণিকের জন্য হইলেও প্রত্যহ যে মুখখানি দেখিতেছি, তাহা পরিচিত বলিয়া মনে না হওয়াটাই তো অস্বাভাবিক।

ট্রাম ও বাস পাশাপাশি চলিতেছে। অতি ধীরে। আমাদের পারস্পরিক ব্যবধানও অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইতেছে।

বাসের গতিবেগ বাড়িল। সহসা বহু লোক একত্রে চীৎকার করিয়া উঠিল, সামাল—সামাল—

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়া বাসখানি থামিয়া গেল। ট্রামে বাসে ধাক্কা লাগিয়াছে। ঝুলন্ত মানুষগুলি টাল সামলাইতে পারে নাই। পাকা আঙুরের মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে।

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম। পাঁচ-ছয় জন লোক পড়িয়া আছে। একটি লোকের পায়ের উপর বাসের একটি চাকা চাপিয়া বসিয়াছে। দেহটি তাহার যন্ত্রণায় পাক খাইতেছে।

মরণাহত লোকটি আমার দিকে মুখ ফিরাইল।

দেখিলাম, সেই লোকটি।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল।

* * *

রবিবার।

নীলিমা আসিয়াছে। আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু নীলিমা। সেও চাকুরি করে। বহুক্ষণ ধরিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া অন্তরের ভার লাঘব করিলাম।

নীলিমা উঠিল। তাহাকে আগাইয়া দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

নীলিমা বলিল, একটা বড় দুঃসংবাদ আছে রে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম।

জীতেশ অ্যাক্‌সিডেণ্টে মারা গেছে।

কোন্ জীতেশ?

আমাদের বারে যে ইংরিজী অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'ল, সেই জীতেশ সান্যাল। তোর কাছে আচমকা এক প্রেমপত্র লিখে কি ক্যাসাদেই না পড়েছিল বেচারী! সেই যে, I shall follow you unto death! এর মধ্যে নামটা পর্যন্ত ভুলে গেলি? ডায়না, না, ডাইনী তুই?

নীলিমার মুখে চাপা হাসি খেলিতেছে।

দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আহা! তুই খবর পেলি কি ক'রে?

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল ওরা। কাল রাতে বাসায় ফিরে শুনলাম। বুড়ী মা আর দুটি ভাই। কি কান্নাটাই সব কাঁদছে! তবু রক্ষে, বিয়ে করে নি।

অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'ল কি ক'রে?

ট্রামে আসছিল ঝুলে। একটা বাস এসে ধাক্কা দেয়। সামলাতে না পেরে একেবারে বাসের তলায়। হাসপাতালে ঘণ্টাখানেক বেঁচে ছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল না।

দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া উঠিল। অস্ফুট-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে?

গত কাল।

দেহ-মনের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার জিজ্ঞেস করিলাম, কোথায়?

লালবাজার পুলিস-আপিসের সামনে।

পৃথিবীটা যেন দুলিয়া উঠিল। দরজার চৌকাঠ ধরিয়া টাল সামলাইলাম। কানে বাজিতে লাগিল, I shall follow you unto death।

নীলিমা বলিল, আসি ভাই।

যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় নাড়িলাম।

নীলিমা চলিয়া গেল।

* * *

চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছি এবং সত্যেনকে বিবাহ করিতেই সম্মত হইয়াছি।

বিবাহের তারিখ একুশে বৈশাখ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মানুষে যা চায়

মানুষের প্রিয় হতে প্রিয়তর সন্তান। সন্তান ভেবে জোর পাই ব'লে তাদের লক্ষ্য ক'রে লেখা। আসলে যার হিত হবে, তার জন্যই লেখা।

তুমি যা চাও তা পেলে তুমি খুশি, যদি তোমাকে তা দিতে পারি তবে আমিও খুশি। তারই চেষ্টার আয়োজন এই লেখা। ভয় নেই, দেবার বেলা তোমার কাছে এমন কিছু চাইব না, যা তোমার হাতে নেই। যাতে তোমার চাওয়া তুমি অমনি পাও বা অতি সহজে পাও সেই চেষ্টাই করব। আমাদের হাতে কি আছে না-আছে তা তো আমরা জানি। হাতে হয়তো কানাকড়ি আছে, এই কানাকড়ি দিয়ে খেলেই যাতে আমরা যা চাই তা পাই, তারই কৌশল বের করতে হবে।

মুখবন্ধ ও বাণীর কাঠামো

তুমি আমি সুখে শান্তিতে থাকতে চাই, কাজে উন্নতি-সফলতা চাই, আর চাই সকলের প্রিয় হতে। সবাই তা চায়। তোমার আমার সুখ, শান্তি, সফলতা ও জনপ্রিয়তা, এই কাম্য চতুষ্টয়ের জন্যই বাবার বাণী।

তুমি আমি যা চাই, অন্য মানুষেও তাই চায়। সব দেশে ও সব কালে মানুষ মূলত চেয়েছে দুটো জিনিস, মাত্র দুটো—স্বাস্থ্য ও মানুষের সম্পর্কে সফলতা—Health and human relation success. এই দুটোর চালনায়, Projectionএ পাই আর তিনটে—দীর্ঘজীবন, যৌবনশক্তি ও সংস্থান (Provision-Prosperity)—এই তোমার, আমার, ওর, তার, সকলের সর্বনিম্ন কাম্য, দুটোই বল আর পাঁচটাই বল। এরই শাখা-প্রশাখার বিস্তারে সংসারে সতের গণ্ডা বা সাতাশি গণ্ডা বা সহস্র গণ্ডা চাওয়া। মূলে কিন্তু দুটোই। আমরা এই চাওয়াটা আমাদের সহজবুদ্ধিতে ও সাদা কথায় বলেছি,—সুখ, শান্তি, সফলতা ও জনপ্রিয়তা। এর সন্ধান ও সহজ পথ দেখিয়ে দেবার জন্যই বাবার বাণী।

ভাবছ পথ বুঝি দুর্গম। এই মাত্র বলেছি, যাতে অতি সহজে পথ পাও সেই চেষ্টাই করছি। আরও ভরসা দিচ্ছি, ফল পাবেই, আমাদের ব্যবস্থা কখনও ব্যর্থ হয় নি, এর পেছনে অনেক পরীক্ষা ও তপস্যার ফল আছে। আরও বলছি, ফল পেতে দেরিও হবে না,—আজই, এখনই ফল পাবে। যেতে যে হবে বহুদূর, তা সবাই জানে। কিন্তু যখন আরম্ভ থেকেই ফল পাবে, তখন তোমার পথ তিক্ত হবে না। মিষ্টিও হবে, উৎসাহও পাবে। মানুষ হাজার হাজার বছরের তপস্যার ফল পেয়েছে, আজ বিজ্ঞানের জ্ঞান পেয়েছি, নিজেরা বস্তু পরখ ক'রে নেবার শিক্ষা ও দৃষ্টি পেয়েছি। অতএব আজ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ঠুলিটা ফেলে দিয়ে, খোলা চোখে ও খোলা মনে এগিয়ে যাব। ফল যদি না পাই কোন ব্যবস্থায়, তবে তখনই সেই ব্যবস্থা ছুঁড়ে ফেলে দেব, সোজা কথা। ছমাস ধ'রে, মাদুলি ধারণ ক'রে, ফলের জন্য প্রতীক্ষা

করার অনিশ্চয় দীর্ঘ পথ ধরতে রাজী নই। আর হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ সাধনাও আমাদের দর্শনে নামঞ্জুর।

চৌষট্টি বছরের দেখে শুনে ঠেকে শেখা জ্ঞান, নানা রিসার্চ ও পরীক্ষার ফল, পূর্ব আচার্যদের তপস্যার সঞ্চিত ফল, এই সব থেকে যা দিচ্ছি তা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ। কিছু না কিছু পাথেয় পাবেই। তা ছাড়া অত বড় আশার বাণী, ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে না, আজই ফল পাবে। স্বার্থ বা প্রয়োজন বাদই দিলাম, ঔৎসুক্যেও বাবার বাণী একবার উল্টে দেখা উচিত।

মানুষের দুটো চাওয়া—স্বাস্থ্য ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যে আজকে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই কথা বলছি। এবং তার সন্ধি অংশ নিয়ে, বিগ্রহরূপ নিয়ে নয়। সন্ধি বলতে সন্ধিপ্রধান বুঝি, কারণ সন্ধিবিগ্রহ জড়িয়ে বিশ্বরূপ।

আমাদের আজকের বিষয়বস্তু সংসারে তোমার তপস্যা। আমি যা চাই, তুমি যা চাও, তার উপর আমাদের ভিত। আমি যা জানি, তুমি যা জান, তাই আমাদের উপাদান। কাজেই বাণী সহজেই বুঝবে। আচার্যের কথায় বলি, It is myself I portray। ইচ্ছা—আমার নিজের কথাই বলব। আচার্যদের তপস্যার সঞ্চিত ফল ও বাণী যা আমার রক্তে মিশিয়েছি, তাকে আমার কথাই বলব। পরের কথা অর্ধচর্বিত ভাবে দিয়ে দুর্বোধ্য না ক'রে, নিজের কথা বলাতে এই বাণী সহজবোধ্য হবে ব'লেই আশা করি। কল্পনা, কোটেশন, রূপক, মিস্টিসিজ্‌ম্ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছি। কথাগুলি গুছিয়ে বলেছি ব'লে, নূতন বললে নূতন, নতুবা সবই পুরানো, প্রায় সবই তোমার আমার জানা কথা।

কথাগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, সে জন্য সংক্ষেপ সূত্রাকারে দিলাম। বাংলাতে সুবিধে করতে পারি নি ব'লে সূত্রগুলি ইংরেজীতে দিতে হ'ল। অবশ্য ভাব ও ভাষ্য বাংলাতে। ইচ্ছা হয় ইংরেজী বাদ দিয়েও পড়তে পার, তবে ইংরেজীটা মনে রাখবার সঙ্কেত। মূলসূত্র—Your Tapashya in Sangsar, সংসারে তোমার তপস্যা। তপস্যা ও সংসারের ইংরেজী পাই নি। এই চারিটি শব্দে চারিটি অধ্যায়, এবং

এই একুশটি অক্ষরে একুশটি সূত্র। বাণীতে থাকবে থিওরি ও টেকনিক বা ভূমিকা ও সূত্রপ্রয়োগ-সন্ধানের কৌশল। টেকনিক, যাতে সূত্রগুলি সহজে কাজে লাগাবার জন্য প্র্যাক্‌টিক্যাল নির্দেশ পাই। আমাদের পথ চলতে দুটো বাধা সব চাইতে প্রবল—Ignorance ও Inaction, না-জানা ও না-করা। জানবার জন্য মানে-বই বা অভিধান চাই, এবং করার জন্য শুধু উৎসাহ পেলেই হবে না, সহজ টেকনিক চাই। আমাদের 'মানুষে যা চায়'-দর্শনের মূলসূত্র এই দুটো—মানুষে কি চায় তার মানে এবং কি উপায়ে তা সহজে পাওয়া যায় সেই কৌশল। অর্থাৎ আমরা চাই এবং প্রতিষ্ঠা করতে চাই থিওরি ও টেকনিক।

প্রাক্‌টিক্যাল বলতে এই বুঝি যে, আমার সুবিধের জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে না থেকে, হাতের কানাকড়ি দিয়েই খেলা এবং খেলায় ভুল না করা। এই কানাকড়ি দিয়েই রাজারাজড়ার সঙ্গেও পাল্লা দিতে হবে, নতুবা তোমার আমার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের মূল্য কি? পাঁচ কোটি বছরের ইতিহাস বলে, সর্পজাতি যা ছিল তাই আছে। আর মানুষ গত পঞ্চাশ বছরে কোথা থেকে কোথায় এসেছে দেখতেই পাচ্ছ। ধনীর ছেলে ছানা খায়। আমার পয়সা নেই, অথচ ঐ ছানার পুষ্টি আমার চাই। পয়সার অভাব বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে পূরণ করতে হবে। ছানাতে আট আনা খরচ না ক'রে, এক পয়সার কাঁচা চিনে বাদাম দিতে পারি, স্বাদ কম হ'লেও খাদ্যমূল্য কাছাকাছি। সংসারের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কানাকড়ি দিয়েও জিততে পারি যদি খেলতে জানি, অর্থাৎ যদি ঠিক ঠিক টেকনিক জানা থাকে। টেকনিক ভুল না হয় তাও দেখতে হবে। Don't rub the wrong way—সাপের ল্যাজে পা দিও না। এই টেকনিকের সন্ধানই আমাদের আজকের রিসার্চ।

পথ চলতে অনেক খানা-ডোবা আছে, তাতে পা না পড়ে, অতএব একটু সাবধান ক'রে দি। একটা কথা মনে রাখবে, আমরা দর্শনের আখড়া খুলে বসি নি যে, কথার তত্ত্ব নিয়ে তর্ক-যুক্তিতে সব শক্তিটুকু খরচ করব। আমরা সংসারে পথ চলতে প্রাক্‌টিক্যাল নির্দেশ ও সাহায্য

চাই, যাতে এগিয়ে যাব, যাতে সুখ শান্তি সফলতা ও ভালবাসা পাব। স্বভাবতার্কিক কিন্তু প্রতিপদে ধাক্কা দেবেই, তাতে চঞ্চল হ'লে চলবে না। সস্তা অহমিকা প্রকাশ স্বভাবতার্কিকের স্বভাব। সেদিন এক পণ্ডিত-সভায় হঠাৎ ব'লে ফেলেছি, মানুষের সন্তোষ মনে। আর যায় কোথায়! ধাক্কার পর ধাক্কা—মন বস্তুটা কি, কোথায় বসতি, কোথা থেকে এল, গুণ, সত্তা, স্থিতি, স্থাপকতা, এটা, ওটা, সেটা, কত কি! বাজার না করলে হাঁড়ি চড়বে না, পেয়েছি পাঁচটা টাকা। এখন টাকার তত্ত্ব আলোচনায় ব'সে গেলে, টাকাটা কি ধাতুর, কত খাদ মেশানো, টোকন মুদ্রা কাকে বলে, বাটার হার কত—এ সব গবেষণায় ব'সে গেলে, বাজার করা হয় না। আজ টাকার সত্তা সম্বন্ধে বোকা থাকতে রাজী আছি, তবু বাজার করা চাই। কাল অবকাশ-বিলাসের সময় টাকার সত্তা ও ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করা যাবে।

বিবাহ-পণ-নিবারণী সভা। বক্তা বলেন, পণ এই, পণ ঐ, পণের এই বুৎপত্তি। প্রতিবাদ হয়, পণ অন্যভাবে সিদ্ধ। তৃতীয় ব্যাখ্যা হয় অন্য রকম। চতুর্থ পণ্ডিত দাঁড়ায় ভিন্ন ব্যুৎপত্তি নিয়ে। বিতণ্ডা বাধে প্রচণ্ড। আঠারখানা অভিধান, চোদ্দখানা ব্যাকরণ ও নানা শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে পণ্ডিতকুল। হট্টগোলে মুখ থেকে বিতণ্ডা নাসে হাতে। তর্কচূড়ামণির টিকি বাচস্পতির হাতে। কাব্যতীর্থের যজ্ঞোপবীত তর্কতীর্থের পায়ে। বাকিটা সহজে অনুমেয়। সভা ভাঙে। পণ থাকে তোলা। প্যাণ্ডেলে গোজাতির ভিড়, পূজার কলা পাতা চাল কলার আকর্ষণে। এই স্বভাবতার্কিকের রূপ এখানে সেখানে দেখতে পাই।

এই সব স্বভাবতার্কিকের হাত এড়াবার জন্য গোড়াতেই মুখবন্ধ ক'রে নিয়েছি, 'আমার নিজের কথা বলছি, তুমি আমি যা চাই তাই আমাদের ভিত, তুমি আমি যা জানি তাই আমাদের উপাদান'। অবশ্য খোলামন পণ্ডিতের সমালোচনাকে আমন্ত্রণ করি, যাতে ভুল ধরা পড়বে এবং যাতে ভুল শোধরাতে পারব। কিন্তু মাক্ষীবৃত্তি স্বভাবতার্কিকের কাছে যেতে ইচ্ছে নেই, পাশ কাটিয়ে যাব।

মূলসূত্র—Your Tapashya in Sangsar—সংসারে তোমার

এইবার একুশটি সূত্র সাজিয়ে যাই, একটু একটু ভাষ্য দিয়ে, অবশ্য অল্পপরিসরে যতটা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত শোন, কারণ এক সূত্রভাষ্যে যে সন্দেহ জাগবে, অন্যটাতে হয়তো তার জবাব পাব।

প্রথম অধ্যায়—ভাবনা

ভাবনাই শক্তি

প্রথম সূত্র—Your Life is what your thought makes it—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যে যা ভাবে তাই হয়, যা চায় তাই পায়।

রোমসম্রাট ও দার্শনিকের কথায় বলি—এই আটটি শব্দে তোমার আমার নিয়তি নিয়ন্ত্রিত।

আয়ুর্বেদ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান মেও ক্লিনিকাদি ও শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যতাত্ত্বিকদের আজকের শেষ সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি মনে (শতকরা ৭০ থেকে ৯০)। রোগ বাড়তি কমতি, সারা না-সারার উপর মনের প্রভাব সব চাইতে বেশি, এদের লম্বা ফিরিস্তি দেখলে মনে হয় না যে, কোন রোগ বাদ পড়েছে।

পৃথিবীর যত বড় বড় কাজ সকলেরই উৎপত্তি—সফলতা বিফলতা মনে, ইতিহাস বলে। জয় ভাবলে জয়, পরাজয় ভাবলে পরাজয়, অসুস্থ ভাবলে অসুস্থ, সুস্থ ভাবলে সুস্থ, ভাল আছি ভাবলে বারো আনা রোগ সারে। ভীতি, হতাশা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ত্যাগ ক'রে জয় ভাবা, এবং ক্ষয় ভাবনা মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না দেওয়া তোমার আমার মুক্তির ও সফলতার নিশ্চিত পথ।

মানুষের সন্তোষ মনে। পৃথিবীর সব চাইতে দুর্ভাগ্য, জন্ম-অন্ধ, কালা, বোবা হেলেন কেলার বলেন, পৃথিবী যে কত সুন্দর, কত মিষ্টি, কত মধুর, কত ভাল, তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। আবার জয়তিলকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান জীবনের শেষ অঙ্কে সেণ্ট হেলেনাতে দুঃখ করেছেন, জীবনে আমি ছয়টিও আনন্দের দিন পাই নি। দুর্ভাগ্য কার, সৌভাগ্য কার? অতএব যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এই থিওরি। এর টেকনিক দেবার জন্যই বাবার বাণী।

শক্তির উৎস

দ্বিতীয় সূত্র—Ourself or overself is omnipotent.

তুমি, তোমার অন্তর্দেবতা সর্বশক্তিমান। যাদের অতিমানব মহামানব বল, তাদের সঙ্গে তোমার একটি মাত্র প্রভেদ। তারা নিজেদের শক্তিমান ভেবে আত্মশক্তি জাগিয়েছে, কাজে লাগিয়েছে। তুমি আমি নিজেকে অক্ষম পঙ্গু ভেবে রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

শক্তির বোধন

তৃতীয় সূত্র—Utilise your Energy by developing latent power—সুপ্তশক্তি জাগাও।

এই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক জার্মান ভুন্ধ্ ও মার্কিন জেম্‌স ও তাঁদের সহকর্মীদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, মানুষ তার এতটুকু শক্তি নিয়ে, ধর, তার মাত্র এক আনা শক্তি নিয়ে কাজ করে, আর তার বাকি পনের আনা থাকে সুপ্ত। অতএব তোমার কর্তব্য সুস্পষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক বলেন—Discover, Develop Dormant power within to meet Life's situation in every field—Business, Society & Home for sure success—তোমার ভিতরের সুপ্ত শক্তি চিনে নিয়ে তাকে জাগাও এবং নিশ্চিত সফলতার জন্য সংসারের কাজে লাগাও। (শক্তি চায় সবাই, কেউ দাম দিয়ে চায়, কেউ অমনিই চায়। শেষের দলই ভারী, ফলে তাদের শক্তি সুপ্তই থাকে। আবহমান কাল ধ'রে শক্তি জাগাবার জন্য মানুষ নানা উপায়—টেকনিক দিয়ে গিয়েছে। পাত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে পূজা, পাঠ, প্রার্থনা, মন্ত্র, সাধ্যায়, আসন-মুদ্রাদি যোগাভ্যাস, ভজন, কীর্তন, যাগ, যজ্ঞ, কত কি!)

সহযোগিতা

চতুর্থ সূত্র—Reciprocate & adjust by co-operation (compromise, correction & compensation), আদান-প্রদানের সহযোগিতা কর পরস্পরের স্বার্থে। এটা Cosmic Habit Forceএর, বিশ্বস্বভাবের নিয়ম, যার Projection, অভিক্ষেপণ—তুমি

আমি। চক্ষু সারাও (correction) বা চশমা পর (compensation)। শিবের নাম ভাঙ্গতু, ভাঙে গড়ে—শিব মানে মঙ্গল। বিশ্বস্বভাব এগিয়ে যাওয়া—প্রতিযোগিতা, তার আবরণ সহযোগিতা। পৃথিবীকে বদলাতে না পার নিজেকে বদলাও, পৃথিবী তোমার সহায় হবে। পৃথিবীর ধূলো এড়াবার জন্য পৃথিবীকে চামড়া দিয়ে মোড়া যায় না, তোমার পা দুটো চামড়া দিয়ে ঢাক, জুতো পর। শক্তির চাইতে, abilityর চাইতে বড়—উপযোগিতা—adaptability.

এই হ'ল আমাদের ভূমিকা, যার উপর এখন তপস্যার (টেকনিকের) কাঠামো উঠবে। ভূমিকা হ'ল, তুমিই তোমার, তোমারই তুমি। অর্থাৎ তুমিই তোমার মিত্র, তুমিই তোমার শত্রু, তুমিই তোমার উত্তমর্ণ, তুমিই তোমার অধমর্ণ, তুমিই অপরাধী, তুমিই বিচারক। দেশে পাই, আত্মানং বিদ্ধি; বিদেশে—গ্রীসে পাই—Know thyself—একই কথা।

এর প্রাকৃটিক্যাল ইঙ্গিত। তোমার স্বাস্থ্য তোমার হাতে, তোমার বৈভব তোমাকেই গড়তে হবে। তোমার ভুল-ত্রুটির জন্য তোমারই কাছে জবাব দেবে, আর তোমার ভুল তোমাকেই শোধরাতে হবে। তোমার কাছেই তুমি নিন্দা-প্রশংসা, তিরস্কার-পুরস্কার পাবে। তোমার আরজি-আবেদন তোমার কাছেই পেশ করবে।

আমি বা তুমি। বুঝলাম। তবে এরা কারা? এরা তোমার আবেষ্টনী, পারিপার্শ্বিক। এদের না হ'লে তোমার চলে না। আর তুমি না হ'লেও এদের চলে না। তাই তো বলি—সহযোগিতা কর, পরস্পরের প্রয়োজনে ও স্বার্থে।

ভূমিকাটা এক হিসেবে—Hypothesis.

দ্বিতীয় অধ্যায়—তপস্যা—Tapashya

ধৈর্য ও স্থৈর্য

পঞ্চম সূত্র—Tolerate upto tolerance,—not by timidity but by transposition.

সহ্য কর, সহ্যসীমা পর্যন্ত, ভয়ে নয়, অবস্থা পাল্টে। অবস্থা পাল্টে অপরের অবস্থা, অপরের ব্যথা বোঝ।

নানা মত ও নানা পথ, অহরহ মতান্তর বিরোধে মানুষ বিভ্রান্ত। অসহিষ্ণু হ'লে চলবে না, অতএব সহ্য কর, বরদাস্ত কর—সহ্য-সীমা পর্যন্ত। সহ্য করবার, অপরকে বরদাস্ত করবার সহজ পন্থা, তার সঙ্গে তোমার অবস্থা পাল্টে তার অবস্থাটা বোঝ। বিড়ালের লেজে আগুন দিলে কি মজা! কিন্তু তার অবস্থাটা কল্পনা করলে তার জ্বালাটাও বুঝতে পার।

ভাসানের ভিড়, পা ফেলা যায় না, আঁকুপাকু ক'রে লাভ নেই। গায়ের জোরে ধাক্কাধাক্কি করার বিপদ আছে, হয়তো মারামারি রক্তারক্তি ক'রে হাসপাতালে যেতে হবে। বরঞ্চ চোখ চেয়ে দেখ, তোমার সামনে যে তারও পথ বন্ধ, তার ব্যথাও তোমার চাইতে কম নয়। অবস্থা পাল্টে তার অবস্থাটা বোঝ। তোমার সময়সীমা পর্যন্ত দেখ—ওটাই সহ্যের সীমা, tolerance—ভিড় না কমে, এই পথ ছেড়ে দিয়ে ।ভন্ন পথ ধরবে।

বাইবেলের সব চাইতে বড় কথা দুটো—এক, ভগবানকে ভালবাস; দ্বিতীয়, প্রতিবেশীকে ভালবাস। বাইবেলের প্রতিবেশীকে ভালবাসার ব্যবস্থা, recipe, আর আমাদের ব্যবস্থা একই, do unto others as you want to be done—একই কথা, ভিন্নভাবে। ডাক্তার নেপলিয়ান হিল তাঁর সফলতা দর্শনে এই transposition বা অবস্থা পাল্টানো টেকনিককে golden rule—সোনার নিয়ম নাম দিয়েছেন। সোনার নিয়মই বটে।

যারা বড় হয় তারা সহ্য করে, tolerate করে সব চাইতে বেশি, তাদের সহ্যসীমা বা tolerance অনেক দূর পর্যন্ত। নিউটনের সম্বন্ধে (?) একটা গল্প আছে। বিশ বছরের গবেষণার ফল চাকরের অসাবধানতায়, কুকুরটা ছাড়া পেয়ে, বাতি উল্টে সব জ্বালিয়ে দেয়। নিউটন থমকে দাঁড়ান, চোখে জল, ভাবেন। তারপরই হাসিমুখে কুকুরটাকে আদর করতে শুরু করেন, ওর দোষ কি!

ব্যক্তি-আকর্ষণ

ষষ্ঠ সূত্র—Amiable and sociable attitude attracts, the opposite repels—অমায়িক মিষ্ট স্বভাব অপরকে আকর্ষণ করে, বিরুদ্ধ ভাব দূরে সরিয়ে দেয়। সহজ কথা। মিষ্ট হাসিমুখে মানুষ ভরসা পায়, আর ভ্রূকুঞ্চিত কঠিন গোমড়া মুখের কাছে কেউ যেতে চায় না। এর দুটো লক্ষণ, তোমার কাছে মিষ্ট হবে এবং তার আবেষ্টনীতেও মিষ্ট হবে। মিষ্টির দোকানে তোমায় বেশ আপ্যায়িত করতে করতে কর্মচারীকে দাঁত খিঁচুচ্ছে—"ডাল ও দমটা ফস্ ক'রে বের করলি, বাড়তি পয়সা তো লাগে না, খদ্দের একবার দেখতে পেলে কি আর ছাড়ে"—মিষ্টিওলা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বিমুখ করে।

ব্যক্তি-মেরুদণ্ড

সপ্তম সূত্র—Personality wins—(Poise, Positive thinking, Self esteem)—ব্যক্তিত্ব না থাকলে জয় হয় না, ব্যক্তিত্ব মানে স্থিতধী, স্থিরসংকল্প ভাবনা ও আত্মশ্রদ্ধা।

মাধবীলতা সহকারকে আশ্রয় করে। লতার কাছে কেউ আশ্রয় চায় না। কারণ লতা নিজেই দাঁড়াতে পারে না। তোমার ব্যক্তিত্ব না থাকলে, আমি অক্ষম পঙ্গু দুর্বল এই negative ভাব থাকলে গড্ডলিকা প্রবাহের ধাক্কা খেয়েই চলবে। হালপালবিহীন নৌকা স্রোতে বাতাসে এদিক ওদিক করে, এক সময় কিসে ধাক্কা লেগে ডুববে। ফল অপমৃত্যু। তোমার বৃদ্ধ ভৃত্যের ভালবাসার মূল্য কতটুকু; কিন্তু বাবার ভালবাসার মূল্য অনেক, কারণ বাবা থাপ্পড়ও দিতে পারে। ভগবানের উপাসনার মন্ত্র দেখ—

"রুদ্র (হে ভয়ঙ্কর) যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যম্।"

অষ্টম সূত্র—Accept him, appreciate his ahamika (feeling of importance) sincerely—তাকে স্বীকার কর, অকপটে তার অহমিকাকে মেনে নাও, সে তোমার সহায় হবে।

ব্যক্তি ও অহমিকা

অকপটভাবে তার অহমিকাকে স্বীকার করবে, তোষামোদে নয়, কারণ সেটা হবে সাময়িক আর তাতে তোমার ব্যক্তিত্বও ক্ষুণ্ণ হবে।

সব মানুষেরই কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছু, কৃতিত্ব আছেই, তাই বুঝে নিয়ে স্বীকার করবে। সকালবেলা যে তোমার নর্দমা সাফ করে তাকে জমাদার সম্বোধন কর, আর একবার বল 'সাবাস', সে দ্বিগুণ উৎসাহে তোমার চতুর্গুণ কাজ করবে। তুমি সর্বেসর্বা মালিকই হও আর বেতনভুক ম্যানেজারই হও, তোমার অধীনে কাজ করে কেরানী সরকার গোমস্তা, যাই হোক, তাকে তোমার সহকর্মী (colleague) ব'লে পরিচয় দাও, সে ধন্য হবে, তোমার উপর আশাতীত শ্রদ্ধাবান হবে। দেশকালপাত্রহিসাবে ঐ এতটুকু অহমিকাই যথেষ্ট। তাতে তোমার সত্যের অপলাপ হয় না, তোষামোদও হয় না, অথচ এই সামান্য মূল্যে তাকে জয় ক'রে কিনে রাখতে পার। জাপানে 'ঝি চাকরাণী দাসী বাঁদী' নেই, ওরা বলে, এই মেয়েটি আমাদের পরিবারে আছে, সংসারের সব ভার ওর উপর। পরিবার প্রতিদানও পায় তেমনই ষোল আনার উপর আঠারো আনা। আগে আমাদের ভৃত্যেরা দাদা কাকা মামা জ্যাঠা স্বাদে সম্বোধন পেত। জবাবে যেমন কর্তৃত্ব করত, তেমনই নিজেকে বিলিয়েও দিত। 'দিবসা গতা' নয়—যুগের উপযোগী ক'রে মন্ত্র প্রয়োগে আজও সমান ফলই পাবে।

সেবাস্বভাব অপরাজেয়

নবম সূত্র—Service habit never fails—service—nine—সেবা ও সেবাস্বভাব কদাচিত ব্যর্থ হয়, নবধা সেবা। সেবা ও সেবাধর্ম দাতা ও গ্রহিতা উভয়কে বাঁচায় সংসারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র।

তথাপি শুনতে পাই, সেবা ব্যর্থ হয়েছে, উপকার ভুলেছে, কৃতজ্ঞতা নেই। সন্দেহ জাগে। মনে হয়, হয়তো সেবার সঙ্গে কোথাও অসেবা মিশে ছিল, আর ঐ রন্ধ্রপথে এসেছে গ্লানি। অতএব সেবা শব্দটা বানান করতে হ'ল, সেবাধর্ম বিশ্লেষণ করতে হ'ল, এদিক-ওদিক থেকে এবং নিজের অভিজ্ঞতায় পেয়েছি, সেবার নয়টি লক্ষণ। Sincere—sympathetic—specific—social—saving face—service—excelling—exceeding dues, and for no return or less return—অকপট—সহানুভূতিসূচক—ব্যক্তি-

গত—সমাজনৈতিক—মুখ-মান রক্ষা করা—সেবা—গুণে সরেস—ওজনে বেশি—দামে কম।

সেবাকে প্রশস্ত দৃষ্টিতে দেখ। কেবল আর্তত্রাণেই নয়, সর্বত্রই সেবার স্পর্শ দিতে পারি। আজকে ব্যবসাক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ স্লোগান সেবা—Service. Am sorry, thank you থেকে শুরু ক'রে সেবার পরিধি বহুদূরবিস্তৃত। অমায়িক ব্যবহারেও সেবারই স্পর্শ।

সেবাস্বভাব বলেছি, মানেটা বলা দরকার। সাজা সেবকের ঝাঁজ ও জাঁক সেবাকে ম্লান করে। ফলে লোক আর্তত্রাণ-সমিতির উপর শ্রদ্ধাবান হয়, কিন্তু সেবককর্মীদের উপর তেমন শ্রদ্ধাবান হয় না। এক শো কর্মীর মধ্যে দু-পাঁচ জন মাত্র শ্রদ্ধা ভালবাসা পায়, যারা সত্যি সেবাস্বভাব। অন্য কর্মীরা শুধু আজকের জন্য সাজা।

এবার সেবার লক্ষণগুলি দেখা যাক। (১) অকপট। (২) সহানুভূতি-সূচক। (৩) ব্যক্তিগত। ব্যক্তিকে স্বীকার বা ব্যক্তিস্বীকারের সুর না থাকলে তুমি প্রিয় হবে না। ব্যক্তিকে খুশি কর, সে খুশি হবে, তুমিও জনপ্রিয় হবে। হাসপাতাল শ্রেষ্ঠ সামাজিক সেবা-প্রতিষ্ঠান। এখানে সেবা হয় সেরা সেবা। কিন্তু রোগী ও ডাক্তার পরস্পর অপরিচিত। এখানেও ব্যক্তিগত সুর কার্যকরী। একজন ডাক্তার এল, কলের পুতুলের মত রোগী দেখলে, দরকার হয় ধমকালে, ওষুধ দিলে, চ'লে গেল। এবার এলেন জনপ্রিয় ডাক্তার। ইনিও ঐ এক কাজই করলেন কিন্তু ব্যক্তিগত সুরে, যেন কত পরিচিত। 'দেখি মা তোমার চোখ' 'বাঃ, লাল অনেকটা কমেছে, ভয় কি মা, দুদিনে সেরে উঠবে, ওষুধ দিচ্ছি।' রোগীর মনে পড়ে স্নেহের ছাপ, ডাক্তার হয় জনপ্রিয়, ঐ ব্যক্তিগত সুরে। (৪) সমাজনৈতিক। হীন কাজের জন্য গুণ্ডা রেখেছি, বেতন দশ গুণ, মুখে মিষ্টি, কিন্তু উভয়ে উভয়কে মনে মনে ঘৃণা করি। কাজ ফুরুলে উভয়ের কাছে উভয়ে পাজী। নীতি-বিরুদ্ধ কাজে সেবা জমে না, ঘৃণাই জমে।

(৫) মান ও মুখ রক্ষা ক'রে দেবে। নতুবা সেবা ব্যর্থ হবে, ঘৃণা জমতে পারে, শত্রুতাও ক্ষেত্রবিশেষে। বল, ওহে, এখানে খেয়ে যেও। সাবধান, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দারিদ্র্যের খোঁচা দিও না। চাকরি দিয়েছ,

কাজ দিয়েছ, সে কৃতজ্ঞ, তোমার প্রশংসা তার মুখে। কিন্তু তুমি যদি 'তখন খেতে পেত না, অন্ন দিয়েছি, চাকুরি দিয়েছি' ব'লে দিকে দিকে তার গ্লানি রটাও এবং তখন যদি সে তোমার উপর চাবুক হাঁকড়ায়, তাকে নিন্দা করা চলে না, অস্বাভাবিক বলা চলে না। তোমার লেখা নকল ক'রে পাস করেছে, তুমি হবে তার শত্রু, কারণ তুমি তার পাসের হীন ইতিহাস জান, তোমার কাছে তার মুখরক্ষা হয় নি। তা ছাড়া নকল করা নীতিবিরুদ্ধ। পরের ভুল দেখাবার বেলাও ঐ টেকনিক। গৃহিণীরা চাকরকে ব'লে থাকেন, তোকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে দিয়েছে। এই টেকনিক অভিজ্ঞতায় পাওয়া ও পারম্পর্যে এসেছে। যা দেবে তা শ্রদ্ধয়া দিলে তো ভালই। তা যদি না পার, যতটা সম্ভব মান ও মুখ রক্ষা ক'রে দেবে।

(৬) সেবা। সত্যিকার সেবা হওয়া চাই। এখানে তিনটে কথা মনে রাখবে। এক, তেলা মাথায় তেল দিলে ঠিক সেবা হবে না। দুই, যাতে প্রয়োজন নেই এমন কিছু দিলেও ঠিক সেবা হয় না। বাস্তহারা, নিঃস্ব ঘরে নেই চাল, সারাদিন হয়তো তেমন জোটে নি। রাত দুপুরে তুমি দিয়ে এলে আট টাকা দরের এক গঙ্গার ইলিশ। নাই চাল, তেল, নুন, কয়লা। পুরোনো সমৃদ্ধির দিনের কথা মনে ক'রে চোখে আসে জল। এত খরচ না ক'রে, কোন ছু'ল ক'রে, মুখরক্ষা ক'রে যদি দুটো টাকার চাল ডাল তেল নুন দিতে তা হ'লে এরাই দু হাত তুলে তোমার আশীর্বাদ করত। তিন, যা দেবে সময় থাকতে দেবে। নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্। তোমার স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর তোমার ধনী হবার মানে হয় না। পাওনাদারকে যখন দিতেই হবে, তখন সময়েই দাও। তিন জোড়া জুতো ছিঁড়ে সে যখন পাবে, তখন মুখে ধন্যবাদ দিলেও মনে মনে শাপ দেবে। আর তার কাছে তোমার ক্রেডিটও গেল।

(৭, ৮, ৯) জিনিস সরেস, ওজন বেশি, দামেও সস্তা। আজকে অন্যের চাইতে কম পেলে বটে, কিন্তু কাল ফল পাবে। দেখতে দেখতে তোমার পাঁচ জন খদ্দের হয় পঞ্চাশ, ও পঞ্চাশ হয় পাঁচ শো, তোমার খ্যাতি ও সুনাম দিকে দিকে। ঐশ্বর্য আপনি আসে।

কৃতজ্ঞ হওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শিক্ষা ও কালচারের ফল। তুমি আমি কোন্ ছার, স্বয়ং যীশুও কৃতজ্ঞতা পান নি। আজকালকার বাপেদের অভিযোগ শুনি, ছেলেরা তেমন শ্রদ্ধাবান নয়। দোষ যে শিক্ষার, দায়ী যে বাপ মা, এ কথা এদের চোখ এড়িয়ে যায়। যা বুনব তাই তো পাব।

আবার বলি, সেবাস্বভাব কখনও ব্যর্থ হয় না। Problem child, বাতুল ও অবুঝ এসব খাপছাড়াদের কথা আলাদা। তবু যদি কোথাও সেবা ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে অবস্থা পাল্টে by transposition দেখবে, হয়তো তার ব্যর্থতার এতখানি তীব্র ব্যথা যে তাকে মাথা ঠিক রাখতে দেয় নি,—তাকে হঠাৎ বেসামাল ক'রে ফেলেছে। সমুদ্রের ঘটস্থ দৈত্যের গল্পে 'মুক্তিদাতাকে সংহার করার প্রতিজ্ঞা'টা মনে কর। তবে জেনে রাখ, ওটা সাময়িক। সেবার সঙ্গে অসেবা মিশিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে আমরা দোষ চাপাই সেবার ঘাড়ে। আসলে সেবা অপরাজেয়।

অভ্যাস তোমার আমার মুক্তির পথ

দশম সূত্র—Habit is the strongest—next to nature—technic one step—স্বভাবের পরই অভ্যাস শক্তিমান। অভ্যাস ভাঙা কঠিন, স্বভাব ভাঙা আরও কঠিন। অভ্যাসের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও টেকনিক 'একপা একপা ক'রে এগুবে'।

হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে অতিকষ্টে হাঁটাটা অভ্যাস হয়ে আজকে Reflex actionএ দাঁড়িয়েছে। হাঁটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, ইচ্ছা মাত্র হাঁটা শুরু করতে পারি, কোন আড়ম্বরও নেই, আয়াসও নেই। জন্মগত অভ্যাসকে স্বভাব বলি,—আর স্বকৃত অভ্যাসকে অভ্যাস বলি। তাবার আলগা ভাবে অনেক সময় দুটো—একই অর্থে ব্যবহার হয়, আমরাও এই স্বাধীনতা নিয়েছি কোথাও কোথাও। যাকে স্বভাব বলি, তাও অভ্যাসই। কারণ অনেক স্বভাব প্রথম প্রাণী এমিবাতে ছিল না। স্বভাব বা অভ্যাস ক্রমে অভ্যাস দ্বারা পেয়েছি—এই ইভলিউশনের প্রতিষ্ঠা। Cosmic habit forceএ কোথা থেকে একটা গতি এল, একটা পাক খেলে, আবার পাক খেলে, এমনি ক'রে অভ্যাস করতে

গল, অভ্যাস ক্রমে পাকা হ'ল, ঐ অভ্যাস উত্তরপুরুষেও গেল, অভ্যাস হ'ল Nature বা প্রকৃতি বা স্বভাব বা অভ্যাস। মার তোমার গতি ও অভ্যাসও ঐ বিশ্বগতিরই Projection বা ভিক্ষেপণ, উভয়ই এক নিয়মের অধীন। এই হ'ল অভ্যাস বা ভাব। তা হ'লে বোঝা গেল, একটা অভ্যাস দূর করতে হ'লে চাই টা অভ্যাস, ঐ একই নিয়মে। এমনি ক'রে উগ্র তপস্যায় নাকি ভাবেরও পরিবর্তন হয়।

বিশ্বগতিতে গতির পেছনে কি আছে দেখা যায় না, অর্থাৎ গতি নন কোথা থেকে এল দেখা যায় না, বিজ্ঞান-দুরবীন অতটা দেখতে রে নি। কিন্তু তোমার আমার গতির পেছনে খানিকটা দেখতে পাই। মুষে আর অন্য জীবে তফাত এই যে, মানুষ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। ন্য জীব সম্বন্ধে বলি, ওরা Cosmic habit forceএ, instinctএ লে; কেবল মানুষই একটু স্বাধীনতা পেয়েছে।

আমার কাজ ও অভ্যাসের পারম্পর্য এই। মনে জাগে ইচ্ছা, করি কল্প, আনি উৎসাহ, শুরু করি কাজ, অভ্যাস করি (repeat), কালে ই অভ্যাস (Habit), পাকা হয়ে অভ্যাস হয় সহজ, ক্রমে automatic reflex বা তারই কাছাকাছি। Habit is second nature— অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব—কথাটা সত্যি।

এবার তোমার আমার কর্তব্য সুস্পষ্ট। কল্যাণ যা, হিত যা, তা অভ্যাস ক'রে অভ্যাসে পরিণত করা। অভ্যাস করতে করতে স্বভাব াই, আবার অভ্যাস দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। প্র্যাক্টিক্যাল নির্দেশ দিতে আমাদের দেশের শাস্ত্র ঐ এক অভ্যাসই নির্দেশ দিয়েছেন, কবলমাত্র অভ্যাস। গীতা—অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে (অনন্যমনা হয়ে অভ্যাস, অতএব বৈরাগ্য—detached, অপর বিষয়ে অনাসক্তি)। পাতঞ্জল—অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। যাগাভ্যাস মানেই অভ্যাস, আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, মন্ত্র, সাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, ধ্যান-ধারণা সবই অভ্যাস। চোখে দেখা যা তাতে অভ্যাস, না দেখা যা তাতে কল্পনায় অভ্যাস, বাস্তবে অভ্যাস, মস্তিষ্কে অভ্যাস। সর্বত্রই প্র্যাক্টিক্যাল নির্দেশ অভ্যাস। স্বাস্থ্য শক্তি

সেবা সন্তোষ, স্থৈর্যধৈর্য অঋণ অপ্রবাস—এই সাতটি নিত্য অভ্যা আমাদের 'মানুষে যা চায়'-দর্শনের প্রতিমা। নিত্য সপ্তাভ্যাস।

ক্রমশ

শ্রীঅতুল সেন

'রামের ব্যথা'

শবরীর পথ-চাওয়া আমি রাম নহি
স্পর্শে যার জেগেছিল অহল্যা পাষাণী
আলিঙ্গনে ধন্য যেই গুহক চণ্ডালে
সীতাপতি নররামে ধন্য ব'লে মানি।
রাজাসনে সুমহান রঘুকুলপতি
রাজদণ্ড করে ধরি আমি রাজারাম
প্রজার রঞ্জনে ব্রতী দশরথ-সুত
লোকে লোকে উচ্চারিছে আজি মোর নাম
রামরাজ্য ধর্মরাজ্য গাহিছে চারণে
সত্যবাদী ন্যায়ধর্মী জানে মোরে প্রজা
কি অন্যায় অবিচারে কলঙ্কিত আমি
ধূলিলুপ্ত অঙ্গারে ত নাহি যায় বোঝা।
রাজধর্ম পতিধর্ম পিতৃধর্ম মোর
অপমানে ধিক্কারিয়া ফিরে চ'লে যায়
দেবতা-বিমুখ মোরে সে ত জানি আমি
অন্তর গুমরি কাঁদে ব্যর্থ বেদনায়।
ভ্রান্তচিত্তে সত্যাসত্য বুঝিয়া না পাই
ধর্মাধর্ম নিত্য মোর চিত্তে দেয় দোলা
বনচারী সীতাপতি লক্ষ্মণ-অগ্রজে
হিংসা করি রাজারাম আজি যে উতলা।
প্রজারূপে সীতা মোরে করে উপহাস
বিবেক বিদ্রূপি বলে হায় মিথ্যাচারী

সত্য ব'লে জান যাহা আপন অন্তরে
লোকলাজে অপমান করিছে তাহারই।
ধিক ধিক শত ধিক হায় মূঢ় রাম
কলঙ্কে করেছ কালো রঘুকুল তুমি
নরসূর্য নহ তুমি ওগো রাবণারি
লজ্জায় হয়েছে মূক আজি আর্যভূমি।
মন বলে, সত্যবাদী নহে রাজারাম;
জনতার তুষ্টি লাগি ছলনা তাহার
রাজারামে ধিক্কারিয়া ব্যথায় বিহ্বল
নররাম ব্যর্থ রোষে কাঁদে বার বার।
অবলারে করিবারে অন্যায় দলন
মহাগ্লানি পৌরুষের নির্দয় লাঞ্ছনা
কুললক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী ব্যথায় বিমুখ
সীতা-অপমানে কাঁদে কমল-আসনা।
গুরুভার রাজদণ্ডে ক্লান্তচিত্ত আমি
কণ্টকিত সিংহাসনে জর্জরিত প্রাণ
এ বোঝা হয়েছে ভারী বহিব কেমনে
সুখহীন রাজ্যভোগে হয়েছি পাষাণ।
রাজরাণী ভূলুণ্ঠিতা পথ-ভিখারিণী
একাকিনী বিরহিণী ফেরে বনে বনে
বনচারী রামে যাচি কাঁদিছে একেলা
হায় রাম! রাজারাম বধির শ্রবণে। . .
রাজৈশ্বর্যে কিবা কাজ মণিমুক্তামালা
নিদ্রাহীন স্বর্ণশয্যা শুধু বিড়ম্বনা
বনবাসে একাহারে ছিনু মন-সুখে
ফেলে দিয়ে যেতে চাই সকল ভাবনা।
এস পিতা মৃত্যু ত্যজি ধরি বরতনু
চাহ বর পুত্র লাগি হে মাতা কৈকেয়ী,
করহ উদ্ধার মোরে বিবেক-দহনে
হে মোর বিগত দিন হও মৃত্যুঞ্জয়ী।

চাহি না এ রাজ্য-ভোগ তিক্ত বিষজ্বালা
ক্ষম মোর অপরাধ হায় সাধ্বী সীতা
রাজধর্ম কলুষিত অন্যায় বিচা র
মোর অপরাধে কাঁদে জনকদুহিতা ;
দেবতা কি ভুলে যাবে এ কলঙ্কলিখা
অন্যের জীবন ল'য়ে রূঢ় উপহাস
পতিত্বের অধিকার এই অভিমানে
রচিল সে আপনার খেয়াল বিলাস।
লহ রাজ্য মুক্তি দাও হে ভাই ভরত,
এ ঐশ্বর্য গুরুভার পারি না বহিতে
মনে কর মৃত আমি ওগো রামানুজ
অহরহ অন্তর্দাহ পারি না সহিতে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে রচি স্বর্ণসীতা
রাজগুরু কাছে ভিক্ষা এই আশীর্বাদ
কি হবে এ স্বর্ণসীতা সীতারে ত্যজিয়া
রামপত্নী সীতা শুধু জানাইতে সাধ।
অন্য কোন নারী নাই রামের জীবনে
নাই কারো অধিকার সীতার আসনে
এ কথা জানুক লোকে'এক সীতা সতী
রামের হৃদয়-লক্ষ্মী জনমে মরণে।
দিয়েছি ক ঠোর দণ্ড মোর মানসীরে
সয়েছি বৃশ্চিকজ্বালা আমি অহরহ
লয়েছি এ রাজ্যভার ভিখারী সাজিয়া
বাঞ্ছা মোর ফিরিতেছে বাঞ্ছিতার সহ।
অন্তর-দেবতা কাঁদে দণ্ডিতের লাগি
কাঁদে সাথে ব্যথাতুর নিজে দণ্ডদাতা
জনমদুঃখিনী সীতা বিড়ম্বিত রাম—
এই নিদারুণ লিপি লিখিল বিধাতা।

শ্রীমতী বিভা সরকার

দশ-আনা ছ-আনার সালতামামী

সবটাই লড়াইয়ের ব্যাপার। আপিসে লাখ টাকার হিসেব মিটিয়ে এক শো দশ টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সেখানে তো এক বিরাট ফ্রণ্ট খোলা হয়েই আছে। গয়লা, মুদী, রেশন, ধোপা, সবাই দেখি সমুদ্যত। এখানেও হিসেব মেটাতে কার্পণ্য করলাম না এতটুকু। লাল খেরোর বাঁধাই খাতায় ছড়িয়ে দিলাম যার যা প্রাপ্য বিভিন্ন খাতে। কিন্তু অখুশি হয়ে উঠল নিজের মেজাজটাই। লাখ লাখ টাকার হিসেব মেটাই অন্যের, অথচ নিজের বাজেট ঘাটতি প'ড়েই আছে। বারান্দায় গেলাম, একটুখানি স্বস্তির প্রয়োজন। সেখানেও যুদ্ধ ঘোরতর। নেপালীবাবার দাওয়াই নিয়ে লড়াই চলেছে বিশ্বাসী আর অ-বিশ্বাসীতে। ওদিকে ছোকরারা আলোচনার তুফান ছুটিয়ে দিয়েছে আর একটি মহাযুদ্ধের যাথার্থ্য নিয়ে। মনের দুঃখে বনে না গিয়ে গেলাম সিনেমায়।

সেও এক শাস্তি হ'ল। ফিরে এলাম বোকা ব'নে। অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম ভাল না লাগবার কারণটা। গান যে ভালবাসি তা, গান শুনলাম এগারখানা। ছবির গল্প—তাও জমজমাট। অর্থবান পিতার একমাত্র মেয়ে দুশ্চরিত্র স্বামীর পাল্লায় প'ড়ে নানা রকম ঘটনার গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এক মহর্ষির কৃপায় সেই স্বামীকেই ফিরে পেল চরিত্রবানরূপে, এবং দুজনে নতুন ক'রে হনিমুন করতে চলে গেল অজানার উদ্দেশে। ফাঁক নেই কোথাও। কিন্তু তবু আনন্দ পেলাম না কেন? চিন্তায় পড়লাম। দোষটা কার? আমার, আপনার, না, তৃতীয় পক্ষের?

অনেকক্ষণ ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, যোগটি ঘটেছে ত্র্যহস্পর্শের। তৃষ্ণার্ত আমরা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান হারিয়ে ছুটে যাচ্ছি, পরিবেশকের কাছে আছে মন-মাতানো পাঁচমিশেলী উগ্র পানীয়; খাচ্ছি বটে, কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না, জ্বালা যাচ্ছে বেড়ে। মনে হ'ল, আনন্দের এই বিকৃতিটা আমাদেরই স্বোপার্জিত।

ভাবুনে মন আমার। ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম এই আনন্দ-পরিবেশনের ধারাটা আদিযুগ থেকে কেমন সুন্দর একটা

নৃত্যপরা ছন্দে চ'লে এসে হঠাৎ শেষকালে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

চিন্তা করলাম সৃষ্টির আদিযুগের কথা। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা হার-জিতের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলছিল নখে দাঁতে, পৃথিবী তখন নবীনা, সবে আদিগন্তসমুদ্রমেখলা বিশ্বের অন্তর হেকে উর্বশীর মত দেখা দিয়েছে। ভূ-প্রকৃতি তখনও নবজীবনের নেশায় টলমলায়মান। মানুষ তখন নিতান্তই অসহায়, শিশুর মত। ঝড় তার শত্রু, সক্রিয় শত্রু তার দাবানল, তুষারপাত, ভূমিকম্প আর হিংস্র জন্তুর দল। সেদিন থেকে মানুষ একটু একটু ক'রে দাবি কায়েম করতে চেষ্টা করেছে এতগুলো জেহাদের বিরুদ্ধে। সেদিন থেকে সে ক্ষুধার নিরসন করতে চেষ্টা করেছে, আশ্রয় খুঁজেছে আধিদৈবিক দুর্বিপাকের কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। এমনই ক'রেই ধীরে ধীরে মানুষ জয় করেছে দুরন্ত প্রকৃতিকে। সে হয়েছে বিজেতা। কিন্তু জয়ের আনন্দ এক নেশা, সে নেশা বড় সাংঘাতিক। তাই প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে মানুষ নিজের সমাজের মধ্যেও বিজেতা ও বিজিতের সৃষ্টি করল। শক্তি হাতে পেয়ে বন্দী করল দুর্বলকে। সেদিন থেকে যুগে যুগে মানুষের চেহারা বদলে গেছে। কত শত জাতিতে, কত শত সংস্কৃতিতে বহুধা হয়ে মানব ইতিহাস জন্ম নিয়েছে বার বার পৃথিবীর নানা দেশে। কিন্তু সভ্যতা শতধা হ'লেও বার বার আনন্দ-পাগল মানুষের মন জীবনের মূলছন্দ থেকে রস আহরণ ক'রে বার বার সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। সত্যশিবসুন্দরের প্রতিরূপ এই অনাবিল আনন্দধারা জীবনের জয়গানে দীপ্ত, মানুষের শুভকামনায় স্বতোৎসারিত। বাঁচবার এবং বাঁচাবার মন্ত্র মানুষ এই আনন্দগান থেকেই সংগ্রহ করেছে এবং এই সুরেলা মনটাই তাকে নিশানা দিয়েছে শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, সমাজের খাতিরে সমষ্টির জন্য, সর্বজনীন উৎসবের এমন সব ছাঁচ তৈরি করতে, যার মধ্যে তার স্বকীয় সংস্কৃতি, স্বকীয় ঐতিহ্য রূপ পেয়েছে তার ।নজব স্বরবিতানের অপূর্ব রাগবিন্যাসে। আপাত-বিচ্ছিন্ন হ'লেও মানব-সভ্যতার সঙ্গে এই স্বরগ্রামগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই সুরে মেলালে তার সমস্ত জীবন

র্ণিত হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনা ও সুষমায়। কিন্তু দুঃখের কথা যে, এই সংগ্রাম আমরা আজ নিঃসন্দেহে ভুলে গেছি। তাই আমি এত নিঃসঙ্গ, এত বেসুরো, এতটা অসামাজিক।

আমাদের দেশ, বাংলা দেশ, ধর্মমাতৃক। এই বাংলার মধ্যেই ভারতের স্বকীয় ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ একদিন সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় তাই দেখি এমন কতকগুলি উৎসব-আনন্দের প্রচলন ছিল, যা একান্তভাবে আমাদেরই শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির সত্যিকার জবানবন্দী, এবং যার দ্বারা দশজনের মধ্যে উৎসাহ, আনন্দ ও নব নব সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলা সত্যিই সম্ভব হ'ত। পুরাণবর্ণিত সোনার বাংলার কথা বলছি না ; এই শ'খানেক বছর আগেকার বাংলা দেশেও দেখি, কথকতা, কীর্তন, যাত্রাগান, কবিগান, কবির লড়াই—এই সব সাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত ছিল। এই সব অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সমাজ সেদিনের বাঙালীকে, শুধু ব্যাবহারিক বা সামাজিক জীবনেই নয়—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুবর্ণসুযোগ দিয়েছিল।

সেদিনের কলকাতার প্রামাণ্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাই এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অভিজাতসম্প্রদায় মধ্যে নাচ, গান, বাজি-পোড়ানো ইত্যাদি যে সব আমোদ-প্রমোদের চল ছিল, সেগুলি ঠিক সর্বসাধারণভোগ্য নয়। কিন্তু এই সব বাবু জমিদারেরা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন লৌকিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোকে। তাঁদের উৎসাহ অর্থসাহায্য ও অন্যান্য সহযোগিতায় গ'ড়ে উঠত কবিয়াল, যাত্রা ও অপেরার দলগুলো। হরু ঠাকুর, নীলমণি ঠাকুর বা আণ্টনি সাহেব এঁরা ছিলেন কবিয়ালদের মধ্যে সুবিখ্যাত। কিন্তু এঁরা ছাড়াও নিজেদের তাগিদে গ্রামগ্রামান্তে অজ্ঞাত সব পল্লীতে শিল্পীদল নিজেদের সংঘ গ'ড়ে তুলতেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সীমানা কাটিয়ে দলবলের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠবার সুযোগ এইরকম সর্বজনীন অনুষ্ঠান ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। সেদিনকার সমাজে, এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রূপ ছিল সর্বজনীন, অন্যান্য যে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত ছিল—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালী-

পূজা, চড়ক, গাজন, নবান্ন, এইসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে আপামর সাধারণ একত্র হবার সুযোগ পেত।

এই সব আনন্দ-উৎসব সেদিনের বাঙালীকে পয়সা দিয়ে কিনতে হ'ত না। স্বরোপিত বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, আর সেই গাছ ফুলে ফলে সার্থক হয়ে উঠলে যতখানি আনন্দের হয়, পয়সার বিনিময়ে কেনা ফুল ফল মনে সে আনন্দ সঞ্চার করতে পারে না। তেমনই নিজেদের আনন্দে, নিজেদের গ'ড়ে তুলে, নিজেদের সহযোগিতায় উৎসব সৃজন ক'রে সেদিনকার বাঙালী যে আনন্দ পেত, আজকের ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়াদারিতে উপোসী মন নিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখে আমরা সে আনন্দ পাই না। পাই না, কেন-না এ দুই-ই ভিন্ন গোত্রের।

মনে পড়ে এক শো বছর আগেকার এই কলকাতা শহরের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের জোয়ার আসছে রামমোহন রায় প্রমুখ ভগীরথদের দেখানো পথের নিশানা ধ'রে। ওদিকে মান্ধাতার আমলের রীতিনীতি, আইনকানুন, আদবকায়দার শিখণ্ডী খাড়া ক'রে রেখে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীনপন্থী সমাজব্যবস্থা। শিল্প-বাণিজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত মুঠো বাড়িয়ে আধিপত্য বিস্তার করছে বিদেশী মালিকানা। এই রকম নানা রকম ঘাতপ্রতিঘাতের সাক্ষী হয়েই বেড়ে উঠছিল সেদিনকার মহানগরী কলকাতা। আজকের কলকাতার গায়ে তার কোনও চিহ্ন নেই।

নেই, তার কারণ আছে। শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য নির্দেশে বর্তমান যুগ ঢালাই হয়ে গেছে নতুন ছাঁচে। বর্তমান শিল্প-যুগের হালচাল, সমাজব্যবস্থা, সব কিছু চলে ব্যবসায়ী ভাবে। বিদেশী মালিকানাই আমাদের দেশে যন্ত্রযুগের আমদানি করেছে বললে, হয়তো ভুল বলা হবে। সর্ব দেশে, সর্ব কালে ইতিহাসের অমোঘ রূপান্তর অনুযায়ীই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য এই পরিণতি। তবুও, বিদেশী শাসনের আওতায়, নতুন যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভিনদেশীরাই যে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের থামগুলো সুনির্দিষ্ট হাতে ঠিক ক'রে দিয়েছে—এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মেশিন আর স্টীমরোলার চলবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বজনীন দৃষ্টিধর্মী সব শিল্পগুলোতে পড়ল বাধা। কুটিরশিল্পের দিন গেল চ'লে। সেই সঙ্গে চ'লে গেল পটুয়া, তাঁতি, কুমোর, কামার, ছুতোরেরা—যারা বাংলার শিল্পপ্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আনন্দধারার সূত্র গেল ছিঁড়ে, গান থেমে গেল তাদের। আমোদ-প্রমোদের বেনেতি সংস্করণ চালু করা হ'ল—এল কলের গান, বলনাচ, সিনেমা, কার্নিভাল। স্বদেশী সুরে বিদেশী দোলা লেগে নাচ-গানের ঢঙ গেল পালটে, স্বকীয় দৃষ্টিধর্মী মনের প্রাণবন্ত প্রয়াসের কোন প্রয়োজন বা মূল্য থাকল না। যেখানে চলত যাত্রাগান, সেখানে এল থিয়েটার; যেখানে ছিল মেলা, সেখানে এল কার্নিভাল। বিদেশী পণ্যসম্ভারের মতই এই সব বিদেশী আমোদ-প্রমোদগুলো জোর ক'রে চাপানো হ'ল আমাদের উপর। সার্কাসে ক্লাউনের আমদানি হ'ল কৌতুকরসের জন্য। অথচ আমাদের দেশীয় রীতিতে যে সঙ বের করবার প্রথা ছিল, তার সঙ্গে এর বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। বিভ্রান্তি এল সেইখানেই।

এমন দাবি করছি না, সেই সব যাত্রা, মেলা বা সঙ নির্ভেজাল রূপে আজকের সমাজেও চ'লে যাবে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, যদি সত্যি সত্যি পরিবর্তিত ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ-গুলোকে যুগোপযোগী ক'রে সংস্কার করা যেত, তা হ'লে ওগুলো খুব দৃষ্টিকটু হ'ত না। এই সব বিদেশী আমোদ-প্রমোদের আমদানিতে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে শুধু অবমাননাই করা হ'ল না, তাকে একেবারে উপড়ে ফেলা হ'ল এই দেশের মাটি থেকে। আপত্তি এখানেই।

এতদিন জনসাধারণের আনন্দ-উৎসবে লোক-সংস্কৃতির যে সব অনুষ্ঠান আমরা দেখতাম, তা আমার আপনার হাজারজনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার তারগুলোর সঙ্গে সমধর্মী। আমার দেশীয় সংস্কৃতি তাতে রূপ পেত। তা আমার দেশেরই মাটি থেকে রস আহরণ করেছে, আমার স্বকীয় ঐতিহ্যের মূল থেকে প্রেরণা পেয়েছে। কিন্তু আজকের দিনের আমোদ-প্রমোদের বেনিয়া সংস্করণের স্বরগ্রাম আমাদের দেশের হৃদয়ের সঙ্গে মোটেই মেলে না। আর দেশী হাতে

সেই সব বিজাতীয় স্বরগ্রামের রূপান্তর আরও অদ্ভুত, 'কিম্ভূত'এর মত সেটা না ঘরকা না ঘাটকা।

শিল্পসৃষ্টির মধ্যে খুন মনোম্যানিয়া। হত্যাপ্রবণতা এবং বিবিধ অপরাধপ্রবণতা তখনই বেড়ে ওঠে, যখনই সমাজকে ঘুণে ধরেছে, কাঠামোটা তার প'চে গ'লে বীভৎস এক মমীর রূপ নিয়েছে।

দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্ম আনন্দ-পরিবেশনের প্রত্যেকটা মাধ্যমকে আমাদের ব্যবহার করা উচিত এমনভাবে, যার ভিতর দিয়ে সুস্থ সুন্দর কল্যাণকামী সমাজগঠনের প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যে শোচনীয়ভাবে অন্ধ, এইটাই সব চাইতে মর্মান্তিক। দেশী বিদেশী পুঁজিবাদ, কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যড় ক'রে এমনই ক'রেই শয়তানের হাতে অমৃতভাণ্ড তুলে দিয়েছে। ইতিহাসের এই দুর্দিনের শিক্ষা, বিশেষ ক'রে আজ আমাদের পক্ষে স্মরণীয়।

হাল আমলে তথাকথিত শিল্পসৃষ্টির নাম ক'রে আমাদের দেশে দশ-আনা ছ-আনার যে অক্ষম অবদানগুলো প্রামাণিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার প্রত্যেকটিই বিষকন্যার মত— স্পর্শে যার মাদকতা, মিলনে যে মৃত্যু সঞ্চার করে। যান্ত্রিক বেনিয়া সভ্যতার আমলে শিল্পের এই অধোগতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ অতিবড় শিল্পসৃষ্টিও আজ নিছক একটা পণ্য বই আর কিছু হতে পারে না। শুধু সান্ত্বনা এই যে, সমস্ত ভালমন্দ, সাদাকালো নিয়ে এই শিল্পযুগও ইতিহাসের একটি অবশ্যম্ভাবী অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কালরাত্রির অবসানও অবশ্যম্ভাবী—ঐতিহাসিক নিয়মেই। অবশ্য ইতিমধ্যে কর্তব্য আছে। কর্তব্য এই যে, এই বিভ্রান্তির ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে, আমাদের জাতির স্বকীয় স্বরগ্রামটা খুঁজে বের করতে হবে। মূল স্বরসপ্তকের ওপর ভিত্তি ক'রে যেমন চৌষট্টি রাগ-রাগিণী গ'ড়ে উঠেছে, তেমনই আমাদের সংস্কৃতির মূল সুরটাকে আশ্রয় ক'রে নতুন ক'রে শিল্পসৃষ্টির পথে এগিয়ে যেতে হবে। প্রাণধর্মী ক'রে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো নতুন ক'রে। সর্বাঙ্গীণ সর্বজনীন শুভ উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে এ কথ

চালা চলবে না, পথটা উজ্জ্বল হ'লেও বন্ধুর। আর যা চাই, তা দুরায়ত যদিও নয়, দুরধিগম্য নিশ্চয়ই।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

পৃথিবীর রূপকথা

আদিতে ছিল অন্ধকার আর ছিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর চাইলেন আলো সৃষ্টি করতে। এর পর সূর্য উঠল, আলোর জন্ম হ'ল। তারপর হ'ল জল বাতাস আর মাটি, মাটির বুকে উঠল সবুজ ঘাস। এইভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল।

এর পর ঈশ্বর নিয়ে এলেন আদমকে। এই হ'ল তাঁর নবতম সৃষ্টি। কি প্রেরণা আর কি অধ্যবসায় নিয়ে তিনি এই আশ্চর্য সৃষ্টি করলেন! এ হ'ল তাঁরই প্রতিরূপ। আদমের দিকে চেয়ে শিল্পী জিহোভার মনপ্রাণ বিস্ময়ে আর আনন্দে ভ'রে ওঠে। এতদিনে সৃষ্টিতে প্রাণ এল। তাঁর বিরাট রচনার একটা মানে হ'ল।

পৃথিবীতে এল আদম। সে যেন একটা প্রবল প্রাণ নিয়ে আলো-বাতাসের মধ্যে হঠাৎ একদিন জেগে উঠল। এই জেগে ওঠার আগের কথা সে জানত না। জানবার প্রশ্নও তার মনে আসে নি। শুধু স্বপ্নের অস্ফুট স্মৃতির মত একটা উপলব্ধি ছিল তার মনে।

সবুজ শস্যের হিল্লোলিত মাঠে, অরণ্যের নিস্তব্ধ সবুজ অন্ধকারে, সে যেন কি একটা খুঁজে পেত। এক এক দিন নিঃসঙ্গ গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছে, তার মনে হয়েছে কেউ যেন অসীম স্নেহে চেয়ে আছে তার দিকে। কোনদিন সমুদ্রের গভীর ধ্বনি তাকে অভিভূত করত। তন্ময় হয়ে সে শুনত, সেই ধ্বনি যেন তারও বুকে।

এই সব কিছুই ছিল তার কাছে রহস্যময়। কিন্তু এই রহস্যবোধে ছিল না অতৃপ্তি, যা থেকে আসে দুঃখ বেদনা আর অবিশ্বাস।

সে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে, ওইখানে

হাত দেওয়া যায় না ওখানে, কোন দূরের পাহাড়ে তার কিনার ঠেকে কে জানে! তবু আকাশকে তার জীবন্ত মনে হ'ল।

এই বিশ্বাস নিয়েই সে বেড়ে উঠল। এইভাবেই অস্পষ্ট অনুভূতির মধ্য দিয়ে সে চিনল তার নিয়ন্তাকে।

এক একদিন ঝড় উঠত, বৃষ্টি নামত আর বজ্র গর্জন ক'রে উঠত। অন্ধকার গুহার মধ্যে ব'সে বাইরের অন্ধকারে সভয়ে তাকাত সে পাগলা হাওয়ার মাতামাতি···সাঁ-সাঁ ক'রে উড়ত গাছের পাতা।·· অন্ধকার, আকাশ, মাঠ, বন, পাহাড়, নদী সব তখন মিশে এক হয়ে গেছে···অন্ধকারে তাকিয়ে তার মনে হ'ত, আকাশের দেবতা পাহাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আসছে।

আকাশের দেবতা, যে আগুন জ্বালে আর হাওয়ায় পাখিকে উড়িয়ে দেয়। তার বিশ্বাস ঘনতর হ'ল। এই দ্বিতীয়বার দেবতার জন্ম হ'ল মানুষের মনে, সহজ বিশ্বাসের দেবতা।

এর পর একদিন সকালে গুহা থেকে বেরিয়ে এল সে। তখন আলো জ্বলেছে। আকাশ-পৃথিবী হেসে উঠেছে তার আভায়। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল সে। দেহে মনে প্রাণে সেই আনন্দের ঢেউ। এ আনন্দ এল তার সেই আশ্চর্য বিশ্বাস থেকে। তার চারপাশের সব কিছুকে সে ভালবাসল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আপনা থেকে তার হাঁটু মুড়ে এল।।

কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কি ক'রে? কেমন ক'রে নতুন সন্ততিতে পরিপূর্ণ হবে পৃথিবী? তাই জিহোভা আবার এলেন পৃথিবীতে। সঙ্গে এল ইভ। অরণ্যের পথে আদম একদিন হঠাৎ তাকে খুঁজে পেল। আলো-অন্ধকারে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে পৃথিবী, সেই স্বপ্নলোক থেকেই যেন বনদেবীর মত ইভের জন্ম হ'ল।

চলতি পথে থমকে দাঁড়াল আদম। দেবদারু গাছের পাতায় পাতায় যেন বাতাসের হিল্লোল উঠল। অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে, পাহাড়ের সানুদেশে হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে পাখিরা। আজকে উৎসব। এগিয়ে এল আদম। অভিভূতের মত চেয়ে রইল ওরা—একজন

আর একজনের দিকে। ওরা জানতে পারল না, কি অপূর্ব আনন্দে আর বিপুল বিস্ময়ে ভ'রে উঠছে ওদের বুক! এগিয়ে এসে একজন আর একজনকে হাত দিয়ে স্পর্শ করল, হাত বুলিয়ে দেখল সমস্ত শরীর। অপূর্ব! একটা নতুন উপলব্ধি ওদের মনে। স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ওরা। ওরা পরিপূর্ণ হ'ল, রোমাঞ্চিত হ'ল।

আর আদমের হঠাৎ মনে হ'ল আকাশের কথা। সেই অনেক দূরের পাহাড়ে লাগা যার কিনার। ইভের হাত ধ'রে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ও ওপরের দিকে দেখল। এই প্রথম কথা বলবার প্রেরণা ওর মনে। অজ্ঞান-প্রচেষ্টায় ওর মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। আকাশ—এই কথা ও বললে, তারপর আবার বললে, আবার। ইভ প্রতিধ্বনি করল, একটা প্রশান্ত নির্দোষ হাসি ওর মুখে। এর পর ও বললে, আলো। আলো—আদম বললে। এইভাবে মানুষ একদিন প্রথম কথা বলেছিল।

মাছের আঁশের মত পাতলা মেঘের আঁচল স'রে গেল আকাশের মুখ থেকে। মেঘের ফাঁক থেকে জিহোভা দেখলেন ওদের। সার্থক, এতদিনে পরিপূর্ণ তাঁর শিল্পরচনা। এক ঝলক সোনার রোদ ছড়িয়ে পড়ল ওদের সারা দেহে। অরণ্যের সুগন্ধ নিয়ে একরাশ হাওয়া ছুটে এল ওদের দিকে—উড়িয়ে নিল ইভের মাথার সোনালী চুলের গুচ্ছ। আজ উৎসব। জিহোভার আশীর্বাদ নামল তাদের মাথায়। তারা বুঝল না, জানল না কিন্তু সুখী হ'ল।

আদম আর ইভ, এই হ'ল সৃষ্টির সম্পূর্ণতা।

মাটি কর্ষণ ক'রে ওরা শস্যবীজ বপন করল। তারপর ফলে শস্যে সুশোভিতা হয়ে উঠল পৃথিবী। পশু ও পাখিদের বংশ-বিস্তার ঘটল। তারা মানুষের সখ্য গ্রহণ করল। বৃষ্টি, অগ্নি, বায়ু—মানুষের ওপর এদের আশীর্বাদ নেমে এল। বৃষ্টির জল অবাধ দাক্ষিণ্যে তার শস্যভূমিকে অভিসিঞ্চিত ক'রে দিল। অগ্নি তার মধ্যে দিল তেজ। আর বায়ু হিল্লোলিত ক'রে তুলল তার শস্যক্ষেত্র, তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ।

প্রত্যূষের আলোকাভাসে নতুন কর্মের উদ্যমে চঞ্চল হ'ল তারা, আর অন্ধকারের মধ্যে তাদের আচ্ছন্ন করল গভীর প্রশান্তি।

এইভাবে তারা বাঁচল। ঠিক যেমন ক'রে মানুষের বাঁচা উচিত। চারপাশের সব কিছুর সঙ্গে প্রাণের সহজ মিলনে তারা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাঁচবার এই একটিমাত্র উপায়। আর তাদের অন্তরে রইল সেই আশ্চর্য বিশ্বাস, যে বিশ্বাসে তারা একজন আর একজনের মধ্যে একটা নতুন শক্তিকে আবিষ্কার করল। এই বিশ্বাসে তারা সব কিছুকে জীবন্ত দেখল, আর ভালবাসল। বিশ্বাস হ'ল তাদের ধর্ম। তারা সুখী।

কিন্তু এত ক'রেও কেন নিখুঁত হ'ল না জিহোভার সৃষ্টি। মানুষের রক্তে কোথায় জ্ঞানের বিষ গিয়ে মিশেছে, কে তার খবর জানে! স্বর্গের জ্ঞানবৃদ্ধ দেবদূত ছিল শয়তান। জিহোভার কাছে গিয়ে সে বললে, সৃষ্টির এই ত্রুটি কেন? জ্ঞানের বিষ কেন মানুষের রক্তে, এর থেকে যে সৃষ্টি ছারখারে যাবে একদিন। কোপাবিষ্ট হলেন জিহোভা। এ খবর ছিল তাঁর নিজেরই, অজানা, তাই তিনি ভাবলেন, শয়তান বুঝি জ্ঞানের গর্বে তাঁকে অতিক্রম করতে চায়। সেই মুহূর্তে ক্রোধে নীল হয়ে উঠল জিহোভার শরীর। আগুনের মত লাল হয়ে উঠল দুই চোখ। স্ফীতনাশায় দেখা দিল ঝড়ের পূর্বাভাষ, আর দেহে জাগল কম্পন। সেই কম্পনে অনুরণিত হয়ে হাতের বজ্র গর্জন ক'রে উঠল। বিতাড়িত হ'ল শয়তান।

সে রাতে জিহোভার ক্রোধাগ্নি পৃথিবীর আকাশকে ব্যথিত ক'রল। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-বজ্রে মুহুর্মুহু কম্পিত হ'ল পৃথিবীর মাটি। সেই দুর্যোগের রাতে আদিম নরনারী পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে সভয়ে চেয়ে রইল বাইরের অন্ধকারে। তারা জানল না কিছুই, শুধু অনুভব করল, পাহাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আসছে সেই আকাশের দেবতা।

পরের দিন শয়তান এসে করাঘাত করল তাদের গুহাদ্বারে। লাঞ্ছনা আর পরাজয়ের গ্লানিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তার মন। সৃষ্টির ফাঁকিকে প্রকট ক'রে অপমানের প্রতিশোধ নেবে—এই তার প্রতিজ্ঞা।

ইভকে সে দীক্ষা দিল জ্ঞানের মন্ত্রে, আর জ্ঞানবৃক্ষের ফল এনে দিল। ইভের সঙ্গে আদম খেল সেই ফল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্তের সেই সুপ্ত বিষের উত্তেজন ঘটল। দেশকালপাত্রের জ্ঞান হ'ল তাদের। তারা হঠাৎ অনুভব করল যে, তারা সম্পূর্ণ নগ্ন। সেই মুহূর্তে তারা একজন আর একজনের সামনে দাঁড়াতে পারল না কিছুতে। অরণ্যের পথে ছুটে পালিয়ে গেল তারা। গাছের পাতায় আবৃত করল সর্বদেহ। এইভাবে সর্বপ্রথম তারা প্রকৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করল। সৃষ্টির ইতিহাসে এই প্রথম পড়ল একটা বিপরীত রেখা। মানুষের দুরদৃষ্টের এই প্রথম সূত্রপাত।

সেই বিশ্বাস হারিয়ে গেল তাদের। অন্ধকার-আকাশ-মাঠ-বন পাহাড়-নদী এই সব কিছুকে আর জীবন্ত ব'লে মনে হ'ল না। তেমন ক'রে এদের ভালবাসতে পারল না তারা, মিশতে পারল না, অনুভব করতে পারল না। শুধু একটা জ্ঞানে তারা জাগ্রত হ'ল। তারা জানল অরণ্য থেকে আনতে হবে কাঠ, নদী থেকে জল আর মাঠ থেকে শস্য। এ বোধ প্রয়োজনের। এইভাবে নিছক প্রয়োজনবোধেই তারা বেঁচে রইল।

গভীর সন্দেহে উদ্বেল হ'ল তাদের হৃদয়। আকাশের দিকে চেয়ে ঠিক বিস্মিত হ'ল না তারা, ওর ওদিকে কি আছে এই কথাই তারা ভাবল। পাথর ছুঁড়ল আকাশের দিকে, দেখতে চাইল তা আকাশকে আঘাত করে কি না! সূর্য ডোবার সময়ে তারা হঠাৎ বিস্মিত হ'ল। কেন ডোবে সূর্য—এই কথাই তারা ভাবল।

অন্ধকার রাতে আদম ইভকে স্পর্শ করল আবার। গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করল তাকে। আনন্দ পেল তারা। কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যেও কোথায় রইল একটু অতৃপ্তি। সেই অতৃপ্তি তাদের দুঃখ দিল। সেই দুঃখকে তারা ভুলতে পারল না কোনদিন।

সেই অতৃপ্তির দুঃখ নিয়েই তারা ঘুমোল। আর ঘুমিয়ে সারারাত স্বপ্ন দেখে শিউরে উঠল। জ্ঞানের অভিশাপ নিয়ে মানুষের সন্ততিরা রক্তের নদী পার হচ্ছে, দেখল তারা। বড় বড় যন্ত্র চলেছে,

দেখল তারা ; যন্ত্র ব'লে বুঝল না, তাদের মনে হ'ল—দানব, তার ধারাল চাকায় রক্তের স্রোত। প্রেমহীন, অনুভূতিহীন মানুষের জীবনে শুধু দুঃখ আর মৃত্যু। দেখে দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠল তারা।

গুহার বাইরে অন্ধকারে তখন চলেছে বৃষ্টি, ঝড় আর বজ্রপাত। বজ্র হয়তো ঈশ্বরের রোষাগ্নি, কিন্তু বৃষ্টির ধারা কি তাঁর শোকাশ্রু ?

প্রণব মিত্র

দাসত্ব

জীবনকে অনুসরণ করাই মানুষের কাজ। তাই তার দিন দুঃখ দিয়ে রাঙানো,-রাত ব্যথার অশ্রুতে ভরানো।

আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগের কোন এক শুভ মুহূর্তের মধুর লগ্নে আমার যাত্রা হয়েছিল শুরু। কিন্তু যাত্রারম্ভের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত দেখছি জীবনকে অন্ধ অনুসরণ, আর শুনছি দাসত্বের শৃঙ্খল-ঝঙ্কার। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চালিয়েছি আমার অভিসার ; আর করেছি জীবনের আলো-ছায়ায় পরিভ্রমণ। আঁধার থেকে আলোতে দেখেছি সভ্যতার জয়যাত্রা। আমি দেখেছি, দাসত্বের অপমানে জর্জরিত আত্মার আর্তনাদ। সবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণ, তাও দেখেছি।

ব্যাবিলন থেকে কায়রো, আঁতুর থেকে বোগদাদের পথে পথে লক্ষ্য করেছি মানুষের ইতিহাস-শৃঙ্খলিত জীবনের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন। আমি শুনেছি, ফেলে-আসা দিনের বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

আমি মন্দিরে প্রবেশ ক'রে পূজাবেদী দেখেছি, প্রসাদ খেয়েছি, বসেছি দেবতার সামনে। আমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল কর্মচারীর দাসত্ব, সৈনিকের দাসত্ব, শাসকের দাসত্ব, রাজার দাসত্ব, পুরোহিতের দাসত্ব—একঘেয়ে একটানা দাসত্বের কলরব-মিছিল যেন সব !

ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে আমার অবাধ বিচরণ হয়েছে। প্রতিপদে লক্ষ্য করলাম, শিশু গ্রহণ করছে দাসীর স্তন্য আর কিশোরের হচ্ছে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাসত্বের হাতেখড়ি।

কংগো থেকে ইউফ্রেটিসের তীর পর্যন্ত আমি সহযাত্রী ছিলাম রূপধর্মের। আমার যাত্রা হয়েছে নীলনদের উৎস-মুখ থেকে আবিসিনিয়ার প্রান্তে; এথেন্সের চোরাগলি থেকে রোমের গীর্জার দরজায়; কনস্তান্তিনোপোলের বস্তি থেকে আলেকজেন্দ্রিয়ার রাজপ্রাসাদে। কোন জায়গায় বাদ পড়ল না অজ্ঞতার অন্ধ আলোড়ন আর দাসত্বের স্পর্ধিত মিছিল দেখা।

এক দিকে দেখেছি ভগবানের উদ্দেশে বলিদান আর এক দিকে সুরার সঙ্গে সুগন্ধ মিশিয়ে রাণীর কাছে বলিদান। ধূপ জ্বালিয়ে সুরভিতে মাত করার নাম অবতার; তার সামনে নীরব প্রার্থনার নাম আইন; তার জন্য যুদ্ধ ক'রে মরা যোগপ্রেম; তার জন্য সংগ্রাম হচ্ছে সৌভাগ্য; আর অপরের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মানে একতা!

তার যতগুলো নাম, ততখানি সত্তা নয়। তার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ এক ধাতুতেই গড়া। কিন্তু এটা রোগের মত জন্ম থেকেই ধ'রে আছে।

অন্ধ দাসত্বের পরিচয় পেতে গিয়ে দেখেছি বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার আনুগত্য—যেন প্রাচীন খোলসে নতুন দেহ।

আর এক ধরনের দাসত্ব দেখেছি, যার ভাষা নেই, প্রকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। অনাদৃত স্ত্রীকে তার অনাকাঙ্ক্ষিত স্বামীর সঙ্গে জোর ক'রে বাসের দুর্বিষহ জীবন।

দাসত্বের বীভৎস রূপ দেখাও বাকি নেই; জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই যা ক'রে তোলে লোভের অন্ধ দাস। যেখানে অজ্ঞান এসে প্রয়োজনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে মানুষকে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। নিরাশা দিচ্ছে অপমানের জ্বালার প্রলেপ।

'আমি যে দেখেছি' প্রতিকারহীন দাসত্বের নব নব রূপ—এক জিনিসকে অন্য নামে প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টা। ইতরামিকে বলে বুদ্ধি, মূল্যহীন উচ্ছ্বাসের নাম জ্ঞান, দুর্বলতার পরিচয় হচ্ছে অন্তরের কোমলতা, আর কাপুরুষতা হচ্ছে শক্তির প্রাচুর্য নিয়ে উপেক্ষা।

বিকৃত দাসত্বও আমি দেখেছি। যা দুর্বলকে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয় না, সর্বদাই ক'রে রাখে ভীত সন্ত্রস্ত। মনের ভাব প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা

তাই অজ্ঞাত আর অবজ্ঞাত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে, শিশুদের কামনা-বাসনার পথকে করে কণ্টকিত।

এইখানেই শেষ নয়। আমি আরও দেখেছি মানুষের সুপরিচিত-চিরদাসত্বের ছবি। যা অপরাধীর বংশধরদের জীবনে আনে কলঙ্ক আর বিভীষিকা। সংক্রামক রোগের মত দীর্ঘদিনের জন্য তিলে তিলে ছড়িয়ে পড়ে দেহ থেকে দেহান্তরে।

এমনই ক'রে নিঃসঙ্গভাবে নির্জনে চলেছে আমার যুগপরিভ্রমণ। দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে ব'সে পড়লাম ছায়া-মাখানো জীবনের তটে। এখানেও আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল অতীতের অপরাধ লুকানোর ব্যস্ততা আর ভবিষ্যতের নিজেকে ঢেকে রাখার ব্যগ্রতা। সেই অশ্রুসিক্ত আর রক্ত-মাখানো বিষাক্ত আবহাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের কানে শুনতে পেলাম দাসত্ব-কবলিত জীবনে গুমরে-মরা আত্মার আকুল দীর্ঘশ্বাস।

কতক্ষণ সেই ভাবে ব'সে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ চমক ভাঙলে দেখি, আমার পাশে এক বীভৎস প্রেতাত্মা মুমূর্ষু অবস্থায় প'ড়ে আছে। কিন্তু তার স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি ওপরের দিকে আটকানো। মনটা ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল। ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, নাম?

স্বাধীনতা।—অস্পষ্ট জবাব এল সেই কুৎসিত প্রেতের কাছ থেকে।

তোমার আত্মীয়স্বজন, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই?—আবার জিজ্ঞেস করলাম।

মুমূর্ষুর চোখ দুটো জলে টলটল ক'রে উঠল। বুক চিরে বেরিয়ে এল এক গভীর দীর্ঘশ্বাস। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলে, একজনকে বলি দিয়েছি ক্রুশে; একজন মরেছে পাগল হয়ে, আর তৃতীয় জনের এখনও শৈশব।......

আরও কিছু বলবার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু বেদনাহত অন্তর আর অশ্রুভরা দৃষ্টিতে কিছুই শুনতে পেলাম না। নিজেকে সামলাবার জন্য দু হাতে মুখ ঢাকি শুধু...*

শ্রীতন্ময় বাগচী

---

* খলিল জিব্রানের 'স্লেভারি' অবলম্বনে।

সংবাদ-সাহিত্য

আজ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শুভ পয়লা বৈশাখ। ঠিক দশ বৎসর পূর্বে এই তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁহার "আশি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে জন্মোৎসবে অভিভাষণ"-স্বরূপ "সভ্যতার সংকট" বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনার শেষ অংশ এইরূপ—

"এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি এ'কে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ডহাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছে।······দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ ক'রে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত ক'রে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।"

আশি বৎসরের রবীন্দ্রনাথের আজ নব্বই বৎসর পূর্ণ হইল; তাঁহার তিরোধানের পর প্রায় দশ বৎসর হইতে চলিল। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য মানুষদের হস্তস্খলিত হইয়া নামে স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু সেই পাশ্চাত্ত্য "বিধি এবং ব্যবস্থা" একচুল বদলায় নাই। মানুষ গিয়াছে, কিন্তু method রাখিয়া গিয়াছে। ফলে যে ভয়াবহতার মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ঋষি-কবি সেদিন তাহা আশঙ্কা করিয়াই তাঁহার সেই বিখ্যাত বহুপ্রচারিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে

একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

রবীন্দ্রনাথ এই দেউলিয়া-অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বাস্তবে ইহা যে কতখানি বীভৎস ও ভয়ঙ্কর হইতে পারে আমরা তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। "লক্ষ্মীছ'ড়া দীনতার আবর্জনা" "বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতা" এই সকল সাধু সংস্কৃত বিশেষণে এই অবস্থা পরিস্ফুট নহে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনের সকল বিভাগে ব্রিটিশ "বিধি এবং ব্যবস্থা"র ভারতীয় বিকারে কি নিলর্জ জঘন্যতার তাণ্ডব চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহা ধারণা করা সম্ভব ছিল না। যে মা-কালী-মহাত্মাগান্ধীর নামে শপথ করিয়া পাশ্চাত্যমতে এই ডাকাতি ও নরহত্যা চলিতেছে, সেই মহাত্মা গান্ধীই আজীবন আর্তকণ্ঠে সেই পাশ্চাত্য মত পরিহার ও পরিবর্তন করিবার জন্য তথাকথিত শিষ্য ও ভক্ত সম্প্রদায়কে ব্যাকুল অনুরোধ জানাইতে জানাইতে আত্মবলি দিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে ততদূর পর্যন্ত দেখিতে হয় নাই।

ভারতে ইয়োরোপীয় সভ্যতার এই সংকটে মহাভারতের আর এক-জন মহাসাধকের কথাও স্মরণীয়। কিছু দিন হইল (১০ জানুয়ারি ১৯৫১) বোম্বাইয়ের 'মৌজ' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের একটি পুরাতন পত্রের (পণ্ডিচারি, ৫ জানুয়ারি ১৯২০) অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—

I do not at all look down on politics or political action or consider I have got above them. I have always laid a dominant stress and I now lay an entire stress on the spiritual life, but my idea of spirituality has nothing to do with ascetic withdrawal or contempt or disgust of secular things. There is to me nothing secular, all human activity is for me a thing to be included in a complete spiritual life, and the importance of politics at the present time is very great. But my line and intention of political activity would differ considerably from any now current in the field. I entered into political action and continued it from 1903 to 1910 with one aim and one alone, to get into the mind of the people a settled will for freedom and the neccessity of a struggle to achieve it in place of the futile rambling Congress methods till then

in vogue. That is now done and the Amritsar Congress is the seal upon it. The will is not as practical and compact nor by any means as organised and sustained in action as it should be, but there is the will and plenty of strong and able leaders to guide it. I consider that in spite of the inadequacy of the Reforms the will to self-determination, if the country keeps its present temper, as I have no doubt it will, is bound to prevail before long. What preoccupies me now is the question what it is going to do with its self-determination, how will it use its freedom, on what lines is it going to determine its future?

You may ask why not come out and help myself so far as I can in giving a lead? But my mind has a habit of running inconveniently ahead of the times,—some might say, out of tune altogether into the world of the ideal. Your party, you say, is going to be a social democratic party. Now I believe in something which might be called social democracy, but not in any of the forms now current, and I am not altogether in love with the European kind, however great an improvement it may be on the past. I hold that India having a spirit of her own and a governing temperament proper to her own civilization, should in politics as in every thing else strike out her own original path and not stumble in the wake of Europe. But this is precisely what she will be obliged to do, if she has to start on the road in her present chaotic and unprepared condition of mind. No doubt people talk of India developing on her own lines but nobody seems to have very clear or sufficient ideas as to what those lines are to be. In this matter I have formed ideals and certain definite ideas of my own, in which at present very few are likely to follow me, since they are governed by an uncompromising spiritual idealism of an unconventional kind and would be unintelligible to many and an offence and stumbling block to a great number.

পাশ্চাত্ত্যমতে "Secular" হইবার চেষ্টায় ভারতবর্ষ কতখানি আত্মঘাতী হইতে পারে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ তাহার আভাসও নিশ্চয় পান নাই। তাঁহার কথা এবং আজ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিবার দিনে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ কথাগুলি আমাদের বর্তমান নিদারুণ সংকটে কতখানি আশ্বাস দিবে জানি না। রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলি এই :—

"আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব।

আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

হে জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা, আমরাও যেন শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারি, এখনই যেন আমাদের আশাভঙ্গ না হয়!

বিলম্বিত বর্ষশেষের কাগজে আমাদের নববর্ষের ইহাই প্রার্থনা।

গত মাসে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক যে সরকারী সম্মেলন বসিয়াছিল. তাহাতে সম্মেলনের অধিনায়ক ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মহামহোপাধ্যায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের প্রশস্তি গাহিয়া সকল ভারতীয় সাহিত্য-সেবীকে হিন্দীর অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমরা বাঙালীরা খুবই গৌরবান্বিত হইয়াছি। বাচনিক ক্ষেত্রে তিনি উত্তম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যে বস্তুর দ্বারা চিপিটক আর্দ্র হয়, তাহা তাঁহার বদান্যতায় প্রায়শই উর্দু-খাতেই প্রবাহিত হয় শুনিতে পাই; বাংলা-খাতে তাহার দুই-এক ফোঁটাও পতিত হয় না, ইহাই বাংলা দেশের দুঃখ। হিন্দীকে রসসিঞ্চিত করিবার পূর্বে তাই তাঁহার নিকট বাঙালীর প্রার্থনা, যত্তে দক্ষিণং হস্তং তেন মাং পাহি নিত্যম্। কারণ, হে মহাভাগ, বাঙালী বড় নির্ধন, ধনের অভাবে ঘরে বাহিরে তাহার লাঞ্ছনা, তাহার শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য দরিদ্রের মনোরথের মত সমতল হৃদয়ে উত্থিত হইবার পূর্বেই লীন হইতেছে। তুমি তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কৃপা কর, পরিবর্তে তাহারা শুধু হিন্দী কেন, অচিরাৎ উর্দুকেও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে পারিবে। তাহার এক অপরাধ মহাভারতের শান্তিপর্বে মহাবীর অর্জুন-প্রোক্ত অর্থ-প্রশস্তিটি সে আজিও আয়ত্ত করিতে পারিল না, এবং পারিল না বলিয়া বিবিধ অনর্থের আবর্তে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যাপার, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়েরা ইহা সম্যক্‌ভাবে অনুশীলন ও প্রয়োগ করিয়া আজ সর্ববিধ জাগতিক দুঃখকে অতিক্রম করিতে পরিয়াছে। আমরা তাহা পারিব না, আমাদিগকে

তুমি কিঞ্চিৎ দাও, আমরা আপনি জীবিত থাকিয়া পিতৃনামও বজায় রাখিতে পারিব। ভীষ্মপর্বে গোটা শ্রীমদ্ভাগবৎ আয়ত্ত এবং ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া শান্তিপর্বে অর্জুন যেমন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, তেমনই তোমাকেও আমরা বলিতেছি—

"মানুষ পার্শ্ববর্তী দরিদ্রকে অপবাদগ্রস্তের ন্যায় দেখিয়া থাকে। অতএব জগতে দারিদ্র্য একটা পাতক। রাজা! নীচ জাতি শোক করে এবং নির্ধন ব্যক্তিও শোক করে; অতএব আমি নীচজাতির ও নির্ধন ব্যক্তির কোন বৈষম্য আছে বলিয়া মনে করি না। পর্বত হইতে যেমন নদী সকল আবির্ভূত হয়, সেইরূপ নানা স্থান হইতে অর্জিত ও ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থ হইতে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়। নরনাথ! এক অর্থ হইতে ধর্ম, কাম ও স্বর্গ হইয়া থাকে; আর অর্থ না থাকিলে মানুষের প্রাণযাত্রাও সম্পন্ন হয় না। গ্রীষ্মকালে কুৎসিত নদীগুলি যেমন স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; সেইরূপ অর্থবিহীন অল্পবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কার্যই অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। যাহার ধন থাকে, তাহার মিত্র আসিয়া উপস্থিত হয়; যাহার ধন থাকে, তাহার বন্ধুও জুটিতে থাকে, যাহার ধন থাকে, জগতে সেই উল্লেখযোগ্য পুরুষ হয় এবং যাহার ধন থাকে, সে মূর্খ হইলেও পণ্ডিত হয়। নির্ধন লোকের মনে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে সে তাহা সম্পাদন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না। মানুষ যেমন হস্তীদ্বারাই বিশাল হস্তী ধরে, সেইরূপ অর্থদ্বারাই অর্থ সম্পাদন করে। নরনাথ! ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়দমন এ সমস্তই অর্থ হইতে নিষ্পন্ন হয়। ধন হইতে কুলের উৎকর্ষ হয় এবং ধন হইতে ধর্ম বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ধনহীন লোকের ইহলোকও নাই এবং পরলোকও নাই।…যাহার ধন কৃশ, গরু কৃশ, ভৃত্য কৃশ এবং অতিথি কৃশ, সেই লোকই বাস্তবিক কৃশ; কিন্তু যাহার কেবল শরীর কৃশ, সে কৃশ নহে।" [মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত অনুবাদ]

হে খণ্ডিত ভারতের পণ্ডিত শিক্ষা-সচিব, সামান্য "গ্রাণ্টের" সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাদিগকে এই শিক্ষাই দাও, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণেও আমরা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তখন হিন্দী, উর্দু, পোস্তু, পাখতুনী কিনতেই

আমাদের আটকাইবে না, যেমন আটকাইতেছে না রাজপুতানার অপভ্রংশ বীর বণিকদের।

যে দেশে চার্বাকেও গীতার ভাষ্য করিতে পারে সে দেশে শ্রীমৎ "বেপরোয়া"র ভাষ্য ছাপাইয়া যে এতখানি বিপন্ন হইয়া পড়িব তাহা ভাবিতেই পারি নাই। ইতিমধ্যেই সর্বসাকুল্যে বিয়াল্লিশটি প্রতি-ভাষ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহাদের সব কটির ভাষা যে ভালবাসা-প্রণোদিত তাহা বলিতে পারিব না, অনেকের বক্তব্য মোটেই ভাসা-ভাসা নয়, অতিশয় তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। আমরা যুক্তি ও গুণবিচারে নাচার হইয়া উহারই মধ্যে উচ্চ ও মধ্যপন্থী দুই মহাজনের বক্তব্য নমুনাস্বরূপ এই সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-সমাজ ইহা গ্রাহ্য করিয়া আমাদিগকে রেহাই দিবেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আমরা নিজেরাই যাহা হয় একটা জবাবদিহি করিব এবং সেই উদ্দেশ্যে মরীয়া হইয়া বিভিন্ন গীতাভাষ্য(মুদ্রিত)সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। মাত্র তিন দিনের পরিশ্রমে যাহা সংগৃহীত হইল, শুধু তাহার তালিকা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইবে। এত লোকের—লোকের বলিলে ভুল হইবে, এত মনীষীর—মেধা ও শ্রদ্ধা যে বস্তুর উপর আলোকপাত করিবার জন্য দ্বিসহস্রবর্ষকাল নিত্যনিয়োজিত রহিয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য বেপরোয়ারা যতই অস্বীকার করিতে চান করুন। তাহার মহিমা কদাচ খর্ব হইবে না। আরও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই তালিকাটিও আমরা আগামী বারে মুদ্রিত করিব। আগেই নোটিশ দিয়া রাখিলাম।

বর্ধমান হইতে কৃষ্ণনগর। কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্বে সপরিবারে বর্ধমান হইতে বিতাড়িত কবি ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় ও সম্মান দিয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির মান রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনা ঐতিহাসিক ও স্মরণীয়; কিন্তু, ইহা অপেক্ষাও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে স্মরণীয় যাহা, স্বয়ং ভারতচন্দ্র তাহা তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে "রাজার অন্নদার সহিত কথা" অধ্যায়ে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
বেদলয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অর্থাৎ ১৬৭৪ শক, ১১৫৯ বঙ্গাব্দ, ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পরিচ্ছন্ন শিল্পসুষমামণ্ডিত কাব্য বাঙালীর হস্তগত হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে এই ঘটনার পরে দুই শত বৎসর শেষ হইতে চলিল। সুখের বিষয়, এবারও কৃষ্ণনগরবাসীরা কবিকে সম্মানিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঐতিহাসিক বৈঠকখানাতেই তাঁহারা 'অন্নদামঙ্গল' পুথি পূজা করিয়া ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন ও জাতির অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিয়াছেন। সেদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং হাত পাতিয়া 'অন্নদামঙ্গলে'র পুথি গ্রহণ করিয়াছিলেন, দুই শত বৎসর পরে তাঁহারই সুযোগ্য বংশধর শ্রীমান সৌরীশচন্দ্র রৌপ্যাধারে তাহা রক্ষা করিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ভারতচন্দ্র যে সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং এই প্রভাব যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার মুদ্রিত প্রমাণ আমরা পাইতেছি হালহেডের ব্যাকরণে (১৭৭৮), ফরস্টারের অভিধানে (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডেফের ব্যাকরণে (১৮০১)। প্রথম বাঙালী সংবাদপত্র-পরিচালক ও পুস্তক-প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, বাংলার প্রথম সাহিত্য-শিল্পী বিদ্যাসাগর মহাশয় যথাক্রমে 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম সচিত্র (১৮১৬ খ্রীঃ) এবং প্রথম সঠিক (১৮৪৭ খ্রী) সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সম্মানিত হন।

সর্বপ্রথম নাটক অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর,' ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, মাইকেল মধুসূদন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে বসিয়াই "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি" ও "ঈশ্বরী পাটনী"কে লইয়া চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। এমন সম্মান কদাচিৎ কোনও বঙ্গকবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। জাতীয় রুচির পরিবর্তনের মধ্যে কিছুকাল শুধু রসিকসমাজেই ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সংগীতির উদ্যোগে তিনি যদি আবার দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

—

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীসুভাষচন্দ্রকে লইয়া জল্পনা-কল্পনার শেষ কখনও হইবে না, কারণ পঞ্চপাণ্ডবের মত ইঁহাদের ভাগ্যেও কিছুকাল অজ্ঞাতবাস ঘটিয়াছিল। এই অজ্ঞাতকালের যে কোনও বিচিত্র কাহিনী আমরা শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা ঘটনার উপর মিথ্যা কল্পনার রঙ চড়াইলে তাহা বরদাস্ত করা কঠিন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র অজ্ঞাতবাসকালে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না এবং তাঁহার একটি কন্যাসন্তান বর্তমান আছে কি না, তাহা লইয়া যত ইচ্ছা বিবাদ চলিতে থাকুক; যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবাহ-দলিল না দেখানো হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা বিশ্বাস করা বা না-করা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের বিবেচনাধীন থাকিতেছে। মহাভারতে বনবাস বা অজ্ঞাতবাসের কালে এরূপ বিবাহ পাণ্ডুপুত্রেরা কেহ কেহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভ্রাতারাও সেই সকল বিবাহ গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁহার ভ্রাতারা সুযোগসত্ত্বেও জীবিতকালে প্রকাশ্যে বিবাহ গ্রাহ্য করেন নাই। সুতরাং যাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অজ্ঞাতবাসের জল্পনা-বিলাসই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি কেহ আজ প্রচার করেন সুভাষচন্দ্রই মাও সে তুং, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিব; কারণ মাও সে তুংয়ের জীবন পূর্বাপর খোলা পাতার মত আমাদের সম্মুখে ধরা আছে। শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে তথ্যের এইরূপ বিকৃতি ঘটাইয়াছেন গত পৌষ সংখ্যা 'গল্প-ভারতী'তে শ্রীবলাই দেবশর্মা, তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও জাতীয় বিদ্যালয়

সম্পর্কে যাহা তাঁহার প্রাণ চাহিয়াছে লিখিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং যাঁহারা তথ্য জানেন তাঁহারা আপত্তি জানাইতেছেন। গত ২০ মার্চের 'যুগান্তরে' "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন ছাত্র" যে কষ্ট স্বীকার করিয়া দেবশর্মা মহাশয়ের ভুলগুলি প্রমাণসহ ধরাইয়া দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের দেশে "দুর হোক, যা হচ্ছে হোকগে ছাই"-জাতীয় অলসতাই প্রবল, ভুলের তাণ্ডব এই কারণে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। আর একটি মারাত্মক ব্যাপার আমাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ঘটিতেছে, উদ্ধৃতির নামে রচনার উপর হস্তক্ষেপ। এ বিষয়ে আমাদের পাঠকেরা ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানগুলি সজাগ হইয়া প্রতিবাদ না করিলে কাঁচপোকা-আরসোলা আর চেনা যাইবে না। গত ১১ মার্চ তারিখের মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' দৈনিকে শ্রীতারাপদ পাত্র দেখাইয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দের *Thoughts and Glimpses* পুস্তকের অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক শ্রীঅধরচন্দ্র দাস নিজের সুবিধা-মত অদলবদল কাটছাঁট করিয়া স্বীয় প্রবন্ধে ঢুকাইয়া শ্রীঅরবিন্দের মতামতের ধর্মনাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ইহা তো হামেশাই হইতেছে, এ যেন সেই বেওয়ারিশ ময়দা, যাহার যেমন প্রয়োজন খানিকটা ঠাসিয়া-ঠুসিয়া লইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রতিকার থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু দেখিতেছি বিদ্যাসুন্দরেরা সেখানে বসিয়াই সিঁধকাঠি চালাইতেছেন !

ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে, মন্দ হইতেও ভাল হইতে পারে। যাহারা কালপ্রবাহে বিস্তার লাভ করিয়া ক্রমশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধু দূরত্বের নয়—মনের ও রুচির ব্যবধান রচনা করিয়াছিল ; যাহাদের পূজা পার্বণ ব্রত, মন্ত্র আলপনা প্রবাদ, এমন কি ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি পর্যন্ত রূপান্তর লাভ করিয়া পৃথক হইতেছিল এবং ভাষার ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের আশা ও ভালবাসা, সংস্কার ও ব্যবহার ভিন্ন হইয়া একই জাতিকে দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করিতে চলিয়াছিল, মহাকালের তাণ্ডবলীলায় তাহারা আবার কাছাকাছি আসিয়া এক হইতেছে। আবাস এবং

অন্নের সমস্যা যেদিন মিটিয়া যাইবে, অনাদরে উষর মরু ও দুর্গম অরণ্যভূমিতে পরিণত বিমুখ মৃত্তিকা-মাতা নিরুপায়ের যত্ন ও চেষ্টায় আবার যেদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন, শুষ্ক নদীখাতগুলি জলপূর্ণ হইয়া মৎস্যাশী জলচর মানুষকে আবার যেদিন আশা ও আনন্দ দান করিবে, সেদিন অন্ধকার ঘোরতর অমঙ্গল পূর্ণ মঙ্গলরূপে দেখা দিবে, নিরানন্দ শ্মশানে আবার স্থানে স্থানে আনন্দমঠ রচনা করিয়া শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে এবং ধূপধুনার গন্ধে ইহাদের প্রাতঃসন্ধ্যা মুখরিত করিয়া তুলিবে। জঙ্গল-জাঙ্গালের মধ্যে যে শ্রীহীন সম্পদহীন কুটীরগুলি আজ একে একে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যেই যেন মেঘের আলোয় ঝলসিত দেবালয়ের কনকত্রিশূল-চূড়া আজ দেখিতে পাইলাম, ফুলের সাজি হাতে ইতস্তত-বিচরণশীলা বালিকাদেরও। যাহারা রহিয়া গেল ভগবান তাহাদের রক্ষা করিবেন, যাহারা আসিয়াছে তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে—নববর্ষের শুভদিনে এই বোধই হইল।

সাদা কাগজের উপর আবার কালোবাজারী প্রেতেদের থাবা পড়িয়াছে, কাগজ নাই অর্থাৎ প্রকাশ্য স্থানে নাই। যাহারা নূতন খরিদ্দার অর্থাৎ যাহাদের কাছে বিক্রেতার চক্ষুলজ্জা নাই, তাঁহারা যে-যাদুমন্ত্রবলে কাগজ সংগ্রহ করিতেছেন, পুরাতন খরিদ্দারদের তাহা প্রয়োগের সুযোগ ও সুবিধা নাই। ফলে, "নাই নাই" শুনিতে শুনিতে তাঁহারা হতাশ হইয়া উঠিতেছেন। আইনত মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছেই, বেআইনী বৃদ্ধির তাল ভদ্র ব্যবসায়ীরা অন্তত সামলাইতে পারিতেছেন না, সুতরাং পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেছেন। শেষ পর্যন্ত তাল গিয়া পড়িতেছে নিরীহ ভদ্র জনসাধারণের উপর, যাঁহারা কষ্টার্জিত উপায়ের কথঞ্চিৎ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয় করিয়া থাকেন। এই বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, তাহা ছাড়াইয়া গেলেই সাহিত্যক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপর্যয় অনিবার্য। গবর্মেণ্টের সহায়তা এবং সজাগ দৃষ্টি ব্যতীত সে বিপর্যয় নিবারণ সম্ভব নয়। অবহিত হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে আমরা সকাতর অনুরোধ জানাইতেছি। ইতিমধ্যে কাগজ চালু রাখিবার জন্য আমরা কিঞ্চিৎ মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইতেছি। বৈশাখ হইতে 'শনিবারের

'চিঠি'র নগদ মূল্য হইবে আট আনা, বার্ষিক ছয় টাকা এবং ষাণ্মাসিক তিন টাকা। মাল যে বেশি দিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা কম, তবু চেষ্টা করিব।

আশার কথা এই যে, এই অবস্থাতেও ভাল ভাল বই বাংলা ভাষায় বাহির হইতেছে। দুর্যোগের মধ্যে প্রকাশকদের কৌশল ও তৎপরতা প্রশংসনীয়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার এবং বিশ্বভারতীর বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সেগুলির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন তাঁহারা এখনও বঞ্চিত হন নাই, দুটি গ্রন্থমালাই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি সাধকদের জন্য 'স্বরবিতান' ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডও বাহির হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতেছেন। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত কাণ্টদর্শনের তাৎপর্য সহ অধ্যাপক ডক্টর রাসবিহারী দাস প্রণীত 'কাণ্টের দর্শন' প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কঠিন তত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী এই প্রথম লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে। রজনীকান্ত গুহ, পঞ্চানন সিংহ, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হুমায়ুন কবীর ও তারকনাথ রায় প্রভৃতি এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞানানুশীলন, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোচনাকে একটা শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলা ভাষায় ইহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-প্রবর্তন নয়। ডক্টর দাস সেই কার্য করিলেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এই দুর্দিনে আমাদিগকে দুইখানি একাধারে প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। 'দেশের কথা' ও 'খাতার পাতা'—প্রথমটি গুরু এবং দ্বিতীয়টি লঘু। গুরু লঘু দুইই খাঁটি বাংলা ভাষায় লেখা—বিমলচন্দ্রের রচনায় ইহাই বিশেষত্ব। 'দেশের কথা'র সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকদের খানিকটা পরিচয় ঘটিয়াছে। "দায়ভাগী" নামের আড়ালে "সংবাদ-সাহিত্যে" এবং অন্যত্র যে সময়োপযোগী অতিশয় প্রয়োজনীয় [illegible]

সঙ্কলন। 'খাতার পাতা'য় আমাদের জাতীয় অনেক সমস্যার আলোচনা আছে, সেগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লেখা—বৈদগ্ধ্যে ও সরস রসিকতায় লেখাগুলি সমুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল আরও এই কারণে যে এগুলিতে আশার কথা আছে। দুইটি বইই ডি. এম. লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। 'যাত্রী'—বিপ্লবী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকথার প্রথম খণ্ড—এই খণ্ডে আমরা কবি সৌম্যেন্দ্রনাথেরই বেশি সাক্ষাৎ পাইতেছি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথের। আমাদের যুগের, আমাদের ক্রমিক মানসিক বিবর্তনের একটা চমকপ্রদ পরিচয় 'যাত্রী' বহন করিতেছে। ইহা নানা দিক দিয়া বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকেরা আরও দীর্ঘপথ 'যাত্রী'র সহযাত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবেন। অভিযান পাবলিশিং হাউস লিমিটেড ইহার প্রকাশক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ গল্পগুলির সংগ্রহ 'কুশল পাহাড়ী' সদ্য প্রকাশ করিয়াছেন মিত্র ও ঘোষ। 'শনিবারের চিঠি'র বিভূতি-সংখ্যায় প্রকাশিত "শেষ লেখা" দিয়া এই সংগ্রহ শেষ হইয়াছে। বইখানি পড়িতে পড়িতে তাঁহার প্রতিভার সতেজ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে করিতে তাঁহার অকালমৃত্যুর বেদনা নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। 'কুশল পাহাড়ী' শুধু গল্পের বই নয়, তাঁহার বহু সাধনা ও বেদনালব্ধ জীবনদর্শন বইখানিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। শ্রীগুরু লাইব্রেরি ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত ও অনূদিত যে উপনিষৎ-মালা প্রকাশ করিতেছেন, বাঙালী সাধারণ পাঠকদের উপযোগী এমন প্রাঞ্জল সংস্করণ আর ছিল না। আচার্য শঙ্কর স্বয়ং ভাষ্য লিখিয়া অথবা তাঁহার ভাষ্যমধ্যে উল্লেখ করিয়া যে চৌদ্দটি উপনিষৎ স্বীকার করিয়াছেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি তন্মধ্যে ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয়খানি প্রকাশ করিলেন, আশা করিতেছি বাকি পাঁচখানি অর্থাৎ ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক কৌষিতকী জাবাল ও মহানারায়ণ উপনিষৎও তিনি বাহির করিবেন। এই উপনিষৎগুলি পাঠে উক্ত আশ্রমের স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি-লিখিত 'উপনিষদের কথা' প্রবেশকের কাজ করিবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি

কার্তিক ১৩৫৭—চৈত্র ১৩৫৭

ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

অপুর দেশে একদিন—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী ... ১৪৯
আঞ্চলিকতা—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ২৫৩, ৩৩০
আরণ্যক—"সম্বুদ্ধ" ... ২১২
আলো—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ... ৪৯১
এ গলিতে বাস মোর—শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ... ৩৪১
এদের এই স্বভাব—শ্রীভোলা সেন ... ৩০৭
'কণ্টকেনৈব'—শ্রীঅমলেন্দু সেন ... ২৮৮
কবিচন্দ্রের "বড়পণ্ডিতাষ্টক"—"প্রত্নকম্র" ... ২৮৫
কবি বিভূতিভূষণ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ১২৭
কয়েকটি প্রশ্ন—"দায়ভাগী" ... ৫২১
কল্যাণ-সঙ্ঘ—শ্রীঅমলা দেবী ২৩, ১৬৪, ২৬৫, ৩৪৫, ৪৫৭, ৫৩০
কাগজ কলম—শ্রীকৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য ... ১৮
কৌতুকী বার্নাড শ—শ্রীমণি বাগচি ... ৮১
ক্যাসাবিয়াংকার বাবা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ... ৭০
গান্ধী-বাণী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৩২৯
গীতাভাষ্য—"বেপরোয়া" ... ৩৬৫
গীতাভাষ্য (আলোচনা)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫২৫
—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ... ৫৩০
ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ... ১২১
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪১
চার্বাক ... ২৫২
চির-যাযাবর—শ্রীমতী বাণী রায় ... ১৩৬
জাতিভেদের উচ্ছেদ—শ্রীনির্মলকুমার বসু ... ১৮৯
তদা — বিজয়ায় ... ৪৯৪
দশ-আনা ছ-আনার সালতামামী—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ... ৫৮৭

।সম্ব—শ্রীতন্ময় বাগচী	...	৫১৮
দূরদৃষ্টি—"সম্বুদ্ধ"	...	৪৫৩
নাতি	...	৮০
নাম—অসিতকুমার	...	৩৪৩
নিঃস্ব বিশ্বনাথ—শ্রীভোলানাথ দত্ত	...	৩৭৬
নেশা ও পেশা—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	...	৬৫
পত্রিকা-সম্পাদক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রী গোপাল ভৌমিক	...	১৮০
পথের পাঁচালী—শ্রী গোপাল হালদার	...	২০৪
পথের পাঁচালী'—দেবব্রত	...	২১৩
'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১১৬
..াগ্লা-গারদের কবিতা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	...	৪৯৫
পা দুটি কি ঠেকিত গলায় ?—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	...	৬৫
পৃথিবীর রূপকথা—প্রণব মিত্র	...	৫৯৩
প্রতিশোধ—শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত	...	৭৫
বঙ্গদেশ কি ছিল ?—"আর্য্যপুত্র সুপ্রিয়"	...	৬৬
বন্দে মাতরম্—বিপিনচন্দ্র পাল	...	১
বর্ষফল—"আফিংখোর"	...	৩৬০
বস্তু ও বাস্তব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	৫৬২
বাউল—সু. চ. ব.	...	১২৫
বাংলা ও বাঙালী—"দায়ভাগী"	...	২৩৩
বাঁচা-মরা	...	২১১
বাণী	...	৩১৬
...ও বিভূতিভূষণ—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	...	১৩৮
	...	১২৬
বিভূতি-দা—শ্রীমনোজ বসু	...	২০২